দশম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৭ হইতে পৌষ, ১৩৪৭

সম্পাদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পরিচয়

সূচিপত্র

১০ম বর্ষ—১ম খণ্ড; শ্রাবণ, ১৩৪৭—পৌষ, ১৩৪৭

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—

পরাভূত (গল্প) ৫১৬

পুস্তক-পরিচয় ১৭৭

শ্রীঅজিত দত্ত—

পুস্তক-পরিচয় ২৭৪

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—

পুস্তক-পরিচয় ৮৪, ৩৬৭, ৪৭৩

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী—

অ্যাক্সিডেণ্ট্ (কবিতা) ৪৪০

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন—

সম্রাট অশোকের শিলালিপি ৫২৮

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী—

জ্বালাতন (গল্প) ৩৫১

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—

মাটি (গল্প) ৪৪৭

শিবির (কবিতা) ৩৪৬

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—

একটি কথা (কবিতা) ১৬১

স্মৃতি („) ৪৪৬

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য—

পুস্তক-পরিচয় ৩৭৫

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়—

অলকা (কবিতা) ২৫৭

নেপথ্য („) ২৮

মৃত্যুং তীর্ত্বা („) ৫৪৩

শ্রীচিন্ময় সেহানবীশ—

পুস্তক-পরিচয় ৫৬২

শ্রীজগদীশ আচার্য্য—

পুস্তক-পরিচয় ১৭৭

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত—

প্যারাডিম (কবিতা) ২৫৪

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—

চতুষ্পদী (কবিতা) ৫৩৯

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

পুস্তক-পরিচয় ৪৬১, ৫৫২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪৮

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—

পুস্তক-পরিচয় ৮৬

শ্রীনিখিলনাথ চক্রবর্ত্তী—
ফ্লাড্ কমিশন রিপোর্ট ও কৃষকের দাবী ... ৫৭

শ্রীপুলকেশ দে সরকার—
ভাষা ও আচরণতত্ত্ব ... ২১৫

শ্রীপ্রতিভা বসু—
পরিশেষ (গল্প) ... ১১১

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক—
পুস্তক-পরিচয় ... ৩৫৯

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—
একখানি প্রাচীন নাটক ... ৭০

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—
জুড়ি-দৃশ্য (গল্প) ... ৩০

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—
পুস্তক-পরিচয় ... ৮৯

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ... ২৮১

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—
বিবর্ত্তন (কবিতা) ... ৪৪৫
পুস্তক-পরিচয় ... ৯২, ৫৬৮

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ... ৪৬৬
সাফো (উপন্যাস) ... ৪৮৭

শ্রীবিষ্ণু দে—
একটি ছবি (কবিতা) ... ২৫৩

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—
ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস ... ২৩৫, ৩১৩, ৪০০, ৫১০

শ্রীমণীন্দ্র রায়—
চাঁদ (কবিতা) ... ৩৪৫

শ্রীমাণিক বন্দোপাধ্যায়—
অহিংসা (উপন্যাস) ... ৪৪, ১৫১, ২০৪, ৪২১, ৫৪৫

শ্রীরজত সেন—
রাজকন্যা (গল্প) ... ২২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
কালিম্পঙের চিঠি ... ৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার—
অবসর (কবিতা) ... ৩৪৭

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—
পুস্তক-পরিচয় ... ৪৫৫

শ্রীশচীন সেন—
পুস্তক-পরিচয় ... ৫৫৯
বাঙালীর রাজনীতি ... ৪৩০

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—
পুস্তক-পরিচয় ... ৭৭, ১৮০, ২৭৬, ৩৭৫, ৫৬৫

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য—
পুস্তক-পরিচয় ... ১৭৮, ৪৭৪
সমতল (কবিতা) ... ১৬৩

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—
মর্ম্মবাণী (কবিতা) ... ৫৪

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত—
পুস্তক-পরিচয় ... ৭৩
রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় পর্য্যায় ... ১৩৬

শ্রীসুশীলকুমার দেব—
সাগরিকা (নাটক) ১০, ১৬৪, ২৫৯, ২৯৮, ৩৯৩

হ—
পত্রিকা-প্রসঙ্গ ৯৪, ১৯২, ২৮৬, ৪৭৬, ৫৭১

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র—
পুস্তক-পরিচয় ২৭১
শান্তি (কবিতা) ৫৫

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—
পুস্তক-পরিচয় ২৮৩, ৩৭৯, ৪৭০, ৫৬৯

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—
অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায় ১
জীবন্মুক্ত ৯৯
জীবন্মুক্তির পরে ১৯৫
জীবন্মুক্তির দশা ২৮৯, ৩৮৩
স্বারাজ্য-সিদ্ধি ৪৫৯

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩৪৭

পরিচয়

অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায়

গত মাসের 'পরিচয়ে' আমরা অমৃতত্ব-সিদ্ধির আলোচনা করিতেছিলাম। সে আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, অমৃতের পুত্র জীবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা অমৃতত্ব-সিদ্ধি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যজ্ঞাদির ফলে তথাকথিত অমর দেবতাদিগের সহিত সালোক্য, সামীপ্য বা সাযুজ্য দ্বারা আত্যন্তিক অমৃতত্ব-সিদ্ধি অসম্ভব। তবে অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায় কি? এক কথায় ব্রহ্ম-সাযুজ্য—সেই অক্ষর অজর অমর ব্রহ্মের সহিত একীভাব।

তমেব বিদিত্বা অমৃতত্বম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—যজুর্বেদ

তাঁহারে জানিলে জীব যায় মৃত্যুপার
অমৃতত্ব-তরে অন্য গতি নাহি আর।

অর্থাৎ, ঐ অমৃতত্ব-সিদ্ধি ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই হয় না—হইতে পারে না।

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুম্ অত্যেতি নান্যঃপন্থা বিমুক্তয়ে
—কৈবল্য, ৯

'তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়—বিমুক্তির গত্যন্তর নাই—নাই।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ—শ্বেত, ১।৮

'ব্রহ্মবিজ্ঞানই পাশমুক্তির অদ্বিতীয় হেতু।'

সে জন্য এই বিজ্ঞানকে ঋষিরা বিদ্যা বলিতেন—আর সমস্ত জ্ঞান অ-বিদ্যা।

ক্ষরং ত্ববিদ্যা অমৃতং হি বিদ্যা—শ্বেত, ৫।১

কারণ, তাহাই বিদ্যা—যাহার ফলে অমৃতত্ব-সিদ্ধি হয়—বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে (ঈশ, ১১)। সেই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তম্ এবৈকং জানথ আত্মানম্

অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষঃ সেতুঃ

—মুণ্ডক, ২।২।৫

'সেই পরমাত্মাকেই একমাত্র জানিবার চেষ্টা কর—তিনিই অমৃতের সেতু। তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ কর।' ঐ আলোচনা 'বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ'—is mere verbiage.

কারণ, যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হন।'

অধিকন্তু তিনি 'পদবিৎ' হন—তিনি অকর্ম-কৃৎ হন—তিনি অতিমৃত্যু অতিক্রম করেন।

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ

রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।

তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ

আত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্॥

—অথর্ববেদ, ১০।৪।৮।৪৪

'যিনি সেই চির তরুণ, অজর, ধীর (বিপশ্চিৎ) পরমাত্মাকে জানেন, মৃত্যু হইতে তাঁহার ভয় হয় না।'

তস্যৈব আত্মা পদবিৎ তং বিদিত্বা

ন কর্মণা লিপ্যতে পাপকেন।

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৮

'তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আত্মা পদবিৎ (path-finder) হয়—তিনি কর্মরূপ পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।'

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।'

সেই জন্য শ্বেতাশ্বতর অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

যদা চর্ম্মবং আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় সংসারান্তো ভবিষ্যতি ॥

—শ্বেত, ৬।২০

'যেদিন মানব বাহুদ্বয়ে মহাকাশকে ক্ষুদ্র চর্ম্মখণ্ডের ন্যায় বেষ্টন করিতে পারিবে, সেইদিনই ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হইবে।'

ঐ মোক্ষ-শব্দের নিরুক্তি কি? ব্রহ্মসাযুজ্যকে কেন মোক্ষ বলা হয়? মোক্ষ অর্থে বন্ধন-মুক্তি—Release, Liberation, Emancipation। কিসের বন্ধন? অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, মোহের বন্ধন—যাহাদিগকে উপনিষদে গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা জীবের বদ্ধভাব হয়—পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ। ঐ অবিদ্যার শাতন হইলে, ঐ কামনা বাসনার বারণ হইলে, ঐ মোহের অপসারণ হইলে—তবেই জীবের মুক্তি (Deliverence)—অর্থাৎ Emancipation, instead of the glory of Heaven.

তখন—ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ

—মুণ্ডক, ২।২।৮

তখন—গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি

—মুণ্ডক, ৩।২।৯

তখন—স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ

—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

তখন—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ

—শ্বেত, ১।১১

বুদ্ধদেব এই মোক্ষকে নির্বাণ বলিতেন। কোনও প্রাচীন উপনিষদে কিন্তু 'নির্বাণ'-শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দুই এক-খানি অর্বাচীন উপনিষদে মোক্ষ-অর্থে নির্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—এবং নির্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনম্ (আরুণেয়, ৫), একমেব পরব্রহ্ম বিভাতি

নির্বাণম্ (ব্রহ্ম, ২)। ইহার কারণ এই যে, বৈদিক যুগে 'নির্বাণে'র মোক্ষ অর্থ হয় নাই। এমন কি, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে সংকলিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণেও 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ মোক্ষ নহে—নির্বাণঃ অবাতে (৮।২।৫০)। নির্ পূর্বক বা-ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় হইলে 'নির্বাত' স্থলে 'নির্বাণ' পদ সিদ্ধ হইবে—অবাতে অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শ না বুঝাইলে (নচেৎ বাতাধিকরণো বাতার্থো ভবতি—কাশিকা)—যেমন নির্বাণঃ অগ্নিঃ কিন্তু নির্বাতং বাতেন।*

বুদ্ধদেবের মতে যিনি নির্বাণী, তিনি—already in this present life, has actually realised complete deliverence from everything that is অনাত্মা—has completed the gigantic task of getting rid of his bondage to this will (তন্‌হা); has burst all the fetters, 'whether refined or gross.' (Grimm, p. 333).

সেই জন্য সাংখ্যেরা মুক্তিকে 'অন্তরায়-ধ্বস্তি' বলেন—মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তিঃ ন পরঃ (সাংখ্য সূত্র, ৬।২০)—অন্তরায়-ধ্বংসই মুক্তি। কি অন্তরায়? কামনা, বাসনা, শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) অশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরা-মৃত্যুম্ অত্যেতি (বৃহ, ৩।৫।১)।

বুদ্ধদেব মোক্ষকে নির্বাণ বলিতেন কেন? তাঁহার নিজের মুখের বাণী শুনুন—

সেয্যথাপি ভিক্খবে। তেলং পটিচ্চ বট্টিং পঠিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝাযেয্য, তত্র পুরিসো ন কালেন তেলং আসিঞ্চেয্য ন বট্টিং চ উপসংহবেয্য। এবং হি সো ভিক্খবে! তেলপ্পদিপো পুবিমন চ উপাদানস্স পরিযাদানা অঞ্ঞস্সচ অনুপাহারো অনাহারো নিব্বায়েয্য। এবং এব খো ভিক্খবে! সঞ্ঞোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্সিনো বিহরতো তন্‌হা নিরুজ্ঝতি, তন্‌হানিরোধা উপাদান নিরোধাপি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খখন্ধস্স নিরোধো হোতি!—সংযুক্তনিকায়

---

* 'গীতাকার কয়েকস্থলে নির্বাণ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন—'শান্তিং নির্বাণপরমাম্' [৬।১৪], 'ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি' [২।৭২], 'স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি' [৫।২৪], অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্ [৫।২৬]। ইহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নহে—কারণ, এখন আমরা যে আকারে গীতা পাই, তাহা বুদ্ধদেব অপেক্ষা অর্বাচীন। ঐ যুগে বোধহয় নির্বাণ শব্দ extinction-অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইজন্য গীতাকার 'ব্রহ্ম' শব্দ উপসর্গ রূপে ব্যবহার করিয়া ঐ মতের প্রতিবাদ করিলেন। প্রাচীনতর আকারে গীতা "ভারত-সংহিতা'র অঙ্গীভূত ছিল—যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে ইত্যাদি।

'হে ভিক্ষুগণ ! যেমন তৈল ও বর্তি সংযোগে প্রজ্বলিত প্রদীপে যদি কেহ তৈল ও বর্তি আর যোগ না করে, তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত সংযোজনের (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান (grasping) নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চ স্কন্ধের নিরোধ হয়।'

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

I teach the annihilation of craving, the annihilation of hatred, the annihilation of delusion.

অর্থাৎ, লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্বাণই নির্বাণ।

Nirvana * is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ—of desire, hatred and illusion * —What is Buddhism. p. 60.

এই যে লোভ দ্বেষ ও মোহ—ইহারা তৃষ্ণা বা তন্‌হারই প্রকট মূর্তি ; সেই জন্য ত্রিপিটকে বহুবার "তন্‌হা"-নির্বাণকেই নির্বাণ বলা হইয়াছে।

'All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তন্‌হা) to remain in contact with the world.—Grimm, p. 339.

অর্থাৎ, উপনিষদের ভাষায়—

সংসার-মোক্ষ-স্থিতি বন্ধ হেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬

অতএব যিনি মুক্ত, যিনি নির্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পুব্বে লোভো, তং অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে দোসো, তং অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে মোহো, তং অহু অকুসলং, সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং ইতি—অঙ্গুত্তর নিকায়।

'একদিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন আর তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ

* This epithet Nirvana, 'the going out', that is to say, the going out in the heart of the three fires of lust, ill-will and dullness.

—Rhys Davis. p. 151.

'Nibbana Nibbana' so they say friend Sariputta ! Now what means Nibbana ? That which is the vanishing of Desire, the vanishing of Hate, the vanishing of Delusion—that, friend ! is called Nibbana,—সংযুক্তনিকায়, VI.

হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।'

যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার দৃষ্টি কিরূপ হয় ? যিনি ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মের সহিত একীভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সেই অমেয় অজ্ঞেয় অজেয়, সেই অব্যয় অদ্বয় অক্ষয়কে আত্মস্থ করিয়াছেন—তিনি বিশ্বকে যে কেবল ব্রহ্মময় দেখেন—

সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।১

বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি—গীতা, ৭।১৯

—তাহা নয়, নানাত্ব তাঁহার নিকট নিঃশেষে নিবৃত্ত হয় (Plurality is wholly negated) ; তখন শুধু সুস্থিত থাকেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ

—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্ম

—মুণ্ডক, ২।২।১১

'ব্রহ্মই অধে, তিনিই ঊর্ধ্বে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই নানাত্ব-নিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯

'ঐ অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ হয়—(মুক্ত পুরুষ) মনঃ দ্বারা তাঁহাকেই দর্শন করেন।' কিরূপ দর্শন করেন ?

যদেবেহ তদ্ অমুত্র, যদ্ অমুত্র তদ্ অন্বিহ—কঠ, ৪।১০

'দেখেন যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে'—তিনি সর্বময়, তিনিই সর্ব—তিনি ভিন্ন কিছু নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—তিনি প্রপঞ্চোপশম (effacing the entire universe)—তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত।

অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং, শিবম্ অদ্বৈতম্

—মাণ্ডুক্য, ৭

যতদিন তিনি নানাত্ব দেখিতেন—pluralityর আয়ত্তে ছিলেন, ততদিন

তাঁহার শোক মোহ ছিল, তাঁহার ভয় ভাবনা ছিল—ততদিন তিনি মৃত্যুর অধীন ছিলেন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯

এখন ? একধৈবানু দ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ম্ ধ্রুবম্ (বৃহ, ৪।৪।২০)—এখন তিনি একত্বের উপলব্ধি করিয়াছেন—বুঝিয়াছেন—'All plurality is mere appearance,' জানিয়াছেন যে, স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্তিত হইয়া যেমন অলাতচক্র (fiery circle) রচনা করে (অলাতচক্রম্ ইব স্ফুরন্তম্ আদিত্যবর্ণম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২৪),—এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব সেইরূপ মায়ার বিবর্ত।

এখানে পাঠককে একটু সতর্ক করিতে চাই। ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সংসারান্ত হয় বটে—কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের জনক নয়—অর্থাৎ, উহা মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নয়। উপনিষদের ঋষি বলেন, মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নয়—মোক্ষ অজাত, অকৃত—জাত বা কৃত নয়—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 'It is uncaused and is not the consequence or effect of any cause' ; দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে, 'it is being and not becoming'—সম্ভূতি নয়, অসম্ভূতি (ঈশ-উপনিষদ, ১২-১৪)*

যাহাই উৎপত্তিশীল, তাহাই বিনাশশীল। মোক্ষ যদি নৈমিত্তিক হইত, তবে উহা নিত্য হইতে পারিত না। গৌড়পাদাচার্য ঠিকই বলিয়াছেন—

অনাদেরন্তবত্বং চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥

'সংসার যদি অনাদি হইত তবে তাহার অন্ত সিদ্ধ হইত না। মোক্ষ যদি সাদি হইত, তবে তাহা অনন্ত হইতে পারিত না।'

বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন—যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং, সব্বং তং নিরোধধম্মং

—মজ্ঝিমনিকায় ১৪৭ সুত্ত

* In the sphere of metaphysical phenomenon, to which emancipation belongs, there is in general no becoming but only a being—as all metaphysical thinkers, not only in India but in the West also, from Perminides and Plato down to Kant and Schopenhauer have recognised.—Deussen's The Philosophy of the Upanisads. p. 344.

'What has in any way become, that must perish.'

এইজন্য মোক্ষকে 'নিরুপাধি' বলে। মোক্ষ দেশ, কাল ও নিমিত্ত—Time Space and Causality—এই ত্রিবিধ উপাধির অতীত। যাহা beyond causation, তাহা Becoming হইবে কিরূপে ?

বিশেষতঃ জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বরূপ—

নিত্যঃশুদ্ধঃ বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সংবিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ

—মৈত্রেয়ী, ১।১১

অতএব আত্মা যখন নিত্যমুক্ত, তখন তাহার মুক্তির কথা উঠিবে কিরূপে ? সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে—কঠ, ৫।১

Emancipation therefore is not properly a new beginning but only the perception of that which has existed from eternity but has hitherto been concealed from us.—Deussen, p. 345.

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ ইহার উপর আর একগ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্তিরিত্যেষা পরমার্থতা।—১০

'পরমার্থ দৃষ্টিতে (from the absolute standpoint) মুমুক্ষা ও মুক্তির কথাই উঠিতে পারে না।'

সে জন্য পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্

'বন্ধ-মোক্ষকে যদি 'বাস্তব' বলিতে চাও, তবে তাহা শ্রুতির অসহ্য'—কারণ, 'we are all emancipated already—how could we otherwise become so ?'—বস্তুতঃ জীব, ছান্দোগ্যের ভাষায়, অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যা-মোহিত)—অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ (ছা, ৮।৩।২)

ঐ অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নয়।

• For deliverance is not effected by the knowledge of the Atman (ব্রহ্মবিজ্ঞান) but it consists in this knowledge; it is not a *consequence* of the knowledge of the Atman but this knowledge is already deliverance (মোক্ষ) in all its fulness.*—Deussen, p. 346.

আমরা দেখিয়াছি, দেহসত্বে ইহ ও এক্ষণেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে—

ইহ চেদ্ অবেদী অথ সত্যম্ অস্তি

যাঁহার হয়—তিনি জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তির সম্পর্কে অনেক কথা বক্তব্য আছে—আগামীতে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* There is no real question of *becoming* perfect or being *made* perfect but of realising the perfection that ever is within. * * It is realisation rather than *becoming*, that will help. * * Dont struggle and endeavour to *become*, by great effort, that which you are essentially all the time.—Bosman.
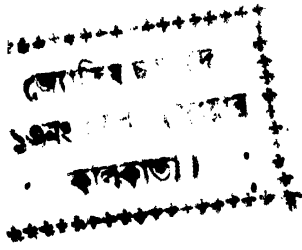
সাগরিকা

তৃতীয় অঙ্ক

(দৃশ্য :—ডাক্তার বাংলোর উদ্যানের এক দুরপ্রান্তে প্রকাণ্ড ও প্রাচীন তরু-রাজির ছায়ান্ধকার মধ্যে জলাভূমি। ডান দিকে এক নোংরা পুষ্করিণীর প্রান্ত-রেখা দেখা যাইতেছে। উদ্যানের অনুচ্চ খোলা বেষ্টনীর বহির্দেশে ফুটপাথ। ফুটপাথের পেছনে ফিওর্ড। দিগন্তে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শ্রেণী। অপরাহ্ণকাল—সন্ধ্যা হয়-হয়। বোলেত্ একটা প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট আছেন। আসনের একপাশে কয়েকখানা পুঁথি ও হাতের কাজের থুকি। হিল্ডে ও লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্ উভয়েই মাছ-ধরার সরঞ্জাম হাতে পুষ্করিণীর পাড়ে-পাড়ে ঘুরিতেছেন।)

হিল্ডে—(লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি ইসারা করিয়া) একটা বেশ মোটা-সোটা দেখ্‌ছি।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—(তাকাইয়া) কই ?

হিল্ডে—(আঙুল দিয়া দেখাইয়া) দেখ্‌ছো না ?—ঐ যে ওখানে। ও হরি! এই যে আরেকটা। (বৃক্ষরাজির অবকাশ-পথে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া) ঐ এলেন ; হাঁটার যা নমুনা—মাছটাকে না তাড়িয়ে ছাড়ছেন না।

বোলেত্—(মুখ তুলিয়া) কে রে ?

হিল্ডে—তোমার মাষ্টার ;—আবার কে !

বোলেত্—আমার মাষ্টার ?

হিল্ডে—তোমার না ত' কি আমার ?

(আর্ন্‌হল্‌ম্ তরু-বীথিকার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতেছেন।)

আর্ন্‌হল্‌ম্—পুকুরে এখনো মাছ আছে ?

হিল্ডে—খুব পুরোণো কার্প্ কয়েকটা আছে বৈকি।

আর্ন্‌হল্‌ম্—ঐ কবেকার কার্প্‌গুলো এখনো বেঁচে থাকে কি-করে ?

হিল্ডে—খাসা তেজী মাছ যে ! ছিপ পাতছি, কয়েকটাকে ধরবো।

আর্ন্‌হল্‌ম্—এর চেয়ে বরং ফিওর্ডে গিয়ে দেখো না চেষ্টা করে।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—যাই বলুন, মজা কিন্তু পুকুরেই বেশী।

হিল্ডে—সত্যি; ভারি ফুর্ত্তি !...আপনি কি সমুদ্র থেকে আসছেন ?

আর্ন্‌হল্‌ম্—স্নানটি সেরেই বরাবর আসছি।

হিল্ডে—কী, ঘের থেকে নেয়েছেন ?

আর্নহল্‌ম্‌—হাঁ। আমি খুব ভালো সাঁতার জানিনে তো।

হিল্ডে—আচ্ছা, চিৎ হয়ে সাঁত্‌রাতে পারেন ?

আর্নহল্‌ম্‌—না।

হিল্ডে—আমি পারি। (লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি) চলো ওপারে গিয়ে দেখা যাক্‌।

(তাঁহারা পুষ্করিণীর পাড় ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলেন।)

আর্নহল্‌ম্‌—(বোলেতের সমীপবর্ত্তী হইয়া) বড়ো যে একা বসে আছো, বোলেত্‌ ?

বোলেত্‌—একাই তো বসি।

আর্নহল্‌ম্‌—তোমার মা এখানে ছিলেন না ?

বোলেত্‌—না ! বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়।

আর্নহল্‌ম্‌—বিকেল বেলাটা কেমন কাট্‌লো তাঁর ?

বোলেত্‌—ঠিক বলতে পাচ্ছিনে। জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম।

আর্নহলম্‌—কি বই ওগুলো ?

বোলেত্‌—একখানা উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব। আরেকখানা ভূগোল।

আর্নহলম্‌—পড়তে ভালো লাগে ?

বোলেত্‌—ভালো লাগলে কি হবে ? পড়ার আমার সময় কোথায় ? আগে তো বাড়ীর খিদমৎগারি শেষ করি, তারপর—

আর্নহলম্‌—তোমার মা—সৎমা—ঘরের কাজে তোমায় সাহায্য করেন না ?

বোলেত্‌—না ; ও আমার কাজ। আমি এই দু'বছর যাবৎই করে আসছি। —যদ্দিন বাবা একলাটি ছিলেন। সেই থেকে এখনো চলছে।

আর্নহলম্‌—তবু কিন্তু তোমার পড়া-শুনার রুচি আগের চেয়ে একটুও কমেনি।

বোলেত্‌—দেখুন, ভালো ভালো বই পেলেই পড়ি। দুনিয়ার খবরাখবর জানতে ইচ্ছে করে। বিশ্বে কি ঘটছে-না-ঘটছে তার সঙ্গে তো আমাদের এখানকার জীবন-যাত্রার কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই !—অন্তত অনেকখানিই নেই।

আর্নহলম্‌—ও কী কথা বলছো, বোলেত্‌ !

বোলেত্‌—আমার মনে হয়, আমাদের জীবন ঐ ডোবার কার্প্‌-মাছের মতো। এতো কাছেই ফিওর্ড রয়েছে। কতো বুনো মাছের ঝাঁক আসছে

যাচ্ছে। অথচ বেচারী ঘরোয়া মাছ-গুলো এর কিছুই জানতে পারলো না—পরিচ্ছিন্ন হয়েই রইলো।

আন্‌হলম্—এরা বেরিয়ে গিয়ে ফিওর্ডে পড়লেই এদের যে কল্যাণ হবে, তা মনে করিনে।

বোলেত্—নেহাৎ দুরবস্থা-ও হবে না, আশা হয়।

আন্‌হলম্—পরন্তু, এস্থানটির সঙ্গে দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই—একথা কি বলা চলে? গ্রীষ্মকালে নয় কিছুতেই; আজকাল তো সংসারের যতো কেজো লোকদের বিশ্রামের আড্ডা বলে' মনে হয়। মনে হয় যেন, পর্য্যটকদের সাময়িক বিরাম-স্থল হয়ে দাঁড়ালো।

বোলেত্—সাবাস্! নিজে দিন-কতকের জন্যে এখানে বেড়াতে এসেছেন কিনা, তাই আমাদের নিয়ে খুব ফষ্টিনষ্টি করা হচ্ছে বুঝি?

আন্‌হলম্—ফষ্টিনষ্টি?—কেন?

বোলেত্—বলছিলুম, এই যায়গাকে আড্ডা নাম দেওয়া অথবা দুনিয়ার কেজো লোকদের বিরাম-স্থল বলা—ইত্যাদি আপনি স্থানীয় লোকদের মুখে শুনে থাকবেন। হুঁ, তাদের মুখে এহেন আলাপ-আলোচনা লেগেই আছে।

আন্‌হলম্—হক্ কথা বলতে কি?—আমারও তাই মনে হয়।

বোলেত্—কিন্তু এর মধ্যে একতিল-ও সত্যি যদি থাক্‌তো! আমরা যারা এখানকার বাসিন্দা তাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি, বলুন? এলোই বা এখানে কিছুদিনের জন্যে এই বিরাট্ বিচিত্র জগতের যত নর-নারী, উত্তর দেশের মাঝ-রাতের সূর্য্য দেখবে বলে'—তাতে আমাদের কি? আমরা তো আর তাদের দলের লোক নই। আমরা মাঝ-রাতের সূর্য্যকে একটি-বারও দেখতে পাইনে। নাঃ! আমরা স্রেফ ভালোমানুষের মতো ঘরোয়া পুকুরেই আমাদের জীবন সুষ্ঠু কাটিয়ে দিতে পারি।

আন্‌হলম্—(পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া) ভীয়ার! বলো দেখি, কী যেন একটা স্পষ্ট কিছুর জন্যে তোমার প্রাণ উৎপিপাসু হয়ে আছে—নয়?

বোলেত্—তা হবে। কি-জানি!

আন্‌হলম্—কী সেটা? কিসের জন্যে তোমার মন এতো উন্মুখ?

বোলেত্—মোদ্দা কথা, এখান থেকে বেরিয়ে পড়্তে চাই।

আর্ন্হলম্—এই তোমার একান্ত ইচ্ছা ?

বোলেত্—তাছাড়া আরো কিছু জ্ঞানার্জ্জন করার ইচ্ছা—সব-রকম বিষয়ের কিছু-কিছু জ্ঞান।

আর্ন্হলম্—আমি যখন তোমায় পড়াতুম তোমার বাবা প্রায়ই বলতেন, তোমাকে কলেজে দেবেন।

বোলেত্—ও ! ভালোমানুষের কথাই তুললেন। বাবা কতোই না মুখে বলেন, কিন্তু কাজের বেলায় ঢুঢু। তখন বাবার সত্যিকার আঁট্ থাকে না।

আর্ন্হলম্—এ তুমি অন্যায় বলোনি। কাজে তাঁর চাড় নেই। আচ্ছা, তুমি এ-সম্বন্ধে তাঁর কাছে কথা তুলেছো ? যথা-সম্ভব পরিষ্কার করে এর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছো ?

বোলেত্—না, এমনিতরো কখনো বলিনি।

আর্ন্হলম্—বলা উচিত ছিলো, বোলেত্। এখনো সময় যায়নি। এখনো বলো।

বোলেত্—তা, কাজের বেলায় যে আমারো আঁট্ নেই। আমিও বাবার দ্বিতীয় সংস্করণ হুবহু।

আর্ন্হলম্—তোমার নিজের ওপর অবিচার করা হচ্ছে।

বোলেত্—তা হতে যাবে কেন ? পোড়া কপাল আমার ! বলতে গেলে—আমার সম্বন্ধে, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করারই বা সময় তাঁর কতোটুকু ? তাঁর অতো ভাবাভাবির দিকে লক্ষ্যও নেই। পারলে কিছুতেই হাঙ্গামা ঘেঁস্তে দেন না। তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব এলীডাকে নিয়েই তিনি বে-সামাল।

আর্ন্হলম্—কাকে নিয়ে ? কী বল্লে ?

বোলেত্—বলছি যে, বাবাতে ও সৎমাতে (বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া)…দেখ্ছেন না, তাঁরা পরস্পর দিব্যি খুশীতে আছেন !

আর্ন্হলম্—সত্যি, এখান থেকে চলে যাওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়।

বোলেত্—শ্রেয় হলে কি-হয় ? বাবাকে ছেড়ে যাবার অধিকার আমার আছে মনে হয় না।

আর্ন্‌হলম্‌—কিন্তু বোলেত্‌ একদিন যেমন ক'রেই হোক্‌, ওঁকে তোমায় পরিত্যাগ করে যেতেই হবে। অতএব যত শীঘ্র হয়, ততোই ভালো। এই আমার ধারণা।

বোলেত্‌—সে একটা কথা বটে। যাই হোক্‌, আমার নিজের সম্বন্ধে আমাকেই ভাবতে হবে। তোড়জোড় করে একটা পেশা আমাকে জুটিয়ে নিতেই হবে। বাবার পর আমার আপনার বলতে কেউ নেই। কিন্তু বাবাকে একলা ফেলে যেতেই আমার ভয়।

আর্ন্‌হলম্‌—ভয় ?

বোলেত্‌—সত্যি, বাবার জন্যে ভয় হয়।

আর্ন্‌হলম্‌—অতো কি। তোমার সৎমা তো রইলেন ? তিনিই তাঁকে দেখবেন-শুনবেন।

বোলেত্‌—তা হয় না। যদি ইনি মা'র মতো নিপুণ হাতে সব গুছিয়ে করতে পারতেন, তবে এক কথা ছিলো। কিন্তু পারেন কই ? অনেক-কিছুই যে তাঁর নজরে পড়ে না।—খেয়াল করেন না অথবা করার দরকার আছে জেনেও গা করেন না ;—এর তু'টোর একটা হবে।

আর্ন্‌হলম্‌—হুঁ, বুঝতে পাচ্ছি তোমার কথা।

বোলেত্‌—বাবা আমার পুরোদস্তুর ভালোমানুষ। আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেছেন, চৌকশ লোক ন'ন তিনি। তবু যে কাজে-কর্ম্মে অবকাশ ভরে তুলবেন, তা নয়। কাজের তুলনায় অবকাশ তাঁর ঢের বেশী। তা ছাড়া, মা-ও তাঁকে লেশমাত্র সাহায্য করতে পারেন না। অবশ্যি এজন্যে বাবাই কিছুটা দায়ী।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কি-রকম ?

বোলেত্‌—দেখুন, বাবার ইচ্ছে, সকলের খালি হাসিমুখ দেখবেন। তিনি বলেন, বাড়ীতে আনন্দের মন্দাকিনী বইবে। তাই আমি ভেবে আকুল হই, তিনি যে মাকে এতো ওষুধ খেতে দেন তাতে অতঃপর তাঁর অমঙ্গলই হবে।

আর্ন্‌হল্‌ম—অ্যা, তাই নাকি ?

বোলেত্‌—হাঁ, এ আমি কিছুতেই না ভেবে পারিনে। এক-এক সময় মা এমন বিতিকিচ্ছি সঙ্‌ও সাজতে পারেন! (সোচ্ছ্বাসে) কিন্তু তাই বলে', আমি ছাড়া পাবো না;—একি অন্যায় নয়? বাস্তবিক বাবার এতে কিচ্ছু উপকার হয় না। আমারও তো নিজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে!

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বোলেত্‌! একটা কথা তোমায় বলি। এ-বিষয়ে আমরা দু'জনে পরে ভালো করে আলোচনা করে দেখবো;—কি বলো?

বোলেত্‌—ফায়দা কিছু হবে কি? আমার ধারণা, কূপ-মণ্ডূকের মতো জীবন কাটানোর জন্যেই আমি আছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—মোটেই নয়। তোমার নিজের ওপরই সমস্ত নির্ভর করছে।

বোলেত্‌—(আস্তব্যস্ত ভাবে) সত্যি?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বিশ্বাস করো। একমাত্র তোমার-ই ওপর এর নির্ভর।

বোলেত্‌—আপনার কথা অক্ষয় হোক। আচ্ছা, বাবার কাছে আমার হয়ে দু'টি কথা বুঝিয়ে বলবেন? বেঁচে যাই তাহলে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—নিশ্চয় বলবো। কিন্তু, তার আগে, তোমার সঙ্গে আমার পুরো-পুরি মন-খোলা আলাপ হওয়া দরকার।

বোলেত্‌—(বামদিকে তাকাইয়া) চুপ্‌! ওঁরা শুনতে পাবেন। এখন থাক্‌।

(এলীডা বামদিক হইতে প্রবেশ করিলেন। মাথায় টুপি নাই। তৎপরিবর্ত্তে একখানা চওড়া শাল মস্তকে ও স্কন্ধে বিন্যস্ত।)

এলীডা—(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে) বাঃ! এখানটায় বড্ড আরাম। বেড়ে লাগছে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—(দাঁড়াইয়া) বেড়াতে গেছলে বুঝি?

এলীডা—হাঁ, বাঙ্গেলের সঙ্গে খুব এক-চোট লম্বা বেড়িয়ে এলুম। এখন একটু জাহাজে করে ঘুরে আসবো।

বোলেত্‌—বসবে না?

এলীডা—না, বসবো না। ধন্যবাদ।

বোলেত্‌—(প্রস্তরাসনে স্থান ছাড়িয়া দিয়া) এখানটায় বেশ আরাম হবে বসে।

এলীডা—(পদচারণা করিতে-করিতে) না-না-না, আমি বসবো না—বসবো না।

আর্নহল্‌ম্‌—বেড়িয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করছো? তোমাকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে কিন্তু!

এলীডা—ও! ভারি ভাল লাগছে! কী অনন্ত তৃপ্তি! আপদ চুকে গেছে। বাঁচলুম। (বামদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া) ও-ই একখানা বড়ো জাহাজ আসছে না? কী ওখানা?

বোলেত্‌—(দাঁড়াইয়া দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) নিশ্চয়ই সেই প্রকাণ্ড ইংরেজ জাহাজ!

আর্নহল্‌ম্‌—বয়া পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই এখানে থামে না, না?

বোলেত্‌—আধঘণ্টাটাক্‌ থাকে। এখন ফিওর্ড উজিয়ে আরও কিছুদূর যাবে।

এলীডা—তারপর কাল রওনা দেবে—অবারিত মহাসমুদ্রের মাঝে, একেবারে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে। আচ্ছা ওদের সঙ্গে থাকলে কেমন হতো! উঃ! যদি যেতে পারতুম, সত্যি!

আর্নহল্‌ম্‌—সমুদ্রে লম্বা পাড়ি কখনো দাওনি, মিসেস্‌ বাঙ্গেল্‌?

এলীডা—না। এই ফিওর্ডে ছোটো-খাটো যে-কয়টা ট্রিপ্‌ দিয়েছি, এই যা।

বোলেত্‌—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) থাক্‌ পাড়ি! আমি বলি, আমাদের শুক্‌নো ডাঙাই ভালো।

আর্নহল্‌ম্‌—দোষ কিসের?—মাটিই তো আমাদের থাকবার যায়গা।

এলীডা—আমি মানি না কিন্তু।

আর্নহল্‌ম্‌—কী, তা নয়?

এলীডা—না। আমার মত বলবো? আমি ভাবি যে, আদিম যুগ থেকে যদি মানুষ সমুদ্রের বুকে, চাই-কি সমুদ্রের গর্ভেও ঘর বাঁধতো, তাহলেই পূর্ণতার দিকে আমরা আজ অনেক দূর এগিয়ে যেতুম;—অগ্রগতি আনন্দ, দু'ই হতো বেশী।

আর্নহল্‌ম্‌—বটে?

এলীডা—আমার মত, এখনো আমাদের তাই করা উচিত। কি বলো? এ-সম্বন্ধে বাঙ্গেলের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে।

আর্নহল্‌ম্‌—বাঙ্গেল কি বলেন?

এলীডা—আমার মতেই তাঁর মত।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—(বিদ্রূপের সুরে) তা হবে। কিন্তু উপায় নেই। একবার ভুল পথে যখন ঢুকে পড়েছি এবং সমুদ্রের জন্তু-জানোয়ার না হয়ে যখন স্থলচর জীব হতেই হলো, তখন এতকাল পরে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করলে ফলাশা ত্যাগ করতেই হবে ;

এলীডা এও ঠিক। অপ্রিয় হলেও কথা অভ্রান্ত। আমার মনে হয়, মানুষ নিজেই তার সহজ জ্ঞান দিয়ে অবস্থাটা বুঝতে পারে। ফলে, তার যে কষ্ট ও আপশোষ হয়, তা দৃষ্টির আড়াল করে-করে চলে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর্দ্দাহের এইটেই হচ্ছে নিগূঢ় হেতু। এ ধ্রুব সত্য।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—ওগো, মিসেস্ বাঙ্গেল্‌! মানুষ যে অতো দুঃখী, তা তো আমার চক্ষে পড়েনি। বরং আমি দেখি, বেশীর ভাগ লোকেই জীবনকে স্বচ্ছন্দ আয়েসের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে, উদ্ধত শান্ত অস্পষ্ট উল্লাসের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে।

এলীডা—না গো, তা নয়। উল্লাস কি-রকম জানো ?—যেমন ধরো গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ মধুর দিবস-ব্যাপী আনন্দ-বিস্তার। সঙ্গে-সঙ্গেই অনাগত অন্ধকার দিনাবলীর আমেজও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে ; দুঃখের পূর্ব্বাভাসের আওতায় মানুষের সুখ আচ্ছন্ন যে ;—ফিওর্ড্‌-গুলোর বুকে চঞ্চল মেঘমালার ছায়াপাতের মতো। এই এখন উজ্জ্বল নীল, দেখতে-না-দেখতে—

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—ফের দুর্ভাবনার স্রোতে গা-ভাসান দিচ্ছো ? এই তো একটু আগে কেমন খুশী, কেমন প্রফুল্ল ছিলে !

এলীডা—সত্যি, খাসা ছিলুম। শুধু-শুধু খামখেয়ালী করে—(অস্বস্থ ভাবে চারিদিকে দৃক্‌পাত করিয়া) ভালো, বাঙ্গেল্‌ কোথায় গেলেন ? আসবেন বলে আসছেন না যে ! মিঃ আর্ন্‌হল্‌ম্‌, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো না ভাই। দেখো না, এইখানে কোথায় আছেন !

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—আচ্ছা যাচ্ছি।

এলীডা—এখনি এখানে আসতে বলো। তাঁকে দেখতে না পেয়ে—

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কী ?

এলীডা—ওঃ ! তুমি বুঝবে না। কাছে না থাকলে তাঁর চেহারাখানা বিলকুল গুলিয়ে যায়। মনে হয়, তাঁকে খোয়ালুম। উঃ ! কী কষ্ট ! যাচ্ছো.

তো? যাও না গো! (পুষ্করিণীর চারিধারে পদচারণা করিতে লাগিলেন।)

বোলেত্—(আর্ন্‌হল্ম্-এর প্রতি) আমি আপনার সঙ্গে আসছি। রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

আর্ন্‌হল্ম্—দরকার নেই। আমিই চিনে নেবো'খন।

বোলেত্—(জনান্তিকে) কী উৎপাত! আবার না একটা অনর্থ বাধে! বাবা নিশ্চয়ই ষ্টীমারে গেছেন।

আর্ন্‌হল্ম্—অনর্থ? কেন?

বোলেত্—দেখুন, তিনি প্রায়ই ও-রকম যান। ভাবেন হয়তো বা পরিচিত কারুর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, ষ্টীমারে একটা রেস্তোরাঁও আছে—

আর্ন্‌হল্ম্—আচ্ছা তাহলে চলো।

(তিনি ও বোলেত্ চলিয়া গেলেন। এলীডা ক্ষণেক নিশ্চল ভাবে পুষ্করিণীর দিকে নতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মধ্যে-মধ্যে অনুদাত্ত স্বরে স্বগত কথা বলিতেছেন ও অসম্পূর্ণ রাখিয়াই থামিয়া যাইতেছেন। উদ্যান-বেষ্টনীর বাহিরে ফুট্‌পাথ্ দিয়া একজন বিদেশী ভ্রাম্যমানের পরিচ্ছদে বাম দিক্ হইতে আসিতেছেন। তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু উস্ক-খুস্ক ও পিঙ্গল। মাথায় একটি স্কচ্ টুপি। একটি ভ্রমণোপযোগী ব্যাগ্ কাঁধের সঙ্গে পেটি দিয়া বাঁধা।)

পরদেশী—(বেষ্টনীর পার্শ্ব দিয়া মন্থর গতিতে যাইতে বাগানের অভ্যন্তরে উঁকি মারিতেছেন। এলীডার দর্শন-মাত্র থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীব্র অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন) শুভ সন্ধ্যা, এলীডা।

এলীডা—(চক্ষু ফিরাইবামাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া) ও ডীয়ার! তুমি এলে শেষে!!

পরদেশী—হাঁ, এসেছি।

এলীডা—(আতঙ্কিত বিস্ময়ে তাকাইয়া) কে তুমি? কাকে চাও এখানে?

পরদেশী—তোমার তো ভালো করেই জানা আছে, এলীডা।

এলীডা—(চমকিত) এ কী! এই কি সম্ভাষণ করার রীতি? কাকে তোমার দরকার?

পরদেশী—তোমাকে।

এলীডা—(কাঁপিতে কাঁপিতে) ও! (তাঁহার দিকে দৃষ্টি উদ্যত রাখিয়া, স্খলিত-চরণে, অর্দ্ধ-স্ফুট আর্ত্তরব করিয়া) কী চোখ্! বাপরে কী চোখ!

পরদেশী—আমাকে তাহলে চিনতে পাচ্ছো? তোমায় আমি পলকে চিনে নিয়েছি, এলীডা।

এলীডা—কী চাউনি! অমন্ করে আমার দিকে তাকিও না, বল্ছি। আমি চেঁচিয়ে উঠবো।

পরদেশী—থামো, থামো। ভয় পাচ্ছো কেন? কিচ্ছু অনিষ্ট করবো না।

এলীডা—(উভয় হস্ত দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া) অমন করে আমার দিকে তাকিও না, বলছি।

পরদেশী—(বাগানের বেড়ায় হাত দিয়া ভর করিয়া) আমি ঐ ইংরেজদের জাহাজে এসেছি।

এলীডা—(আড়চোখে ভীত-দৃষ্টিতে চাহিয়া) আমাকে তোমার কী দরকার?

পরদেশী—তোমাকে কথা দিয়েছিলুম, যতো শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসবো—

এলীডা—যাও, বেরিয়ে যাও, বলছি। এখানে কখনো এসো না—কখ্খনো না। তোমায় তো আমি লিখে পাঠিয়েছিলুম—তোমার সঙ্গে আমার লেনদেন শেষ, একদম শেষ! সে কথা মনে নেই?

পরদেশী—(সপ্রতিভ ভাবে প্রকৃত উত্তর না দিয়া) তোমার কাছে আরও আগেই আসার ইচ্ছে ছিলো। তবু পারিনি। এবারে সুযোগ পেয়েই এলুম, এলীডা।

এলীডা—আমার সঙ্গে তোমার কিসের দরকার? কি চাও তুমি? কেন এসেছো?

পরদেশী—অবশ্য জানো, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

এলীডা—(ভয়ে পশ্চাৎ হটিয়া) বটে? নিয়ে যাবার মতলব?

পরদেশী—হাঁ।

এলীডা—জানো?—আমার বিয়ে হয়েছে?

পরদেশী—তা জানি।

এলীডা—তবু—তবু, তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছো ?

পরদেশী—এসেছি-ই তো।

এলীডা—(উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক চাপিয়া) উঃ! কী দুর্গতি! কী লাঞ্ছনা! কী বিভীষিকা!

পরদেশী—তোমার চলে আসার ইচ্ছে নেই নাকি ?

এলীডা—(কিংবক্তব্যবিমূঢ়) অমন করে তাকিও না!

পরদেশী—জিজ্ঞেস কচ্ছি, আমার সঙ্গে যাবে—না—না ?

এলীডা—না-না-না। কখ্‌খনো না। কখ্‌খনো না। আমি যেতে পারবো না। আমি যাবো না। (মৃদুতর কণ্ঠে) সাহস নেই।

পরদেশী—(বেড়া ডিঙাইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন) শোনো, এলীডা! যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলে যাই।

এলীডা—(পলায়নেচ্ছু হইয়াও অসমর্থ-ভাবে চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন এবং পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষ-কাণ্ডে হেলান দিয়া রহিলেন) ছুঁয়ো না আমায়। কাছে এসো না। যাও! ছুঁয়ো না, বল্‌ছি!

পরদেশী—(সতর্ক পদক্ষেপে নিকটবর্ত্তী হইয়া) এলীডা, আমাকে অতো ভয় কেন ?

এলীডা—(উভয় হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া) ও-রকম তাকিও না আমার দিকে!

পরদেশী—ভয় নেই, ভয় নেই।

(বাঙ্গেল্ বামদিক হইতে উদ্যানে প্রবেশ করিতেছেন)

বাঙ্গেল্—(বৃক্ষ-বীথির অর্দ্ধ-পথ হইতে) কিগো! তোমায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলুম ?

এলীডা—(তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন) বাঙ্গেল্! বাঁচাও! একমাত্র তুমিই আমায় বাঁচাতে পারো।—পারবে ?

বাঙ্গেল্—এলীডা! আবার কী বিপত্তি ঘটালে ?

এলীডা—রক্ষা করো, বাঙ্গেল্! দেখছো না ওকে ? ওই যে—ও-ই যে দাঁড়িয়ে!

বাঙ্গেল্—(ঐদিকে তাকাইয়া) সে-ই লোকটি ? (আরও অগ্রসর হইয়া) জিজ্ঞেস করতে পারি কি, আপনি কে এবং কেন এই বাগানে ঢুকেছেন ?

পরদেশী—(এলীডার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) ওঁর সঙ্গে আমার কথা।

বাঙ্গেল্—বটে ! আপনিই তাহলে—(এলীডার প্রতি) আমিও এই শুনে এলুম, কে একজন বিদেশী বাড়ীতে এসে তোমায় খুঁজছিলেন।

পরদেশী—আমিই।

বাঙ্গেল্—আমার পত্নীর সঙ্গে কী দরকার, শুনতে পারি ? (দৃষ্টি ফিরাইয়া) এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, এলীডা ?

এলীডা—(হাতে মোচড় দিতে-দিতে, নীচু স্বরে) পরিচয় আবার নেই ? আছে গো আছে !

বাঙ্গেল্—(তৎক্ষণাৎ) সে-ই তবে ?

এলীডা—হাঁ, গো—সে-ই ! এক্কেবারে চোখের সামনে ! তুমিও জানো বৈকি—

বাঙ্গেল্—কী—কী বল্লে ? (ঘুরিয়া) তুমি জনষ্টন ?—যে একবার—

পরদেশী—খুশী হয়, জনষ্টন বলতে পারেন। আমার ভয়ের তাতে কিছুই নেই। কারণ এ-নাম আমার নয় ?

বাঙ্গেল্—এ-নাম নয় ?

পরদেশী—না ;—আ-পা-ত-ত নয়।

বাঙ্গেল্—আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন ? তুমি নিশ্চয়ই জানো, বাতি-ঘরের কর্ম্মচারীর কন্যার বহুদিন হলো বিয়ে হয়েছে তা-ও তোমার অজানা নেই, আশা করি।

পরদেশী—সে আমি তিন বছর ধরেই জেনেছি।

এলীডা—(উদ্বিগ্ন) কি-করে জানলে ?

পরদেশী—তখন বাড়ী ফিরছিলুম। তোমার-ই কাছে আসছিলুম, এলীডা। একখানা পুরাণো পত্রিকা পেলুম ; এখানকারই কাগজ। তাতেই বিয়ের খবরটা দেখলুম।

এলীডা—(সোজাসুজি সম্মুখে তাকাইয়া) বিয়ের খবর পেলে !

পরদেশী—আমার কাছে বড়ো উদ্ভট ঠেকলো। কেন ? সেই আঙটি দিয়ে গেরো ;—ওটা কি বিয়ে হয়নি, এলীডা ?

এলীডা—(উভয় হস্তে মুখ আবৃত করিয়া) উঃ !

বাঙ্গেল্‌—কী আস্পর্দ্ধা !

পরদেশী—আজ তা ভুলে গেলে ?

এলীডা—(তাঁহার দৃষ্টি অনুভব করিয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে অমন তাকাচ্ছো কেন ?

বাঙ্গেল্‌—(পরদেশীর নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমার সঙ্গে কথা হোক্‌। ওঁর সঙ্গে কথার কোন আবশ্যক নেই। এখন তো সব জানলে ; আর তোমার এখানে কী কাজ ? আমার পত্নীর কাছে তোমার আর কী প্রয়োজন সাধিত হবে ?

পরদেশী—এলীডাকে কথা দিয়েছিলুম যে, সুযোগ পেলেই আসবো।

বাঙ্গেল্‌—ফের 'এলীডা' !—

পরদেশী—এলীডা-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবেন।

বাঙ্গেল্‌—দেখছি, তুমি আমার স্ত্রীর নাম ধরে ডাক্‌ছো। এমনিতরো ঘনিষ্ঠতা আমাদের এখানে রীতি-বিরুদ্ধ।

পরদেশী—সে আমি বিলক্ষণ জানি। তবে, সর্ব্বোপরি—উনি একান্তই আমার।

বাঙ্গেল্‌—তোমার ! এখনো !—

এলীডা—(বাঙ্গেলের পশ্চাদ্দেশে আশ্রয় লইয়া) উঃ ! আমায় কিছুতেই ছাড়বে না !

বাঙ্গেল্‌—কী বল্লে ?—ইনি তোমার !!

পরদেশী—আচ্ছা, ইনি দু'টো আঙ্‌টি সম্বন্ধে কোনো-কিছু আপনাকে বলেছেন —এলীডা ও আমার আঙ্‌টির ঘটনাটি ?

বাঙ্গেল্‌—বলেছেন বৈকি। তাতে কি ? সে ব্যাপারের তো ইতি হয়ে গেছে বহুদিন। তাঁর চিঠি পাওনি ? তাহলে তো নিজেই জানো ?

পরদেশী—এলীডা ও আমি দু'জনেই স্বীকার করে নিয়েছি যে, আমরা যা করলুম তা-ই সত্যিকার বিয়ে বলে' ন্যায়ত ও ধর্ম্মত মেনে নেবো।

এলীডা—কিন্তু, আমি অস্বীকার করছি। ওসব মানবো না। তোমার সম্পর্কে

একটা কথাও আর আমি জান্‌তে চাইনে। ও-রকম করে আমার দিকে তাকিও না। আমি ও-সব মানিনে, বলে দিচ্ছি।

বাঙ্গেল্‌—নিছক পাগল দেখছি! নইলে, কোথাকার এক ফাঁকা দাবীর ওপর ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এখানে দৌরাত্ম্য করতে আসে?

পরদেশী—তা বটে। আপনি এটাকে একটা দাবী না-ও মনে করতে পারেন।

বাঙ্গেল্‌—তুমি করতে চাও কি? এঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? এই ফিকির তোমার মাথায়?

পরদেশী—নাঃ, ওতে কী লাভ! যদি এলীডা আমার অনুগামিনী হতে চান, তবে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছামতোই আসবেন।

এলীডা—(শিহরিয়া, আর্ত্তকণ্ঠে) স্বাধীন ইচ্ছা!

বাঙ্গেল্‌—বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—

এলীডা—(স্বগত) স্বাধীন ইচ্ছামতো!

বাঙ্গেল্‌—লোকটার বুদ্ধি-সুদ্ধি চুলোয় গেছে। বেরোও এখান থেকে! তোমার সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনা কিচ্ছু নেই।

পরদেশী—(ঘড়ি দেখিতে-দেখিতে) জাহাজে ওঠার সময় হয়ে এলো। (কাছে আসিয়া) ভালোই হলো, এলীডা, আমি আমার কর্ত্তব্য সেরে গেলুম। (আরও কাছে আসিয়া) আমার কথা আমি রাখ্‌লুম।

এলীডা—(মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে, পিছন দিকে হটিয়া) আঃ, আমায় ছুঁয়ো না!

পরদেশী—কালকের রাত পর্য্যন্ত শেষ একবার ভেবে-চিন্তে দেখো—

বাঙ্গেল্‌—ভেবেচিন্তে দেখার কিছু নেই। তুমি তোমার পথ দেখো।

পরদেশী—(পুনশ্চ এলীডার প্রতি) এখন তবে ষ্টীমারে উঠে ফিওর্ডের ভেতরে আরেকটু এগিয়ে যাচ্ছি। কাল রাত্তিরে আবার আসবো। এইখানে তোমায় যেন পাই। বাগানের মধ্যে তুমি আমার অপেক্ষা করে থেকো। একলা শুধু তোমারি সঙ্গে এ-নিয়ে একটা বোঝা-পড়া করে ফেলতে চাই। বুঝলে?

এলীডা—(অনুচ্চ কম্পিত স্বরে) শুনছো, বাঙ্গেল্‌?

বাঙ্গেল্‌—অস্থির হয়ো না। দেখা যাতে না হয় তার বিহিত করছি।

পরদেশী—এখন বিদায়, এলীডা। কাল রাত্তিরে—

এলীডা—(কাতর ভাবে) না-না, কাল রাত্তিরে এসো না। কখ্খনো আর এসো না!

পরদেশী—তখন যদি তোমার ইচ্ছে জাগে, সমুদ্র-পথে আমার সঙ্গিনী হতে—

এলীডা—আঃ! ও-রকম তাকাচ্ছো কেন আমার দিকে?

পরদেশী—বল্‌ছিলুম, যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

বাঙ্গেল্—এলীডা! ঘরে চলো দিকিন্।

এলীডা—উঃ! পারছিনে। শক্তি নেই। রক্ষা করো, বাঙ্গেল্!

পরদেশী—মনে থাকে যেন, কাল যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে এই শেষ!

এলীডা—(ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া) এ-ই শেষ? চির জীবনের জন্যে শেষ?

পরদেশী—(শির দোলাইয়া) হাঁ। এর আর নড়্‌চড়্ হবে না, এলীডা। এখানে জন্মের শোধ আর আসবো না। তুমি আমায় কখ্খনো দেখতে পাবে না। আমার খবরও তোমায় একটিবার কেউ দেবে না। তোমার কাছে চিরকালের মতো আমি শূন্য হয়ে যাবো।

এলীডা—(কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া) ও!

পরদেশী—কর্ত্তব্য ভালো করে ভেবে নিও। আসি এখন। (বেষ্টনীর পার্শ্বে গিয়া উহার উপরে আরোহণ করিলেন। অচঞ্চল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন) এলীডা! কাল রাত্রে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত থেকো কিন্তু। আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো। (ফুট্‌পাথে নামিয়া ডান দিকে ধীর মন্থর-গতিতে চলিতে লাগিলেন।)

এলীডা—(কিছুক্ষণ তাঁহাকে দৃষ্টিদ্বারা অনুসরণ করিয়া) বলে গেলো—“স্বাধীন ইচ্ছামতো”। ভেবে দেখেছো?—বল্লে, স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী তার সঙ্গে যেতে পারি।

বাঙ্গেল্—অধীর হচ্ছো কেন? ও তো চলেই গেলো। আর তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না।

এলীডা—(শির দোলাইয়া) বাঙ্গেল্! ভাব্‌ছো, তাকে ফেরাতে পারবে?

বাঙ্গেল্—লক্ষ্মিটি, দেখোই না কি করি! আমাকে অবিশ্বাস করছো কেন?

এলীডা—(উন্মনা ভাবে তাঁহার কথা না শুনিয়া) কাল রাত্তিরে যখন সে এখানে আসবে—তারপর যখন জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা করবে—

বাঙ্গেল্—তখন—কি ?

এলীডা--জানতে চাই, সে আর কখনো—কখনো এ-মুখো হবে কি ?—বলতে পারো ?

বাঙ্গেল্—এলীডা, লক্ষ্মিটি, তুমি নিশ্চিন্ত হও। এর পরে আর তার এখানে কী কাজ থাক্‌তে পারে ? সে তো এখন সরাসরি তোমার মুখ থেকেই জানতে পেলো, তোমার সঙ্গে আর তার কোনো সম্বন্ধ নেই। এই তো লেঠা চুক্‌লো।

এলীডা—(স্বগত) হয়, কাল—নয়, এই শেষ !

বাঙ্গেল্—ফের যদি ও এখানে উপযাচক হয়ে আসে—

এলীডা—তবে ?

বাঙ্গেল্—তবে আর কি ? বাছাধনকে নাজেহাল না করে ছাড়ছি নে।

এলীডা—এ তোমার অতিশয়োক্তি !

বাঙ্গেল্---ছাড়ছিনে, তোমায় বল্লুম। আর কোনো রকমে না পারলে কাপ্তেনের হত্যার জন্যে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতেই হবে।

এলীডা—(উদ্‌গ্রীব) না-না-না, তা কি হয় ? কাপ্তেনের হত্যা সম্বন্ধে আমরা কিচ্ছু জানিনে—একটা কথাও না।

বাঙ্গেল্—কিছুই জানিনে ? কেন, সে তো নিজেই তোমার কাছে স্বীকার করেছে।

এলীডা—না না, ও-নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না। তুমি যদি এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে যাও, আমি কিন্তু অস্বীকার করবো। কারাদণ্ড তার পক্ষে যোগ্য শাস্তি নয়। সে ঐ অবাধ সমুদ্দুরের নাবিক ;—সমুদ্র-পরিপ্রেক্ষিত হয়েই সে থাকবে !

বাঙ্গেল্—(তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আস্তে-আস্তে বলিতেছেন) হায়, এলীডা !—এলীডা !

এলীডা--(আবেগ আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়তম ! এই লোকটার কবল থেকে আমায় বাঁচাও !

বাঙ্গেল্‌—(ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া) চলো, চলো।

(লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌ ও হিল্ডে উভয়ে ছিপ প্রভৃতি লইয়া ডান দিক্‌ হইতে পুষ্করিণীর পাড় ধরিয়া আসিতেছেন।)

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—(দ্রুত এলীডার সমীপবর্ত্তী হইয়া) শুনুন, মাসীমা, আশ্চর্য্যের কথা।

বাঙ্গেল্‌—কী ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—অবাক্‌ কাণ্ড! সেই আমেরিক-কে দেখতে পেলুম।

বাঙ্গেল্‌—আমেরিক কে হে ?

হিল্ডে—আমিও দেখেছি।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—ও বাগানের পেছন দিক্‌টা একবার পরিক্রমা করে সেই প্রকাণ্ড ইংরেজ জাহাজটায় গিয়ে উঠলো।

বাঙ্গেল্‌—তুমি আগে জানতে ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—আমি যে একবার সমুদ্রে তার সহযাত্রী ছিলুম। যাকে ধ্রুব জলমগ্ন ভাবতুম, তাকে আজ কিনা উন্মগ্ন অবস্থায় দেখতে হলো!

বাঙ্গেল্‌—ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানো ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—না।...কিন্তু এ-আমি নিশ্চয় বলতে পারি, ও তার স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

বাঙ্গেল্‌—এর মানে ?

হিল্ডে—লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌ যে ওকে তাঁর শিল্পের বিষয়-বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

বাঙ্গেল্‌—যাঃ, একটি বর্ণও বুঝতে পারলুম না।

এলীডা—তোমাকে পরে বল্‌বো'খন।

(আন্‌হলম্‌ ও বোলেত্‌ উদ্যানের বাহিরকার ফুট্‌পাথের বাম দিক্‌ হইতে আসিতেছেন।)

বোলেত্‌—(উদ্যানস্থ সকলের প্রতি) সবাই দেখে যাও। ও-ই বড়ো জাহাজটি ফিওর্ড্‌ উজিয়ে চল্‌লো। (একটি বৃহৎ ষ্টীমার শনৈঃ শনৈঃ চলিতে আরম্ভ করিয়া দূরে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।)

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—(উদ্যান-বেষ্টনীর অন্তরাল হইতে হিল্ডেকে) আজ রাত্তিরে সে নিশ্চয়ই বউকে খুঁজতে বেরোবে।

হিল্ডে—(মাথা দোলাইয়া) সে-ই অন্যপূর্ব্বা নাবিক-রমণীকে তো ?—তা বেরোবে বৈকি।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—একেবারে নিশীথ রাত্রে—

হিল্ডে—বেড়ে মজা হবে যাহোক্।

এলীডা—(অর্ণবপোতকে চলিতে দেখিয়া) তাহলে কাল—

বাঙ্গেল্—হাঁ। তারপরে চিরতরে শেষ।

এলীডা—(অনুচ্চ অনুনয়ের স্বরে) ওগো বাঙ্গেল্! আমাকে আমার নিজের কাছ থেকে বাঁচাও!

বাঙ্গেল্—(উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া) এলীডা, এ-সবের পেছনে যেন কী রহস্য আছে।

এলীডা—এক—আকর্ষণ!

বাঙ্গেল্—আকর্ষণ ? কিসের ?

এলীডা—সাগরবৎ ঐ মানুষটির আকর্ষণ!

(চিন্তিত মন্থর-গতিতে উদ্যানের মধ্য দিয়া বাম দিকে চলিলেন। বাঙ্গেল্-ও অস্বস্তিপূর্ণ চিত্তে চলিতে-চলিতে তাঁহাকে নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।)

ক্রমশঃ

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইবসেনের "The Lady from the sea" হইতে অনূদিত

নেপথ্য

মৃত্যুর গবাক্ষ খোলা ঃ
কালের দিগন্ত শ্যাম—
চিতাধূম-বিষবাষ্পনীল।
করোটি-কঙ্কর-কীর্ণ বন্ধুর প্রান্তর
পদশব্দ-প্রতিধ্বনি উচ্চকিত করে—
অন্তহীন প্রেতের মিছিল।
বিষনীল রক্ত-বৈতরণী-—
নাগবেণী বঙ্কিল পৃথ্বীর ঃ
পৃথ্বী সে পূতনা ধাত্রী
স্তনগিরি নীলবিষে ঠাসা।
কঙ্কাল-পঞ্জর হানে
চৈতী হাওয়া হা-হা অট্টহাসে—
ধ্বংসের রভস-মত্ত কার্মুক-টঙ্কার
ক্রূর বিধাতার—
বিশৃঙ্খল বর্বর উল্লাস।......
হাসি নয়—
উদ্‌গীরিত প্রতপ্ত উচ্ছ্বাস,
নিরালম্ব হতাশার গুরু গুমরণ,
দুঃশাসন সৃজনের বেড়াজালে বন্দী বিধাতার
অমরতা-অভিশপ্ত আর্ত আর্তনাদ।

মৃত্যুর গবাক্ষ খোলা ঃ
আড়াল করিয়া ঢাকো—
যৌবনপিনদ্ধ তনু নীলবাসে লীলায় সম্বরো।
চাঁদ-নেভা অন্ধকারে মুখোমুখি বসি এসো

এই ছোটো ঘরে—
আধোছায়া-আধোআলো মরণমেদুর।
রাত বাড়ে ;
ঘুম থাক্ আজ ;
দীপে কিবা প্রয়োজন—
আছে তব নয়নের নিশীথ-বিস্ময় ;
কথায় কি কাজ ?
খুলে দাও প্রবল-তিমির-কেশভার—
মরণ-প্রান্তরবাহী নিশীথের হিম হাওয়া
ঈঙ্গিসী সে-বীণায় হোক্ রূপায়িত
নিবৃত্ত-বচন গুঞ্জরণে—
একান্তে যে-জালবোনা তোমায় আমায়
নাহি মানি' বিধাতার ঋণ।
জীবন-দিগন্ত জানি মরণ-খণ্ডিত—
পরম দাক্ষিণ্য তায় মানি।
চাহিনা চাহিনা অমরতা
মৃত্যুমৌলি মহিমায় গরীয়ান্ প্রেমবিনিময়ে ;
পরিবর্তভিক্ষু আজ পরিক্লান্ত পরম দেবতা।

মৃত্যুর গবাক্ষ খোলা ॥

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

জুড়ি-দৃশ্য

প্রথম ধাক্কা

আমি যখন নেহাৎ ছোকরা, তখন কলকাতায় প্রথম পড়তে আসি। নেহাৎ ছোকরা বলছি এই জন্যে যে, তখন আমি তেরো পেরিয়েছি, কিন্তু চৌদ্দতে পৌঁছইনি।

থাকতুম কায়ক্লেশে বৈঠকখানা বাজার রোডে একটি ভাড়া বাড়ীতে। বাড়ীটা মন্দ নয়, কিন্তু ছোট।

ছেলেবেলা থেকে পাড়াগাঁয়ে যে বাড়ীতে মানুষ হ'য়েছি, সে বাড়ীতে ছিল দেদার প'ড়ো জমি। সুতরাং বায়ুভুক আমাদের ভূমিশূন্য বাড়ীতে কায়ক্লেশেই থাক্‌তে হ'ত।

বাবা তখন থাকতেন পশ্চিমে চাকরির খাতিরে।

একদিন বাবা না-বলা-কওয়া হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তাঁকে দেখে খুসী হলুম, কিন্তু একটু চম্‌কে উঠলুম। আদালত খোলা—এ অবস্থায় তিনি এলেন কি ক'রে ও কিসের জন্যে বুঝতে পারলুম না। শুনলুম রাণীমার এক জরুরী তার পেয়ে, বাবা তিন চার দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছেন। রাণীমা ছিলেন আমাদের স্বজাত গেরস্তের মেয়ে, বাবার মাতৃস্থানীয়া। তাঁর জোর তলব তিনি অমান্য করতে পারেন না। আহারান্তে তিনি উত্তর বঙ্গের ট্রেণে চ'লে গেলেন আর পরদিনই ফিরে এলেন,—রাণীমার কাছে অজস্র ভর্ৎসনা খেয়ে। একথা এখানে উল্লেখ করবার কারণ এই যে, বাবা হাসিমুখে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু মন ভার ক'রে। বাবার অপরাধ দাদাকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিলেন। রাণীমার মতে বিলেত যাওয়াও যা, আন্দামান যাওয়াও তাই। কালাপানি পার হয় সুধু কুলাঙ্গাররা।

(২)

তার পরদিন সকালে বাবা বল্‌লেন—আজ বিকেলে জয়ন্তীবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে বাবার শেষ দেখা।

জয়ন্তী বাবুর নাম আগে শুনেছি, কিন্তু তিনি কে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানতুম না। তিনি আমাদের দূরসম্পর্কীয়ও কেউ নন্। জয়ন্তীবাবু কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ। তিনি কলকাতার আদিবাসী, আমরা পদ্মাপারের বাঙ্গাল।

বাবা কৈশোরে সেকালের হিন্দু কলেজে পড়তেন, তারপর প্রথম যৌবনে নিজেদের জমিদারীর মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির হাইকোর্টে করতেন এবং সেই সঙ্গে রাণীমারও। জয়ন্তীবাবু ছিলেন বাবার বড় ইংরেজ ব্যারিষ্টারের বাবু, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়। বাবা তাঁকে বড় ভাল লোক বলেই জানতেন। যদিও সেই মামলায় বাবা সর্ব্বস্বান্ত হন, তবুও জয়ন্তীবাবুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। বিশ পঁচিশ বৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, তবুও বাবার মনে তাঁর সব পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠল। বোধহয় রাণীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার ফলে।

জয়ন্তীবাবুর কোন্ রাস্তার বাড়ী বাবা তার নাম জানতেন, কিন্তু বাড়ীর নম্বর জানতেন না। বিকেলে আমি ঠিকে গাড়ীতে বাবার সঙ্গে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে গেলুম। আমিই ছিলুম বাবার ইঁচড়ে পাকা ছেলে, তাই আমিই হলুম তাঁর পথ-প্রদর্শক। যদিচ সে অঞ্চলে আমি পূর্ব্বে কখনো যাইনি, পরেও নয়। একালে আমাদের পলিটিকাল নেতারা যেমন মুক্তি কোন পথে জানেন না অথচ আমাদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক হ'ন।

(৩)

বাবা একখানা বাড়ী দেখে বললেন, এই জয়ন্তীবাবুর বাড়ী। বাড়ীটি বড় এবং কেতা-দুরস্ত। পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস ক'রে শুনলুম বাড়ী এককালে ছিল জয়ন্তীবাবুর, এখন হ'য়েছে অন্যের। জয়ন্তীবাবু শুনলুম বেঁচে আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তা কেউ বলতে পারে না। পাড়ার একটি মুদি বল্ল, তাঁর ভাই কুলদাবাবু বীডন ষ্ট্রীটে থাকেন, তাঁর কাছে গেলেই জয়ন্তীবাবু কোথায় থাকেন জানতে পারবেন। মুদি ভদ্রলোক অনুগ্রহ ক'রে কুলদাবাবুর বাড়ীর ঠিকানা ব'লে দিলেন। তারপর একটু হাসলেন। আমরা ফিরতি বেলায় কুলদাবাবুর বাড়ীতে গেলুম। মস্ত দোতলা বাড়ী, বীডন পার্কের ঠিক উল্টো দিকে। সে তো বাড়ী নয় ইঁটের পাঁজা।

আমরা তার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে যাকে দেখলুম তাকে কুলদাবাবুর

কথা জিজ্ঞেস করতে সে এক তলায় একটি কামরা দেখিয়ে দিল। আমি ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠ্‌লুম। এমন এঁদো স্যাঁতসেঁতে ঘরে যে মানুষ বাস করতে পারে, আমার পূর্ব্বে সে জ্ঞান ছিল না। ঘরখানার যেন গলিত কুষ্ঠ হ'য়েছে। দেয়াল থেকে চুনবালি সব খসে পড়েছে, আর মধ্যে মধ্যে বড় বড় ফোস্কার মত ফুলে উঠেছে। আর দুর্গন্ধ অসাধারণ। সেকালে কলকাতা সহরে ঢুকতেই যে পাঁচমিশালি গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে পেটে ঢুকত আর গা পাক দিয়ে উঠত, সেই গন্ধ যেন এ ঘরে জমাট বেঁধেছে। হাওয়া সে ঘরে দক্ষিণের জানলা দিয়ে ঢুকতে পারে, কিন্তু বেরবার পথ নেই। মেঝে কেন ভিজে বুঝতে পারলুম না। বোধহয় ইঁদুর ও ছুঁচোর প্রস্রাবে সিক্ত। মনে হ'ল বাড়ীটি রোগ ও মৃত্যুর ডিপো। এখানে মানুষ আসে মরতে, বাঁচতে নয়।

(৪)

তারপর তাকিয়ে দেখি যে, ঘরের এক কোণে দড়ি দিয়ে ছাওয়া একটি মড়া-ফেলা খাটিয়ার উপর লাল খেরো মোড়া ইঁটের মত তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে, একটি ত্রিভঙ্গ লোক শুয়ে কিংবা বসে ডাবা হুঁকোয় কষে দম মারছেন। প্রথমেই নজরে পড়ল, লোকটা আগে ছিল সুপুরুষ, এখন হ'য়েছে সেই জাতীয় কুপুরুষ যাকে দেখলে লোক আঁতকে ওঠে।

আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনে লোকটি চোখ বুঁজে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে "কে ও" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন।

বাবা নিজের নাম বল্‌লেন। শুনে ভদ্রলোক উত্তর করলেন—

—চৌধুরী মশায়! নমস্কার। ডান পা'টা জখ্‌মী, তাই উঠে পায়ের ধূলো নিতে পারলুম না। মাপ করবেন। দাদার খোঁজে বোধহয় এসেছেন!

—হ্যাঁ, তাই।

—মামলা 'করবার সখ এখনও আছে? দাদা তো আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছেন। এখন আবার কি নিয়ে মামলা?

—আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি বটে, কিন্তু তার জন্যে দায়ী তো জয়ন্তীবাবু নন্। তিনি ছিলেন অতি সৎ লোক।

—আর সেই সঙ্গে ছিলেন অতি নির্ব্বোধ। বোকা আর বজ্জাত দুই সমান

সর্ব্বনেশে জন্ত। দাদার সঙ্গে আমার তফাৎ কি জানেন? আমার রক্তে আছে alcohol ও দাদার আছে আফিং।

—ভয় নেই, আমি ফের মামলার তদ্বির করতে আসিনি, এসেছি শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আছেন কেমন?

—শুনেছি মন্দ নয়। তাঁকে দেখিনি।

—দেখেননি কেন?

—দেখতে পাইনে ব'লে।—আমি এখন অন্ধ।

—চোখ হারালেন কবে?

—আন্দামানে।

—আপনি আন্দামানে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলুম হাওয়া বদ্‌লাতে। আর সেখানে ছিলুম দশটি বৎসর। সম্প্রতি ফিরেছি, আর আছি এই রাজপ্রাসাদে।

—এ ঘর ত রাজপ্রাসাদ নয়, অন্ধকূপ!

—অন্ধের কাছে সবই Black-hole, মায় লাটসাহেবের নাচঘর।

—তা ঠিক।

—তা'তে কোন দুঃখ নেই। গতস্য শোচনা নাস্তি।

—সেখানে দেখলেন কি?

—নরক গুলজার।

—আর?

—দেশটা বিলেতের ছোট ভাই।

—অর্থাৎ?

—সে দেশে জাতিভেদ নেই, বাল্যবিবাহ নেই, বহু-বিবাহ নেই—আছে শুধু বিধবা-বিবাহ। সব মেয়েরাই স্বয়ম্বরা হয়। বিয়ে সেখানে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যাঁরা দেশী সমাজকে বিলেতি সমাজ করতে চান্—আন্দামান তাঁদের জ্যান্ত আদর্শ।

—এ আদর্শ সমাজে থেকে আপনার কিছু লাভ হ'লো?

—লাভ হ'য়েছে এই যে, হারিয়ে এসেছি একটি পা, চোখ দু'টি, মিষ্ট কণ্ঠ,

মিষ্ট কথা আর ভগবানে বিশ্বাস। তারপর তিনি ব'ললেন—"May I speak to you in English ?"

—Certainly.

—Can you lend me five rupees ?

—Of course.

—Payable when able.

—That is understood.

এর পর বাবা কুলদা বাবুকে পাঁচটি টাকা দিতে তিনি ব'লেন—"Thank you."

(৫)

নিমতলা ঘাটের সেই waiting-room থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। এবং ভয়ে ভয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লুম, জয়ন্তীবাবুর বাসায় যেতে হবে ভেবে। আমার পরিচিত সেই গলিটির মত পচা ও নোংরা গলি কলকাতায় আর দ্বিতীয় ছিল না, এখনও বোধ হয় নেই। সে তো গলি নয়, একটি সুড়ঙ্গ বিশেষ। ঠিকে গাড়ী সে রাস্তায় কি করে ঢুকতে পারল বুঝলুম না।

ইংরেজিতে বলে Where there is a will there is a way। কোচম্যান মিঞা ছ' পাশের বাড়ীতে ধাক্কা খেতে খেতে আমাদের জয়ন্তীবাবুর বাসায় পৌঁছে দিল।

একটি দাড়িগোঁফওয়ালা ভদ্রলোক দুয়োরে এসে আমাদের উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই আমার মনের মেঘ কেটে গেল। গলিটি যেমন কদর্য্য—ঘরটি তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে একখানি ধব্‌ধবে জাজিম পাতা, তার এক কোণে একটি ভদ্রলোক একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর গলায় কাঠের মালা, নাকে তিলক, দাড়ীগোঁফ কামানো, মাথার চুল পাকা। এমন বিষণ্ণ অবসন্ন নির্ব্বিকার মূর্ত্তি কদাচ দেখা যায়। তিনি একটি বিদ্‌রির ফরসিতে তামাক খাচ্ছিলেন। বাবা আমাকে আস্তে আস্তে বললেন—"ইনিই জয়ন্তীবাবু।"

(৬)

জয়ন্তীবাবু বাবাকে দেখেই বললেন—"নমস্কার চৌধুরী মহাশয়। বসুন। কোমরে বাত, তাই উঠে পায়ের ধূলো নিতে পারলুম না। মাপ করবেন। কেমন আছেন ?"

—দেখ্‌তে তো পাচ্ছেন।

—শরীর দেখছি ভালই আছে, কিন্তু সেকালের সে রূপ নেই। কি তেজস্বী চেহারা ছিল আপনার, সে তেজ আজ নেই।

—তেজ-টেজ্ যা ছিল সব গেছে গভর্ণমেণ্টের নকরি ক'রে। তাইতে ছেলেদের বলেছি, কখনও সরকারের চাকরি ক'রো না। ও-যন্ত্রের ভিতর পড়লে একদম পিষে যাবে।

—তাহ'লে আপনার এখনও কিছু আছে। আমি ত জানতুম, আমরাই আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছি।

—সর্ব্বস্বান্ত অবশ্য হ'য়েছি কিন্তু তার জন্যে আপনারা দায়ী কিসে ?

—আমরাই তো আপনাকে ও-মামলা compromise করতে দিই নি। যদিচ কুলদা আপোষ মীমাংসা করতে বলেছিল।

—সে যাই হোক, এখনও ফোঁটা দেবার মাটি আছে। এখন আপনার এ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটল কি ক'রে ?

—আমার বাসার ঠিকানা পেলেন কার কাছ থেকে ?

—আপনার ভাই কুলদার কাছে।

—তার আস্তানায় গিয়েছিলেন কি ?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।

—সে ত একটা বেশ্যা ব্যারাক। কুলাঙ্গারটা আন্দামান থেকে ফিরে ঐ বাড়ীতেই ঢুকেছে এই ব'লে যে, old friendsদের ছেড়ে আর কোথাও থাকতে পারবে না। তাকে আর কারোর স্থান দেওয়া অসম্ভব। আর কেউ স্থান দিলেও সে তা নেবে না। সে বলে ভদ্রসমাজের অমানুষদের কারও পোষা-কুকুর হ'য়ে থাকবে না।—আন্দামান থেকে ও দুটি বিদ্যে শিখে এসেছে—

চীৎকার করা ও গালিগালাজ দেওয়া, ইংরেজী ও বাঙলা—ছু'ভাষাতেই।

—কুলদা ত ছিল অতি মিষ্টভাষী আর অতি ভদ্র।

—আর চমৎকার গাইয়ে আর অতি বুদ্ধিমান। আন্দামান থেকে ও হারিয়ে এসেছে ছু'টি চোখ, মিষ্ট কথা ও মিষ্ট কণ্ঠ। তবে দুষ্ট বুদ্ধি সমানই আছে।

—আমাকে ত কোন গালিগালাজ করলে না। শুধু কথা অতি চেঁচিয়ে বললে।

—আপনার কাছে কিছু টাকা চায়নি ?

—চেয়েছিল পাঁচ টাকা, আমি তা দিয়েছি।

—না দিলে আপনার বাপান্ত করত। ও টাকায় সে মদ কিনে খাবে। সে যাই হোক, ও নিজেও ডুবেছে আমাদেরও ডুবিয়েছে। মদ মেয়েমানুষে প্রথমে মস্‌গুল হ'য়ে পড়ল, এর জন্যে টাকা চাই। আর টাকা রোজগার করবার উপায় ঠাওরাল জাল-জুয়োচুরি, তাই করতে স্থরু করল। ওর কথা ছিল, ডুবেছি না ডুবতে আছি—দেখি পাতাল কত দূর। শেষটা পাতাল পর্য্যন্তই পৌঁছল, আর আমাকেও ডোবাল। তাই আমি আজ এখানে, আমার মেয়ের বাড়ীতে। জামাই গরিব, কিন্তু অতি ভদ্র আর অতি ভাল লোক। স্কুল মাষ্টার ও ঘোর ব্রাহ্ম। ওই আমাকে প্রতিপালন করছে। স্কুল মাষ্টারীতে কিছু পায়, আমার মেয়ের হাতেও কিছু টাকা আছে—বিয়ের সময় আমারই দেওয়া। তাতেই চ'লে যায়।

—আপনার কি পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেই, ঐ বিদ্‌রীর ফর্‌সিটি ছাড়া ?

—না, সব গেছে। আমি আফিং ধরেছি, তাই তামাক খেতে হয়। তাই সব গেছে শুধু হুঁকোটি রেখেছি। এর পর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

(৭)

গাড়ীতে আমরা উভয়েই চুপ ক'রে রইলুম, সে দিনকার নূতন অভিজ্ঞতার ফলে।

বাবা বোধহয় আমাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে অন্য কথা পাড়লেন। তিনি বললেন যে—আমাদের দেশের বাড়ীতে দেদার রূপোর গুড়গুড়ি ছিল, কিন্তু জয়ন্তীবাবুর ঐ বিদ্‌রীর কাজ করা অষ্ট ধাতুর মত এমন সুন্দর ফরসি একটিও না। বাবা সেকালে অবিরাম হুঁকো টানতেন। একালে আমি যেমন অবিরাম সিগারেট টানি। অর্থাৎ একটি পুড়িয়েই আর একটির মুখাগ্নি করি। বাবাও অগ্নিহোত্রীর অগ্নির মত কল্‌কের আগুন নিবতে দিতেন না।

আমি এ বিষয় কিছু উচ্চবাচ্য কর্‌লুম না, কেন না তখন আমার মনে বাবার পূর্ব্ববন্ধুদের রূপ ও গুণ জাগছে।

কুলদাবাবুকে দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গিয়েছিল। জয়ন্তীবাবুকে দেখে সে ভক্তি ফিরে এল না। জয়ন্তীবাবু তিলককাটা একটি ছবি মাত্র। ফিকে জলরঙের ছবি, মানুষের আবরণের অর্থাৎ চামড়ার ছবি মানুষের নয়। সে ছবি মনকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। কিন্তু কুলদাবাবুর ছবি মানুষের চামড়ার ছবি নয়—চামড়ার পরদা মুখে মানুষের ছবি। আর দেহের মত তার আত্মাও অন্ধ ও খঞ্জ। অথচ দুর্দ্দান্ত। কি ভীষণ এই বে-পরোয়া জীবটি। আমার মনে হয় যে আমরা সকলেই সমাজে যেন বাঁশবাজী করছি—একবার বেসামাল হলেই কুলদাবাবুর মত পাতালে পড়ব।

এ দৃশ্য আমার মনকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল, যার রেশ আজও আমার মনে আছে। আর সেই জন্যই এই গল্প লেখা।

দ্বিতীয় ধাক্কা

পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে মানব জীবনের সিনেমার আর একটি দৃশ্য হঠাৎ আমার চোখে পড়ে, যা আমার মনে একটি গভীর ছাপ রেখে যায়। ব্যাপার কি ঘটেছিল সেই কথাটি আমি বলব।

প্রথম দৃশ্যটি যখন দেখি—তখন আমি হেয়ার স্কুলে এন্‌ট্রান্স্‌ ক্লাসে পড়ি। দ্বিতীয় ঘটনা যখন ঘটে—তখন আমি প্রেসিডেন্সিতে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।

ইতিমধ্যে আমি আধা কলকাত্তাই হয়ে যাই; যদিও ভাষাতে নয়—ব্যবহারেও নয়। কারণ আমি পদ্মাপারের বাঙ্গাল হলেও—বাঙ্গালে ভাষা

বলতুম না। বলতুম নদে-শান্তিপুরের ভাষা। তখন আমাদের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তবে কলকাতার কথা শুনে শুনে মুখের ভাষার টানটোন যে কিছু বদলায় নি—এমন কথা বলতে পারি নে।

আধা কলকাত্তাই হয়ে গিয়েছিলুম বলছি, এই জন্যে যে, ইতিমধ্যে আমার জনকতক কলকাতার বন্ধুবান্ধব জুটেছিল; খুব বেশি নয়—পাঁচ-ছ'জন মাত্র। তাঁরা সকলেই ছিলেন সুবর্ণ বণিক। বলা বাহুল্য যে, তাঁদের ভাষা ও রসিকতা আমার কাছে অগ্রাহ্য ছিল। কারণ তাঁদের ভাষা ছিল বিকৃত, আর রসিকতা যেমন বাসি তেমন পান্‌সে। ভাষার উপর অধিকার না থাকলে রসিকতা করা যায় না। আর আমার বন্ধুদের ভাষার পুঁজি খুব কম ছিল। এঁদের ভিতর একজন ছিলেন তিনি লেখা পড়ার কোনও ধার ধারতেন না, অপর পক্ষে ছিলেন গাইয়ে ও বাজিয়ে। তাঁর গলা ছিল হেঁড়ে, কিন্তু গাইতেন তালে ও মানে। আর তিনি বাজাতেন হার্মোনিয়াম, সেতার, এস্‌রাজ ও বাঁয়া তবলা। তিনি ছিলেন যথার্থ সঙ্গীতপ্রাণ।

কলকাতায় আসবার পূর্ব্বেই আমার সঙ্গীতের নেশা হয়। ফলে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আমি বহু গানবাজনার আড্ডাতে হাজ্‌রে দিতুম—এমন কি বস্তিতে খাপরার ঘরেও। সে যাই হোক, তিনি একটি যুবককে আবিষ্কার করলেন,—সে বেহালা বাজাত ভাল।

আমার বয়েস যখন ষোলো, এ যুবকটির বয়েস তখন বিশ কি একুশ। তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শন, পরন পরিচ্ছদে সৌখীন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, কথায় বার্ত্তায় মিষ্টভাষী—এবং ব্যবহারেও ভদ্র। আমি তাঁর নাম করব না, কেন না হয়ত, তিনি এখনও বেঁচে আছেন, এবং সঙ্গীত জগতে গণ্যমান্য হয়েছেন। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধুটিকে একদিন তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন, ভাল করে তাঁর বেহালা শুনবার জন্যে। আমরা দু'জনে দুপুর বেলা আহারান্তে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেম। সে বাড়ী কোন রাস্তায় তা বলব না কিন্তু সেটি একটি বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী।

বাড়ীটি বাইরে থেকে দেখ্‌তে একটু দৃষ্টিকটু। বাড়ীটির গায়ে বালির আস্তর নেই, ইঁটগুলো সব দাঁত বার করে রয়েছে। দেখ্‌তে কেমন নেড়া নেড়া লাগে। আমার বন্ধুটি পাঁচ মিনিট ধরে সজোরে সদর দরজার কড়া নাড়লেন।

একটি হিন্দুস্থানী চাকর এসে, আধা বাঙলায় আধা হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞেস করলে, "কাকে চান?" যাঁকে চাই তাঁর নাম করতে সে বললে—"ছন্নু বাবুকে?—আচ্ছা সামনে খাড়া রহো, হামি বাবুকে বুলিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। এই চাকরটির সঙ্গে ছিল গা-ঢাকা দিয়ে একটি স্ত্রীলোক, দেখতে পরমা সুন্দরী—জেন্নু আঁচরে উজোর সোণা।

কিছুক্ষণ পরে ছন্নু এসে উপস্থিত হলেন, আর মিনিট পাঁচেক আমাদের যে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে তার জন্য মাপ চাইলেন ও বল্লেন যে—এ বাড়ীতে আমি ছাড়া ত আর পুরুষ মানুষ নেই, তাই বার দু'য়োরে খিল ও শিকল দিয়ে রাখতে হয়। যে চাকরটি দেখলেন, ঐ বুলাকি আমাদের দরওয়ান বেহারা সব—আর কে আসে না আসে মাও তা দেখতে চান। এর পর ছন্নু বাবুর সঙ্গে আমরা উপরে গেলুম। যে ঘরে ঢুকলুম সেটি যথেষ্ট প্রমাণ সই, কিন্তু সে ঘরে একটুক্রোও আস্‌বাব নেই। তারপর তাকিয়ে দেখি, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি কাঠের চেয়ারের উপর একটি ভদ্রলোক জোড়াসন হয়ে বসে আছেন। লোকটির বর্ণ গৌর, নাক চোখ সব নিখুঁৎ, নধর দেহ অনাবৃত ও বুকে এক গোছা ধব্‌ধবে পৈতে। তিনি চোখ বুঁজে ছিলেন। মনে হল যেন স্বয়ং মহাদেব ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন।

আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি মহা চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন "কে ও?"

ছন্নু উত্তর করলে—আমি।

—কে—ছন্নু? তোমার সঙ্গে কে?

—কেউ নয়।

—দেখ, আমি কাণা হয়েছি বলে ত কালা হইনি?

—আমরা কাণা হইনি কিন্তু কালা হব—দিবারাত্র আপনার চীৎকার শুনে।

—কথা যে চেঁচিয়ে বলি, তার কারণ কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করে না, কেউ আমার কথার উত্তর দেয় না। ও এক রকম অরণ্যে রোদন। চোখ যে গেছে—সে এক রকম ভালই হয়েছে। তোমার মার আমি মুখ দর্শন করতে চাইনে। ঐ পাপ মূর্ত্তি যাতে দেখতে না হয় ভগবান সেই জন্য আমাকে অন্ধ করেছেন।

—দেখুন বাইরের লোকের কাছে মার উপর আপনার আক্রোশ অত তারস্বরে প্রকাশ করবেন না।

—তবে যে বল্‌লে, তোমার সঙ্গে কেউ নেই? আমি তিন জন লোকের পায়ের শব্দ শুনলুম। তোমার সঙ্গীরা কে?

—আমার দুটি বন্ধু।

—ছোকরা?

—হ্যাঁ।

—এখানে এসেছে কি করতে?

—আমার বাজনা শুনতে।

—ভারি ত বাজাও। যন্ত্র তো বেহালা, যা সাহেবরা বাজাতে পারে—বাঙ্গালীতে পারে না। আমাদের কব্জীর সে শক্তি নেই। আমি আগে সুর-বাহার বাজাতুম, আর সৌখীন বাজিয়েদের মধ্যে সেরা ছিলুম। বাজাও ত পিলু বারোঁয়া। বাজাও ত একটি নট-নারায়ণ—অস্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী পুরোপুরি।

—আমি অবশ্য পিলু বারোঁয়া বাজাই,—কিন্তু নটের ঘরের অনেক রাগ রাগিণীও বাজাই— যথা, কেদারা হাম্বীর ছায়ানট প্রভৃতি।

—আর তোমার ঐ ছোকরা বন্ধুরা কোথায় শুদ্ধ মধ্যম ও কোথায় কড়ি মধ্যম নাগাল ধরতে পারবে?

—না পারলেও, আশা করি সমগ্র রাগিণী শুনে মুগ্ধ হবে।

—সত্য কথা বল্, ওরা তোর বোনদের গান শুন্‌তে এসেছে। তোমার মা তো ছুঁড়ি দুটোকে তয়ফা-ওয়ালি বানাচ্ছেন।

— এ কথা কেন বলছেন?

—ভদ্রলোকের ঝি বৌরা কি গান বাজনা করে?

—আগে হয়ত করত না এখন করে। আপনি ত এক যুগ এদেশে ছিলেন না—এর মধ্যে সমাজের হালচাল অনেক বদলে গেছে।

—তা যেন হল, কোন ভদ্র ঘরে মুসলমান বাইজির তেড়ুয়া সারঙ্গী ওয়ালাকে মেয়েদের মাষ্টার করে?

—যাঁরা দস্তুর মত সঙ্গীত শিক্ষা দিতে চায়, তারা করে। ওস্তাদ মাত্রেই ত মুসলমান। রোমজানকে তো মা আনেন নি, আমি এনেছি।

—সারঙ্গী ওয়ালার কাছে বুঝি বেহালা শেখো?

—কিছু কিছু শিখি বটে।

—তুমি বুঝি কীর্ত্তনওয়ালীদের বেহালাদার হবে?

—যদি কপালে থাকে ত তাই হব।

—মরুকগে ছুঁড়ি দুটো! এখন জিজ্ঞেস করি, তোমার বন্ধু ছোক্‌রা দুটি কে?

—দু'জনেই ভদ্র সন্তান। একজন গান বাজনার চর্চ্চা করে—অপরটি কলেজে পড়ে।

—বুঝেছি—তোমার মা ওঁদের ফাঁদে ফেলতে চান। মেয়েদের রূপ দেখিয়ে ও গান শুনিয়ে ঘাড়ে গতাতে চান। ওদের ত কেউ বিয়ে করবে না—তাই এই সব জোটাচ্ছেন।

—না সে দুরভিসন্ধি তাঁর নেই। যেটি আমার সঙ্গী ও সঙ্গীত চর্চ্চা করে, সেটি সুবর্ণ বণিক, উপরন্তু বিবাহিত। অপরটি ব্রাহ্মণ বটে—কিন্তু আমাদের সম্প্রদায় নয়, বারেন্দ্র।

—তোমার মা কি জাত্-টাত মানেন?

—তিনি না মান্‌লে ছোক্‌রা ত মানে।

—যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। ছোকরাটি দেখতে কেমন?

—দেখতে বাঙ্গাল। রং মেটে, নাক চাপা, চোখ তেরচা।

—এ কথা শুনে পাশের ঘরে দরজার কাছ থেকে কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠল। তাকিয়ে দেখি দরজার পাশে দুটি ছবি দাঁড়িয়ে আছে। সে ছবি যে কত সুন্দর, কত অপূর্ব্ব তা বলতে পারি নে।

এ হাসি শুনে—চেয়ারস্থ ভদ্রলোক চীৎকার করে বললেন, ও হাসে কে?

ছনু বললে—আপনার মেয়ে শ্যামু ও রামু।

—ওরা ত আমার মেয়ে নয়, তোমার মার মেয়ে। আমার মেয়ে হলে কি অত নির্লজ্জ অত বেহায়া হত। ওদুটোকে ওখান থেকে দূর করে দাও।

—ছন্নু ব'ল্লে, আমরাও যাচ্ছি। যে রকম চীৎকার করছেন, এরপর কাউকে না কাউকে গালিগালাজ সুরু করবেন। এই বলে সে আমাদের পাশের ঘরে যেতে ইঙ্গিত করলে।

ছন্নুর বাবা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—

—প্রবাসে যাবার সময় আমার প্রধান দুঃখ ছিল—তোমার মাকে ছেড়ে যেতে হবে। আর প্রবাসে থেকে সেকালে কি ভালবাসতুম ওকে! ফিরে এসে আমার প্রধান দুঃখ এই যে, তোমার মার আশ্রয়ে আমাকে থাক্‌তে হচ্ছে ও তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে হচ্ছে। নরক যন্ত্রণা লোকে ভোগ করে, দেহে নয়—অন্তরে। আমি এখন দিবারাত্র নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। তুমি আছ বলে আমি বেঁচে আছি, নইলে আত্মহত্যা করতুম—যদি করতে পারতুম! মানুষের পক্ষে, বেঁচে থাকাও কঠিন, মরাও সোজা নয়।

তাঁর এই শেষ কথাটি শুনে আমরা পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গেলুম। সে ঘরে বসবার আসন ছিল, আমরা গিয়ে তাতেই বসে প'ড়লুম। ছন্নু বললে, "আমি ভারি দুঃখিত। তোমাদের ডেকে নিয়ে এলুম বেহালা শোনাতে—আর শোনালুম শুধু বিকট চীৎকার। উনি হচ্ছেন আমার পিতা, গিয়েছিলেন আন্দামানে—বারো বৎসর পরে ফিরেছেন সম্প্রতি। চোখ দুটি হারিয়েছেন—আর শিখে এসেছেন শুধু চীৎকার করতে ও গালিগালাজ দিতে। বাবা ছিলেন একটা বড় ব্যাঙ্কের বড় কর্ম্মচারী। শেষটা ধরা পড়ল যে ব্যাঙ্কের পাঁচ ছয় লাখ টাকা তহবিল তছরুপ করা হয়েছে। বাবা নিজের অপকর্ম্ম স্বীকার করলেন না কিন্তু বারো বছরের জন্য সাহেবরা তাঁকে আন্দামান পাঠালেন। আমাদের যা কিছু সম্পত্তি ছিল—ব্যাঙ্ক সব বেচে কিনে নিল। মা একটি ছেলে আর দু'টি পাঁচ ছ' বৎসরের মেয়ে নিয়ে এক রকম রাস্তায় দাঁড়ালেন। এমন সময় বুলাকির মুখে মা শুনলেন, বাবা তাঁর একটি অন্তরঙ্গ ধনী বন্ধুর নামে লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ বেনামী করে রেখে গিয়েছেন। মা গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন, আর তিনিও অনুগ্রহ করে, সেই অর্জ্জিত বা অপহৃত টাকা দিয়ে আমাদের ভরণ পোষণ করছেন। বাবা যে চুরি করেছেন, একথা কখনও স্বীকার করেন নি। সুতরাং এই বেনামী ব্যাপারটাও স্বীকার করেন না। অতএব আমরা গ্রাসাচ্ছাদনের টাকা কোথা থেকে পেলুম—এই প্রশ্ন তাঁর মনে

জাগছে। আর সেই জন্যই মার উপর তাঁর এত রাগ। বাবার সঙ্গে এক বাড়ীতে এখন থাকা অসম্ভব, কিন্তু আমি তাঁকে ছাড়তে কিছুতেই রাজী হলুম না। এই ত ব্যাপার!"

এর পর আমরা দুই বন্ধুতে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে এলুম। আমার মন ভরে উঠ্‌ল ছন্নুর মা'র প্রতি সন্দেহ মিশ্রিত করুণায়, আর ছন্নুর প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধায়। আর মনে হল আন্দামান ফেরৎ বটে কিন্তু কুলদা বাবুর তুলনায় তাঁর অবস্থা কত বেশি মর্ম্মস্পর্শী। তাঁর শেষ কয়টি কথা আজও ভুলিনি। মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও কঠিন, মরাও সোজা নয়।

প্রমথ চৌধুরী

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল, 'দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্ত্তি ?'

মহেশ বলিল, 'ওর অধঃপতন হয়েছে।'

বিভূতি নাক সিঁটকাইয়া বলিল, 'ও আবার ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে ? ও লোকটা চিরকাল ভেতরে ভেতরে এমনি বজ্জাত। সাধে কি ওকে ঘুঁসি মেরেছিলাম।'

ছেলের সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সহজে ভুলিবার নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল,—

'ঘুঁসি মেরে লাভ কি হয়েছিল ?'

'তোমার জন্যে—'

'আমার কথা বাদ দিয়ে বল। আমি কিছু না করলেও তোর লাভটা কি হত ? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারি বেধে যেত, গাঁয়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে তুই রাগের যন্ত্রণায় ছটফট করতিস—'

মহেশের যুক্তিতর্ক কোন দিনই ভাল করিয়া বিভূতির মাথায় ঢোকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে মহেশ ঠিক তার উল্টা কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্ত্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘুঁসি মারানোর মত উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আপশোষের সীমা নাই। তার আদর্শগুলি এমন যে কাজে কিছু করার সুযোগ না পাইলেও কেবল একটা দলে কয়েক মাস মেলামেশা করার জন্যই পুলিশ তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়গুলির সঙ্গে রফা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত

হইয়াছে, আমাদের মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবু, মানুষের মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

'তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চুপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল ?'

'ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তো কমেছিল।'

'তুমি আমাকে দিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনো রাগ কমে ?'

'কমে বৈকি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মত চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কি হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মত জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড় বিরক্তি বোধ হয়।'

[লেখকের মন্তব্য ঃ কথাটা মিথ্যা নয়।]

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগের বারের চেয়েও এবার তার বেশী রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিশ একটু নজর রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়ী ঘর খানাতল্লাস করিবে, এসব বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিশ একেবারে জন্মের মত ত্যাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনিই পুলিশ যাকে বাগে পাওয়ার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, তার নামে মিথ্যা করিয়া পুলিশের কাছে লাগানো। বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থায় থাকে, রাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভোঁতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে গিয়া সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে।

রাত্রে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ ?'

বিভূতি বলে, 'না। কিছু ভাবছি না।'

মাধবীলতা গভীর আদরের সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে, 'বল না, কি ভাবছ ?'

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালবাসার খেলা মাধবী-লতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীর পাওনাগণ্ডার বিষয়টা খেয়াল না থাকিলে এমনও হয় যে, ফাঁকেতালে একটু সোহাগ করিতে আসিয়া দু'হাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতার খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কারের সুরে সে বলে, কি যে কর তুমি, চাদ্দিকে লোক রয়েছে? ওমা দরজা বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ লোক তো তুমি?' তবু, দিনে রাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার অধিকার জন্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ, রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্য্যন্ত যেন মাধবীর চলিয়া যায়, বিভূতির ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তর তাকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতে ভালবাসিতে শ্রান্ত হইয়া বিভূতি ঝিমাইয়া পড়িলে মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে যে সে ধরণের অপরূপ কাব্যের স্থান আছে বিভূতি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে, 'পুলিশের কথা ভাবছিলাম। আবার যদি আমায় ধরে নিয়ে যায়?'

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'মাগো, পুলিশ দেখে আমার যা হচ্ছিল!'

পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আরও তিনচার বার এমনি ভাবে সে প্রায় এই কথাগুলিই বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়, সব কি মাধবীলতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিষ্টিরিয়া? কিন্তু এই টাইপের খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিষ্টিরিয়া ঠিক কি রকম সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বৌ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার!

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া

জানাইয়া দেয়, আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কারসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিশ আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবীলতার কোন ভয় নাই, পুলিশ আর বিভূতিকে ধরিবে না, বৌকে এমনিভাবে বুকে করিয়া, বিভূতি জীবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইয়াছিল মাধবীলতার চোখ তার চেয়ে বেশী রকম বিস্ফারিত হইয়া গেল।

'উনি! উনি এমন কাজ করলেন!'

'কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না?'

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, 'পারে, ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ওর মত ভয়ানক মানুষ—'

মাধবীলতার ক্ষোভ-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালবাসিতে আজ যেন মাধবীলতার ভাল লাগিল না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার সে ওই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমটা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তার বিচলিত ভাব দেখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল। কি ভালই মাধবীলতা তাকে বাসে!

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। বড় সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়। একটু আদর যত্ন করা, রূপের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির কাছে এ সমস্ত যে কত দামী বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায়! কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায় মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়া নিজের অফুরন্ত মন-কেমন-করার অভিশাপ তার যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু, বীভৎস কিছু, প্রচণ্ড কিছুর জন্য কামনা যে স্বপ্নানুভূতির মত মৃদু অথচ মানসিক রোগের মত একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে উঠিতে নামিতে তার প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া জীবনের প্রত্যেকটি সহজ সুখ ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড় করার কথাটা

তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা কমিতে কমিতে মাঝরাত্রি প্রায় কাবার হইয়া যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আপশোষের তার সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ঘষিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, 'না না, তুমি ভেবো না, ও তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

এতক্ষণ পরে নিজের দেওয়া আশ্বাস ফিরাইয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আর বিভূতিকে কাবু করিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামী করার একটা রোমাঞ্চকর সাধ বরং তাকে ছোট ছেলের মত লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে, 'তোমার কিছু হলে আমি মরে যাব।'

বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাদামী আলোয় মশারির ভিতরে ও বাহিরে গভীর রাত্রি রূপ নিয়াছে, লণ্ঠনের কাছের কয়েকটা জিনিষ ছাড়া মশারির জন্য বাহিরের আর কিছু ভাল দেখা যায় না, রঙিন কুয়াশায় যেন একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ষ্টোভের পাশেই স্পিরিটের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাঙ্গণপ্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশী ভাবপ্রবণ আর মমতাময়? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত ব্যগ্র শুধু দেওয়ার জন্য? জেল আর ফাঁসীর ভয় তুচ্ছ করিয়া সে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে সে সদানন্দের নাকে ঘুঁসি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু!

তা হোক। তাই ভাল।

আরও জোরে বিভূতির মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া গায়ের জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

'ঘুমোবে না?'

'তোমার ঘুম পেয়েছে?'

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে; 'আমার ঘুম দিয়ে কি করবে, আমি তো দিনে ঘুমোই। তোমার ঘুম পেয়েছে কি না তাই বল।'

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমের উদ্দেশে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গরুর গাড়ীতে। আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়ো মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি নামাবলী গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গ নিল।

মনোহর দত্তের বৌ দেড়মাসের ছেলে কোলে করিয়া আপশোষ করিয়া বলিল, 'আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কি আর ধম্মো কম্মো আছে।'

আগে মাধবীলতা শশধরের বৌকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়ার একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বৌ তো শুনিয়া অবাক!

'আশ্রমে যাবে? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কর তা তো জানতাম না ভাই!'

'ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুণ্ডুপাত করতে। আমাদের বাড়ীতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, এমন আস্পদ্ধা!'

শশধরের বৌ থতমত খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল। বলিয়াছিল, 'বাড়ীতে ওঁরা জানতে পারলে কিন্তু বড্ড রাগ করবেন।'

'বাবাকে বলে এসেছি।'

চুপি চুপি কারো কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে না মহেশ চৌধুরীর অনুমতি নিয়া যাইবে, সমস্ত সকালটা মাধবীলতা আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজী হইবে কি না এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু বলিয়া যাওয়াই ভাল মনে করিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তার বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইয়া বলিয়াছিল, 'আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা? বেশ তো।' তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল, 'পুরোণো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে?'

মহেশ চৌধুরীই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আপশোষ করে, এসব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে

সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরীর মত মানুষের পক্ষেও মাধবীলতা সম্ভব ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সত্যই অপমান করিয়াছিল মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল?

তুপুর বেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বৌ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে ঘরে গেল তারপর সঙ্গী তুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল, 'একটু বোস্ না ভাই, তুদণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময় পেলাম না।'

সদানন্দের নির্দ্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিনঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল। কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকর ভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে তাতে তু'চার ঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয়?

মাধবীলতা বলিল, 'না ভাই, চট্ করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসিনি বলে বড্ড চটে আছেন।'

'তুই কি করে জানলি চটে আছেন?'

'ওকে চিনি না আমি?'

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিয়াই বলিল, 'কি সর্ব্বনাশ, তুমি এখানে!'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কেন?'

'আমার দরকার আছে।'

'কি দরকার?'

'আছে।'

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সেদিন তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—'

মাধবীলতার নিজেরও বুকের মধ্যে অকথ্য রকমের ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, 'আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা—উনি সে রকম মানুষ নন্।'

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চল তোমাকে বাইরে রেখে আসি।'

'কেন?'

'কেন আবার কি? আমার আশ্রমে আমি যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়ের জোরে ঢুকবে?'

কথা হইতেছিল সদানন্দের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবী-লতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া দুজনের কথা শুনিতেছিল, এবার ডাকিয়া বলিল, 'এসো মাধু ভেতরে এসো। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসবে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।'

আগাইয়া আসিয়া বিপিনের চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল, বিপিনের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল, 'বিপিন বাবু! ও বিপিন-বাবু!' তারপর স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল, 'সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না? দরজা খুলে দে—ওকে ছেড়ে দে।'

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল, 'কেন ভাবছিস্ তুই? কিচ্ছু হবে না, তোর কোন ভাবনা নেই। যদি হয়, তোর বোকামির জন্যে হবে।'

'তোর পায়ে পড়ি সদা—'

'পায়ে পড়িস্ আর যাই করিস কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মত কেন সময় নষ্ট করছিস্, একজন কেউ এসে পড়লে ভাল হবে? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছিস্ না নচ্ছার, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারো

কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না।'

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশী অমানুষিক কাণ্ড সর্ব্বদাই সংসারে ঘটে কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্য্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পারে! বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয় তো ভাল, তা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল, 'বিপিন, গেলি?'

বিপিন বলিল, 'যাচ্ছি।'

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথার মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটা তার থাকে যে দরজা বন্ধ করার চেয়ে দরজা খুলিয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভাল।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে, 'এখানে বসে আছেন?'

'এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন—আমারও একটু দরকার আছে ওনার সঙ্গে।'

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কেউ দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া বাজে কথা বলিয়া যায়। চালার নীচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী নরনারী একে একে আসিয়া জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল সে খাইয়া আসিবে সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভরসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নীচে সকলে সমবেত হইয়া অধীর আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতার খবর নিতে আসিল।

বিপিন পাংশু মুখে বলিল, 'উনি মাধুর সঙ্গে কথা বলছেন।'

'এখনো কথা বলছেন!' রত্নাবলী বলিল।

বিপিন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'মাধুকে উনি একটু বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে সব কথা বলছেন বোধহয়।' রত্নাবলী বলিল, 'এতদিন এক বাড়ীতে থেকে বললেন না, এখন—'

বিপিন বলিল, 'বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কি হবে? উনি অ্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেন নি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল—'

'আমরাও একটু শুনে আসি' বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিতে যায়, বিপিন ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, 'না না, যেও না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।'

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মত গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিয়া গেল।

রত্নাবলীর মনটা একটু সন্দিগ্ধ।

ক্রমশঃ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মর্ম্মবাণী

যুগ চলে যায় যুগের নেশায় অনাগত যুগ দাঁড়িয়ে হাসে,
নবীন দিনের সম্ভাবনায় আমরা আসিয়া দাঁড়াই পাশে।
প্রবীণ বটের পাতা ঝরা শেষ, নব কিশলয়ে ভরেছে শাখা,
সে কি ভুলে যাবে ঘনছায়া তলে তাদের পায়ের চিহ্ন আঁকা ?
স্ফুট অস্ফুট মর্ম্মবাণীরে বন মর্ম্মর বাঁচায়ে রাখে,
পায়ে চলা পথ নিরুদ্দেশের কত না যাত্রা ধূলায় ঢাকে,
লোক হতে লোকে গুঞ্জরি যায় আশা নিরাশার মর্ম্মবাণী,
উদাসী মনেরে আমরা জানি,
যুগ ভুলে যায় সে যুগের কথা আগামী দিনের উন্মাদনে,
দূরের সূর্য্যে বড় মনে হয়, কাছের পৃথিবী লাগে না মনে।

মাথার উপরে অসীম আকাশ পায়ের তলায় কঠিন ধরা,
কল্পনা ধায় বল্গাবিহীন ফুল তুলে দেখি কাঁটায় ভরা।
নব বসন্তে দখিনা পবনে মর্ম্মের বাণী কাঁদিয়া মরে,
আকাশের বাণী ধূলার ধরণী কেমনে না জানি রাখিল ধরে।
ফুলের গন্ধে কানাকানি হয়, জানাজানি হয় গোপন কথা,
আনন্দ যদি ভাগ্যে মিলিল কেবা মনে রাখে কাঁটার ব্যথা ?
মর্ম্মের বাণী কাঁটারও আছে,
কেয়ার গন্ধ লুট হয়ে যায়, সন্ধ্যাবিলাসী অলির কাছে।
ফণিমনসার আড়াল ছাড়িয়া বিষধর ফণি কি অনুরাগে,
সেই গন্ধের আনন্দ লাগি লোভাতুর মনে প্রহর জাগে ?

নবনীল মেঘ নয়নে লাগিলে ময়ুর ময়ূরী নাচিয়া ওঠে,
ঘন বরিষায় অভিসারিকার মম-মালঞ্চে কুসুম ফোটে,
জনহীন পথে আঁধারে আড়ালে যে নারী দয়িতে পরাণ সঁপে,
সেই আনমনে নিরালায় বসি প্রাণ-বিলিবার মন্ত্র জপে,

যুগ যুগান্ত যাহার আশায় একাসনে বসি জীবন কাটে,
তারে পেয়ে দেখি হৃদয় ভরে না, যবনিকা পড়ে জীবন-নাটে,
মর্ম্মের বাণী পড়ে না ধরা,
সুধার পাত্র হাতে পেয়ে দেখি তীব্র গরলে পূর্ণ করা।
তবু ভুল ভালো, ভুলে যদি মিলে অরূপ রতন, ধন্য মানি
নিরবধিকাল বিপুলা পৃথ্বি, না জানি কি তার মর্ম্মবাণী।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শান্তি

ব্যবধান যদি দুরতিক্রম্য হয়, হোক
হৃদয়কে চোখ ঠারবেই।
বৈতরণী-তে চির উজান কি ?—তাই শোক ?
শেষে পালে হাওয়া লাগবেই।
মিঠে ক'রে বলো হু'কথা
পর্দা-তে ঢাকি জনতা

অবশেষে শোনো টানে যদি কোনো দত্তক,
সেই অরণ্য মন্দ কি আর লাগবে!
না হয় ঢাকবে আরও অকুণ্ঠ নির্মোক,
গোদাবরী-তেই জাগর যামিনী কাটবে।
বিশ্বাস নেই শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে ?
ছেয়ে আছে পথ অনেক সিদ্ধাসিদ্ধে।

নব মেঘে আসে বলাকার পাল সেখানে,
মধুপ-পুঞ্জ জম্বু!

ফোটে কদম্ব, পাশাপাশি মাথা শিথানে।
মিছে জিজ্ঞাসা—'উপবাস কি নিরম্বু?'
কোনো গুহক তো নিশ্চয় দেবে চৌকি।
চাঁদহীন রাতে যুগলের তবে ভয় কি?

পাখা খুলে দিয়ে কাছে এসে ব'সো তা'হলে
নবনীত বুকে ঢাকো মুখ।
হৃদয়ের গান এখন কি সয় বাদলে,—
অথৈ মেঘের নীচে হৃদয় তো হ'লো মূক।
মিছে হাঙ্গামে নাক ঢোকাবে কে বন্ধু!
জানি বিন্দুতে গড়ে প্রমত্ত সিন্ধু॥

আত্মবেদের এই কথা চাই ব'লতে
ফুল-কোঁচা ধরে আদ্দির নীচে আত্মা।
তেল তো প্রচুর। ঢুঁড়্‌বে কে বলো স'ল্‌তে?
তাই আলো নেই। অগ্নিকাণ্ড সস্তা।
ঘড়ি যদি বলে সকালে-বিকেলে টিক্‌-টিক্‌
জানি বেঁচে আছি অটুট স্বাস্থ্যে আমরা।

হরপ্রসাদ মিত্র

ফ্লাড্ কমিশন রিপোর্ট ও কৃষকের দাবী *

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই আন্দোলনের প্রধান দাবী হইল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। কৃষক আন্দোলনের চাপে বাংলা সরকার জমিদারী প্রথা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ফ্লাড্ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিশন নিয়োগের বিরুদ্ধে যে কৃষকদের দাবীপূরণের কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ছিল শুধু কৃষকদের মন ভুলাইবার চেষ্টা, তাহা কমিশনের সদস্য বাছাই করিবার ধরণ দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এখন ফ্লাড্ কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিস হইতে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

কমিশন সুপারিস করিয়াছেন যে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিয়া রাইতোয়ারী প্রথা চালু করিতে হইবে। সরকার জমিদারদের সমস্ত সম্পত্তি কিনিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে কৃষকেরা সাক্ষাৎভাবে সরকারের প্রজা হইবে; জমিতে কোনও মধ্যস্বত্ব-ভোগী থাকিবে না। এই সুপারিশটি ঠিক যেন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মতই শুনা যায়; কিন্তু বাস্তবে ইহা হইবে গবর্ণমেণ্টের জমিদারী। ইহার উদ্দেশ্য কৃষকের খাজনার বোঝা কমান নহে; বরং ঠিক উল্টা। ইহার সঙ্গে যে সব সর্ত্ত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কৃষকের খাজনা বাড়িবে; তাহার উপর সার্টিফিকেট প্রথা নূতন করিয়া কায়েম হইবে। ফলতঃ প্রত্যেক কৃষকের শোচনীয় অবস্থা মোটেই দূরীভূত হইবে না।

ক্ষতিপূরণ

কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইতে পারে না। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতেই হইবে। কত দিতে হইবে সে সম্পর্কে তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই; তবে এই

* পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়টি গুরুতর, একাধিক মত পোষণের ব্যাপকতা ইহাতে আছে।—পরিচয়-সম্পাদক।

কথা বলিয়াছেন যে, যে যত খাজনা পায় তাহাকে তাহার ১০ গুণ, ১২ গুণ অথবা ১৫ গুণ দিতে হইবে। যদি সর্ব্বাপেক্ষা কম (অর্থাৎ ১০ গুণ) দেওয়া হয়, তাহা হইলেও সরকারকে এই অর্থের জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং একথা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে এই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষকদিগকে অতিরিক্ত ট্যাক্সের ভার বহন করিতে হইবে। কমিশনের কাছে তাহাদের দাবী ছিল বিনা-ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কারণ কৃষকদের ঐ ক্ষতিপূরণের ভার গ্রহণ করা সম্ভব নহে এবং জমিদারদেরও উহা পাইবার অধিকার নাই। কিন্তু, বলা বাহুল্য, সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

খাজনা বৃদ্ধি

কমিশন যে কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের সুপারিশ পেশ করেন নাই সে কথা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। কমিশনের কাছে কৃষকদের আর একটি দাবী ছিল যে অবিলম্বে কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা মকুব করিতে হইবে, অবিলম্বে খাজনার হার অর্দ্ধেক কমাইতে হইবে, এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া খাজনার পরিবর্ত্তে কৃষকদের আয় অনুযায়ী ট্যাক্স কমাইবার নিয়ম চালু করিতে হইবে। কিন্তু কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে সরকার সমস্ত বকেয়া খাজনা আদায় করিবেন; খাজনার হার কিছুতেই কমান হইবে না। তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে বাংলাদেশে খাজনার হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কম, সুতরাং খাজনা বরং বৃদ্ধি করা চলিতে পারে। অথচ তাঁহারাই একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বাংলাদেশে শতকরা ৭৯টি কৃষক পরিবারে জমির পরিমাণ এত কম যে তাহা হইতে খাজনা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের ভরণ-পোষণই চলে না। কমিশনের অন্যতম সদস্য, খাঁ বাহাদুর মেয়োজ্জেমউদ্দিন হোসেন তাঁহার স্বতন্ত্র রিপোর্টে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাংলাদেশে খাজনার হার অন্য প্রদেশের চেয়ে কম ত নয়ই, বরং বেশী। অথচ কমিশনের মতে খাজনা হ্রাসের দাবীই নাকি অসঙ্গত এবং খাজনা বৃদ্ধিই যুক্তিসঙ্গত। এই কি তাহা হইলে প্রজাহিতৈষী কমিশনের সুপারিশ?

সার্টিফিকেট প্রথা

প্রবল কৃষক আন্দোলনের বন্যার চাপে বাংলা সরকার ১৯৩৮ সালে নূতন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়া সার্টিফিকেট দ্বারা খাজনা আদায়ের নিয়ম তুলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিয়ম উঠিয়া যাওয়ার পর একমাত্র দেওয়ানী আদালতের ডিগ্রী ছাড়া বকেয়া খাজনা আদায় চলিতে পারে না। কিন্তু কৃষকদের এই সুবিচার চাইবার সুযোগটুকু কমিশন সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রিপোর্টের ৩১৪ প্যারাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে,—এই সার্টিফিকেট প্রথাটি বেশ একটি উৎকৃষ্ট প্রথা। জমিদারী প্রথা রদ করা হউক আর না হউক সরকারেরা কর্ত্তব্য খাজনা আদায়ের ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতে না রাখিয়া সরকারী তহশীলদারদের হাতে দেওয়া। অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের আগে সার্টি-ফিকেট প্রথা যতটুকু ছিল তাহার চেয়েও বেশী করিয়া এই প্রথাটি চালু করা এই সুপারিশে কি কৃষকদের সর্ব্বনাশ করিবার ব্যবস্থা হয় নাই?

বর্গাদার

কমিশনের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলা দেশের যত আবাদী জমী আছে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ নানা রকম বর্গাদারেরা চাষ করিয়া থাকে। এই বর্গাদারেরা ঠিক দিনমজুর নয়, সাধারণতঃ তাহারা ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ জমির মালিককে দিতে বাধ্য। ইহারা নিজেদের লাঙ্গল এবং নিজেদের বলদ দিয়া নিজেরা খাটিয়া জমি চাষ করে, কিন্তু জমিতে ইহাদের কোনও সত্ত্ব নাই। কমিশনের রিপোর্টে ইহাদের দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। কমিশনের কাছে কৃষকদের দাবীর মধ্যে বলা হইয়াছিল যে জমিতে বর্গাদারদের কায়েমী স্বত্ব দেওয়া হউক, কিন্তু, সে দাবী কমিশন গ্রহণ করেন নাই। এই বর্গাদারদের জন্য তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? ১১৪ প্যারায় তাঁহারা লিখিয়াছেন যে "বর্গাদারদের প্রজাস্বত্ব দেওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি কিন্তু, অন্যান্য প্রজাদের জমি সম্পর্কে সরকারী খরিদ-ব্যবস্থা শেষ হইবার আগে নহে।" ১৪৫ প্যারায় তাঁহারা লিখিতেছেন—"প্রজার অধীনে যে বর্গাদার আছে তাহাকে রায়তের স্বত্ব এবং রায়তের অধীনে যে বর্গাদার আছে তাহাকে আণ্ডার-রায়তের স্বত্ব দেওয়া উচিত, কিন্তু, তাহাদের কায়েমী দখলী স্বত্ব দেওয়া উচিত নহে।

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মীগের পর অথবা তাহারা সন্তোষজনক ভাবে চাষের ফল যদি না দেখাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের যাহাতে জমী হইতে উচ্ছেদ করা হয় সেই রকম আইন তৈরী হওয়া আবশ্যক।"

কমিশন ১৪৬ প্যারায় আবার বলিতেছেন যে "বর্গাদারদের ফসলের ভাগ অর্দ্ধেক না হইয়া তিন ভাগের দুই ভাগ ও মালিকের একভাগ হওয়া উচিত।" রিপোর্টের ১১৪ ধারা অনুসারে তাহারা যখন প্রজা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে তখন এই হারেই তাহাদের খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। কি সুবিচার!—নূতন ব্যবস্থায় জমীতে তাহাদের দখলী স্বত্ব জন্মিবে না, অথচ ফসলের দুই তৃতীয়াংশ মূল্য খাজনা হিসাবে ধার্য্য হইবে। বর্গাদারদেরও অন্যান্য কৃষকদের মত জমীতে পূর্ণ দখলী স্বত্ব দেওয়া উচিত এবং তাহাদের জন্যও খাজনার পরিবর্ত্তে আয় অনুযায়ী ট্যাক্সের ব্যবস্থা করা উচিত।

কৃষিঋণ ও ফসলের দাম

ফ্লাড্ কমিশনের কাছে কৃষকদের একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, যতই না কেন প্রজাস্বত্ব আইন করা হউক, কৃষিঋণ মকুব, ঋণদানের ব্যবস্থা এবং ফসলের দাম বৃদ্ধি না করিলে কৃষকদের বাঁচিবার আর আশা নাই। কিন্তু, এই সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি মামুলি কথা ছাড়া কমিশন কার্য্যকরী কিছুই বলেন নাই।

কমিশনের এই সমস্ত সুপারিশ যদি আইনে পরিণত করা হয় তাহা হইলে কৃষকদের কম পক্ষে ১০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের ভার লইতে হইবে, ২৬ কোটি টাকা বকেয়া খাজনা সরকারী কর্ম্মচারীরা কৃষকদের কাছ হইতে আদায় করিয়া লইবেন, খাজনা কমিবে না এবং বাড়ান হইবে। ইহার নাম কি জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ? কৃষক মরে মরুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু, সরকারী তহবিলে যাহাতে বেশী টাকা আসে তাহার জন্য এইভাবে জমীদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকারী জমীদারী স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাকে জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ বলে না। কৃষক আন্দোলনের ফলে জমীদারী প্রথা যখন আসামীর কাঠগড়ায় উঠিয়াছিল তখন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত এই 'বিচারকেরা" আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু আসামীর উপর

শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া ফরিয়াদীকে জরিমানা করা হইয়াছে। জমিদারেরাও এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়াছেন—তাঁহাদের আপত্তি জমিদারীটা তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া সরকারের হাতে কেন যাইবে, ক্ষতিপূরণ তাঁহারা ১০০ কোটির জায়গায় ২০০ কোটি কেন পাইবেন না, ইত্যাদি। কিন্তু, কৃষকের আসল দাবী হইল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হউক।

কমিশনের রিপোর্টে দুই একটি উপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশও আছে। তাঁহারা বর্গাদারদের ফসলের হিসাব আইন করিয়া অর্দ্ধেকের জায়গায় তিন ভাগের দুই ভাগ করিতে বলিয়াছেন, এবং অবিলম্বে তাহাদের রায়তী ও আণ্ডার-রায়তী স্বত্ব দিতে বলিয়াছেন, এবং ঋণ দানের দিকে সরকারকে নজর দিতে বলিয়াছেন, তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে যতদিন জমিদারী প্রথা থাকিবে ততদিনের জন্য জমিদারদের উপর আয়কর বসাইয়া ঐ টাকা দেশের কৃষির উন্নতিতে ব্যয় করা হউক। এই ব্যবস্থাগুলি অবিলম্বে চালু করা প্রয়োজন এবং ইহার বিরুদ্ধে জমিদারদের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলে কৃষক সমস্যা আরও দুরূহ হইয়া পড়িবে।

ফ্লাড্ কমিশনের রিপোর্ট প্রমাণ করিয়াছে যে সরকারী অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কৃষকদের বাঁচিয়া থাকিবার কোনও আশা নাই। কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সংহতিই কৃষকদের মুক্তির একমাত্র পন্থা।

নিখিলনাথ চক্রবর্ত্তী
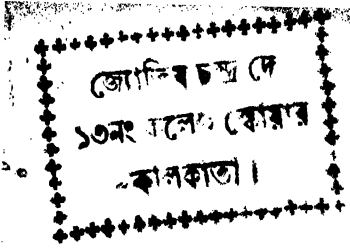
একখানি প্রাচীন নাটক

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত নাটকের অপ্রাচুর্য না থাকলেও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত প্রাচীন জনপ্রিয় নাটকের খোঁজ অতি কমই পাওয়া যায়। 'যাত্রা'র পালাগুলি অতি আধুনিক, কিন্তু তা যে আজ পর্যন্ত একটি প্রাচীন ধারাই সংরক্ষণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রাচীন ধারার ইতিবৃত্ত অঙ্কন করবার উপযুক্ত উপাদান আমাদের নাই। অথচ সংস্কৃত নাটককেও এই ধারা হতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেখা চলে বলে মনে হয় না।

নেপালের রাজকীয় পুস্তকাগারে অনেকগুলি প্রাচীন নাটকের পুঁথি সংরক্ষিত আছে। কিছুকাল পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় "নেপালে ভাষা নাটক" নামক প্রবন্ধে এই সব পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলাম। এই নাটকগুলি খৃষ্টীয় ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ নাটকের রচয়িতা ছিলেন নেপালের রাজবংশের রাজারা।

সে কালে হিন্দু রাজারা নাট্য ও সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, বিশেষত হিমালয়ের নিভৃত উপত্যকায় নেপালের রাজাদের নাট্য ও সঙ্গীতে উৎসাহ দেখাবার যে অবসর ছিল তৎকালীন অন্যান্য রাজাদের তা ছিল না। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ ভাগে নান্যদেব নামক কর্ণাট দেশের এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার কোনক্রমে মিথিলা হস্তগত করেন ও পরে নেপাল জয় করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বহুদিন নেপালে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই বংশের রাজারাই নাট্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

নান্যদেব নিজে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের এক টীকা রচনা করেন, এ গ্রন্থের নাম 'সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কার'। জগজ্জ্যোতি মল্ল নামক এক রাজা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমে ভাতগাঁওয়ে রাজত্ব করেন। তিনিও সঙ্গীত শাস্ত্রের উপর নানা গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর প্রধান রচনা হচ্ছে নাটক। তাঁর রচিত তিনখানি নাটক এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে—"মুদিত কুবলয়াশ্ব', 'হরগৌরী বিবাহ', ও 'কুঞ্জবিহার নাটক'। এর কোনখানিই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। শুধু নেপালের রাজকীয় পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুথি হতেই এগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সব নাটককে গীতিনাট্য বলা চলে, বস্তুত 'যাত্রা'ও প্রাচীনকালে গীতি-নাট্য ব্যতীত আর কিছু ছিল না। সেই কারণে এই সব নাটকে শুধু গানগুলিই দেওয়া আছে, এ ছাড়া অভিনেতারা অভিনয়ের সময়ে অন্যান্য কথা রচনা করে বলতেন। পরবর্ত্তীকালেও নেপালে যে সব নাটক রচিত হয় তা বেশীর ভাগ এই ধরণের।

এই নাটকের ভাষা কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষা নয়, একটি কৃত্রিম ভাষা যা এই যুগে প্রায় সমস্ত প্রাচ্য ভারতবর্ষে গীত ও গীতিনাট্যের বাহন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এই ভাষাকে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। এই ভাষার উপাদান কি তা এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। মথুরা অঞ্চলের ব্রজভাষা অথবা মৈথিল বিদ্যাপতি রচিত পদাবলীর ভাষাকে অবলম্বন করে এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ত্তমানে স্থির করা অসম্ভব। তার কারণ ব্রজভাষায় রচিত কোন প্রাচীন পদাবলী এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলী কতদূর তার প্রাচীন রূপ রক্ষা করেছে তাও অনিশ্চিত। বিদ্যাপতি প্রথমে 'কীর্ত্তিলতা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন অবহট্ট বা অপভ্রংশ ভাষায়, বিদ্যাপতির রচিত পদাবলীর মধ্যে দু'একটি পদও এই অবহট্ট ভাষায় রচিত। এ ভাষায় রচিত কাব্য গান করা হত না, কারণ তার বিষয়বস্তু লোকপ্রিয় ছিল না, অথচ পদাবলী ছিল জনপ্রিয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষার কথা বাদ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ হতেই এই ব্রজবুলি সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালী কবি যশোরাজ খাঁ, উড়িষ্যার রামানন্দ রায়, আসামের শঙ্কর দেব, সকলেই এই ভাষায় রচনা করেন। সুতরাং ঐ সময়েই যে সে ভাষা নেপালেও প্রবেশ করেছিল তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নাই। নেপালী নাটকগুলির সঙ্গীতাংশ এই ভাষায় রচিত, একটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে—

অধিন অপন পহু অহনিশি লাস
শয়ন ভোজন কত রচিত সুবাস।
নিজ মন পূরিলহু রতিসুখ আস।
নয়ন তরংগ মৃগমদ বাস।

বিবিধ রমন দিন রজনি সমান।
অধর অরুণ সম অমিঞ নিধান।

ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা হলেও তাতে যে সব সুললিত পদ রচিত হয়েছিল তার কবিত্ব ক্ষুন্ন হয় নি, সেই কারণে নেপালের নাটকগুলির সঙ্গীতাংশ অনেক স্থানেই কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

জগজ্জ্যোতি মল্লের রচিত 'কুঞ্জবিহার নাটক' নাতিদীর্ঘ। এ নাটকে ৩৩টি গান আছে, গানগুলির ভণিতা হতেই বোঝা যায় যে এ নাটক জগজ্জ্যোতি মল্লের রচিত—

—কহে নৃপ জগজোতি সুন শশিভালে
রাগ মালব গাবএ অট তালে।
—নৃপ জগজোতি মল্ল বাণী,
মোর গতি একে ভবাণী॥
—নৃপ জগজোতি মল ভণে গুণি গাব।
ছাড়ো ঋতুরস পুন মতজন পাব।

এই ৩৩টি গানের সুরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সুরগুলির সূচী হতেই বোঝা যাবে যে খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমে নেপালে কোন্ কোন্ রাগ বেশী প্রিয় ছিল।

রাজবিজয়। ১।
মালব। ২।১৭।১৯।২৮।
আসাবরী।৩।১২।১৫।৩১।
বসন্ত।৪।
পহড়িয়া ৫।৯।
ধনাশ্রী।৬।১৪।২১।২৫।
ভূপালী।৭।
নেট (নট) ।৮।
কোরাব।১১।২৩।
সারঙ্গী (সারঙ্গ)।১৩।

বরাড়ী ।১৬।৩০।৩২।

কানরা ।১৮।

বেলাবলী ।২০।

দেশাখ ।২২।

মল্লারী ।২৪।

ভীম পলাসী । ২৬ ।

শ্রী । ২৭ ।

কেদার । ।২৯ ।

পঞ্চম । ৩৩ ।

মারু । (আরতিগীত) ।

এ সব রাগ কি কি তালে গীত হত তার উল্লেখও কিছু পাওয়া যায়। কতকগুলি তালের নাম—জতি, অঠতাল, অস্তারা (?), এ (একতালী), প্র, খ, এবং চো (চৌতাল)। সাংকেতিক অক্ষরগুলির সম্পূর্ণ অর্থ বিশেষজ্ঞেরাই জানেন।

কুঞ্জবিহার নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কুঞ্জলীলা। নাটক শৃঙ্গাররসাত্মক, কিন্তু প্রাচীন নাটক ও 'যাত্রা'র ন্যায় এর উদ্দেশ্যও ধর্মশিক্ষা। এ সব নাটক অভিনীত হত কোন পর্বদিনে এবং মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে। সেই কারণে নাটক শেষ হয়েছে আরতিগীতে। এই আরতিগীতে শিবপদ স্মরণ করা হয়েছে, কারণ নেপালের রাজারা ছিলেন ভবানীভক্ত এবং শিবভক্ত। আরতিগীতের এক কলি উদ্ধৃত করলেই একথা স্পষ্ট হবে—

অনিল অনল জল ভূমি আ(কাশ)কাহি
পুন উপজাই।
অদেহ পরম শিবপদ পর পরম জোতিলয়
তাহি সঞো (?) রাখি।

এ নাটক 'যাত্রা'র মতই জনপ্রিয় নাটক, কিন্তু এ নাটকের অভিনয়ে সংস্কৃত নাটকের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। প্রথমেই নান্দীগীত—

অনল সুরুজশশি তিনিহু নয়নে।
জন অভিমত দেঅ পাচহু বদনে।
বরাভয় শূলহাত ডমরু বজাবে।
তাহি শিব পরসাদে সবে সুখ পাবে।
গজানন ষড়ানন সুত তুহু সঙ্গে।
মঙ্গলদায়করূপ আছতু রঙ্গে।
···গাঙ্গতনু তিনু ধবল প্রকাশে।
নৃপ জগজোতিমল তু পদ আসে॥

নান্দীগীত শেষ হবার পর সূত্রধারের প্রবেশ ও গীত—

বিভূতিভূষণ ভব ফণিময় হারে।
চরম বসন শির সুরসরিধারে।
তিলক অমিঅ কর গরল অহারে।
মদন দহন হর সংসার অসারে (?)।
ত্রিশূল ডমরু কর বেশহ পখানে।
তোমার সরূপ শিব কেও নাহি জানে।
কহে নৃপ জগজোতি সুন শশিভালে।
রাগ মালব গাবএ এহো অঠতালে।

সুত্রধার তাঁর গীত শেষ করলেন এবং যাবার সময় গান গেয়ে নায়কনায়িকার প্রবেশের ইঙ্গিত জানিয়ে গেলেন—

কুঞ্জবিহার হরি সাজরে।
গোপা সবে হরখিত আজরে।

সূত্রধরের এই ইঙ্গিতও নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করছে। এই ইঙ্গিত অনুসারেই রাধাকৃষ্ণ সুসজ্জিত হয়ে প্রবেশ করলেন।

(রাধাকৃষ্ণয়োলঙ্কার প্রবেশ)।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বললেন—যেখানে যমুনাতীরে শীতল সুগন্ধ-সমীর বয়, যেখানে তরুচয় নবপত্রে সুশোভিত, মধুকর গুঞ্জনে সকলে মোহিত, সেই বনে আমরা বিলাস করব।—

জাহি বহ জমুনাতীর শীতল সুরহি সমীর।
নবদলে তরু-অর সোহ মধুকর ধুনি সব মোহ।
তাহি বিদিরা (?) বন মাঝ হমর হৃদয়গুণ বাঝ।
তাহা গত্র করিএ বিলাস জঞো পুরাবএ আস।

সময় বসন্ত, কারণ তরুচয় নবপল্লবে শোভিত হয়েছে, প্রস্ফুটিত পুষ্পের চারিধারে মধুকর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, শীতল [মলয়] সমীর বইছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সময়োপযোগী বসন্ত রাগেই তাঁর অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। অভিনয়ে নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও শ্রোতারা সচেতন হলেন।

এর পর ষড়ঋতু বর্ণনাগীত। এ গীত কে করছেন তা নাটকে বলা হয় নাই। ষড়ঋতু বর্ণনা মামুলী বিষয়, এ জাতীয় সব নাটকেই তা আছে। মনে হয় এ গীত গাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চে 'যাত্রা'র 'জুড়ী'র মত অন্য লোক থাকতেন, তাঁরাই এ সব মামুলী গীত করতেন। পুথি অস্পষ্ট ব'লে এই ষড়ঋতু বর্ণনার দুই একটি কলিকা নাই।

সময় বসন্ত বিপিন ঘন সোহ।
পরিহরি লাজ মুনি···কা মোহ॥
··· ···························।
······ ঋতু করি এ বিলাস॥
তপ ঋতু সবহি সুশীতল জীব।
বিরহিণি রঅণি দিনহ দিন খীণ॥
বারি সধর হর সবহি সোহাব।
জলধর ধোএল ধূলি মোহি তাব।
সরদ সোহা ওন শশধর ভাস।
শাঁখ পখাউল জল পরগাস।
হিম ঋতু জুবতী হৃদয় পায়।
দিন···রসিক বিরহ ঘটি জায়।
শিশির সবহি মন তপন উচ্ছাহ।
কমলিনি বন হিম জনে ভেল দাহ।

নৃপ জগজোতিমল ভণে গুণি গাব।
ছাড়ো ঋতু রস পুন মত জন পাব।

এর পর শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে কুঞ্জবনে বিরাজ করতে অনুরোধ করছেন, রাধাও প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছেন যে অসহ্য বিরহবেদনায় তিনিও কষ্ট পাচ্ছেন—

অসহ বেদন সহি মজায়।
কে বিধি রহব কহ উপায়।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে যে কাব্যরস আছে তা আজও অবহেলা করা চলে না। তিনি রাধিকার সৌন্দর্যের বর্ণনা করছেন—

কুলবহ নারিকা লাজ সোহাবএ কেলি অবসর অনুরীত।
তোহর বদন দেখি ধরি নহো অমন করহ মানস ভীত॥
রাধা তেরে চঞ্চল লোচন জোর॥
তোহর দাস পদমো ভব তউমানও ন করহু হৃদয়মলান।
মদন বেআধি মোর এক ঔষধ তোহর মধুপান॥
হম কিছু বিহুসি নিহারহ সুন্দরি পরিহর পিসুনক পাস।
কতহু নয়াএ অমাবসি রঅণী কুমুদিন হোঅ বিকাশ॥

রাধাকৃষ্ণের এই মিলনের পর আবার বিরহ। শ্রীকৃষ্ণ কার্যব্যপদেশে মথুরাপুরে চলে গেলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে তিনি সত্বর প্রত্যাবর্তন করে রাধিকার সঙ্গে মিলিত হবেন। তখন রাধিকা ও অন্যান্য গোপীদের দারুণ বিরহ উপস্থিত, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অশেষ অনুরাগের কথা স্মরণ করে ব্যথিত হয়ে উঠলেন, তখন—

—চন্দন সখি গরল সমান,
সবতহ কঠিন কুসুম শরবাণ।
মধুরে মধুরে স্বরে কোকিল গাব।
বিহি মোর বাম মরণ যএ ভাব॥

তখন বিরহে কাতর হয়ে গোপীরা সর্বত্র হরিকে দেখতে লাগলেন; এই সময়ে বৃদ্ধার প্রবেশ, বৃদ্ধা কৌতুকপ্রিয়, নাটকে হাস্যরস অবতারণা করবার জন্যই তাঁর আবির্ভাব।

কিন্তু রাধিকা আর অপেক্ষা না করে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন—
"জাএব মথুরপুরি কাহ্নু দেখব তাহি।"

দরশনে ন চিহ্নল চান্দন গাছে।
অনুভবি সৌরভ কুশল যাছে।
তসু গুণ সমুঝি হৃদয় হোঅ ঝুর।
পেম বাঢ় জৈসে সরসিজ সুর।
পুনু মন করি জাইঅ তসু পাসে।
ফণি বেঢ়ল দেখি উপজ তরাসে।
শিব শিব দারুণ-বিধিক অকাজে।
সুজন অমিলহা কুজন সমাজে॥

কিন্তু রাধিকার আর যেতে হল না। দূতী এসে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন—

কাহ্নু চরণ ভেটি আজ।
আনব রাহিক সমাজ।

কিন্তু সখীরা রাধিকার অবস্থার যে বর্ণনা করছেন তা হতে বেশ বোঝা যায় তাঁর উন্মাদের অবস্থা। রাধিকা তখন সখিদের—

পত্র পড়ি পুনু পুনু কহ অনুতাপে।
খনে হস খনে রুস করএ বিলাপে।

এদিকে মথুরাপুরে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও অনুরূপ ভাবে চঞ্চল। ইতিমধ্যে দূতীর মুখে সংবাদ পেয়ে তিনি মথুরা পরিত্যাগ করে যমুনা তীরে কুঞ্জের দিকে উন্মত্তবেশে অগ্রসর হলেন। পথে তরুলতাদের জিজ্ঞাসা করছেন—

আজ দেখলি মোঞ রাধা কি কুঞ্জবন?

এর পর রাধিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনে মান অভিমান, রাধিকা পুরুষ জাতিকে ধিক্কার দিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাও করলেন।

—পুরুষ জাতি সবে জহা তহা বুল
লখএ ন পারক করকী মূল।

সব ঘর সুনিঅ তোহর উপহাস।
তোহ সঞো কেলি করব কঞোন আস ?

শ্রীকৃষ্ণও স্ত্রী জাতির অনুরূপ নিন্দা করলেন—

নারী নীর নীচ অনুসরই।
কত অবরোধি অথির নর হই।
কপট কোপধর কুলটা রীতি।—

রাধাকৃষ্ণের এইরূপ মান অভিমান পালা চলছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধা তাঁর কৌতুকগীত গাইতে গাইতে প্রবেশ করলেন এবং শ্রোতাদের মনে বিচিত্র রসের উদ্রেক করলেন।

বাহ্মণ বনিআ আ অরে রকত জাতিরে।
দশ পাঞে খেপও সগরি (?) এ নাতিরে।
ভুখে দুখে কোপে ভেখ ধর জোগি সন্ত্রাসী।
মোহিসঞো কেলিকর কলপালি তপসী।
দিন দুই চারি গেল পাছে পচ তাই রে।
ধনক কারণে পুনু দহদিস যাই রে।
অমল জোবন ধনমদে মাতিরে।
হমর সঙ্গে সেহে করকত ভাতীরে।
মোঞে বড় রসিআ তুহে সবে জানরে।
কৌতুকে নৃপ জগজোতি মল্ল ভানরে॥

বৃদ্ধা শ্রীরাধিকার রূপ নিয়ে নানা ঠাট্টা তামাসা করতেও ছাড়লেন না। তারপর গোপীরা নানা মিনতি জানিয়ে এই মান ভঙ্গ করলেন, রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় মিলন সাধিত হল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দোষ স্বীকার করলেন—

পরিণত ভেল মোর ভাগ
তোহে বচন মন লাগ।
তোহে মোরে হৃদয়ক হার।
সকল সংসারক সার।
মোঞে জাতি অবুঝ গোআরি।
আবে জনু তেজহ দুরারি।

লোহফাস হোঞ (?) ছড়াএ।
পেমে বাধলু কহা জাএ।
নৃপ জগজোতি মল ভান
হর ছাড়ি গতি নাহি আন॥

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার এই মিলনেই নাটকের পরিসমাপ্তি। কিন্তু অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম্মশিক্ষা। কেবলমাত্র রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ব্যাপারের অবতারণায় শ্রোতাদের মনে অনুরূপ ভাব উদ্রেক নয়। ভগবানের লীলা ভগবানের জন্য, সেই লীলা কীর্ত্তন করা হয় শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। তাই নাটকের ঠিক পরিসমাপ্তি এখানে নয়, অভিনয় শেষ হবার পুর্বে শ্রোতাদের মনে ভক্তিরসের উদ্রেক না করতে পারলে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সেই জন্য রাধাকৃষ্ণের এই মিলনের পরই নাট্যকার শান্তিরসের অবতারণা করেছেন। এই 'শান্তিরস-গীত' বোধ হয় রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত অন্য গায়কদের দ্বারা গীত হ'ত।

মমতা মোহ নিবারি, দেহক তত্ত্ব বিচারি।
রে মন সরে জঞো গুরুগম অবধান।
অহনিশি ধরএ ধেয়ান।
তাহি তে উতরিয় পার বিষম জলধি সংসার।
নৃপ জগজোতি এহো গাব।
অবহু তেজহ জড় ভাব॥

আর একটি শান্তিরস-গীত—

অবুঝক আগে জে গুণ গাব।
অপন পরাভব অপনে লাব।
বিনু বুঝলে পুনু সীর দোলাব।
কানে সুন এমন দহদিশ ধাব।
ঔঘি সগর খন আঁখি ন সুঝ।
গুণিজন পরিসম কিছুও ন বুঝ।
বহিরাকে জেঞো কহিঅ সংদেশ।
হৃদয় বেদনহো বদন কলস।

কহে বিচারি জগজোতি নরেস।
জাহি বিবেক তাহি দিঅ উপদেশ।

এর পর দেবিবিজ্ঞপ্তি-গীত, এ গীত হচ্ছে দেবি ভবানীর গুণগান। মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যবধের উল্লেখ করে দেবীর সমস্ত পৌরাণিক উপাখ্যান সম্বন্ধে শ্রোতাদের সচেতন করা হয়েছে।

সর্বশেষে দেবীর আরতি গীতে অভিনয় সমাপ্ত হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী হতেই এই জাতীয় গীতিনাট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ সব নাটকে ঘটনা বাহুল্যের কোন প্রয়োজন নাই। কোন পৌরাণিক গল্প অবলম্বন করে ধর্ম শিক্ষাই হচ্ছে অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। মোটের উপর সাধারণের মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক করাই হচ্ছে প্রধান কাম্য, কিন্তু সেই প্রধান উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ না করে অন্যান্য রসের অবতারণাও করা চলতে পারে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
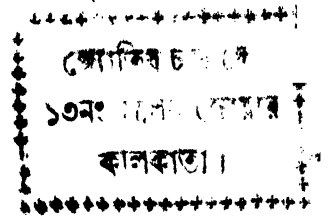
পুস্তক-পরিচয়

The Grand Whiggery—by Marjorie Villiers (John Murray) 16/-

কোল্‌রিজ্‌ বুঝেছিলেন যে হুইগ্‌-টোরি-র মধ্যে আপাতত আকাশ-পাতালের তফাৎ থাকলেও, ইংরেজী রাষ্ট্রব্যবস্থার অনাদি ত্রৈগুণ্যে উভয় পক্ষই সমান আস্থাবান; তবে স্বার্থরক্ষার গরজে প্রথমোক্তেরা যেমন রটাতেন যে রাজা, অভিজাতসম্প্রদায় আর প্রজামণ্ডলীর চিরস্থায়ী ত্রৈলোক্য রাজশক্তির অতিবৃদ্ধিতে বিপন্ন, তেমনই শেষোক্তেরা ইষ্টলাভের প্রত্যাশায় বিশ্বাস করতেন যে সে-সমাজশৃঙ্খলা অন্ত্যজদের অবৈধ উৎপাতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অবশ্য কোল্‌রিজ-এর মন্তব্য এখনো স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি; এবং সেইজন্যে আজও আমরা অনেকে ভাবি যে ফরাসী বিপ্লবের আতিশয্য-প্রসঙ্গে বর্ক্‌-এর অতিশয়োক্তি তাঁর নিরপেক্ষ মাত্রাজ্ঞানের নিদর্শন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা কোল্‌রিজ্‌-এর সিদ্ধান্তই ভজিয়েছে; এবং বিশেষজ্ঞেরা এক রকম এক বাক্যেই বলছেন যে দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ তৎকালীন কুলীনকুলসর্ব্বস্বদের না পুছে সোজাসুজি প্রজারঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছিলেন ব'লেই, টোরি-রা কার্য্যত হুইগ্‌ রাজদ্রোহীদের বাদ সাধেননি, তাঁদের রাজভক্তি থেমে গিয়েছিলো মৌখিক প্রতিবাদে।

পক্ষান্তরে টোরি-রা তখনো পর্য্যন্ত বিবেক আর স্বার্থের প্রভেদ মানতেন। ফলত প্রতিষ্ঠিত রাজকুলের উচ্ছেদসাধন তাঁদের সাধ্যে কুলোয়নি, তাঁরা নবাগত অরেঞ্জ্‌ বংশকে দূরে রেখেছিলেন; এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্‌-এর মুখে যেহেতু ইংরেজী ভাষা সুদ্ধ বেরোতো না, তাই তাঁদের সময়ে হুইগ্‌-দের একাধিপত্য প্রায় অসীমে পৌঁছেছিলো। তৎসত্ত্বেও হুইগ্‌-শাসন অটুট রইলো না। তাঁদের অদৃষ্টদোষে তৃতীয় জর্জ্‌ জন্মালেন অসম্ভব রকমের জেদ নিয়ে; এবং সেই জেদ পাগলামিতে বদলাবার আগেই পৈতৃক মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচার তাঁর অসহ্য লাগলো। উপরন্তু ষড়যন্ত্রী হিসাবে কোনো হুইগ্‌ তাঁর নাগাল পেতেন না; এবং উৎকোচবিতরণের অসামঞ্জস্যবশত হুইগ্‌ গোষ্ঠীতেও ইতিমধ্যে ফাট ধরেছিলো। সুতরাং জনকতক অসাধু টোরি আর সমস্ত অসন্তুষ্ট হুইগ্‌-দের

জুটিয়ে তৃতীয় জর্জ্ অবিলম্বে এক দরবারী দল গ'ড়ে তুললেন; এবং নিশ্চিন্ত হুইগ্ কর্ত্তাদের চমক ভাঙতে না ভাঙতেই ইংলণ্ডের রাষ্ট্রভার তাঁদের কবল থেকে চ'লে গেলো।

তখন রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হয়ে অগত্যা তাঁদের চোখ পড়লো জনসাধারণের উপরে; এবং বিদেশী হ্যানোভেরিয়ান্-দের স্বদেশের সিংহাসনে বসিয়ে তাঁরা যেহেতু ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়েছিলেন যে রাজাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকারে তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, তাই রাতারাতি আভিজাতিক মনোভাব ঘুচিয়ে গণশক্তির স্বপক্ষে বাগ্যুদ্ধ চালাতে তাঁরা লজ্জা পেলেন না। অবশ্য অসদুদ্দেশ্যে সৎকার্য্যের সম্পাদন সকল কালেই সম্ভব; এবং ফক্স্-প্রমুখ বিপ্লববিলাসীদের তর্জ্জন-গর্জ্জন অতৃপ্ত প্রত্যাশার অসরল অভিব্যক্তি ব'লেই, তার ঔদার্য্য তথা ঔচিত্য অস্বীকার্য্য নয়। কিন্তু বর্ক্-এর মতো মহাপুরুষেরাও প্রকাশ্য ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত কদাচারের মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন; এবং মেকলে-র ব্যক্তিগত জীবনে যদিও অপবাদের অবকাশ ছিলো না, তবু সেজন্য তাঁর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রশংসনীয়, না স্বল্প মেধা ও সঙ্কীর্ণ মতি উল্লেখযোগ্য, তা আজ পর্য্যন্ত তর্কাধীন।

তবে স্বার্থ-পরমার্থের সমীকরণে শুধু হুইগ্-রাই সিদ্ধহস্ত নন, সমগ্র ইংরেজ জাতিই সুবিধাবাদী। অন্ততপক্ষে সে-দ্বীপের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী অন্তর্যামীর প্রত্যাদেশে সুবর্ণ সুযোগের সন্ধান পায়; এবং সম্ভবত সেইজন্যে নিজেদের স্খলন-পতন-ত্রুটিতে তারা দমে না, বরং সকল অবস্থাতে আত্মোন্নতির অবকাশে খোঁজে। অতএব হুইগ্ আত্মম্ভরিতা জাতীয় চারিত্র্যের প্রকাশমাত্র; এবং হয়তো এ-দিক থেকে তাঁরা সারা ইংলণ্ডের প্রতিভূকল্প ব'লেই, তাঁদের যথেচ্ছাচারেও সে-দেশের বিশেষ কোনো অনিষ্ট ঘটেনি। পক্ষান্তরে তাঁদের এমন কতকগুলি গুণ ছিলো যা ইংলণ্ডে চির দিন দুর্লভ: সাধারণ ইংরেজের মতো তাঁরা কূপমণ্ডূকদের পছন্দ করতেন না; তাঁরা বুঝতেন যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত শিল্প-বিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি দুঃসাধ্য, এবং তাঁরা যেহেতু জ্ঞানত প্রজ্ঞা ভিন্ন অপর কিছুর নির্দ্দেশ মানতেন না, তাই গুণের আদর তাঁদের সাধারণ ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

উপরন্তু প্রতিভার ধার না ধারলেও, তাঁদের অনেকেই মনীষায় ফাঁকি

পড়েন নি ; এবং তাঁদের সাহিত্যসাধনা বা দর্শনানুশীলন যথার্থ সৃজনীশক্তির অভাবে প্রায়ই বিফলে যেতো বটে, তথাচ মানসিক ব্যাপারে আধুনিক রাষ্ট্রপতিরা যে-হাস্যকর অক্ষমতা দেখান, সে-রকম অকিঞ্চিৎকর আলাপ-আলোচনা তাঁদের কল্পনাতেও আসতো কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ অনধিকার চর্চ্চায় অসামান্য চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় দিতে না পারলে, তাঁদের আত্মপ্রসাদ টিঁকতো না, এবং তাঁরা ভাবতেন যে সুখপাঠ্য চিঠি-পত্রে বহুমুখী ঔৎসুক্যের প্রকাশ শিক্ষিত মানুষমাত্রের প্রথম কর্ত্তব্য। অবশ্য বাহিরের সম্ভ্রমবোধ সত্ত্বেও তাঁদের অন্তর্ব্বিবাদে নীচতা ও পরশ্রীকাতরতাই ধরা পড়তো ; এবং প্রাপ্যের অধিক পাওনা না জুটলে, তাঁরা মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা ভুলতেন। কিন্তু হয়তো সেই কারণেই তাঁদের মানুষী মূল্য বেশী ; অন্ততপক্ষে নিজেরা দুর্ব্বল ব'লে, তাঁরা পরের দোষও সহজে ক্ষমা করতেন ; এবং তাই তাঁদের সৌহৃদ্য যেমন লোভনীয় লাগতো, তেমনই নিরাপদ ঠেকতো তাঁদের শত্রুতা।

মোটের উপরে তাঁদের পরিমণ্ডলে এমন একটা অসঙ্কোচ দেখা দিয়েছিলো যা তাঁদের আগে বা পরে ইংলণ্ডে আর কখনো জ্ঞানগোচরে আসেনি ; এবং এ-সিদ্ধান্ত ঠিক হলে, আমরা আরও মানতে বাধ্য যে আঠারো শতকী ইংলণ্ডে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তবে যাঁদের কাছে সভ্যতার প্রগতি আর দৈনন্দিন জীবনের উপকরণবৃদ্ধি সমানুপাতিক, তাঁদের মতে ভিক্টোরীয় যুগ নিশ্চয়ই অধিক প্রাগ্রসর ; এবং এই মানদণ্ডে মাপলে, হুইগ্ কীর্ত্তি-কলাপের অনেকখানিই অগত্যা বাদ পড়ে। কিন্তু তখনো স্পেংলারী বিচারপদ্ধতি টিঁকে থাকে ; এবং সেই আদর্শ খাটালে, বোঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দী সংস্কৃত নয়, সভ্য, উন্নত নয়, অধঃপতিত। আসলে ভিক্টোরীয় যুগের নিজস্ব সম্পদ কিছুমাত্র নেই ; তার প্রথম দিকটা আঠারো শতকের অস্তরাগে রঞ্জিত, এবং শেষার্দ্ধ বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাভাস। সে-যুগের অনন্য অবদান অজ্ঞাতসারে অথবা বিপরীত বিশ্বাসে ধ্বংসের বীজবপন ; এবং তখনকার বিলম্বিত ফসল কাটতে বর্ত্তমান শতাব্দীর সমস্তটাই ফুরোবে কিনা কে জানে।

মিসেস্ ভিলস্-এর মুখ্য পাত্র-পাত্রীরা আঠারো শতকের মানুষ ; এবং ভিক্টোরীয় যুগের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সম্পর্ক লেডি ক্যারোলিন্ ল্যাম্-এর

স্বামী তথা মহারাণীর প্রথম মন্ত্রী উইলিয়ম্ ল্যাম্-এর মারফতে। উপরন্তু গ্রন্থকর্ত্রী ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খোশখবর সরবরাহ ক'রেই তিনি খুশী ; এবং এই সব গল্প-গুজবেরও নিজস্ব মূল্য নেই, যারা তাঁর পরচর্চ্চার অবলম্বন, তারা অন্যান্য কারণে অবিস্মরণীয় ব'লেই, তাদের বিষয়ে তুচ্ছ কথা সুদ্ধ অর্থগৌরবে গরীয়ান। তবু আলোচ্য পুস্তকের উপসংহারে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের মানসিক অবরোহণ সুস্পষ্ট ; এবং সে-মতি-পরিবর্ত্তনকে আভিজাতিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে দেখা অসম্ভব ; প্রবর্দ্ধমান উনিশ শতকের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইংরেজ জাতির চিৎশক্তিই কেমন যেন লোপ পেতে থাকে। তবে সে-সর্ব্বনাশের উপলব্ধি হুইগ্ দলের জীব-দ্দশায় ঘটেনি ; এবং সেইজন্যে এ-বইয়ে মিসেস্ ভিলর্স্ উক্ত ট্র্যাজেডির আভাস দিয়েছেন মাত্র, তার ছবি আঁকেন নি।

এখানে তিনি হুইগ্ প্রতিভার শেষ জৌলসটুকুই ফুটতে চেয়েছেন ; এবং সেই মুমূর্ষু রশ্মিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে ডেভন্‌শার হাউস-এর নবরত্নসভা—বর্ক্, ফক্স্, শেরিডন্ ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গেরা। সুতরাং মিসেস্ ভিলর্স্-এর পুস্তক স্বভাবতই চিত্তাকর্ষক ; এবং তিনি যেহেতু সাধ্যপক্ষে নিজের জবানিতেও লেখেননি, পারলেই, সে-কালের উপাদেয় চিঠি-পত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করেছেন, তাই রচনারীতির জড়তা সত্ত্বেও 'দি গ্র্যাণ্ড্ হুইগরি' আদ্যন্ত সুখপাঠ্য। কিন্তু তিনি একই লোককে একাধিক নামে ডাকতে অভ্যস্ত ; এবং এই দোষ যদিও মারাত্মক নয়, তবু বিরক্তিকর জটিলতার জনক। গ্রন্থকর্ত্রীর বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ এই যে তাঁর আড়ম্বরপ্রীতি এমনই প্রখর যে অষ্টাদশ শতাব্দীর জনসাধারণ কী ভাবে দিন কাটাতো, কী চক্ষে বড় লোকদের কাণ্ড-কারখানা দেখতো, সে-সব প্রসঙ্গের উল্লেখ এই বৃহৎ পুস্তকে এক বারও নেই ; এবং আঠারো শতকের মতো আপাতনির্লিপ্ত যুগের সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর শুচিবায়ু মার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু এতখানি উন্নাসিকতা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিপন্থী।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
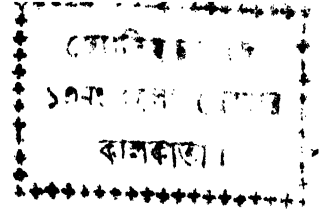
How Green Was My Valley. By Richard Llewllyn.

(Michæl Joseph Ltd.). 9/6d.

ওয়েল্‌স্‌ দেশের উপত্যকাটির নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ছিল মনোরম। নিবিড় শ্যামলিমা, কাকচক্ষু স্রোতস্বিনী আর সুদৃশ্য পর্ব্বতমালা। সেখানকার মানুষও ছিল ভাল—ধর্ম্মভীরু ও শান্ত। ফাঁড়ি বা কয়েদখানার বালাই সেখানে ছিল না। উপত্যকার গায়ে এলায়িত গ্রামটির বাসিন্দারা সকলেই ছিল শ্রমজীবী কিন্তু আমাদের দেশের মজুরদের মত নিরবলম্ব লক্ষ্মীহীন নয়। দরিদ্র হ'লেও ছোট ছোট পরিবারগুলি সুব্যবস্থিত ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। তার মধ্যে মরগান ফ্যামিলি ছিল অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী। সেই পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র হিউ-র আত্মস্মৃতি হচ্ছে গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। তার জীবনকালে জন্মভূমির সুষমাময় আনন কয়লার খনির আবর্জ্জনায় নষ্ট হ'য়ে যায়, বাইরের মজুরদের আমদানিতে সমাজের শৃঙ্খলতা যায় চূর্ণ হয়ে। তার নিজেরও মানসলোকের সরলতা, আশা, ভরসা অভিজ্ঞতার প্রতিঘাতে নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়।

এই সকল পরিবর্ত্তন সহসা আসে নি। সকলের অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতসারে তস্করের মত লঘু পদক্ষেপে এসেছে। কিন্তু হিউ-র হৃদয় ছিল এত কোমল যে প্রত্যেকটি আঘাত তাতে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। বাস্তবিক, বর্ণনা এত নিবিড়, এত করুণ, এত সরল যে মনে হয়, গ্রন্থকার আপন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন ছদ্মনামে।

সাধারণত আত্মস্মৃতি প্রণিধান করলে ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গল্প বয়নের সরঞ্জাম এত সাধারণ ও মামুলি যে সে প্রশ্ন নিরর্থক।

গার্হস্থ্য জীবনের সরল ও মোটা সমস্যা; বিদ্যালয়ের 'শিক্ষকবর্গ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠীদের অত্যাচার; ধর্ম্মযাজকের সঙ্গ; শ্রমিকদের দাবী ও ধর্ম্মঘট—ইত্যাদি ব্যাপার বালক হিউ-র হৃদয়ে যে ব্যথা, আনন্দ ও বিস্ময়ের ছোঁয়া দিয়ে গেছে তার সঙ্গে প্রত্যেক পাঠকই পরিচিত হয়েছেন কোন না কোন সময়। পরিণত বয়সের ঘটনাবলীর মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নাই।

তথাপি গ্রন্থখানি এত চিত্তাকর্ষক ও লোকপ্রিয় হয়েছে যে প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের মধ্যেই সপ্তম সংস্করণ ছাপা হ'ল।

স্বল্প কথায় কারণ নির্ণয় করতে হ'লে বলতে হয় যে স্মরণীয় বিষয়গুলি অনুপম দক্ষতার সঙ্গে চয়িত হয়েচে, অনাবশ্যক ঘটনাভারে শ্লথগতি হয়ে পড়েনি, ভাবালুতার রঙিন ফানুসেও উড়ে যায় নি।

কাহিনীটির গোড়াপত্তন হয়েছে করুণ ভাবে। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দেশস্থ সুখী জনের অসদাচরণের প্রতিপক্ষে যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হ'য়ে হিউ চলেছিল অনির্দ্দিষ্ট যাত্রায়। যৎসামান্য বস্ত্রাদি সঙ্গে নেবার সময় পরলোকগত মাতার রঙিন কেশবস্ত্র তাকে শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

ছয় বছর বয়স্ক ছোট্ট বালকের হাত ধ'রে পিতা নিয়ে যেতেন পাহাড়ে বেড়াতে। ছেলেটির ধারণায় বসুন্ধরার বৈচিত্র্য ছিল অফুরন্ত। গ্রহ নক্ষত্র, আকাশ বাতাস, গাছ পালা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় শরীরী ও অশরীরী ব্যাপার তখনও তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলা শেষ করেনি, অথচ তার কৌতূহলের শেষ নাই। বয়োজ্যেষ্ঠদের দুর্জ্ঞেয় কথাগুলি শোনবার জন্যে ছোট্ট কান দুটি থাকত খাড়া।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃজায়া ইত্যাদি বহু সংখ্যক আত্মীয় পরিবেষ্টিত বালকের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। অগ্রজ ডেভি খনির মালিকদের অবিচারে উত্তপ্ত হ'য়ে দুর্ব্বোধ্য বাক্যের ব্যবহার করেছে, পিতার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। মিসেস্ জেন্‌কিন্‌স তাঁর রুগ্ন বিকলাঙ্গ স্বামীর কষ্টে অতিষ্ঠ হ'য়ে ভগবানের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। ভগ্নী আংহারাথ্ প্রশ্নবাণে বিরক্ত হ'য়ে বলেছে যে নিছক প্রার্থনা দিয়ে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। আরও কত কি কঠিন কথা সে শুনেছে, তার ইয়ত্তা নাই।

হিউ তার পিতার সঙ্গ বড় ভালবাসত। পাহাড়ের শিরোদেশে এসে ক্লান্ত পথিক যে শিলাখণ্ডের পাশে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলত নিচের দিকে চেয়ে, সেখানেই বসতো তারা। সেখান থেকে চোখে পড়ত খনির আবর্জ্জনা-স্তূপ। দিনে দিনে তা' বেড়ে চলেছিল, কিন্তু তখন উজ্জ্বল সবুজের বানে ঐ সকল কটু দৃশ্য খড় কুটোর মতই ভেসে যেত। পিতার মুগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে বালক

নীরব থাকত কিন্তু সুবিধা পেলে প্রশ্ন করতে ছাড়ত না। কখন বা সন্তোষজনক উত্তর পেত, কখনও শুনত 'বড় হলে জানতে পারবে'।

বড় হয়ে জানবার ধৈর্য্য তার ছিল না তাই সে ছুটে যেত স্নেহময়ী ভ্রাতৃ-জায়া ব্রন্‌ওয়েন্‌-এর কাছে। এই দশ বছর বড় রমণীর প্রতি হিউ-র অনুরাগ ছিল রোমাণ্টিক প্রকৃতির। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আসক্তির বহু বর্ণবৈচিত্র্য হয়েছে।

ক্রমেই শ্রমিক আন্দোলন সঙ্গিন হয়ে এল। এক গভীর রাত্রির অধিবেশন হ'তে ফেরবার সময় বালক পথ ভুল ক'রে তুষারের মধ্যে পীড়িত হয়ে পড়ল। তারপর কয়েকটি অসাড় অঙ্গে সাড় আসতে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর সময় গেল কেটে।

এগারো বছরের রুগ্ন বালককে বছরের প্রথম ড্যাফোডিল দেখালেন গির্জ্জার নূতন আচার্য্য গ্রিফিথ। সেদিনকার সেই প্রভাত বেলাটি হিউর চিত্তে চিরাঙ্কিত হ'য়ে যায়। নবোদিত সূর্য্যালোকের অরুণিমা ক্ষীণ কুয়াসার যবনিকায় অদ্ভুত বর্ণবিস্তার করেছিল আর ড্যাফোডিলের অসংখ্য হলুদ মাথা প্রভাত সমীরণে দুলে দুলে নীরব ঘণ্টাধ্বনি ক'রে চলেছিল যেন। সে গিয়েছিলো পিঠে চড়ে কিন্তু এর পর আরোগ্য লাভ করতে আর বিলম্ব হয় নি।

চলৎ-শক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রসার বেড়ে গেল। প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল দূরের কোন বড় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া। সেখানে বলিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ বালকদের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ায় তাকে শরীর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করতে হ'ল।

ইতিমধ্যে নবীন আচার্য্যের উৎসাহে, কর্ম্মশীলতায় ও ধৈর্য্যে পল্লীর মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রবাহ উন্মুক্ত হ'ল। গ্রিফিথ্‌-এর মরগান পরিবারের সঙ্গে গভীর সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশেষ ক'রে বালক হিউ-র সঙ্গে।

ধর্ম্মের প্রবাহ কিন্তু পল্লীটিকে পাপের কলুষ থেকে রক্ষা করতে পারল না। খনির মালিকরা শ্রমিকদের দাবী অগ্রাহ্য করাতে ধর্ম্মঘট সুরু হ'ল। নিষ্করুণ নির্দ্দয় সংগ্রাম চল্‌ল শীতের্ শেষ পর্য্যন্ত। গ্রামবাসীর দুর্দ্দশার অন্ত রইল না। প্রথম মাসের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থ ও খাদ্য ফুরিয়ে গেল। দ্বিতীয় মাসে খাদ্যাভাব প্রকট হ'ল। স্ত্রীলোকেরা শীর্ণ হ'তে শীর্ণতর হ'তে লাগল।

শিশুরা খেলা-ধূলা ছেড়ে দিল। অনেকে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে দিল। মদের দোকান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর শীতের সময় মৃত্যু ঘটতে সুরু হ'ল।

মোটামুটি নিষ্পত্তি হ'ল বটে শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু পূর্ব্বতন শান্তি ফিরে পাওয়া গেল না। চুরি-চামারি, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি নূতন নূতন উপসর্গ দেখা গেল। গ্রিফিথ্-এর অক্লান্ত চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল।

হিউ-র প্রকৃতি বিস্ময়কর ভাবে সরল ও অনাবিল ছিল। কিন্তু যৌবনোদগমের রহস্য সরল ভাবে অনুভূত হয় না। দেহের অন্তর্গত প্লাবনে আদর্শগত খুঁটি-গুলি যখন ভেসে যায় তখন হয় সংশয়ের সৃষ্টি, শিক্ষার প্রতি সন্দেহ হয়, স্বকীয় কল্পনা শক্তি সক্রিয় হ'তে চায়। সে আর ব্রন্ওয়েন্কে প্রশ্ন করতে চায় না, পাদরী গ্রিফিথ্-এর কাছে উপদেশ সংগ্রহ করতে আগ্রহ দেখায় না, অকালপক্ক সহপাঠিনী কাইন্ওয়েন্-এর প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ ক'রে স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

অগ্রজ আইভর-এর অপঘাত মৃত্যুতে ব্রন্ওয়েন্-এর সোণার সংসারে বজ্রাঘাত হল। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দুইটি সন্তানের মাতা হ'লেও তার বয়স তখন ত্রিশ মাত্র। বেচারার নিঃসঙ্গ জীবনযাপন যখন দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠল তখন বিশ বছরের যুবক হিউ মাতৃ-আজ্ঞায় দাদার শূন্য স্থান পূরণ করতে গেল। তারা এখন আর প্রথম আলাপন সময়ের সেই ব্রীড়াবনতা নববধূ আর ছয় বছরের শিশু নাই। অন্তরঙ্গ জীবনযাপনে সম্প্রীতি ও সঙ্কোচের মধ্যে মেঘ রৌদ্রের খেলা লেগে গেল। হিউ স্বভাবতই স্বল্পভাষী ও সদাচারী ছিল এবং ভাবে ব্যবহারে নিজেকে সংযত রাখত কিন্তু ব্রন্ওয়েন্-এর দৃষ্টিকে ব্যাহত করে এমন কোন পর্দ্দা তার মনের কন্দরে মজুত ছিল না। ব্রন্ওয়েন্ জানে হিউ-র প্রণয় সনাতন রমণী-সম্ভোগের কামনা বই আর কিছুই নয় কিন্তু সে এও জানে যে সে কামনার চরিতার্থে সম্প্রীতির উপভোগ্য আবহ যাবে নষ্ট হ'য়ে। সে সাবধানে থাকে। তথাপি ঘনিষ্ঠ সংসর্গে অন্তর ও বাহিরের মধ্যেকার কৃত্রিম ব্যবধানকে খাড়া রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ে, ক্ষণিক পুলকের অনুভূতি জাগে, তারপর উভয়ে পুনর্ব্বার সতর্ক হয়।

এদিকে গ্রিফিথ্-এর সঙ্গে হিউ-র বিবাহিত ভগ্নী আংহারাথ-এর সৌহার্দ্দ্য

গ্রামবাসীর সহ্য হ'ল না। যার কাছে তারা প্রভূত উপকৃত তাকে অনিশ্চিত অপবাদে অভিযুক্ত ক'রে দেশ ছাড়া করতে তারা কিছুমাত্র ইতস্তত করল না। হিউ-র পিতার শরীর ও মন তখন অবসন্ন হয়ে এসেছে। ভ্রাতা ভগ্নীরা প্রায় সকলে বিবাহ করে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার মত কেউ রইল না।

পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর হিউ কয়লার খনির কাজ ছেড়ে দিয়ে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে। উপার্জ্জিত অর্থ এনে সে ব্রন্‌ওয়েন্‌কে দেয়। সংসার চলে সচ্ছলে। কিন্তু কৃত্রিম ভব্যতা আর বজায় রাখা গেল না। ব্রন্‌ওয়েন্ এক দিন অধৈর্য্য হয়ে বলে ফেল্লে—"অবৈধ প্রেম আবার কি, পরের জন্যে এত মাথা ব্যথা—বলি আমার প্রতি তোমার মনোভাবটা কি খুব বৈধ।" এর পরও হিউ নিজের অন্তঃকরণের দুর্ব্বলতাকে ঢাকতে গিয়েছিল সাড়ম্বরে। ব্রন্‌ওয়েন্ বল্লে "বোনের কলঙ্ক শুনে মর্ম্মাহত হচ্ছো, এদিকে আমাদের নিয়ে যে ঢি ঢি পোড়ে গেল তার খোঁজ রাখ কি ?" এ সংবাদে হিউ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল দেখে সে রোষভরে উঠে গেল। সে রাত্রিতে তার শয়ন-কক্ষের দ্বারে চাবি পড়ল বিরক্তির নির্ঘোষে।

কাহিনীটি শেষ হয়েছে এইখানে।

সর্ব্বাঙ্গ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া সম্ভব নয়। নিবেদিত আত্মস্মৃতির মোটা-মুটি একটি গতিবিধি অনুসরণ করে গেলাম।

হিউ বলেছে—"It do seem to me that the life of man is merely a pattern scrawled on Time, with little thought, little care, and no sense of design."

নিজের ছন্নছাড়া জীবনের জন্যে তার কোন খেদ নাই কারণ কোন পরি-কল্পনায় বিশ্বাস তার নাই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ডালপালার মধ্যে সে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেছে অবিরত তাই তার কাহিনীতে কাঠামোর বালাই নাই। আছে ছোট ছোট বিচিত্র বর্ণনা। শব্দের ভঙ্গিমা প্রীতিপ্রদ, ওয়েল্‌স্-এর প্রচলিত গ্রাম্য ভাষা হতে সংগৃহীত বলে প্রতি ঠমকে মাধুর্য্য ঝরে—

'There is pleased were the people to see me, indeed.'

কিম্বা—

'There is shamed I am, Bron.'

আবহাওয়া হতে বিচ্যুত হ'লে উদাহরণ সন্তোষজনক হয় না তবু উল্লেখ করলাম।

নায়কের নিজের চরিত্রের চেয়ে পিতা, মাতা ও ব্রন্‌ওয়েন্‌-এর চরিত্র ভাল ক'রে ফুটেছে। অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলাদ্বয় নারী জাতির যাবতীয় মহিমা-মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ হয়েছেন কথা-বার্ত্তা, হাব-ভাব ও হাস্য-কৌতুকের মধ্যে।

পিতার চরিত্রটি নিপুণ শিল্পীর খোদিত ভাস্কর্য্যের মত সুস্পষ্ট হয়েছে। সাবেকি ধর্ম্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা সম্বল ক'রে তিনি চাকুরির উর্দ্ধতন শিখরে উঠেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শান্তির অনুসন্ধান পাননি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন খনির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিসংবাদ হচ্ছে অলঙ্ঘ্য। প্রথম ধর্ম্মঘটের সময় তিনি মালিকদের পক্ষ অবলম্বন ক'রে নিজের সন্তান ও প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সঙ্কুচিত হননি। দ্বিতীয়বার যখন কর্ত্তৃপক্ষের দোষ সুস্পষ্ট তখন উচ্চ পদ হারাবার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে ধর্ম্মঘটে যোগদান করেন। সুদৃঢ় কঠোর প্রতিজ্ঞার পিছনে ছিল শিশুর মত কোমল অন্তঃকরণ। সহধর্ম্মিণীর প্রতি তাঁর গোপন সলজ্জ প্রেম বালকের অবিদিত ছিল না। কোন চরিত্র-চিত্রণেই প্রয়াসের পরিচয় নাই। সকলেই সংসারের তুচ্ছ দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে ধরা পড়েছে। হিউ-র সঙ্গে তার পিতার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনেক পাঠককে তাঁদের নিজেদের শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। বিশ্ব সাহিত্যে পিতার স্নেহ এত উপেক্ষিত হ'য়ে এসেছে যে এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া টুকুকেও মূল্যবান মনে করি।

গ্রিফিথ্‌-এর চরিত্রটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি জাগাতে পারেনি। সে গ্রামটিতে প্রবেশ করেছিল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবদান নিয়ে। সাহসে, বীর্য্যে, সত্যনিষ্ঠায়, ধৈর্য্যে তার সমতুল্য লোক সে অঞ্চলে আসেনি কখনও। কিন্তু নিছক বাণী ও ব্যক্তিগত আদর্শ দ্বারা সমাজসংস্কার হয় না। শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হ'য়ে যখন দেশ-ত্যাগ করতে হ'ল তাকে—একমাত্র মরগান পরিবার ছাড়া অশ্রুত্যাগ করবার মত বড় একটা কেউ ছিল না। অথচ এক সময় সে সমস্ত পল্লীর লোককে ধর্ম্মের উন্মাদনায় মাতিয়ে দিয়ে পাপীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছে;

ভ্রাম্যমান নাট্য-সম্প্রদায়কে প্রহারের দ্বারা বিতাড়িত করেছে এবং আরও কত কি লোকহিতকর কার্য্য করবার প্রয়াস করেছে তার ইয়ত্তা নাই।

এই ধর্ম্মযাজকটিকে হিউ ভালবাসতো নিবিড় ভাবে এবং তাদের বিদায়ের দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ ভাবে বিবৃত হয়েছে, তথাপি পাঠকের চিত্ত সিক্ত হয় না। বরং হিউর দ্বারা প্রহৃত জনৈক নির্দ্দয় নরপিশাচ শিক্ষকের প্রতি সমবেদনা জাগে।

কারণ সহজেই অনুমেয়। সাধনার উপদেশ ও দীক্ষা দিয়ে যারা জীবিকা উপার্জ্জন করে তাদের ব্যক্তিগত জীবন যতই নির্ব্বিরোধ ও শান্ত হোক না কেন ঔদ্ধত্য থাকে ওতপ্রোত ভাবে মিশে—ভাষার বিনয়ে সে ঔদ্ধত্যকে ঢাকতে পারা যায় না। গ্রন্থখানির সবগুলি চরিত্রই সাধারণ মাটির মানুষ—কেবল মাত্র গ্রিফিথ্ ধর্ম্মের জারকে জীর্ণ হ'য়ে চীনা-মাটিতে পরিণত হয়েছে, তাই যখন সে ভাঙলো পুনর্ব্বার খাড়া হবার সম্ভাবনা আর রইলো না তার।

হিউ সমাজসংস্কারের আর কোন উপায়ের কথা ইঙ্গিত করেনি। তার দৃষ্টি গভীর হলেও বিশ্লেষণী নয়। সে কবি। বিষয়-নির্ব্বিশেষে যা সে দেখেছে, শুনেছে আর অনুভব করেছে তা ব্যক্ত করে গেছে স্বল্প কথায়, মধুর ক'রে। প্রথম চুম্বন, প্রথম যৌন মিলন, প্রথম প্রেম, যাবতীয় প্রথম অনুভূতিগুলি পরিপূর্ণ সৌরভে বিকশিত হয়েছে। মায়ের গায়ের গন্ধ, ব্রন্-এর দেহের সুবাস—সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর নিশ্বাসের মত মৃদু হ'লেও পাঠকের চিত্তে বহু বিস্মৃত বারতা বহন ক'রে এনে দেয়।

বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধবিগ্রহ ও জাতীয় বিদ্বেষের মধ্যে এই প্রকৃতির গ্রন্থের বহুল প্রচলন প্রার্থনীয়। সর্ব্বগ্রাসী অশান্তির মধ্যে ক্ষণিক আনন্দ বিতরণে ত এই বই সক্ষম হবেই অধিকন্তু এই কথা মনে করিয়ে দেবে যে সকল মানুষই এক আর যাবতীয় বিক্ষোভের মূলে আছে অর্থ নৈতিক অসঙ্গতি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Goodbye to Berlin—Christopher Isherwood.
(The Hogarth Press).

জুলিয়ান হক্সলি-র প্রসাদে জানা গেছে যে, আরিষ্টটল-ই প্রথম 'রক্তের সম্পর্ক' কথাটা প্রয়োগ করেন; এবং 'আর্য্য জাতি'র উদ্ভাবক হ'লেন ম্যাক্স মূলর। ঋষিপ্রোক্ত এই দুই প্রমাদ-প্রভব মতবাদের উদ্বাহ ঘটিয়ে হঠকারী হিটলার আজ উদ্বাহু। ইহুদী-শোধন সাধ্যে কুলোয় নি; তাই সেজেছেন ইহুদী-সূদন। ইশারউড্-এর বর্ত্তমান উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাগুক্তি আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং এই ভেবে ইতিহাস-অনভিজ্ঞ পাঠকের বিস্ময়ের উদ্রেক হ'তে পারে যে, জার্মাণীর দিগন্তে নাৎসী অপগ্রহের অংশুপাত হ'তে না হ'তেই কেমন ক'রে সেখানে উপাংশুবধের পালা নির্ব্বিবাদে সুরু হ'য়ে গেল।

প্রাক্-হিটলার আমলের বার্লিনের পটভূমিতে লেখক কয়েকটি বিশ্লিষ্ট ঘটনার সাহায্যে যে আখ্যান গ'ড়ে তুলেছেন, তা'তে প্রচারের গন্ধ প্রকাশ-পদ্ধতির চাতুর্য্যে কতকটা উদ্বায়ী। বইখানা অধুনা-প্রবর্ত্তিত নৈরাত্ম রীতিতেই লেখা। অবশ্য ইশারউড্-কেও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে; নেপথ্য-ভূমিকা নেওয়া তাঁর চলেনি; কিন্তু তা' কেবল ঘটনাবলী ও কুশীলবের যোগ-সূত্র বজায় রাখার জন্য। স্বমত-প্রচারে কোথাও তিনি প্রবৃত্ত হন নি। বামপন্থীসুলভ বহু দুর্নিমিত্ত তাঁর রচনায় নেই বলে এমন কথাও বলা সঙ্গত নয় যে, তিনি শিল্পের নির্নিমিত্ত বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি কল্ডর্-মার্শেল্-এর সোদর নন, তেমনি অপর দিকে শোলোখভ-ও তাঁর উপমান হবার অযোগ্য। শিল্পসামগ্রী ও শিল্পপ্রকরণের সংযোগে তিনি যে স্বয়ংপ্রভ ধাতুটি গ'ড়ে তুলেছেন, তাতে কোন্ উপাদানের ভাগ বেশি আছে, তা' বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পাঠকের অনীহা-ই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, উক্ত ধাতুর স্পর্শগুণে লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষা—এই দ্বৈত লক্ষ্যই সফল হবে। শিল্পী চতুর সন্দেহ নেই; বামপন্থী হওয়াও বুঝি বা তাঁর সার্থক।

উপন্যাসের সার-সংগ্রহের চেষ্টা প্রথাসিদ্ধ হ'লেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার নিপাতন অনিবার্য্য। শ্রমিক-পল্লীর পানশালা ও পান্থশালা থেকে আরম্ভ

ক'রে অভিজাত-পাড়ার আটচালা ও অট্টালিকা—কিছু-ই ইশারউড্-এর দৃষ্টি এড়ায় নি। একটানা একটি গল্পের সাহায্যে তাঁর সঙ্কল্প সফল হওয়া সম্ভব নয় জেনেই তিনি বোধ করি কয়েকটি নক্সা ও ডায়ারির শরণ নিয়েছেন। উত্তর-সামরিক প্রতিক্রিয়ায় জার্মাণী একেই ত' জর্জ্জর হ'য়ে পড়েছিল। তার উপর নাৎসী-কবলিত হওয়ার সূচনায় যখন নূতন ভাব-তরঙ্গ সহসা উত্তাল হ'য়ে বার্লিন গ্রাস করল, তখন তাকে প্রতিহত করার সাধ ও সাধ্য অধিবাসীদের আর ছিল না। ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। উচ্ছল কল্লোল অপগত হ'লে দেখা গেল যে, পলির প্রাবরণীতে প্লাবিত অঞ্চলের প্রাক্তন প্রকৃতিও বদলে গেছে। ইশারউড্-এর অনন্যসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও লিপি-কুশলতার ফলে এই সদ্যোবিলুপ্ত মহানগরের প্রতিবিম্ব তাঁর রচনায় যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। অথচ রাজনীতি-গন্ধী সংলাপ কোথাও ঘটনার গতিকে ব্যাহত করে নি। পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে আলেয়ার অনুগামিনী কুরঙ্গ-চপলা স্যালী; প্রতি সূর্য্যাস্তের সঙ্গে যার প্রায়ই প্রেমাস্ত ঘটে। তারপর আসবে, শ্রমিক-কিশোর অটো নওয়াক। অস্বস্থ পিটার তার অকৃত্রিম বন্ধু হ'লে হবে কি, অহি-নকুল সম্পর্ক তাদের কিছুতেই ঘুচল না। এবং অটো হঠাৎ পিটারের বুকে বাজ হেনে শেষে পালিয়ে বাঁচল। অটোর পরে এল ইশারউড্-এর ইহুদী বান্ধবী নাটালিয়া; এবং নাটালিয়ার মধ্যস্থতায় আবির্ভাব ঘটল তারই এক দূর সম্পর্কের ভাই ব্যর্ণহার্ড্-এর। ব্যর্ণহার্ড্ রহস্যময় যুবক, মস্ত বড় ব্যবসায়ের অন্যতম কর্ত্তা। তার আপাত-বিনয়পূর্ণ আচরণের মধ্যে বিদ্রূপের যে হুল ছিল, তা ত' ইশারউড্-কে বিঁধতে লাগলই; উপরন্তু তারই উপর চলতে লাগল ব্যর্ণহার্ড্-এর অনন্ত পরীক্ষা। এই সময়ে বার্লিনে নাৎসী জাল পাতা হচ্ছিল; এবং মুমুক্ষু ব্যর্ণহার্ড্-কে ইহুদী-সূদনের কৃপায় ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হলো। সমস্ত বইখানার মধ্যে নওয়াক পরিবারের অরুন্তুদ কাহিনী আর ব্যর্ণহার্ড্-এর চরিত্র অবিস্মরণীয়।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দু' একজন সাম্যবাদীর (?) দেখা মেলে। তাদের এক-এক জনই এক-একটা দল। নাবালক রুডি-কে মন্দ লাগে না। কিন্তু নাৎসী নায়কের নিরঙ্কুশ অস্ত্র-নির্ঘাতে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। বার্লিন-বাসী মন্বন্তরে মরে নি, মারী নিয়েও ঘর করেছে। তাই এ-যাত্রায়ও বিধির আশিসে

তারা টি'কে গেল ; এবং বেবাক সব ভুলে গিয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সুখে-দুঃখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে লাগল। বলা বাহুল্য, এইখানেই ট্র্যাজেডির ষোল কলা পূর্ণ হ'লো।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দৈনন্দিন—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়। (পরিচয় প্রেস)।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য একটি মাত্র জিনিষ গড়ে তুলেছে, যার ওপর তার অবিসংবাদী নিজস্বতার দাবী খাটে। ছোট গল্পে বাংলা সাহিত্য আজ এমনই একটা সম্পূর্ণতায় পৌঁছেছে যে নিতান্ত সাধারণ লেখকও মোটের ওপর উপভোগ্য গল্প অতি অনায়াসেই লিখে থাকেন—দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাপদ্ধতির দিক দিয়ে সেই সমস্ত গল্প কোন মৌলিকতার পরিচায়ক হ'ক বা না হ'ক। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবান লেখকের পক্ষে এই হয়েছে বিপদ! চলনসই সুখপাঠ্য গল্পের জনতা ঠেলে আজকের দিনে সাম্নের পর্য্যায়ে এগিয়ে আসার জন্যে তাই দরকার হয় অনেক বেশী শক্তির, যা বিশ বছর আগেও দরকার হত না। সৌভাগ্যের বিষয়, সাধারণ ভালো লেখকের এই ভীড়ের ভেতর থেকে পথ করেই ইদানীং কয়েকজন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁদের অসাধারণ ভালো বলতে পারা যায়। বর্ত্তমান বইয়ের লেখক তাঁদেরই অন্যতম এবং অনেক হিসাবে তাঁকে আমার প্রথমতম বলেই মনে হয়।

ইদানীংকার ছোট গল্পকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—এক বিলাসলালিত উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখা, আর অন্নহীন স্বীকৃতিহীন অবমানিতদের নিয়ে লেখা। এই দুই চরম প্রান্তের মাঝখানে অবস্থিত যে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার—যে পরিবার থেকে বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিকের উদ্ভব—তার রংটা অত্যন্ত ফিকে বলেই গল্পের আসরে তা বড় একটা স্থান পায় না। পেলেও তা হয় যেতে চায় তথাকথিত আভিজাত্যের দিকে, নয়ত নেমে আসতে চায় নিম্নভূমিতে। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে আমাদের গল্প সাহিত্যের প্রেরণা এখনো সত্যিকার জীবন থেকে না এসে আসছে বই থেকে এবং সে বই

সাধারণত বিদেশী। হঠাৎ এই দক্ষিণ-বামের দড়ি টানাটানির ভেতর সুন্দর একটি অবকাশ রচনা করে নিছক মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে কেউ লিখছেন, আর সে লেখায় রঙের জৌলুষ দিয়ে অথবা রাজনৈতিক মতবাদের দোহাই দিয়ে পাঠক ভোলাবার চেষ্টা না করে রসসৃষ্টির আয়োজন হয়েছে, দেখলে মন প্রসন্ন না হয়ে পারে না। এই প্রসন্নতাই 'দৈনন্দিন' বইয়ের সত্যিকার পরিচয়—কিন্তু এর পরেও একটা কথা আছে। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ আজ ক্ষয়ের দিকে—তার ছেলেদের নেই উপার্জ্জন, মেয়েদের নেই বিবাহ, বর্ণাশ্রমের আঁটুনি আজও তার ওপর সমান কায়েম রয়েছে, কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে তার জীবনের বন্ধন গেছে শিথিল হয়ে—একদিক দিয়ে ঢুকেছে বাইরের থেকে আমদানি বহুতর মতবাদ, অন্য দিক দিয়ে এসেছে চরম আত্ম-অপচয়ের প্রয়োজন এবং এই পরস্পর বিরোধী দুটি আদর্শের সঙ্ঘাতেই বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই সমাজটি আজ যেতে বসেছে। সে কথাও দেশকে মনে করিয়ে দেবার দরকার আছে।

'দৈনন্দিনে' সেই ভাঙনের ভেতর থেকেই লেখক রসের সন্ধান করেছেন এবং বিস্ময়ের বিষয়, কোথাও তাঁর অভাব হয়নি। ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দাদের পরস্পরের ভেতর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার ভেতর থাকে কতকটা বান্ধবতা এবং অনেকটাই প্রতিযোগিতা, তা থেকে গল্পের বস্তু আহরণ করা যায়, বা শিক্ষিত বেকারের জীবিকাভাব যেখানে বাধ্যতামূলক প্রতারণায় পর্য্যবসিত হয়েছে, সেখান থেকে যে সুন্দর সহানুভূতিপূর্ণ গল্পের উপকরণ পাওয়া যায়, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। ঠিক তেম্নি বাইরে ছিল, স্বল্পবিত্ত সাহিত্যজীবীর অবদমিত বাসনা কেমন করে গল্প রচনার ভেতর দিয়ে স্ফূর্ত্তি পায় এবং ক্ষণিক হলেও তা তেমন করে তার জীবনে নিয়ে আসে আকস্মিক একটি সৌভাগ্যের স্বপ্ন! কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা বলে রাখা উচিত—তা হচ্ছে সংযম, যা না থাকলে, এই সমস্ত অভাবনীয় উপকরণ থেকে গল্প গড়তে গেলে, অনেক সময়ই দরকার হয়ে পড়ে সস্তা চমক দেবার। লেখক তা হতে দেন নি বলেই যা তিনি বলেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী কথা তিনি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন না-বলার ভেতর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি 'বিস্ময়,' 'রঞ্জনা,' 'পড়শী,' 'গল্পের দান' প্রভৃতি গল্পগুলির। এদের পশ্চাৎপট মোটের ওপর নিরুজ্জ্বল, যে সমস্ত নর-

নারীকে কেন্দ্র করে এই গল্পগুলি গড়ে উঠেছে, তারা কেউই আমাদের দুর্ব্বল জায়গায় ঘা দিয়ে সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে চায় নি—বরং অনেক সময়ই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে করেছে কথা কাটাকাটি। এই বাস্তবতা, এই স্পষ্টতা আছে বলেই গল্পগুলিতে কাব্যের প্রলেপও যেমন দরকার হয় নি, মতবাদের দোহাইও তেম্নি অনাবশ্যক হয়েছে। এখনকার গল্পের ঐ দুটোই হল পুঁজি —কিন্তু ঐ দুটো জিনিষকে সম্বরণ না করতে পারলে যে খাঁটি জাতের সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, তা 'দৈনন্দিনের' গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

গল্পগুলি আমি বিস্ময়ান্বিত কৌতূহলে পড়েছি। তাদের বৈচিত্র্য, তাদের বলিষ্ঠ নিজস্বতা, সর্ব্বোপরি তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দুর্নিবার ভাবে লক্ষ্যণীয়। বিশ্লেষণের হাত তাঁর যথেষ্ট তৈরী, কিন্তু সংশ্লেষণেও তিনি কম পটু নন—তাই নিজের রচনার গুরুত্বকে তিনি ওজন করে নিতে পেরেছেন। আর একটা জিনিষ—তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গী, বিশেষ করে ভাষা-বিন্যাস, প্রথম বইয়েই পূর্ণাঙ্গ লেখকের পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে, এও কম কথা নয়। শুধু দেশজ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে দু'এক জায়গায় আমার খটকা লেগেছে, কিন্তু সমস্ত বই জুড়ে এমন একটি অব্যাহত সাহিত্যরসের স্রোত বয়ে গেছে, যার মুখে এটি গায়েই লাগে না। অনেক গল্প পড়া যায়, যাতে বক্তব্য বিষয়টাকে পাঠকের গোচরে আনার ওপরই দেখি লেখকরা দিয়েছেন ষোল আনা জোর। বলার ধরণটাকে তাঁরা আদৌ দরকারী মনে করেন না। 'দৈনন্দিনের' লেখক কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছুবার জন্যে তৈরী থেকেও উপমার অলঙ্করণে চলার পথটিকে আগাগোড়া কুসুমিত করেই গেছেন। তাই বই বন্ধ করার পরও সমস্ত গল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতকগুলি লাইন মনের পর্দ্দায় ভেসে ওঠে, যেগুলো কোন বই বিশেষের উক্তি নয়, সাহিত্যের চিরন্তন সত্যের দলে তাদের আসন। বইয়ের ছাপা বাঁধাইয়ের মামুলি আলোচনা করবো না, কিন্তু অনিল ভট্টাচার্য্যের আঁকা মলাটের ছবিটির উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ছান্দসিকী (বাংলা ছন্দের বিবরণী—সমডি)। শ্রীদিলীপকুমার রায়। (দি কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স)। ২॥০।

বাংলা ছন্দ এখন শুধু গবেষকের গবেষণার ব্যাপারে বা পাঠকপাঠিকাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যেও তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা মনে ক'রে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে তার সাধারণ ভূমি পরিষ্কার হয়েছে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিবাদের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বাংলা ছন্দ সাধরণত এখন সাধারণের বোধগম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তের ভূমি কোথায় ? বই কোথায় ? বাংলা ছন্দের সাধারণ বিবরণী কোথায় পড়্‌তে পাওয়া যায় ? আমাদের ছাত্ররা কি অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত ভঙ্গীর সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে থাকবে—তাঁরা ছন্দ সম্বন্ধে কি লিখ্‌বেন, কি বল্‌বেন, তার জন্য ? না, আমাদের দেশে এখনও শাস্ত্র রচনা করবার সময় আসে নি ? দিলীপবাবু 'ছান্দসিকী"তে এই শাস্ত্র রচনা করবার চেষ্টাই করেছেন, —ছন্দকে তিনি যা দাম দেন তার সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাষ দেওয়া হয়েছে তাঁর সুন্দর ভূমিকাটির সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে, আর সমুচিত সমর্থন রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের উক্তিতে : The worker knows and respects the material with which he must work and he knows why he is busy with "trifles" and small details and what is their place in the fulness of his labour.

এখন, বাংলায় অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত—এই তিন জাতীয় ছন্দ পাওয়া যায় ; ছন্দের এই জাতি কি সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ? এখানে দিলীপ বাবুর জাতি পৃথক্—এইরূপই যেন বল্‌ছেন। এই আপাত পৃথগ্‌ত্বের আবরণ ভেদ ক'রে এমন কোনও ঐক্যসূত্রে এদের গাঁথা যায় কি না, সে বিষয় আলোচনা করেন নি। কিন্তু জনৈক বিশিষ্ট লেখক এ বিষয়ে চর্চা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :—

'বাংলা ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষার কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচনা হয় নাই। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা,' 'শূন্যপুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্ মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায় না।

সর্ব্বদাই Beat and Bar Theory বা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা নির্ণীত হইতেছে দেখা যায়।······

"···মাত্রা পদ্ধতির দিক্ দিয়া বাংলায় যে তিনটি স্বতন্ত্র 'বৃত্ত' আছে, তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় না।"

এই সিদ্ধান্তের একটা আলোচনা আমরা 'ছান্দসিকী' পড়বার সময় দিলীপ-বাবুর হাত থেকে আশা করেছিলাম, কিন্তু তিনি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা মোটেই করেন নি। এমন কি অমূল্যবাবু বাংলা ছন্দের মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা ক'রে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচেন, তাকে বাদ দিয়েও অমূল্য বাবুর নামটা কোথাও করেন নি। অমূল্যবাবুর নামটা, মনে করি, একবার করা উচিত ছিল। কারণ, তিনি বাংলা ছন্দের আলোচনা যে ভাবে করেছেন, তার বস্তু নির্দেশ করবার যে চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁকে নীরবে উপেক্ষা করা চলে না। দিলীপবাবু ছন্দরসিক, মর্মদর্শী এবং কাব্যরসের স্রষ্টা ও বোদ্ধা, সেই জন্য 'ছান্দসিকী' হতে অমূল্যবাবুকে একেবারে বাদ দেওয়াটা বুঝে উঠ্‌তে পারা কঠিন।

'ছান্দসিকীর' কয়েকটি অধ্যায় বেশ ভাল লেগেছে—তার 'লঘুগুরু ছন্দ', 'স্বরমাত্রিক ছন্দ' ও 'প্রস্বনী ছন্দ'। দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত, দুই দিক থেকেই, গ্রন্থ-খানি সুপাঠ্য ও সুখবোধ্য।

প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয়, দিলীপবাবু "গদ্যছন্দ"-কে আমল দেন নি, "একটা কোনো পর্যাবৃত্তি না থাকলে ছন্দ হ'য়ে উঠবেই অছন্দ কিম্বা 'গদ্যছন্দ'-নামা মাটির পাথর-বাটি।" (২৫৭-৫৮ পৃঃ)। কিন্তু যে "ছন্দঃস্পন্দনের চলদ্‌বেগ" কাব্যে রয়েছে, যা কি না আমাদের চৈতন্যকে গতিমান্ আকৃতিমান্ ক'রে তুল্‌ছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে, সেই ছন্দঃস্পন্দনের "তেরছ চাহনি"-কে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন "ভাবের ছন্দ" আর সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এতে পদ্য ছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ; শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলঙ্করণ নেই তবুও আছে শিল্প।" 'ছান্দসিকী' এই ভাবের ছন্দকে আমল দেয় নি।

ছান্দসিকীর শুদ্ধিপত্র সম্পূর্ণ নয়: আরও চারটে অশুদ্ধি পাতা ওল্‌টাতে গিয়ে চোখে পড়্‌ল। আর বেসুরো বাজ্‌ল ভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিক রাজনীতি-গন্ধী দুটি কথা—"এক এক সময়ে সত্যি অবাক্ লাগে ভাবতে যে, যে-বাঙালি

জাতির দুর্ণামে আজ অবাঙালি রাষ্ট্রনীতিকেরা পুলক-মুখরিত, হিল্লোল-উচ্ছ্বসিত সত্যিই কি সেই বাঙালি জাতি নিঃস্ব? (এমনতর হসনীয় কথাও আজ যার তার মুখে শোনা যায় যে হিন্দিভাষা বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ!)" (৭পৃঃ)। দিলীপবাবু সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, একথা বলা যায় না; ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে, নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য তাদের সমর্থন তিনি বাস্তবিকই চেয়ে থাকেন; সুতরাং 'যার তার' কথা নিয়ে আলোচনা না করলে তো আরও শোভন হত, অন্তত এখানে কাঁদুনি না গাইলেও পার্তেন।

ছান্দসিকী কাদের জন্য লেখা, বইখানি প'ড়ে এই চিন্তা সহজেই মনে হয়, ছাত্রদের জন্য ততটা নয়, যতটা ছন্দ যাঁরা অভ্যেস কর্‌বেন তাঁদের জন্য; অবশ্য ছাত্রেরা ছন্দ অভ্যেস নাই বা কর্বে কেন? এবং ছন্দজ্ঞ হবার জন্য অভ্যেস করাই তো দরকার। তবু ছাত্র ও পদ্য লেখক, উভয়ের জন্য বই লেখার দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য আছে, এবং সে পার্থক্য এখানে রয়েছে। অর্থাৎ মনে হয়, ছান্দসিকী ছাত্রদের জন্য ততটা লেখা নয়, যতটা ছন্দ নিয়ে যাঁরা কারবার কর্বেন তাঁদের জন্য। এটা প্রয়োগবিজ্ঞান।

অবশ্য একথার অর্থ নয় যে, ছাত্রেরা বা শিক্ষকেরা 'ছান্দসিকী'তে শিখবার কিছু পাবেন না; বরং 'ছান্দসিকী'তে ছন্দের আঙ্গিকের দিকটা এত সুন্দর ভাবে এবং এত সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান হয়েছে যে, ছাত্র ও শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপভোগ্য হবে, এবং তাঁরা শিখ্‌তেও পারবেন অনেক কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই গ্রহণ কর্তে হবে; শুধু দু চার জায়গায় প্রশ্ন ওঠে, মনে হয় তাঁর মন্তব্য বা নীরবতা ঠিক সঙ্গত হয় নি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ভোরের আলো—শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়। (মিত্র এণ্ড ঘোষ)।

স্বর্গ হইতে বিদায়—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। (ডি-এম্ লাইব্রেরি)।

প্রথম প্রশ্ন—শ্রীরাইমোহন সাহা। (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)।

প্রথম বই ছাপার প্রলোভনে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, বিশেষ ক'রে কবিতার বইয়ে। বিজনকুমারের প্রথম কবিতার বইয়ে সে সব ত্রুটি আছে। আজকের দিনে কবিতার ধারা অনেক বদ্‌লে গিয়েছে, তার বিষয় এবং ভাষা দুয়েরই রূপান্তর ঘটেছে। এ অবস্থায় পুরানো ভাষায় মামুলি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনায় যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। তবু এ কথা স্বীকার করি, নূতন কবির হাত ভালো। লঘুধ্বনি বাক্যের সংযোজনায় ও হালকা ছন্দের নৈপুণ্যে তিনি কয়েক জায়গায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ ক'রে সনেট্‌গুলির মধ্যে একটা নিজস্ব সুর আছে। আশা করি বিজনকুমার চিরাচরিত পথ ছেড়ে অর্থপূর্ণ কবিতা রচনায় এবার থেকে মনঃসংযোগ করবেন।

ভবানী মুখোপাধ্যায় নূতন লেখক না হ'লেও এ খানি তাঁর প্রথম উপন্যাস। তবু মোটের ওপর বইখানি উপভোগ্য ও সুপাঠ্য। এতে কোনো বড় সমস্যার অবতারণা করা হয় নি, যদিও গ্রন্থকার ইঙ্গিতে একাধিকবার আমাদের সামনে সমাজের একটা বিশিষ্ট অবস্থা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এক হিসাবে উপন্যাস খানিকে সমাজ-চিত্র বলা চলে। কোনো একটি দরিদ্র পরিবারের জীবন কেমন ক'রে সামাজিক কলঙ্ক ও স্বৈরাচারের প্রলেপে মলিন ও দুর্বিষহ হয়ে উঠ্‌ল, এবং কয়েকটি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সেই সঙ্গে ব্যর্থ হ'ল—এ তারই ইতিহাস।

বইয়ের মধ্যে সুবর্ণ মেয়েটিকে বেশ ভালো লাগ্‌ল। কিছু পরিমাণে খাম্-খেয়ালী হলেও, তার চরিত্রে ব্যক্তিত্ব ও মাধুর্য্য আছে। তবে এ চরিত্রটিকে আরো ভালো করে ফোটানো যেতে পারত। জহর ছেলেটিও জীবন্ত, তার প্রাণ ও বুদ্ধি দুই-ই আছে কিন্তু শেষের দিকে সে যেন তলিয়ে গেছে। ব্যর্থতায় আত্মগোপন তার স্বাভাবিক উৎসাহ ও আদর্শবাদের অন্তরায় হয়েছে। এ ছাড়া বইয়ের মধ্যে দ্রুত রচনার ছাপ স্পষ্ট রয়ে গিয়েছে—যার ফলে অনেক-গুলি দৃশ্য ফুটে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই মিলিয়ে যায়। বিশেষ ক'রে বলা যেতে পারে যখন জহর ও সুবর্ণ'র জন্মগত কলঙ্ককাহিনী সত্যরূপে প্রকাশিত হ'ল

তখন তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন চরিত্রগুলির ওপর কি ভাবে কার্য্যকরী হ'ল সেটা আরও বিশদ্ বিশ্লেষণ করলে উপন্যাসের মূল্য বাড়ত। কিন্তু এ সব ত্রুটি ও অনবধানতা সত্ত্বেও বইখানি পড়ে আমার ভালো লেগেছে। কল্‌কাতার তথাকথিত উচ্চ সমাজের অপূর্ব্ব জীবগুলির চরিত্র-অঙ্কনে লেখকের রসবোধ ও লিপিদক্ষতার পরিচয় মেলে। এ ধরণের সামাজিক উপন্যাস একটু দুঃসাহসিক হলেও অসঙ্গত ও নিরর্থক নয়। ভবানী বাবুর ভাষা ভালো, তিনি লিখ্‌তে জানেন।

কোনো উপন্যাস পড়বার সময়ে আমরা দুটো জিনিষ অন্ততঃ প্রত্যাশা করতে পারি। রচনার মধ্যে মননশীলতার পরিচয় না থাক্‌লেও মোটামুটি একটা গল্পের ধারা আর প্রাঞ্জল ভাষা আমরা আশা করতে পারি, যা অনেক সময়ে অতি-সাধারণ উপন্যাসকেও অলস মুহূর্ত্তে সুখপাঠ্য করে তোলে। 'প্রথম প্রশ্নে' এ দুয়ের কোনোটারই সাক্ষাৎ পেলাম না।

বইখানির মধ্যে একটু স্বদেশী আমেজ আছে, কিন্তু তা নিতান্তই বাহ্য। এর নায়ক পমুদা' একটি অদ্ভুত জীব, চরিত্র বললে ভুল হবে। সব্যসাচীর মতই তাঁর নানামুখী প্রতিভা, এবং নাটকীয় মুহূর্ত্তে তিনি আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন। প্রত্যেক নারীই তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে এবং তাদের জীবনধারায় পমুদা'র অদৃশ্য প্রভাব ভৌতিক ভাবেই সক্রিয়। কিন্তু ঠিক্ কি কারণে তিনি এতখানি শ্রদ্ধার পাত্র, তার পরিচয় মেলে না। অনেক বড় বড় কথা তিনি ব'লে থাকেন —আনন্দ, ভোগ, মুক্তি চাই। তবে শেষ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহী লেখক ও কর্ম্মবীর তাঁর সমস্ত চিন্তা ও প্রেরণা মাত্র একটি ধারায় নিয়োজিত করেন,— অসবর্ণ বিবাহ। গ্রন্থকার যে কম্‌প্লেক্স নিয়ে বই লিখেছেন, সেটি সুস্থ মানসিক অবস্থার চিহ্ন নয়, একটি বিশিষ্ট চিত্ত-বিকারের নিদর্শন। উঁচু জাতের সঙ্গে হরিজনের (এ ক্ষেত্রে চামারের) অবাধ বিবাহ প্রচলন হ'লেই দেশ, সমাজ ও মানুষ স্বাধীন ও উন্নত হবে, এই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। এ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারত কিন্তু তা' না ক'রে গ্রন্থকার তিন টাকা দামের বিরাট্ এক-খানা উচ্ছ্বাসবহুল, রোমাঞ্চকর ও পূর্ব্বাপর সঙ্গতিবিহীন উপন্যাস কেন যে লিখতে গেলেন, সে কথার উত্তর দিতে পারেন একমাত্র মনস্তত্ত্ববিদ্।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

'ভারতবর্ষ' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলাদেশের পত্রিকাসাহিত্যে সব চাইতে বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে মাসিক পত্রিকাগুলি। এ শুধু আজকের কথা নয়। 'বঙ্গদর্শন' থেকে আরম্ভ ক'রে 'ভারতী', 'সাধনা', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ',-এর মধ্য দিয়ে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' পর্যন্ত যে-ধারা চলে এসেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত বেশি ও বিশিষ্ট তার দান। 'পরিচয়'-পত্রিকার স্থুরু হয় ত্রৈমাসিকরূপে, কিন্তু ক'বছর পরে মাসিকের প্রবল স্রোতে একেও নিল টেনে। এখন 'পরিচয়' বেশ কায়েমি রকমেই মাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

* * * * * *

বর্ত্তমান বাংলা মাসিকগুলির মধ্যে বোধ হয় সব চাইতে বেশি পরিচিত 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ'। এই দুটির মধ্যে বয়সে 'প্রবাসী' প্রবীণতর, কিন্তু 'ভারতবর্ষ'কেও তরুণ বলা চলে না, কেননা গত আষাঢ় সংখ্যায় এই পত্রিকাটির আঠাশ বছর বয়স স্থুরু হয়েছে।

সাতাশ বছর আগেকার একটি মর্ম্মান্তিক স্মৃতি 'ভারতবর্ষ' চিরদিন বহন করবে। এই পত্রিকার মলাটের মারফৎ বোধহয় কারও জানতে বাকি নাই যে এর প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু 'ভারতবর্ষ'-এর প্রথম সংখ্যা মুদ্রণের পূর্বেই সন্ন্যাস রোগের আকস্মিক অপঘাতে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু ঘটে। এই শোচনীয় ঘটনা তখন বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধ নরনারীর মনে যে গভীর শোকের ছায়াপাত করেছিল আজ তা' উপলব্ধি করাও কঠিন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে পদমর্যাদায় তাঁর স্থান ছিল বরাবরই রবীন্দ্রনাথের নিচে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর জনহৃদয়ে তাঁর সেই শূন্য স্থান আর কেউ পূর্ণ করতে পারেনি—শরৎচন্দ্র পর্যন্ত নয়।

বাংলা সাহিত্যের আসরে দ্বিজেন্দ্রলালের যে আসন তা' চিরন্তন। কিন্তু যে জনপ্রিয়তা জীবদ্দশায় তিনি ভোগ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমশ তার

হ্রাস হয়েছে একথা মানতেই হবে। কেন না এই জনপ্রিয়তার মূলে বহুল পরিমাণে ছিল সাময়িক উত্তেজনার মোহ। এই মোহের ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের যা' সেরা রচনা তা' উপেক্ষিত হ'য়ে জনসাধারণের স্ফীত দৃষ্টিতে তাঁর খেলো রচনাগুলি অত্যন্ত বড় আকার ধারণ করেছিল। আমি তাঁর নাটকের কথা বলছি। এই নাটকগুলির অভিনয়ের পালা এখনো ফুরোয়নি, কিন্তু এগুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে বোধ হয় কোনো তর্কের প্রয়োজন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় এই নাটকগুলি নয়; এই পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর কবিতায় ও গানে—বিশেষভাবে তাঁর হাসির কবিতা ও গানে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের প্রথম ও শেষ হাসির কবি। ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মতন অনাবিল হাসি উদ্রেক করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের হাসির কবিতা যতই উচ্চাঙ্গের হোক, তাঁর কাব্যে তারা নিতান্তই গৌণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পর রজনীকান্ত সেন হাসির কবিতা রচনার ব্যাপক চেষ্টা করেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ধার কাছেও পৌঁছতে তিনি পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র সুকুমার রায় অনাবিল অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনা বিশেষ ভাবে শিশুদের জন্যে, হাসির কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার দাবী তাঁর নাই।

আর একজন মনস্বী লেখকের কথা এই প্রসঙ্গে মনে না হয়ে পারে না। এই লেখকের নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এবং তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী নয়, অগ্রবর্তী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন উদ্ভট কল্পনার রাজা; উদ্ভটরস হাস্যরসের ঠিক সামিল না হলেও কাছ-ঘেঁসা। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' পড়তে পড়তে যেমন এক এক সময়ে লেখকের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ না হ'য়ে পারা যায় না, তেমনি কখনো কখনো হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু হাস্যরস বাদ দিলেও এক বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' বইর তারিফ না ক'রে পারা যায় না—তা' আঙ্গিকের অসাধারণত্ব। বর্ত্তমান বাংলা ছন্দের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ একথা না মেনে উপায় নাই। তাই আরো বেশি আশ্চর্য্য লাগে, কি ক'রে দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেরও বহু আগে তখনকার প্রচলিত বাংলা ছন্দের মধ্যেই অত রকম প্যাঁচ ও

মোচড়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। তেমনি আশ্চর্য্য হ'তে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণ বিমর্দন মর্ম কি গূঢ় ?

প'ড়ে। তখনকার দিনে ঐ জাতীয় ছন্দের উপর অতখানি দখল স্থাপন করতে হ'লে পাকা হাত ও সাহস দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল।

দুঃখের বিষয় 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বা 'আষাঢ়ে' এই দুটি বইর একটিও আজ কোথায়ও দেখতে পাওয়া যায় না। এদের পুনর্মুদ্রণ আজ নিতান্তই আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। এই বিষয়ে 'বিশ্বভারতী' ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌ এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করছি। এই জাতীয় লুপ্ত রত্নের প্রকাশ ও প্রচারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তৎপর হওয়া উচিত।

'লিরিক্‌স্‌ অফ্‌ ইণ্ড' নামে একটি ইংরেজি গীতি-কবিতার পুস্তকও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশিত করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হচ্ছে। তাঁর যে আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর উল্লেখ ক'রে এই আলোচনার সুরু করি, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তা' হয়তো সত্যি ততটা শোচনীয় নয় যতটা তখন মনে হয়েছিল। কেননা, যে রঙিন ও অবাস্তব নাটকীয় কুয়াসায় আবৃত হ'য়ে তাঁর সমসাময়িক ভক্তবৃন্দের মন তিনি উপদেবতার মতন জুড়ে বসেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কুয়াসা-জাল ক্রমশ কেটে গিয়ে তাঁর যথার্থ সাহিত্যিক স্বরূপ আমাদের কাছে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট দান—হাসির গান ও কবিতা, এবং এই দান শুধু তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়, তাঁর অদ্বিতীয় সৃষ্টি। যে নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম ও বৈদগ্ধ্যের জন্যে তিনি বন্ধুবর্গের এত প্রিয় ছিলেন, তাঁর হাসির কবিতা ও গানে পূর্ণমাত্রায় তাদের পরিচয় পাওয়া যায়; তা ছাড়া পাওয়া যায় তাঁর অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার পরিচয়। সর্বোপরি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন শিল্পী।

আর একটি কথার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে: রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ—ব্যক্তিগত নয়, সাহিত্যিক। এই বিরোধের উদ্ভব অবশ্য জনসাধারণের মনে এই দুই সমসাময়িক লেখকের কল্পিত প্রতিদ্বন্দিতা থেকে। রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখায়, বা মুখের কথায়, এই বিরোধের

আভাষ কেউ পেয়েছেন কি না জানি না। বরঞ্চ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর একটি কবিতার (হাসির নয়) রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি অনুবাদও করেন। সামাজিক ও সাহিত্যিক উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের সুযোগ বহুবার ঘটেছে, বিশেষভাবে তা ঘটেছে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মধ্যস্থতায়, কেন না লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন দুই জনেরই অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। কিন্তু তবু অস্বীকার করা যায় না এঁদের দুজনের মধ্যে বিরোধের ভাব জনসাধারণের মনে বেশ স্পষ্ট আকারেই ছিল; বহু খুদে সাহিত্যিক আসরে এঁদের কে বড় কে ছোট তাই নিয়ে জোর তর্ক জমে উঠত, যেন এঁরা ছিলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লেখক, আর দু'জনেই কলম চালাতেন যে যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে! আজ এই কথা মনে পড়লেও হাসি পায়; কি ক'রে এই অসম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ধারণা করাও এখন কঠিন। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তত একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম চালনা করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক রুচি যে খুব উদার ছিল তা' বলতে পারি না, তা' ছাড়া তিনি ছিলেন সরল ও স্পষ্টভাষী, যা অন্যায় মনে করতেন মুখে বা লেখায় তার তীব্র প্রতিবাদ করতে একটুও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। 'সাহিত্য'-পত্রিকায় ক্ষুদ্র এক প্রবন্ধে তিনি একদা রবীন্দ্রনাথের রচনা অশ্লীলতাদুষ্ট এই মত প্রচার করেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন 'চিত্রাঙ্গদা' কবিতা ও 'আহা জাগি পোহাইল বিভাবরী' প্রভৃতি গান! পরবর্তী সংখ্যায় প্রিয়নাথ সেন এই প্রবন্ধের যে উত্তর দেন, রসবোধ, পাণ্ডিত্য ও ধৈর্য্যের জন্যে তা' স্মরণীয়।

'চতুরঙ্গ'

বাংলা ভাষায় একমাত্র ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ'—অর্থাৎ একমাত্র নাম করার মতন ত্রৈমাসিক। এ ছাড়া আরো ত্রৈমাসিক যদি থাকে তা' নিশ্চয়ই নগণ্য। কিন্তু অসংখ্য মাসিকের কোলাহলে 'চতুরঙ্গ'-এর কণ্ঠস্বর প্রায় চাপা পড়েছে, কেন না উৎকর্ষে ত্রৈমাসিকের উপযুক্ত হ'লেও কলেবরে 'চতুরঙ্গ' মোটেই সম্ভ্রমশালী নয়। আকারে আর একটু বড় না হ'লে এই উল্লেখযোগ্য কাগজটিকে ত্রৈমাসিকের মর্যাদা দিতে আমাদের বাধে।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক, হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু, দুই জনেই নাম-করা সাহিত্যিক। এঁদের দুজনের ঝোঁক যে দুই দিকে, কাগজটির পক্ষে তা' শুভ লক্ষণ বলতে হবে। বুদ্ধদেব কবি ও কথা-সাহিত্যিক। হুমায়ুন কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামেন কাব্যলক্ষ্মীকে ভর ক'রে। সেই সময়ে একাধিক বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার অত্যন্ত দক্ষ অনুবাদ ক'রে ইনি নাম করেছিলেন, তা' ছাড়া মৌলিক কবিতাও ইনি কম লেখেন নি। কিন্তু কবিরের কবিতা ইতি-মধ্যেই প্রায় সেকেলে হ'য়ে পড়েছে, ভাবিকাল সেগুলিকে গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। কবিরের যথার্থ কাজ হওয়া উচিত প্রবন্ধ-রচনা, বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে যার অভাব সব চাইতে বেশি। ভালো প্রবন্ধকার হওয়ার মতন ব্যাপক দৃষ্টি, সচেতন মন, পাণ্ডিত্য ও সর্বোপরি লিপিদক্ষতা—সবই কবিরের আছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'চতুরঙ্গ'-এর গত চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের উপাদান' প্রবন্ধে। এই জাতীয় প্রবন্ধ কবিরের হাত দিয়ে আমরা আরো অনেক পাব আশা করি।

কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই বুদ্ধদেবের 'গাধা' সনেটটি মোটেই তাঁর উপযুক্ত হয়নি। নিতান্তই 'আমি কবিতা লিখি' এই কথা জানানো ছাড়া 'আমি আছি'—গাধার মুখ-নিঃসৃত এই তত্ত্ব-বাণীর আর কি তাৎপর্য বোঝা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যে তিন জন কবি এই জাতীয় ছন্দ-রচনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব তাঁদের একজন ঃ অপর দুইজন, মোহিতলাল মজুমদার ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আরো এই কারণে তাঁর উদ্ভাবিত 'গাধা'র আর্তনাদ কবির অপ্রত্যাশিত ভাবে মর্মভেদী হয়েছে।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৪৭

পরিচয়

জীবন্মুক্তি

আমরা দেখিয়াছি, জীবের চরম পরম সিদ্ধি অমৃতত্ব—প্রতিমুচ্য ধীরাঃ অমৃতা ভবন্তি—(কেন, ১।২)। উহারই নাম মুক্তি—এবং ঐ মুক্তি লাভের অনন্য পন্থা ব্রহ্ম-বিজ্ঞান। ঐ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান যখন যাঁহার যেখানেই হয়, তিনিই মুক্ত—তা' সে অদ্যই হো'ক আর কল্পান্তেই হো'ক, ইহলোকেই হো'ক অথবা ব্রহ্ম-লোকেই হো'ক, শরীর থাকিতেই হো'ক বা শরীর না থাকিতেই হো'ক,—তাহাতে কিছু যায় আসে না। তাই বাদরায়ণ বলিয়াছেন, মুক্তি-সম্পর্কে ইহলোক-পরলোক (ইহ-অমুত্র), অদ্য-অনদ্য—এরূপ কোনই নিয়ম নাই

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ

—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২

—কেন না, মুক্তি প্রতিবন্ধক্ষয় বা 'অন্তরায়-ধ্বস্তি'রই নামান্তর।

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান—মুক্তি যাহার সাক্ষাৎ ফল) প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া স্থিতম্।—শঙ্কর

ঐহিকম্ অপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ

—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

এ সম্পর্কে শ্রুতি বলিতেছেন:—

ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যমস্তি
ন চেদ্ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন, ২।১৩

'ইহলোকে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হয় তবেই মুক্ত—না হয় বিনষ্টি, (মৃত্যুময়) সংসার-গতি।'

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্ বয়ং
ন চেদ্ অবেদী মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে পারে—যদি না হয়, তবে মহতী বিনষ্টি; যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহাদের অমৃতত্ব—অন্যথায় দুঃখময় সংসার।'

ইহচেদ্ অশকৎ বোদ্ধুং প্রাক্শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু * শরীরত্বায় কল্পতে ॥
—কঠ, ৬।৪

'শরীর ভ্রংশের পূর্বে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উদয় না হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে শরীর-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী'।

কিন্তু জীবিতমানে মর্ত্য মানুষ যদি চিত্তকে নিষ্কাম করিয়া ঐ বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, তবে তিনি 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে ॥
—বৃহ, ৪।৪।৭

শরীর-ধারণে যিনি ঐ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন, তিনি জীবন্মুক্ত—তাঁহার কথাই আমাদের সম্প্রতি আলোচ্য। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষে
—ছা, ৬।১৪।২

ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানী, ব্রহ্মেস্থিত পুরুষকে বৃহদারণ্যক 'প্রতিবুদ্ধ' বলিয়াছেন—

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সংদেহে গহনে প্রবিষ্টঃ।
—বৃহ, ৪।৪।১৩

* সর্গেষু—পৃথিব্যাদিষু লোকেষু—শঙ্কর।

'এই গহন (অনর্থ-সংকুল) দেহে প্রবিষ্ট যাঁহার আত্মা অনুবিত্ত (ব্রহ্মবিৎ) হইয়াছে, তিনি 'প্রতিবুদ্ধ'। প্রতিবুদ্ধ কেন ? যেহেতু তিনি অনাদি মোহনিদ্রা হইতে এখন জাগরিত হইয়াছেন।*

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১৬

'অনাদি মায়াঘোরে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে উপলব্ধি করে যে, সেই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্নহীন দ্বৈতহীন ব্রহ্মতত্ত্ব।'

সেই জন্য উপনিষদের ঋষিরা উদাত্তস্বরে জীবকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—উৎতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত (কঠ, ৩।১৪)—'উঠ ! জাগ ! প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান অর্জন কর'।

যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকে বামদেব ঋষির উল্লেখ আছে—

তদ্ধ এতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবম্ সূর্যশ্চেতি—বৃহ, ১।৪।১০

জাতিস্মর বামদেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জানিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—'আমি মনু ছিলাম, আমি সূর্য হইয়াছিলাম'। যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহারই সম্বিতের এইরূপ সম্প্রসারণ সম্ভব, কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' যাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইয়াছে, তিনিই এই সমুদয় হন—অপরে হয় না।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মী'তি স ইদং সর্বং ভবতি

—বৃহ, ১।৪।১০

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, যিনি, ঐ বৃহদারণ্যকে দেখি, জনক রাজার নিকট 'ব্রহ্ম-পারায়ণং জগৌ'—তিনিও এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাই জনক রাজা তাঁহার মোক্ষ-বিষয়ক উপদেশ আত্মস্থ করিয়া ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিতে পারিয়াছিলেন 'অভয়ং বৈ জনক ! প্রাপ্তোসি'

—বৃহ, ৪।২।৪

ঐ অভয় আর কে ?

* সেই জন্য শাক্যসিংহের সার্থক সংজ্ঞা—বুদ্ধ—কারণ, তিনি সংবুদ্ধ, সম্যক্ জাগরিত—'The fully wake One'—অনাদি মায়া হইতে, Primeval and Gigantic 'Self-mystification' হইতে প্রতিবুদ্ধ।

এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম—ছা, ৮।১১।১

ব্রহ্মই অভয়—অভয়ং বৈ ব্রহ্ম, অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ—বৃহ, ৪।৪।২৫

বুদ্ধদেবও এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি ইহজীবনেই নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং সেই জন্য তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারিয়াছিলেন—

'I have in this life entered Nirvana' while the life of Goutama has been extinguished. Self (i.e. the personal self) has disappeared and Truth has taken its abode in me'.

শরীর পাতের পর ঐ জীবন্মুক্তের যে মোক্ষ হয়, ঋষিরা তাহার নাম দিয়াছেন 'বিদেহ-মুক্তি'। ঐ বিদেহ মুক্তির সম্পর্কে আমরা আগামী অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিব। এখানে জীবন্মুক্তি হইতে ঐ বিদেহ মুক্তির প্রভেদ-নির্দেশক কয়েকটি শ্রুতি-বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করি।

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যতি—শতপথ ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ আকাশাৎ)—এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবে।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে, এতদ্ ব্রহ্ম! এতম্ ইতঃপ্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি।

—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাদ্ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধন কি? জীবন্মুক্তি-পথের পাথেয় কি? উপনিষদের নানাস্থানে এ সম্পর্কে অনেক অমূল্য উপদেশ বিক্ষিপ্ত আছে—ঐ সকল সংকলিত ও সজ্জিত করিলে একখানি চমৎকার পুস্তিকা রচিত হইতে পারে।* ঋষিদিগের মতে সাধন পথে প্রথম পদন্যাস (First Step)—দুষ্কৃত হইতে বিরতি ('Cease from wrong-doing')

* এই সাধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে যাঁহার কৌতূহল আছে, তিনি বিদ্যারণ্য মুনির জীবন্মুক্তি বিবেক, মিসেস্ বেসেন্ট-প্রণীত 'The Path of Discipleship', বিসপ্ লেডবিটার-রচিত 'Masters and the Path' এবং ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কি-সংকলিত 'Voice of the Silence' ও 'Practical Occultism' প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে পারেন।

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ ॥

—কঠ, ২।২৪

'যে দুশ্চরিত হইতে অ-বিরত, যে অশান্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, যাহার মনঃ অসংযত—সে কখন ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।'

আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত কেন? আমরা ধর্ম জানি কিন্তু ধর্মে প্রবৃত্তি নাই কেন? জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। আমরা কামনার বশবর্তী বলিয়া। অতএব সাধন পথে কামনাজয় অত্যাবশ্যক।

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাঃ
তে শুক্রম্ এতদ্ অতিবর্তন্তি ধীরাঃ।

—মুণ্ডক, ৩।২।১

'যাঁহারা কামনাজয়ী হইয়া সেই (পরম) পুরুষের উপাসক—তাঁহাদিগকে আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না।'

বৃহদারণ্যক এইরূপ চরিতার্থ পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন—

তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।

—বৃহ, ৪।৪।২৩

'শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া এবংবিৎ আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন। পাপ তাঁহাকে তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন—পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। বিপাপ বিরজঃ বিসংশয় তিনি 'ব্রাহ্মণ' হন।'

যিনি এইরূপ বিপাপ বিরজঃ—যিনি ধর্মবলে বলীয়ান্—তিনি স্বভাবতই অ-প্রমত্ত।

নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ

—মুণ্ডক, ৩।২।৪

বস্তুতঃ, ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য ভেদ করিতে হইলে ঐ অ-প্রমাদই অমোঘ অস্ত্র—

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ

—মুণ্ডক, ২।২।৪

যিনি নিষ্কাম—বিষয়-ভোগে নির্বেদ তাঁহার প্রকৃতিগত—তাঁহার লক্ষ্য কৃত নয়, অকৃত,—ভূত নয়, অভূত।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদম্ আয়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

—মুণ্ডক, ১।২।১২

'ব্রাহ্মণ কর্মার্জ্জিত লোকে নির্বিণ্ণ—তিনি জানেন কৃতের দ্বারা কখনো অ-কৃত লাভ হয় না।'

যিনি এইরূপ অকামহত 'ব্রাহ্মণ', তাঁহার ব্রহ্ম-বিজ্ঞান অদূরবর্ত্তী—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

—বৃহ, ৪।৪।৭

গীতা ঐরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

—গীতা, ৫।১৯

'যাঁহাদের মন সমত্বে সুস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসৃতি জয় করিয়াছেন—কারণ, নির্দোষ-সম যে ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি-লাভ হইয়াছে।'

অন্যত্র মুণ্ডক-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্

—৩।১।৫

'নিত্য যিনি সত্য, তপঃ ব্রহ্মচর্য ও প্রজ্ঞানের অনুষ্ঠান করেন, পরমাত্মার লাভ তাঁহার নিকট সুলভ হয়।'

এই সত্যের উপর ঋষিদিগের বিশেষ ঝোঁক। তাঁহারা বলেন—

সত্যমেব জয়তি নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥
—মুণ্ডক, ৩।১।৬

'সত্যই বিজয়ী হয়—মিথ্যা হয় না। সত্য দ্বারা সেই দেবযান পথ বিতত আছে, যদ্দ্বারা ক্ষীণতৃষ্ণ ঋষিগণ সত্যের পরম নিধানে উপনীত হন।'

এইরূপে সাধক জ্ঞানপ্রসাদে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' হইলে তবে সেই নিষ্কল পুরুষকে (যিনি জীবের পরম পুরুষার্থ) প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ
ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।
—মুণ্ডক, ৩।১।৮

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-সংসর্গ-জনিত-রাগাদি-মল-কালুষ্য-অপনয়নাৎ আদর্শ (দর্পণ)-সলিলাদিবৎ প্রসাদিতঃ স্বচ্ছং শান্তম্ অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ।

এজন্য সদ্‌গুরুর সংযোগ অত্যাবশ্যক—যাহা লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ॥
—গীতা, ৪।৩৪

ঐ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী—যাঁহার নিকট সত্য করকলিতকুবলয়বৎ অবদাত—তিনিই সদ্‌গুরু। শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যার আদান করেন। মুণ্ডক ঐরূপ সদ্‌গুরুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—১।২।১২

বিদ্যালাভের জন্য ঐরূপ শ্রোত্রিয় (শ্রুতির পারগামী), ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, শমদমাদি-সম্পন্ন সদ্‌গুরুকে শিষ্য ভাবে উপসন্ন হইতে হয়। তিনিই প্রকৃত 'আচার্য'।

কারণ, আচার্যাৎ হৈব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং প্রাপতি
—ছান্দোগ্য, ৪।৯।৩

'আচার্য হইতে বিদিত বিদ্যাই সর্বোৎকর্ষ লাভ করে।' অতএব উপনিষদের উপদেশ এই—আচার্যবান্ পুরুষো বেদ (ছা, ৬।১৪।২)।

আচার্য অন্তেবাসীকে যে বিদ্যাদান করেন, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে (Realisation-এ) পরিণত করিতে হইলে—যোগাভ্যাস আবশ্যক। যোগ-উপনিষদে তাহার সম্যক্ বিবরণ আছে। পরবর্তীকালে পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের 'অনুশাসন' (শিষ্টস্য শাসনম্ = অনুশাসনম্) করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বরূপ বিস্পষ্ট আকারে প্রাচীন উপনিষদেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগের ঐ অষ্ট অঙ্গ কি কি ?*

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-সমাধয়োঽষ্টৌ অঙ্গানি—যোগসূত্র, ২।২৯

'যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।'

ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (চৌর্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম। শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—ইহাদের নাম নিয়ম। পদ্মাসন, ধীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থিরসুখ-মাসনম্—২।৪৬ সূত্র)। প্রাণ-বায়ুর সংযম = প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—২।৪৯ সূত্র)। ইন্দ্রিয়-নিরোধের নাম প্রত্যাহার। এক দেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধন ধারণা—(দেশ-বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা—৩।১ সূত্র)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—৩।২ সূত্র। ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি।

* মৈত্রী-উপনিষদে যোগকে ষড়ঙ্গ বলা হইয়াছে—

তথা তৎপ্রয়োগকল্পঃ। প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারঃ ধ্যানং ধারণা তর্কঃ সমাধিঃ ষড়ঙ্গ ইত্যুচ্যতে যোগঃ—৬।১৮

তর্ক কি ? রামতীর্থ তাঁহার দীপিকায় বলেন—

সবিকল্পঃ সমাধির্বা তর্কঃ। মৈত্রীর অন্যত্র এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়—অতঃ পরা অস্য ধারণা বাঙ্মনঃপ্রাণ-নিরোধনাৎ ব্রহ্ম তর্কেন পশ্যতি (৬।২০)।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, উক্ত যম ও নিয়ম কতকগুলি নৈতিক সাধন (অর্থাৎ character-building)। উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মসাধনের যে সকল উপায় উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাদিগের সংগ্রহ-নামই যম ও নিয়ম। যম ও নিয়মের পর আসন। ঐ আসনের বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিশিষ্ট উপদেশ আছে—

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-
বিবর্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে,
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥—শ্বেত, ২।১০

'শুচি, সমতল, কঙ্কর, বহ্নি, বালুকাবর্জিত, শব্দ জল ও গৃহাদি হইতে দূরস্থিত,—মনের অনুকূল ও চক্ষুর অপীড়ন স্থানে নিবাত গুহায় আসন স্থাপন করিবে।'

কোথায় কি ভাবে যোগী আসন স্থাপন করিবেন—শ্বেতাশ্বতর তাহারই উপদেশ দিলেন। উহার সহিত গীতার নিম্নোক্তি তুলনীয়—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥—গীতা, ৬।১১

'যোগী পবিত্র দেশে নাতি-উচ্চ, নাতি-নিম্ন স্থানে কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থিরাসন সংস্থাপন করিবেন।'

আসনের পর প্রাণায়াম। তৎসম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের উপদেশ এইরূপ ঃ—

একমেব ব্রতং চরেৎ। প্রাণ্যাৎ চৈব অপান্যাৎ চ।
নেৎ মা পাপ্মা মৃত্যুঃ অপ্নুবৎ ইতি—বৃহ, ১।৫।২৩

'এক (প্রাণ)-ব্রত আচরণ করিবে—প্রাণ ও অপানের সমীকরণ করিবে। যেন পাপ মৃত্যু আমাকে না গ্রাস করে।'

ইহাকেই গীতা বলিয়াছেন—

প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ
—গীতা ৫।২৭

প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার। এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন ঃ—

আত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য
—ছান্দোগ্য, ৮।১৫

কঠ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি আছে ঃ—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
—কঠ, ৩।৬

'যিনি বিজ্ঞানবান্, সংযতমনাঃ, সদশ্ব যেমন সারথির বশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশীভূত হয়।'

কঠ এই ধারণাকে অন্যত্র "আবৃত্ত চক্ষুঃ" বলিয়াছেন—

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ
আবৃত্ত-চক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্।—কঠ, ৪।১

ধ্যানধারণা সম্বন্ধে উপনিষদে বহুতর উপদেশ আছে।

এ সম্বন্ধে কঠ বলিতেছেন ঃ—

যচ্ছেৎবাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেৎ জ্ঞান-আত্মনি।
জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎতদ্‌যচ্ছেৎশান্ত আত্মনি॥
—কঠ, ৩।১৩

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ বাক্যকে মনে সংযত করিবেন; মনকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে মহতে, এবং মহৎকে শান্ত আত্মায়।

এইরূপে ধারণা যখন ধ্যানে পরিপক্ক হইবে, তখন—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ॥
—কঠ, ৬।১০-১১

'যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি নিশ্চল হইবে—তাহাই পরমাগতি। ঐ স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণাকে 'যোগ' বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হন। ঐ যোগের প্রভব ও প্রলয় আছে।'

যে অপ্রমত্ত যোগী ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ—প্রণব তাঁহার ধনু এবং আত্মা শর। ঐ শর সন্ধান করিয়া তিনি তন্ময় হয়েন।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎতন্ময়ো ভবেৎ ॥

—মুণ্ডক, ২।২।৪

স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা প্রণবম্ চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মন্থনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ ॥

—শ্বেত, ১।১৪

'নিজ দেহকে অরণি করিয়া ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যান দ্বারা তাহাদের নির্মন্থন অভ্যাস করতঃ নিগূঢ়বৎ সেই জ্যোতিঃরূপকে দর্শন করিবে।'

এই সমাধিই প্রকৃত যোগ—যুজ্ সমাধৌ—যাহাকে Roman Catholic-রা 'Unio Mystica' (Mystic Union) বলেন। এদেশেরও কথা ঐ ঃ—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।

* * *

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৩১

অর্থাৎ, 'আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।'

যোগ-সম্পর্কে উপনিষদের উপদেশের সমাহার করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—৭।২৬।২

'আহার শুদ্ধির ফলে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধির ফলে ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতিলম্ভে সমস্ত গ্রন্থির বিপ্রমোক্ষ।'—অর্থাৎ, ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ।

শঙ্করাচার্য ঐ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলেন ঃ—

আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু আহরণ করা যায়, তাহাই 'আহার') শব্দাদি-বিষয়বিজ্ঞানং ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধি-লক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিঃ রাগদ্বেষমোহদোষৈঃ অসংশ্লিষ্টবিষয়-বিজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ।

ঐ আহারশুদ্ধি হইলে চিত্তের নৈর্মল্য সম্পাদিত হয় ; এবং ঐ নৈর্মল্যের ফলে আত্মবিস্মৃত জীবের নিজ স্বরূপের স্মৃতি ফুটিয়া উঠে—নষ্টাম্ আপ পুনঃস্মৃতিম্।

এইরূপে জীব যখন নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ উপলব্ধি করেন—তখন ফলতঃ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থি নির্মুক্ত হয়, এবং তিনি পাশ-মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।*

ইহাই জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তির পরে কি? সে অনেক কথা—আগামীতে বলিব এবং প্রসঙ্গতঃ জীবন্মুক্তির সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে ও 'কুটীচক'াদি দীক্ষা সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
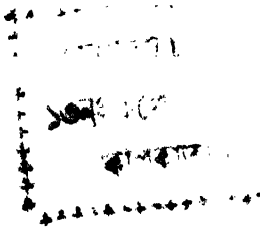
* মৈত্রী উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

তালুধ্যগ্রম্ পরিবর্ত্য চ ইন্দ্রিয়াণি সংযোজ্য মহিমা মহিমানং নিরীক্ষেত ততো নিরাত্মকত্বম্ এতি। নিরাত্মকত্বাৎ ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বম্ লভতে ইত্যেবং হ্যাহ। পরং পূর্বং প্রতিষ্ঠাপ্য নিগৃহীতানিলং ততঃ। তীর্ত্বাপারমপারেণ পশ্চাৎ যুঞ্জীত মূর্দ্ধনি ॥—মৈত্রী—২১ ;

অর্থাৎ জিহ্বাগ্র তালুতে (খেচরী মুদ্রায়) সংচারিত করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে একীভূত করতঃ যোগী পূর্ণ মহিমা নিরীক্ষণ করিবেন। এইবার তিনি নিরাত্মক হইবেন এবং সুখদুঃখের অতীত হইবেন এবং কৈবল্য লাভ করিবেন। এ বিষয়ে এই উক্তি আছে—নিগৃহীত প্রাণকে তালুদেশে পূর্বে স্থাপন করতঃ অপার দ্বারা পারকে পার হইয়া পরে আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে যুক্ত করিবে।

পরিশেষ

মাধুরীকে দেখে হঠাৎ অরবিন্দ থম্‌কে গেল। দেখলো বোধ হয় আট বছর পরে, কিন্তু চিনতে তার এক পলকের বেশী প্রয়োজন হলো না। মাথাটা যথাসম্ভব নিচু করে সে যেন নিজেকে একটু আড়াল করবার চেষ্টা করলো।

বিয়ে বাড়ী। প্রকাণ্ড চকমিলানো দালানের চৌকো উঠোনে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে। ঝলমল করছে আলোতে। মাঝখানে হাত তিনেক ফাঁক রেখে লম্বালম্বি টেবিল আর ভেনেস্তা চেয়ার ফেলে ছুদিকে খাবার ব্যবস্থা—একদিকে মেয়েরা, একদিকে পুরুষেরা। অরবিন্দর অনেকক্ষণ থেকেই মনে হয়েছে যে যে-মেয়েটি তার দিকে পিছন ফিরে খেতে বসেছে তার হাতির দাঁতের মত শুভ্র মসৃণ ঘাড়ের উপরকার ঢেউ খেলানো চুলের অবিন্যস্ত ঢিলে খোঁপাটি সে যেন চেনে। হঠাৎ মেয়েটির মুখ ঘুরলো এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ স্পষ্ট দেখতে পেল সত্যিসত্যিই সে মাধুরী। মনের মধ্যেটা একটু কেমন করলো যেন—একটু বিবেকের দংশন হয়তো—পরমুহূর্ত্তেই সামলে নিল নিজেকে।

খেয়ে উঠে সে আর দেরী করলো না—শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে বেরিয়ে পড়লো সেখান থেকে। তারপর পানের দোকান থেকে ছুখিলি পান এক প্যাকেট সিগারেট কিনে সামনে যে বাস পেল তাতেই চড়ে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে ফিরে বাড়ী ফিরলো রাত বারোটায়।

মেমসাহেব নিশ্চয়ই এতক্ষণ জেগে নেই। আর থাকলেও তার সঙ্গে ছুটো কথা বলে শান্তি পাবার আশা করা নিতান্ত মূঢ়তা। ফ্ল্যাটের দরজায় আস্তে সে টোকা দিল, কলিং বেল টিপলে ফল হত বেশী কিন্তু যদি এ্যানির ঘুম ভাঙে তবে আজ রাত্রে মল্লযুদ্ধ। প্রায় দশ মিনিট টোকা দেবার পরে বয় এসে আস্তে দরজা খুলে দিল। অরবিন্দ নিঃশব্দে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে পোষাক ছেড়ে শুয়ে পড়লো ; ঘুম এলো না অনেকক্ষণ—আর তারপর যখন ঘুমুলো তখন বাকী রাতটুকু সে এমন সব স্বপ্ন দেখলো যা থেকে নির্ঘুম রাত্রিও মানুষের পক্ষে অনেক কাম্য।

দোষ আর কার। সমস্ত দোষ অরবিন্দরই তো। অরবিন্দ যখন ভাইয়ের

পয়সায় চার বছর মেম পুষে পুষে ফতুর হয়ে দেশে ফিরলো তখন তার মাথার কোষে কোষে শয়তানি বুদ্ধি জাল ফেলেছে। দেশে থাকতে তার সুনাম ছিল। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়েণ্ট না হলেও ভাল ছেলে বলেই সকলে জানতো। বি, এ, পাশ করবার পরে তার হঠাৎ ঝোঁক চাপলো বিলেত যাবে। অক্স্‌ফোর্ডে পড়বে। অরবিন্দর দাদা অনন্ত বাবু তখন রাঙামাটির সিভিল-সার্জ্জন। তিনি ভাইয়ের ইচ্ছাকে সদিচ্ছা বলেই মনে করলেন এবং বিনা আপত্তিতে চোখের জল সামলে রাজি হলেন। অরবিন্দ দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। তার স্বাস্থ্য, তার রং, তার চাল চলন, কথাবার্ত্তা সমস্তই নিখুঁত ভাবে সুন্দর এবং বিলেত গিয়ে এই সৌন্দর্য্যই তার কাল হল। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত সহজেই মেয়েদের মনোহরণ করলো এবং শেষ পর্য্যন্ত সস্তা মেয়েদের পেছনে ঘোরাটাই পেশা করে চার বছরে ভাইয়ের রক্ত জল-করা সঞ্চিত সমস্ত অর্থ খুইয়ে—ফতুর হয়ে দেশে ফিরে এলো। ফিরে আসার তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। যে রসে সে ডুবেছিল সে রসের বড় আঠা, সাধ্য কি তা থেকে এত সহজেই সে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু তবু তাকে আসতে হলো—মনের মধ্যে নানারকম প্যাঁচ এঁটে সে লক্ষ্মীছেলের মত ঘরে ফিরে এলো। অনন্ত বাবু ভাইয়ের অধঃপতন সমস্তই বুঝলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। দিনকয়েক অরবিন্দ ভাইয়ের একান্ত অনুগত থেকে হঠাৎ একদিন ব্যবসা করবে বলে হাজার পাঁচেক টাকা চেয়ে বসলো, ব্যবসা বিষয়ে তার কি পর্য্যন্ত জ্ঞান তার তালিকাও সে ঘণ্টা তিনেক ব'সে ভাইয়ের কর্ণগোচর করালো, কিন্তু অনন্তবাবু নিঃশব্দে ব'সে পাইপ টান্‌তে লাগলেন, জবাব দিলেন না।

সেদিন রাত্রেই তিনি শুয়ে শুয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ছাখো, অরবিন্দর কিন্তু আবার পালাবার মতলব, এখন যে ক'রেই হোক ওকে বাঁধ্‌তে হবে।

'কেন ? কি ক'রে বুঝলে ?'

'বয়স তো হলো, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কাজেই বুঝতে দেরী লাগে না।'

স্ত্রী অন্নপূর্ণা একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, 'বাঁধতে হলে তো বিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় দেখি না।'

'আমি তো তাই বলি।'

'ছাখো ভাল ক'রে ভেবে'—অন্নপূর্ণা চিন্তিত ভাবে পাশ ফিরলেন।

অনন্তবাবু অনেকক্ষণ পাইপ টেনে আবার বল্লেন—'অরবিন্দ আমার সন্তানের অধিক। আমার সন্তান নেই একথা আমার কখনো মনে হয় না। সেই অরবিন্দ চোখের উপর এমন ভেসে যাবে?'—

অন্নপূর্ণা নিঃশ্বাস টেনে বল্লেন, 'সে তো ঠিক কথাই।'

অনন্তবাবুর বহুকাল পরে মনে পড়লো মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে তাঁর, ঠিক বাইশ বছর বয়সে যখন প্রৌঢ় পিতা আবার অরবিন্দর মাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন ঘরে। তখন পিতার দুর্ম্মতিতে লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মাহত হয়ে সে গৃহত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এই অরবিন্দর মা, ঐটুকু আঠারো বছরের মেয়ে—ফিরিয়ে আনলো তাকে ঘরে, বিয়ে দিয়ে সংসার পাতলো। তারপর ঠিক মায়ের মত স্নেহে যত্নে কর্ত্তৃত্বে সত্যিকারের মা হয়ে উঠলো দু'দিনেই। তিনি যখন মারা যান অরবিন্দ তখন সাত বছরের একফোঁটা ছেলে। অনন্তবাবুর চোখে অরবিন্দের সেই সাত বছর বয়সের পুষ্ট চেহারা ভেসে উঠ্‌লো স্পষ্ট হয়ে। কি ভালই তিনি বেসেছিলেন ভাইকে—মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার মনে পড়ে আনু—অরবিন্দের মায়ের মৃত্যুর কথা?'

'তা' আর পরে না। একফোঁটা তখন অরবিন্দ—আমার হাত ধরে উনি কেঁদে ফেল্লেন, "বৌমা আজ থেকে তুমিই এর মা,"—অন্নপূর্ণার মুখ করুণ হয়ে উঠ্‌লো বল্‌তে বল্‌তে। অনন্তবাবু বিষণ্ণভাবে আধশোয়া অবস্থায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ—তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপরেই অরবিন্দর বিবাহপর্ব্ব। মাধুরীর বাবা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র অরবিন্দকে দেখে একেবারে ভুলে গেলেন, মাধুরী তখন আই, এ, পড়ে বেথুনে। আঠারো বছরের মেয়ে। কাঠের কারবারে লক্ষপতি মৃত্যুঞ্জয় মিত্র বিনা-দ্বিধায় অরবিন্দর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দিলেন। বিয়েতে তিনি হাজার দশেক টাকা খরচ করলেন, তা ছাড়া মেয়েকে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত মুড়ে দিলেন সোনা দিয়ে। বিয়েতে মাধুরীর একান্ত অমত ছিল। বেচারা এমনিতেই ছেলেমানুষ, তার উপর নতুন নতুন কলেজের আস্বাদ পেয়েছে, এ রকম হুট্ করে বিয়ে করাটা তার ভাল লাগলো না। কিন্তু বিয়ের পর অরবিন্দকে তার সত্যিই ভালো লেগেছিলো। তার মধুর কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্ত্রীকে বললেন,

'কত তোমার ভয় ছিল—একটা মেয়ে, তাকে আমি জলেই ফেললাম বুঝি—খোঁজ-খবর ছাড়া বিয়ে, দেখোতো এখন কেমন জামাই ?'

মাধুরীর মা তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'থাক্ থাক্ আর গর্ব্ব করতে হবে না—মাত্রই তো আজ দশদিন বিয়ে হয়েছে।'

এদিকে অরবিন্দর বৌদিও মাধুরীকে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তার সমস্ত রুদ্ধ মাতৃস্নেহ যেন প্রবাহ বইল মেয়েটির কাঁচা মুখখানির দিকে তাকিয়ে। দশদিন পরে যখন বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ করে অরবিন্দ ফিরে এলো শ্বশুর বাড়ী থেকে, অনন্তবাবু একটু আড়াল বুঝে স্ত্রীকে বল্লেন, "অরবিন্দকে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে দেখেছ ?"

অন্নপূর্ণা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

'এবার ভাই আমার আর পালাবার নাম করবে না।'

'তা তোমারি তো ভাই।' তারপরে দু'জনেই চোখে চোখ রেখে একটু হাসলেন।

অরবিন্দ মাধুরীকে দেখে একটু অবাক হয়েছিল সত্যিই। জীবনে বহু মেয়ে দেখবার তার সুযোগ হয়েছে কিন্তু ঠিক মাধুরীর মত যেন সে কাউকেই দেখেছে মনে হ'লো না। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈকি! কিন্তু একখানা সুন্দর মুখ নিয়েই তো অরবিন্দর কারবার নয়, তাতে তার আশও মেটে না, কাজে কাজেই মনকে সে প্রশ্রয় দিল না। প্রেমই বল যা-ই বল ওসব তো সাময়িক একটা উত্তেজনা ছাড়া কিছু নয়—মনে মনে অরবিন্দ বিবেককে বোঝালো—আর জীবনে উত্তেজনা যদি ভোগই করতে হয় তবে একাধিক স্ত্রীলোক ছাড়া সেটা সম্ভবই নয়। আর সে প্রমোদস্থল হচ্ছে ইয়োরোপ। অতএব দিন কুড়ি পরে একদিন রাত বারোটার সময় সে নিঃশব্দে উঠে বসলো বিছানায়। মাধুরী নিরুদ্বেগে ঘুমুচ্ছিল বালিসে মাথা রেখে—বড় সুন্দর ওর ঘুমন্ত মুখ। ক্ষণিকের জন্য অরবিন্দর মুখ নেমে এসেছিল ওর মসৃণ সাদা কপালের উপর কিন্তু তক্ষুনি সংযত হয়ে মনকে শাসালো, ছিঃ। নীল সেড্ দেওয়া টেব্‌ল ল্যাম্পের মৃদু আলোকে সে অনায়াসেই ঘরের সব কিছু দেখতে পায়, বালিসের তলা হাত্‌ড়ে বার করলো আলমারীর চাবি—তারপর অত্যন্ত মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো আলমারীর কাছে। সমস্ত গহনা মায় অরবিন্দর

মৃত মায়ের চিহ্ন মুক্তার কণ্ঠিটি পর্য্যন্ত পুটুলি বেঁধে সে যখন আলমারী বন্ধ ক'রে বালিসের তলায় চাবি রাখলো—তখন থরথর করে পায়ের তলাটা একটু কেঁপে উঠ্‌লো তার কিন্তু সে মাত্র একটা পলক—তারপরেই নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। যথারীতি খোঁজ খবর টেলিগ্রাম সমস্তই হল এবং অবশেষে মাধুরী ফিরে এলো তার পিত্রালয়ে। অনন্তবাবু এ আঘাতের পরে খুব বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে অন্নপূর্ণার কি গতি হল মাধুরী কোন খবরই নিল না। মাস ছয়েক পরে সিঁথির সিঁদুর নিজের হাতে ঘষে ঘষে তুলে শাঁখা নোয়া খুলে ফেলে সে আবার মাধুরী মিত্র নাম নিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হল। অমঙ্গল আশঙ্কায় তার মা আপত্তি তুলেছিলেন প্রথমে কিন্তু ও এমন ভাবে তাকালো মায়ের দিকে যে মা আর দ্বিতীয় কথা বলতে সাহস পেলেন না। তারপর এই আট বছরে যা পরিবর্ত্তন হয়েছে তা এই যে মাধুরীর বাবা মারা গেছেন, মাধুরী এম, এ, পাশ করেছে এবং তার বয়স হয়েছে ছাব্বিশ।

ভোরের দিকে অরবিন্দর ঘুমের একটা মধুর আমেজ এসেছিল কিন্তু এ্যানির সরু সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের চীৎকারে তা ভেঙে গেল। ভয়ে ভয়ে উৎকর্ণ হয়ে সে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে উঠে বসলো বিছানায়, মনে মনে নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হতে লাগলো—কালকে অত রাত্তিরে ফেরার অপরাধের। এর মধ্যেই দরজায় এ্যানির টোকা শুনে সে যথাসম্ভব হাসিভাব মুখে এনে লাফ দিয়ে দরজা খুলে বললো, 'গুড্‌ মর্ণিং'।

'গুড্‌ মর্ণিং,' এ্যানির গম্ভীর স্বর বেরুলো। অরবিন্দ চেয়ার টেনে ওকে বসতে অনুরোধ করে সিগারেট ধরালো, তারপর নিজে থেকেই বল্‌ল. 'কালকে বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরতে বড়ই রাত হয়ে গেল তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি কাল—তুমি ঘুমিয়েছিলে তাই'—

'চুপ কর'—অরবিন্দর পক্ষে রক্ত জল-করা স্বরে এ্যানি বল্‌লো—তারপর হলদে রংয়ের গাউনটা অনর্থক এপাশ থেকে ওপাশে দু'একবার নেড়ে চেড়ে রূঢ়

স্বরে বল্‌ল, 'আর কতদিন এরকম ভাবে চলবে ঠিক করেছ ? তোমার সঙ্গে যখন স্বামী ছেড়ে বেরুই তখন এই কথা ছিল ? তোমরা ভারতীয়—কাল চামড়ার মানুষ—সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা যে তোমরা করবেই এ বুদ্ধি তখন আমার ছিল না ভেবে আমি এখন অনুতপ্ত।'

'কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি ?

'নিশ্চয়ই'—এ্যানি এত জোর দিয়ে কথাটি উচ্চারণ করলে যে অরবিন্দর বুক কেঁপে উঠ্‌লো—'আমি তোমাকে অর্থবান ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় বুঝতেই পেরেছিলে যে তোমার রূপ আমাকে তিলমাত্র আকর্ষণ করেনি—করেছিল তোমার টাকা আর তুমিও আমায় সেই প্রলোভন দেখিয়েই বিয়ে করেছিলে—আশা করি সে কথা তোমার মনে আছে।'

'আছে।'

'তুমি লম্পট! তুমি জোচ্চোর! তাই ভান করতে তোমার এতটুকু আটকায়নি। কোথায় গেল সেই অর্থ? বম্বে থাকতে তবু কিছু রোজগার ছিল—আর এই দু'মাসে কলকাতা এসে মাসে চার পাঁচশো টাকার অর্দ্ধপয়সা বেশী হয় না। তাও তো অদ্দেকের উপরে আমার নিজের উপার্জ্জন।'

'খরচও তো তোমারি সব।' অরবিন্দ অনেক সাহস সঞ্চয় করে কথাটা বললো। কিন্তু উত্তরে এ্যানি এমন ভাবে তাকালো যে অরবিন্দর সমস্ত সাহস ফুৎকারে নিবে গেল।

'আমি চাই টাকা'—এ্যানির ভদ্রতার মুখোস আর রইল না—'বুঝতে পেরেছ, টাকা! আমেরিকা থাকতে ফ্যাক্টরিতে যখন কাজ করতে তখন বহু মেয়েমানুষ তোমাকে পুষতে দেখে প্রলোভনে পড়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি মেয়ে ভাগানোই ছিল তোমার ব্যবসা। তাছাড়া একবার তুমি দেশে বিয়ে করে আবার আমায় বিয়ে করেছ কেন? তোমাকে আমি জেল খাটাতে পারি জান? ত্রিশ হাজার টাকার দাবীতে আমি ডিভোর্স আনবো; তারপর তোমাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে দেশে ফিরে যাব। জান তো আমি সাদা চামড়ার মেয়ে?' বলতে বলতে এ্যানি তার সাদা বাহু অরবিন্দর দিকে প্রসারিত ক'রে দিল—'আর দেখ্‌ছ আমার রূপ—যে কোন যুবককে আমি একটি ইঙ্গিতে এখনো ঘুরিয়ে দিতে পারি।' অরবিন্দ নিঃশব্দে বসে

রইল বিছানায়—একটি শব্দও আর উচ্চারণ করলো না। এ্যানি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো, 'আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিতে চাইনা, তবে আর একটি মাস আমি তোমাকে সময় দিলাম—এর মধ্যে তুমি আমার ইচ্ছেমত যদি ভাল ভাবে চল এবং তোমার উপার্জ্জন যদি বাড়ে তো ভাল নয়ত আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না।' এ্যানি বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে আর অরবিন্দ বসে রইলো স্থাণুর মত।

খানিকক্ষণ পড়ে নেপালি বয় ট্রেতে করে তার ঘরেই ছোট হাজারি এনে হাজির করেছে।

'কেন এনেছিস ?' অরবিন্দ রুখে উঠ্‌লো বিছানায় বসেই।

বয়টাকে একটু ঘাবড়াতে দেখা গেল না, মেমসাহেব যখন বেড়িয়ে গেছেন তখন আর ভাবনা কি—অরবিন্দকে সে ভয় পায় না কিন্তু ভালবাসে—খুব ভালবাসে কেননা সে বুঝেছে বাইরের অরবিন্দ তার একটা খোলস মাত্র—ভেতরের মানুষটি অত্যন্ত ভীরু, কোমল। মেমসাহেব অরবিন্দকে যখন নির্য্যাতন করে তখন তার মনে হয় কোমরের পেটি থেকে কুক্‌রি খুলে তার সাদা বুক লাল করে দেয়—কিন্তু তার কাপুরুষ মনিব নিঃশব্দে কুকুরের মত হজম করে।

অরবিন্দর ধমকের পরেও সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে—অরবিন্দ চায়ে চুমুক না দেওয়া পর্য্যন্ত সে যাবে না। একটু পরে অরবিন্দ আবার বল্‌ল, 'দাঁড়িয়ে আছিস যে ?'

'চুয়া পানি ঠাণ্ডা ভৈ গয়'—

'ভৈ গয় তো তোর কি! তুই যা।'

'বাবু চুয়া পিত্ত'—অত্যন্ত স্নেহের সুর বেরুলো নেপালির গলা থেকে। অরবিন্দর মনের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগলো। দ্বিতীয় কথা না বলে সে আস্তে চা ঢাললো কাপে—মনে হলো কতকাল পরে তার কোনো প্রিয়জন কাছে ব'সে খাওয়াচ্ছে। খেতে খেতেই বাইরের ঘরে লোকজনের খস্ খস্ শোনা গেল—বয় তাড়াতাড়ি গেল তাদের বসাতে আর অরবিন্দ ত্রস্তে চা সেরে কাপড় চোপড় বদ্‌লাতে উঠে এলো।

অরবিন্দ যে কাজ করে সেটা একটু অভিনব। কুৎসিত মানুষ সুন্দর করা, মোটাকে রোগা করা, সোজা চুল কোঁকরা করা—এ সমস্ত কথাই তার সাইন বোর্ডে লেখা আছে। বম্বেতে এসে সে এই ব্যবসা ক'রে যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছে তু'বছরে—কিন্তু তারপরই তার বুজরুকি আর লোকে বিশ্বাস করতে চাইল না। বুদ্ধিটা অবশ্য এ্যানির, এজন্য তাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়—আর সে সত্যি পারেও এমন কাজ—ভ্রু চাঁছা, চোক টান করা, চামড়া সাদা করা, ঠোঁট ধনুক করা—কিন্তু অরবিন্দর এসব ঠিক আসে না—তাছাড়া যে সমস্ত কথা বললে ব্যবসাতে লোক জমান যায় সে সমস্ত সে আয়ত্ব করতে শেখেনি। কতকাল আর থাকা যায় জোচ্চুরি ক'রে—অরবিন্দ ট্রাউজার্সের মধ্যে সার্ট ঢোকাতে ঢোকাতে ভাবলো—এবার সে নিশ্চয়ই এসব ছেড়ে দেবে, কোন ইস্কুলে মাষ্টারি—বীমার দালালি যা হোক একটা চোখ বুজে সে—

চিন্তায় বাধা পড়লো—বয় এসে তাড়া দিল বাইরে ...র জন্য হঠাৎ অরবিন্দর কি হল, নিমেষে টান মেরে গা থেকে খুলে ফেললো সার্টটা তারপর ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা সুরে বল্‌ল, 'বলে দে আজ সাহেবের অসুখ—কাজ বন্ধ।' তারপর ব'সে ব'সেই সে অনুভব করতে লাগলো বাইরের ঘরের অস্পষ্ট চলা-ফেরার শব্দ আর তু'একটা কথার টুক্‌রো। অনেক শিকার গেল, যাক্‌গে। অলস ভাবে উঠে অরবিন্দ একটা সিগরেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

বেলা প্রায় এগারোটায় এ্যানি ফিরে এলো কোথা থেকে—আজকাল তার বন্ধু জুটেছে অনেক। জুটুক, অরবিন্দর আপত্তি নাই—ও যদি কারো সঙ্গে চলে গিয়ে মুক্তি দিত অরবিন্দকে তবে সে মাথা মুড়িয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতো। কিন্তু এ্যানি যে বড় ধূর্ত্ত। অরবিন্দ ততক্ষণে স্নান সেরে দাড়ি কামিয়ে দরকারী চিঠিপত্র লিখতে বসেছে—এ্যানি এসে সোজা তার ঘরেই ঢুক্‌লো।

'কেমন লোক হয়েছিল আজ?'

'একজনও না—'

'একজনও না! স্কাউণ্ড্রেল, মিথ্যে কথা বলছ?'

মিথ্যে কথা বলাই তো আমাদের ব্যবসা—'

এ্যানির মুখ লাল হয়ে উঠলো রাগে—

'ও সমস্ত চলবে না, যা পেয়েছ সব দাও।'

'সত্যি কিছু পাইনি '

'ফের মিথ্যে কথা বলছ ?'

'মিথ্যে কথা কেন বলবো, ভারতীয়েরা মিথ্যে কথা বলে না।'

'রোগ্'—এ্যানি ক্ষেপে গেল। পাছে অরবিন্দ ঠিক ঠিক মত সব না দেয় এজন্য খদ্দের চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত এ্যানি কক্ষনো বেরোয় না বাড়ি থেকে—আজ ক'দিন থেকে অবিশ্যি বেরুচ্ছে কিন্তু ফিরে এলে অরবিন্দ কড়ায় ক্রান্তিতে তাকে সমস্ত দিয়ে দেয়। আজকে অরবিন্দর মতিগতি দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঝড়ের মত সে তক্ষুণি আবার বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আর অরবিন্দ পরম নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠি শেষ ক'রে ব্যাঙ্কের বই খুলে দেখতে লাগলো কত আছে তার হাতে। অরবিন্দর এত সাহস হল কি ক'রে সে কথা সে নিজেই বুঝলো না—এ্যানির সঙ্গে প্রকাশ্য ঝগড়া ক'রে তার একথা একবারও মনে হল না এরপরে কি হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে শিষ্ দিতে দিতে সে সমস্ত ঘর ঘুরতে লাগলো, আর কেমন একটা উত্তেজনায় কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে লাগলো।

সমস্ত দিন কিন্তু এ্যানি ফিরলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অরবিন্দ যখন খেতে বস্লো তখন এ্যানির জন্য কেমন যেন তার মমতা হল। আহা—কত দূর দেশ থেকে শুদ্ধু এই টাকার লোভে মেয়েটা এসেছে তার সঙ্গে—সত্যিই তো আশানুরূপ সে কি পেল ? আমেরিকা থাকতে সে দু'হাতে উপার্জ্জন করেছে। বাড়ি করেছিল, গাড়ি করেছিল—মন টিকলো কৈ তবু ? শেষের বছরটায় তার দেশে ফিরবার জন্য পাগল হতে বাকী ছিল। কোথা থেকে জুট্লো এই মেয়েটা ? শেষের দিকে অরবিন্দর আর স্পৃহা ছিল না মদে মেয়েমানুষে—কিন্তু এই মেয়েটা আবার ভজালো তাকে। কেন সে মজ্লো ? অরবিন্দ কাঁটা চামচে নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করতে লাগলো প্লেটের মধ্যে। আজ ফিরে আসুক এ্যানি—এ্যানি যা চায় সব দিয়ে সে তা'কে ঠাণ্ডা করে বিদায় দেবে—সমস্তই তো প্রায় গেছে—যা আছে তাও যাক্—সব যাক্ তারপর আবার সেই বারো বছর আগেকার অরবিন্দ। বারো বছর আগেকার অরবিন্দ, বারো-

বছর আগেকার অরবিন্দ—কথাটা বারে বারে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে ভারি ভাল লাগলো তার।

বেলা চারটে পর্য্যন্ত ঘন ঘন ঘড়ি দেখে দেখে অরবিন্দ ক্লান্ত হল তবু এ্যানি ফিরে এলো না। মনটা একটু কেমন বিষণ্ণ লাগলো যেন। চারটের 'পর সে বেরুলো। কেন বেরুলো কোথায় যাবে কিছু তার মনে হল না। ধরমতলা দিয়ে এস্‌প্লেনেডে এসে সে কালিঘাটের ট্রামে চড়ে এগিয়ে এলো গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে। ফুর ফুরে হাওয়া—অরবিন্দের সমস্ত শরীর মনে এক আশ্চর্য্য মুক্তির আনন্দ। জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে সে নেমে পড়লে লাফ দিয়ে, তারপর রাস্তা পার হয়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো হরিশ মুখার্জ্জি রোডের উপর। ভেতরে ভেতরে এই রাস্তাটিই যে তাকে সমস্তটা দিন ধরে এক দুর্নিবার আকর্ষণে টেনেছে এটা সে এতক্ষণ পরে বুঝতে পেরে যেন হঠাৎ থম্‌কে গেল। নিঃশ্বাসটা কেমন ভারি ভারি বোধ হল—স্তব্ধ হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ—তারপর আবার ধীর পায়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে ফিরে এলো বড় রাস্তায়। লাল রংয়ের একটি দোতলা বাড়ীর ছবি তার মনে হল চকিতে—মনে হল আট বছর আগেকার আঠার বছরের একটি মেয়ে। আর তারপর সেই কালকের দেখা মাধুরী—ঐযে ট্রাম যায়—অরবিন্দ টপ্‌ ক'রে উঠে পড়লো লাফ দিয়ে কিন্তু বসতে গিয়েই যাকে দেখলো তাকে দেখে সে আর বসতে পারলো না—অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো ভেতরটা—ট্রামের দরজার হাতলটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল মূঢ়ের মত।

মাধুরী কি দেখেনি অরবিন্দকে? দেখেছে। কালও দেখেছে আজও দেখছে। তাছাড়া চিনতেও তার একটি নিমেষ ক্ষয় করতে হয়নি। কালকে দেখে তার সমস্ত রক্ত বোধহয় মাথায় উঠে এসেছিল আর আজকে দেখেও তার কাণ জ্বালা করতে লাগলো। মনে হল এই মুহূর্ত্তে নেমে যায় ট্রাম থেকে। ভেতরে ভেতরে তার কেমন একটা যন্ত্রণা হতে লাগলো কিন্তু অসহায় ভাবে বসে রইল সে চুপ ক'রে। তার নিজের উপর রাগ হলো। কেন, কেন এই লোকটা সম্বন্ধে সচেতনতা? এ লোকটা তার কে? সে মাধুরী মিত্র, তার হাতে শাঁখা নেই, তার কপালে সিঁদুর নেই—কখনো তার বিয়ে হয়নি—তবু এই লোকটার অস্তিত্বে তার এই যন্ত্রণা কেন? উৎকণ্ঠিত ভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগলো

এলগিন রোডের মোড়টুকুর জন্য। কী কুক্ষণে আজ সে বেড়িয়েছিল—এলগিন রোডে এসে পৌঁছুতে দেরী হল না। মাধুরী নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। রাস্তা ছেড়ে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে সরে দাঁড়ালো অরবিন্দ আর অরবিন্দর ঠিক বুকের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলো মাধুরী। অরবিন্দ আস্তে এসে মাধুরীর পরিত্যক্ত আসনে ব'সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে—আর থেকে থেকে শিরশির করতে লাগলো বুকের ভেতরটা।

বাড়ী ফিরে শুনলো মেমসাহেব ফিরেছেন—অরবিন্দ তক্ষুনি এ্যানির ঘরে টোকা দিয়ে ঢুকলো। দেখ্‌লো ঘর অন্ধকার—পূবের দিক্‌কার খোলা জানালার আব্‌ছা আলোকে দেখা গেলো এ্যানি একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে কপালে হাত রেখে। অরবিন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এসে বললো, 'এ্যানি সমস্ত দিন তুমি কোথায় ছিলে ?'

এ্যানি জবাব দিল না।

'তুমি রাগ ক'রেছ ?'—অরবিন্দর স্বভাবমধুর স্বর বেরুলো এবার—'রাগ করো না—তুমি যা চাও তাই হবে।' এ্যানি এবার নড়ে চড়ে ব'সলো—'তুমি সকালে আমাকে ঠকালে কেন ?' কথার স্বর ভাঙা ভাঙা—অরবিন্দর মনে হল এ্যানি কেঁদেছে—আস্তে এ্যানির একখানা হাত চুম্বন করে সে বল্‌ল, 'আমি সত্যিই ঠকাইনি—ভোরে আজ আমি একটি খদ্দেরও গ্রহণ করিনি -সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কেন ?' এ্যানির স্বর রূঢ় শোনালো—

'কেন আর কি—এমনি! আমি ভেবেছি এসব লোক ঠকিয়ে উপার্জ্জন আর করবো না।'

'ও—এতদিনে বুঝি বিবেক গজালো ? আমার ব্যবস্থা ?'

'তুমি যে রকম চাও।'

'আমি যা চাই তা তুমি মেটাতে পারবে ?'

'চেষ্টা করবো।'

এ্যানি চুপ ক'রে রইল।

অরবিন্দ সস্নেহে বল্‌ল—'আমি তোমাকে সত্যিই ঠকিয়েছি—তুমি তো রাগ করতেই পার, তবে আমি ভেবেছি—আমার কাছে যা কিছু আছে সমস্ত কুড়িয়ে

কাচিয়ে হাজার পনেরো হয়তো হবে—দু'এক হাজার আমি রেখে সমস্তই তোমাকে দিয়ে দেব—তাছাড়া এই বাড়ীর আসবাব পত্র বেচেও কিছু পাবে নিশ্চয়—সব নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও, ইচ্ছে মত বিয়ে করে আবার সুখী হও।'

'ওঃ এত দয়া তোমার !'

এ্যানি যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখে কথা কয়ে উঠ্‌লো।

পরের দিন থেকে এ্যানির স্বভাব দেখে ভৃত্যমহল অবাক হ'য়ে গেল। বিলিতি মেয়ের যতখানি ভদ্রতা জানা থাকে সমস্তই এ্যানি অকৃপণ ভাবে অরবিন্দর উপর প্রয়োগ করলো। এক রাত্রির মধ্যে যেন একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। তারপর পনেরো দিন সমানে ঘুরে ঘুরে অরবিন্দ এক বীমার অফিসে দেড়শো টাকা মাইনের এক কাজ পেলো এবং আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ির আসবাবপত্র বেচে শ' পাঁচেক টাকা এবং চৌদ্দ হাজার টাকা নগদ দিয়ে এ্যানিকে জাহাজে তুলে দিয়ে এসে জীবনের মত নিশ্চিন্ত হল। এবার মনে হল তার বৌদির কথা। দাদার মৃত্যুর খবর সে বিলেত থেকেই জানতে পেরেছিল, তারপরে অভাগিনী বৌদি যে কোথায় কার আশ্রয়ে কি ভাবে আছেন তা সে কিছুই জানতে পারেনি। শ্যামবাজারে বৌদির এক উকিল দাদা ছিলেন একথা সে জানতো কিন্তু এতদিন তাঁরা সেই একই বাড়ীতে আছেন কিনা এ বিষয়ে অরবিন্দর সন্দেহ হলো। তবু ও একদিন সন্ধেবেলা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে সেই বাড়িতে গিয়েই উপস্থিত হল। আশ্চর্য্য, এখনো দাদার সেই সাইনবোর্ডটি ঝোলানো আছে সামনের দরজায়। অরবিন্দ সসঙ্কোচে ভেতরে গিয়ে বেল টিপতেই একটি চাকর বেরিয়ে এলো।

'নগেন বাবু বাড়ী আছেন।'

'না, কর্ত্তা বাইরে গেছেন।'

অরবিন্দ বল্‌ল, 'নগেন বাবুর এক বিধবা বোন এখানে থাকেন জান ?'

চাকরটি ঈষৎ চিন্তা ক'রে বল্‌ল, 'কে, বড় পিসিমা ?' আন্দাজেই অরবিন্দ বল্‌ল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড় পিসিমাই---যাঁর ছেলেপুলে নেই।'

'তিনি আছেন।'

অরবিন্দ হাতে স্বর্গ পেলো, 'এক্ষুনি তাকে ডাক, বল যে তার সঙ্গে একজন

দেখা করতে এসেছেন। আমার তাঁকেই দরকার।' এমন অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে অরবিন্দ কথাটা বল্‌ল যে চাকরটি পর্য্যন্ত একটু অবাক হল। যাই হোক ভেতরে গিয়ে সে খবর দিতেই অন্নপূর্ণাকে খানিক পরে দরজার সামনে দেখা গেল। অরবিন্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারলো না, তারপর এক সময় নতমুখে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বল্‌ল, 'বৌদি, আমাকে ক্ষমা কর।' অন্নপূর্ণার দু' চোখ ভরে জল এলো—নতুন ক'রে মনে পড়লো তাঁর সমস্ত কথা। নিঃশব্দে তিনি অরবিন্দর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন।

অরবিন্দ যে কি কথা বলবে ভেবে পেলো না। সাদা ধবধবে থান কাপড়ে আর অলঙ্কারহীন শূন্য হাত দু'খানায় তাঁকে যে কি অদ্ভুত লাগলো অরবিন্দর চোখে, অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারলো না।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ, ?'

'ভালই। তোমার শরীর ভাল আছে ? নগেনদা কোথায় ?' অরবিন্দ সহজ হবার চেষ্টা করলো।

'দাদার তো ঐ দাবার নেশা—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো। কবে এলে ?'

'এসেছি অনেকদিন, এতদিন তোমার কাছে আসবার মত অবস্থায় ছিলাম না। এখন আমি একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়ে একা আছি ধরমতলায়, তোমাকে নিয়ে যাব বলে এলাম।'

'আমাকে ?'—অন্নপূর্ণা কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলেন, একটু থেমে বল্লেন, 'যিনি তোমার কাছে থাকতে পেলে এখনো সংসারে বেঁচে থাকতেন তিনিই গেছেন।'

'বৌদি তুমি আমার মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' অরবিন্দর গলা ধরে এলো। সহসা দরজার অন্তরালে একটা হাসিখুসি চেহারার আভাস পাওয়া গেল এবং অনতিবিলম্বেই একটি মহিলা এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফর্সা ধবধবে কপালের উপর এতবড় সিঁদুরের ফোঁটা, আধা ময়লা একখানা লাল পাড়ের শাড়ি পরনে। লক্ষ্মীশ্রীতে ঝলমল করতে করতে সেখানে এগিয়ে এলেন। 'দিদি, অরবিন্দ এসেছে আমাকে বলনি যে ? আমি গল্প শুনতে পেয়েই বুঝতে পেরে ছুটে এলাম। তারপর অরবিন্দ, কবে এলে

তুমি ?' আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে অপরূপভাবে হাসতে লাগলেন তিনি। 'আরে বৌদি যে, কেমন আছ ?' অরবিন্দর স্বাভাবিক প্রফুল্লস্বর আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো এবার নগেনদার স্ত্রীকে দেখে—'বাঃ তুমি দেখ্‌ছি একটুও বুড়ো হওনি',—নত হয়ে সে পায়ের ধূলো নিতে এলো। হৈমন্তী খপ ক'রে ওর দু'হাত চেপে ধরলেন, 'কর কি কর কি—সাহেব মানুষ প্রণাম ট্রণাম করে না, এমনিতেই সুখে থাক। কবে এলে তুমি ? খবর কি তোমার ? বসো বসো—চা খাবে না ?' হৈমন্তী ঠিক সেই রকমই আছেন। অরবিন্দর ভেতরটা ফুটতে লাগলো আনন্দে।

'চা তো নিশ্চয়ই খাব কিন্তু তার আগে তুমি বসো তো একটু—বৌদি তুমিও বসছো না কেন ?'

'না তোমরাই বসো। আমি বরং চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।' অন্নপূর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন

'অরবিন্দ, তুমি আগের মত চায়ের সঙ্গে পেঁয়াজকুচো, শুকনো লঙ্কা আর আলু দিয়ে চিঁড়ে ভাজা খেতে ভুলে গেছ নিশ্চয়।'

'একটুও না—ভেজেই সেটা পরীক্ষা কর না আজ।'

'তবে যাই আমি ভাজি গিয়ে।' হৈমন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লেন।

'চল আমিও যাই।'

'তুমি যাবে রান্নাঘরে ? না বাপু, তুমি সাহেব মানুষ এখানেই বসে থাক।'

অরবিন্দ মৃদু হেসে হৈমন্তীর পেছনে পেছনে বাড়ীর ভেতরে এলো। এ বাড়ি তার নখদর্পণে।

বৌদির সঙ্গে কতবার সে এখানে এসেছে, কত জ্বালিয়েছে এদের হল্লা করে। ছেলেমানুষের মত কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে সে বাড়িটি দেখতে লাগলো ঘুরে ঘুরে।

খানিক পরেই নগেনদা এলেন। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। হাসিতে গল্প গুজবে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে অরবিন্দ নতুন জীবন নিয়ে ফিরে এলো বাড়ীতে।

যাবার সময় অরবিন্দ অনেক সংকোচ অনেক ভয় অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে কেউ তার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলো না

এবং যে নামটির আদ্যাক্ষর উচ্চারণ করলেও তার হৃদয়কম্প হতো সেই মাধুরী সম্বন্ধে পর্য্যন্ত কেউ সেখানে টুঁ শব্দ করলো না। তাদের এই কৌতূহলহীন সভ্য মনের পরিচয়ে অরবিন্দ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠ্‌লো। এটুকু সে বুঝলো যে এর মধ্যে বৌদির ইঙ্গিত রয়েছে। বৌদির চিরসংযমী অভ্যাসের কাছে বহুবারের মত আবার নতুন করে সে মাথা নোয়ালো।

অরবিন্দর যে চাকরী তাতে ছুটির বালাই নেই। সাড়ে ন টায় প্যাণ্টের উপর কোট চাপাতে চাপাতে ছোটে আর ফেরে আলো জ্বাললে। সেই নেপালি চাকর পহালমন আছে তার সঙ্গে। সেবায় যত্নে সে তাকে আগলে রাখে মায়ের মত। ফিরে এলে দেরীর জন্য অনুযোগ করে আর শরীরের দিকে নজর দিতে উপদেশ দেয়। রবিবার ভোরে উঠেই অরবিন্দ বল্‌ল, 'এই পহালমন আজ আমার বৌদি আসবে, তুই ঘর টর গুলো কিন্তু সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখবি।' পহালমনের ফোলা ফোলা নেপালি চোখ ছোট হয়ে এলো বিস্ময়ে, 'কিস্‌কা বহু? আপকো? আপকো সুহাসিনী?'

অরবিন্দ হেসে ফেল্‌ল, 'আরে বহু নয়, বৌদি—বড় ভাইকা সুহাসিনী—বেটা জংলি, এতদিন বাংলা মুলুকে আছিস্ বাংলা জানিস্ না।'

'হামি?'—পহালমনের দাঁত বেড়িয়ে গেল এবার—'হামি তো বাংলাই বোলে সরবদা। মাইজি কব্ আয়গা বাবু?'

'আজই! এক্ষুনি আমি তাঁকে আন্‌তে যাচ্ছি—কাপড় চোপর ঠিক করে দে।'

'লূলোঃ'—পহালমন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আটটা বাজতেই অরবিন্দ গিয়ে হাজির হল নগেনদার বাড়ি। নগেনদা তখন দ্বিতীয় প্রস্থ চায়ে মশগুল। 'আরে এসো এসো—কোথায় গেলে—ডাক না তোমার বৌদিকে'—নগেনদা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

'আপনি বসুন না, আমি নিয়ে আসছি ডেকে।' কিন্তু ডাক্‌তে হল না, তিনি গলা পেয়ে নিজে থেকেই এলেন—'বাব্‌বা চমৎকার মানুষ ভাই তুমি'—এসেই তিনি অরবিন্দকে অনুযোগ করলেন—'সেই গেছ বুধবার রাত্তিরে আর এলে রোববার সকালে, এর মধ্যে আর তোমার অবসর হলো না নাকি?'

অরবিন্দর বৌদিও এলেন, 'এতদিন আসনি কেন?'—মৃদুকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন।

'আমার অবসর কোথায়? কি গোলামী আমি করি তা তুমি নিজের চোখেই দেখবে'খন, এইতো রোব্‌বারটুকু যা ছুটি।' তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'নগেনদা আমি কিন্তু আজ বৌদিকে নিয়ে যেতে এসেছি।' নগেনবাবুর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। 'তুমি কি পাগল, অরবিন্দ?'

'কেন, এতে পাগলামীর কী রয়েছে?'

'তা তো তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।' নগেনবাবু চায়ের পেয়ালায় মুখ ডোবালেন। আর অরবিন্দর কান গরম হ'য়ে উঠলো—ইঙ্গিত বুঝে। সহসা জবাব দিতে পারলো না। সেদিন রাত্রের ব্যবহারে তার মনে একটা সূক্ষ্ম আশা বাসা বেঁধেছিল, সে যে মেম নিয়ে এসেছে এটা বোধহয় এঁরা কেউ জানেন না। ওঁরা যে সেদিন চেপে ছিলেন সে কথা ভেবে সে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠলো। 'আমি অনেক অন্যায় করেছি—কিন্তু তাই বলে বৌদির কাছেও কি ক্ষমা নেই নগেনদা?'—কথাটা সে সহজ ভাবেই বলতে চেয়েছিল কিন্তু কি রকম করুণ শোনালো।

অন্নপূর্ণা চুপ ক'রে বসেছিলেন, অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে জল এলো। 'ক্ষমা আবার কি ভাই, তুমি যে সত্যিই ফিরে এসেছ নিজের ঘরে, তা আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। কিন্তু তুমি তো জান বিধবা মানুষের—'

'বিধবার সমস্ত নিয়ম তুমি পালন করতে পারবে বৌদি—সেখানে আমি একা,'—অরবিন্দ অন্নপূর্ণার মুখ থেকে যেন কথাটা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগলো, 'বিশ্বাস করো সেখানে আমি একা।' পরিপূর্ণ শান্তির সঙ্গে সে একথা উচ্চারণ করলো যে সে একা।

'তবে যে শুনলাম'—নগেনদা অর্দ্ধেক বলেই হৈমন্তী ও অন্নপূর্ণার দিকে তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দিলেন।

'ঠিকই শুনেছিলেন, কিন্তু সে সব বালাই আর নেই এখন।' নগেনদা কথাটা বিশ্বাস করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অরবিন্দর আগ্রহকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

অন্নপূর্ণা স্বামীর মৃত্যুর পরেই ভাইয়ের বাড়ী চলে এসেছিলেন—টাকা পয়সা অনন্তবাবু কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—একা অরবিন্দই তাঁকে সর্ব্ব-

স্বান্ত করেছিল—তবু মৃত্যুর পরে বিশ হাজার টাকার একটি লাইফ ইনসিওরেন্স পাওয়া গেল। নগেনবাবু সমস্ত টাকা অন্নপূর্ণার নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। অরবিন্দর কাছে আসবার দিন পাঁচেক পরে অরবিন্দ যখন শুতে যাবে অন্নপূর্ণা তাকে ডেকে বল্লেন, 'অরবিন্দ—টাকা ক'টা বরং তোমার নামেই বদলে রাখ।'

'ক্ষেপেছ ?'—অরবিন্দ সাত হাত পিছিয়ে গেল—'এততেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি নাকি ? ওসব ঝামেলা আমি আর নেবো না কিছুতে।'

অন্নপূর্ণা তাকে নিজের বিছানার প্রান্ত দেখিয়ে বল্‌লেন, 'ব'সো একটু, কথা আছে তোমার সঙ্গে।' অরবিন্দ পা ঝুলিয়ে ব'সতেই তিনি বল্‌লেন, 'তোমাকে যখন ভয় ছিল তখন সে ভয় কাটাবার জন্যেই একটা গুরুতর অন্যায় করেছিলাম, এখন আর ভয় নেই, টাকাটা তোমার কাছেই রাখ, আর আমার একটা শেষ অনুরোধ যে মাধুরীর একটু খোঁজ নাও। মেয়েটার সর্ব্বনাশের জন্যে আমরাই দায়ী—তোমার দাদার আত্মা শান্তি পাবে না নয়তো।' অন্নপূর্ণার গলা ধ'রে এলো—কেশে নিয়ে বল্‌লেন, 'যদি তুমি অনুমতি দাও আমি নিজে যাই তাকে আনতে।'

'সে কি আসবে ?' অরবিন্দর জবাবটা বিষণ্ণ শোনালো। 'আসবে না ? বল কি—হিঁদুর মেয়ে স্বামী ডাকলে কি না এসে পারে ? আর তা ছাড়া ওরা আছেও ভারি কষ্টে। হরিশ মুখার্জ্জী রোডের অত বড় বাড়ীটা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বিক্রী হ'য়ে গেছে। এতটুকু একটু নিচতলার অংশ নিয়ে ওরা আছে। দাদার কাছে শুনলাম ভদ্রলোক ব্যবসায়ে যেমনি উঠেছিলেন—পড়েও গেছেন তেমনি ধাঁ ক'রে। মাধুরী বোধহয় চাকরী করে।'

'কিন্তু আমার মনে হয়'—অরবিন্দ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মাথা নেড়ে বললো, 'ওখানে গেলে তুমি অপমানিত হয়ে আসবে।'

'পাগল !' অন্নপূর্ণা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। আর সত্যি সত্যি নগেনবাবুকে খবর দিয়ে আনিয়ে একদিন তিনি মাধুরীদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। মনে মনে তাঁরও যে দ্বিধা ছিল না তা নয়—কেন না মাধুরী যে তাদের সম্পর্ক একেবারেই অস্বীকার করেছে একথা তিনি লোক-পরম্পরায় শুনেছিলেন কিন্তু মনের সে দ্বিধাকে তিনি আমল দিলেন না। হাজার হোক,

স্বামীর ডাক তো। অরবিন্দ অফিসে গিয়েছিলো, সে কিছুই জানতো না। বাড়ী ফিরে সে বৌদির ঘরে গিয়ে দেখলো যে তিনি অতিশয় বিষণ্ণ মুখে গালে হাত রেখে ব'সে আছেন বিছানায়।

'একি বৌদি, তুমি বিছানায় ব'সে আছ যে সন্ধ্যেবেলা?' অন্নপূর্ণা চোখ তুলে তাকালেন জবাব দিলেন না।

'কি হয়েছে তোমার?'

'সেখানে গিয়েছিলাম।'

'সেখানে?'—বলেই অরবিন্দ কথাটা বুঝতে পেরে চুপ ক'রে গেল।

'তোমার কথাই ঠিক অরবিন্দ—মাধুরী আমাদের অস্বীকার ক'রেছে।'

'তাই তো উচিত'—অরবিন্দ গলার স্বরে ফাজলেমির ভাব আনবার চেষ্টা ক'রলো।

'কেন—উচিত বল্‌লে কেন?'

'বাঃ, উচিত বলবো না—ওর সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্কটা হল কবে?'

'কেন তুমি কি তাকে নারায়ণ সাক্ষী করে বিয়ে করনি?'

'বিয়ে করলেই কি পতিদেবতা হয়ে বসা যায় নাকি বৌদি? তোমাদের যুগ আর নেই।'

'আমাদের যুগ না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তো সধবা মেয়ে আর কুমারী হয়ে যেতে পারে না।'

'হিন্দু বিবাহে যে ডিভোর্স নেই—এটা একটা মস্ত খুঁত তা নৈলে সে বেচারা এতদিনে দিব্যি বিয়ে করে সুখী হতে পারতো।'

'কে জানে বিয়েই হয়তো করবার জন্য কুমারী সেজেছে—তোমাকে বলবো কি অরু—সিঁথিতে পর্য্যন্ত এক ছিটে সিঁদুর রাখেনি মেয়েটা। আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো, তারপর মাকে ডেকে দিয়ে বেরিয়ে গেল।' অরবিন্দ এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—'ও যদি বিয়ে করে বৌদি আমি কিন্তু একটুও বাধা দেব না।'—বলে সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আফিস থেকে ফিরেই হাতমুখ ধুয়ে আবার পরিপাটি ক'রে পোষাক পরতে ব'সলো অরবিন্দ।

'একি, এক্ষুনি আবার যাচ্ছ কোথায়?'

ধুতির কোঁচাটা বার দুই মুড়ে অরবিন্দ মুখ তুলে বল্‌লো, 'মনেই ছিল না—একটা নেমন্তন্ন রয়েছে যে আজ পাঁচটার সময়—বাজলো তো প্রায় ছ'টা।'

'চায়ের ?'

'হুঁ।'

'কোথায় ?'

'এই কাছেই।'

অরবিন্দ দ্রুত হস্তে চুলে দু'বার ব্রাস বুলিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়েই সে সর্ব্বপ্রথম দু'খিলি পান কিনে গালে পুরলো—এটা তার অভ্যেস। বিকেলের দিকে সে প্রায়ই বেরোয় না, আফিস থেকে ফিরতেই তো রাত হয়ে যায়, কতকাল যে বিকেল দেখে না তার ঠিক নেই। ভারি ভালো লাগলো তার। বিলিতি গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে সে হেঁটে এগুতে লাগলো। কিন্তু এখন তো তার দেরী করবার সময় নেই, যেতে হবে সেই বালিগঞ্জে। আচ্ছা বাসে গেলে হয় না ? অরবিন্দর মন সায় দিল না। ছোঃ, বাসে চড়ে নষ্ট করবে নাকি এই অমূল্য বিকেলটি—ট্রামে সুন্দর গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে—ভাবতেই কি আরাম। অরবিন্দ ট্রামে উঠে ব'সে সিগারেট ধরালো।

সুপ্রকাশের সঙ্গে অরবিন্দর লণ্ডনেই প্রথম আলাপ। ছিপ্‌ছিপে সুন্দর এক ছোকরা—দেখলেই ভাল লাগে। বাপ বিহারের মস্ত উকিল—বিস্তর টাকা—নানাদিক থেকেই অরবিন্দর ওর সঙ্গে ভাব জমাবার একটা তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল আর বন্ধুতা গভীর হ'তেও সময় লাগলো না বেশী। কিন্তু এই বছর পাঁচেক যাবত তাদের আর দেখা শোনা হয়নি। হঠাৎ কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে পরশু দিন দেখা হ'য়ে গেল। অরবিন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ওকে দেখে।

'একি, তুমি ?'

'আরে অরবিন্দ যে'—পিঠে চাপড় খেয়ে পিছন ফিরে সুপ্রকাশ অবাক হয়ে গেল—'কবে ফিরলে তুমি ?'

'এই তো বছর আড়াই, কি আশ্চর্য্য—তুমি কলকাতায় আছ অথচ এই প্রথম দেখা হ'ল। কি করছ তুমি, কোথায় আছ ?

'আছি বালিগঞ্জে, আর কলেজের রাখালি করি।'—সুপ্রকাশ মিষ্টি ক'রে হাসলো—'আর তুমি ?'

'আমার আবার খবর'—অরবিন্দও হাসলো।

সুপ্রকাশ আন্তরিক ভাবে ব'ললো, 'আমার বাড়ীতে চল না।'

'আজ ? এখন ?'—ঈষৎ চিন্তা ক'রে অরবিন্দ বল্‌ল, 'না আজ যাব না—বরং অন্য একদিন—তোমার ঠিকানা কি ?'

সুপ্রকাশ শুধু ঠিকানাই দিল না, বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের নখ দিয়ে ছবি এঁকে এঁকে বোঝাতে লাগলো বাড়ীটা ঠিক কোথায়।

'বিয়ে করেছ ?' অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো।

মধুর হাসিতে সুপ্রকাশের মুখ ভরে গেল—'ভেবেছিলাম ও হাঙ্গামায় আর কাজ নেই কিন্তু সম্প্রতি মনে হচ্ছে বিয়ে ব্যাপারটা তত খারাপ নয়, যত খারাপ বলে অন্ততঃ আমার ধারণা ছিল।'

'কেন বলত ?'—অরবিন্দ প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌ল, 'নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছ।'

'উঃ লাগে'—

'তবে বল শীগ্‌গির—তিনি কোন ভাগ্যবতী যিনি শিবের তপস্যায় বাধা দিলেন।'

'তিনি ভাগ্যবতী কি না জানি না—তবে আমি যে ভাগ্যবান হবো তাঁকে পেলে একথা নিঃসংশয়েই মনে করতে পার।'

'তাই নাকি ? তবে তোমার এঞ্জেলটিকে একদিন দেখাও না।'

'বেশ তো—পর্শু আমার বোনের জন্মদিন—উনিও আসবেন, তুমিও যেয়ো।—আর শোনো—এসব নিয়ে কিন্তু কোন ইঙ্গিত ক'র না।'

'কেন ?'—

'পাগল ! এটা একান্তই আমার নিজের মনের কথা।'

'ভাল ! ভাল !'—অরবিন্দ বেপরোয়া ভাবে খানিকক্ষণ ওর পিঠ চাপড়িয়ে বিদায় নিল।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় অরবিন্দ গিয়ে সুপ্রকাশের ওখানে পৌঁছল। সুন্দর একতলা বাড়ি—সামনে সবুজ কম্পাউণ্ড, গেট থেকে লাল সুরকির প্রশস্ত রাস্তা গোল হয়ে বেঁকে গিয়ে গাড়ি বারান্দায় ঠেকেছে। বাড়িটি দেখা গেল ঝক্ ঝক্ করছে আলোতে, অরবিন্দ একটু ইতস্ততঃ করে আবার নম্বরটা

মিলিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ীর মধ্যে। একদল অতিথি বোধহয় ফিরে যাচ্ছিল—সুপ্রকাশ আর উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে দেখা গেল বিদায় সূচক নানারকম ভদ্রতা ক'রে তাদের বিদায় দিচ্ছে। গাড়ীটা হেড্ লাইট জ্বালিয়ে তার কানের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল বোঁ করে—সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রকাশের আন্তরিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই যেঅরবিন্দ! অবশেষে এলে তা হলে?' —সুপ্রকাশ দ্রুত এগিয়ে এলো—'এই যে আমার বোন সুমিত্রা—এর উপলক্ষ্যেই আজ—।' অরবিন্দ যুক্ত করে অভিবাদন জানালো। সুমিত্রা হেসে বল্‌ল, 'আসুন'। সুমিত্রা একটু এগিয়ে যেতেই সুপ্রকাশ অনুচ্চারিত স্বরে বল্‌ল, 'তুমি একটা সিলি ফুল—'

'কেন?'

'এত দেরীতে এলে যে কারো সঙ্গেই তোমার দেখা হল না। আমার এঞ্জেলটিও তো পালাবার উপক্রম করেছিলেন, নানা অছিলায় ধরে রেখেছি।'

'তা হলেই যথেষ্ট।'

অরবিন্দকে নিয়ে সুপ্রকাশ ড্রইংরুমে ঢুকলো। ঘর প্রায় শূন্য। এখানে ওখানে দু'চার জন স্ত্রীপুরুষের স্বল্পতম ভিড়—কিন্তু জানালার দিকের সেটিতে যে মেয়েটির পাশে গিয়ে সুমিত্রা দাঁড়ালো এবং তা'কে ব'সবার অনুরোধ জানালো তাকে দেখে অরবিন্দর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ক'রে উঠলো। সুমিত্রা মাধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল বটে কিন্তু অরবিন্দর গলা দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না আর মাধুরী বিবর্ণ মুখে সেটির কোণে ব'সে ঘাম্‌তে লাগলো দৈবের নিষ্ঠুরতা স্মরণ ক'রে।

সুমিত্রা উঠে গিয়ে চা নিয়ে ফিরে এলো। অরবিন্দ দু'চারবার কেশে চেষ্টা করলো আলাপ জমাতে—কিন্তু বারে বারেই ব্যর্থ হয়ে চুপ ক'রে গেল। সুপ্রকাশ এলো ভেতর থেকে, 'আরে অরবিন্দ তুমি যে একেবারে ভদ্রলোক হয়ে আছ। কথা টথা বল।'

অরবিন্দ যেন খেই পেল সুপ্রকাশকে দেখে, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'এইতো এদিকে'—মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'এঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন, দেখবেন অদ্ভুত আমুদে মানুষ আমার বন্ধুটি।'

মাধুরী অতি কষ্টে একটু হাসলো এবং একটু পরেই বল্‌ল, 'আমার এবার যাওয়া দরকার, সুপ্রকাশ বাবু।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমি নিজে গিয়েই তো আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো কথা দিয়েছি। একটু অপেক্ষা করুন দয়া ক'রে। দাসেদের পৌঁছিয়ে দিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবে আমার গাড়ি।'

'গাড়ির দরকার কি, আমি স্বচ্ছন্দে ট্রামে চলে যেতে পারবো।'

'না না সে কি হয়। একটু বস্তুন দয়া ক'রে।'

'এত ব্যস্ত হয়েছিস্ কেন, বস্ না আর একটু'—বলে সুমিত্রা ব'সে পড়লো তার পাশে। অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'মিঃ দত্ত ইনি আমার সহপাঠিনী ছিলেন এখন সহকর্ম্মিণী।'

অরবিন্দ বোকার মত হাসলো।

'কিছুই খাচ্ছেন না আপনি'—সুমিত্রা আবার অনুযোগ করলো।

'না, না, খাচ্ছি বইকি—খাওয়া বিষয়ে আমি একান্ত নির্লজ্জ।' বল্‌তে বল্‌তে সে হঠাৎ তাকালো মাধুরীর দিকে।

মাধুরী নিমেষে চোখ নামিয়ে ফেল্‌ল তার মুখ থেকে এবং পরমুহূর্ত্তেই সোজা দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'না ভাই, আমার আর দেরী করা চলে না—আমি ট্রামেই যাই।'

'আর একটু, আর একটু'—সুপ্রকাশ অনুনয় করে বললো।

সুমিত্রা মৃদু হেসে বল্‌ল, 'তুমি আজকে আমাদের মাননীয় অতিথি, তোমাকে পৌঁছিয়ে দেবার সম্মানটুকু অন্ততঃ আমাদের দাও।'

মাধুরী নিরুপায় ভাবে চুপ করে ব'সে পড়লো। আর অরবিন্দ তক্ষুনি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বল্‌ল, 'সুপ্রকাশ, আমিও কিন্তু ভাই আর বসবো না আজ—মিস্ কর, অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার জীবনের এই শুভ-দিনটিতে আস্‌তে পাবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেও আমি খানিকক্ষণ আপনাদের সুমধুর সাহচর্য্য লাভ করতে পারলুম না'—বল্‌তে বল্‌তে অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালো—'অত্যন্ত অভদ্রতা, অত্যন্ত অসভ্যতা হচ্ছে বুঝেও আমি নিরুপায় হয়েই আপনাদের কাছে বিদায় নিতে বাধ্য হলাম'—হাতের ঘড়ির দিকে ব্যস্ত ভাবে চোখ বুলিয়ে—'নিশ্চয়ই আমাকে মার্জ্জনা করবেন।'

'ওকি এই তো এলে,' সুপ্রকাশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ণ বাজলো গাড়ি বারান্দায়। উৎকর্ণ হয়ে সুপ্রকাশ এগিয়ে এলো একবার দরজার সামনে—তারপরেই ফিরে এসে বল্‌ল, 'আচ্ছা, চল।'

'আমি—আমি কেন—'

'নাও নাও, আর ভদ্রতা করতে হবে না,' সুপ্রকাশ তাকে ঠেলে এনে গাড়িতে ঢুকিয়ে দিল—মাধুরীও এগিয়ে এলো নিঃশব্দে। 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম মিস্ মিত্র,' সুপ্রকাশ ভদ্রতা জানাতে জানাতে ড্রাইভারকে নামিয়ে নিজেই ড্রাইভ করতে বসলো সামনে। ভেতরে মাধুরী আর অরবিন্দ অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বে নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল।

গাড়ি রাসবিহারী এভিনিউ পার হয়ে যখন রসা-রোডে এসে পৌঁছুলো অরবিন্দ অত্যন্ত আস্তে, প্রায় কানে কানে বলার মত করে ডাকলো, 'মাধুরী'।

মাধুরী কাঠ হয়ে গেল অরবিন্দর ডাক শুনে। 'আমি বলছিলাম কি'—অরবিন্দ বিপন্নের মত বল্‌ল, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, কালকে যে বৌদি গিয়েছিলেন তোমাদের ওখানে সেকথা আমি জানতাম না।'

মাধুরী নিস্পন্দ।

অরবিন্দ—যাতে শোনা না যায় এভাবে সুপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে বল্‌ল, 'তোমাদের এন্‌গেজমেন্টের কথা শুন্‌লাম।'—

'এন্‌গেজমেন্ট!'—মাধুরীর গলা চিরে শব্দ বেরুলো।

'কী হলো?' সুপ্রকাশ চালাতে চালাতে মুখ ফেরালো। সে কথাটা শুনতে পায়নি, কিন্তু অদ্ভুত ভাঙা আওয়াজটা শুনেছিল।

'কিছু না, ধন্যবাদ,' মাধুরী হাসি টেনে বল্‌ল।

অরবিন্দ একটু অপেক্ষা করে আবার নীচু স্বরে বল্‌ল, 'হ্যাঁ, এন্‌গেজমেন্ট না হয়ে গেলেও তোমরা উভয়ে যে বিবাহে ইচ্ছুক একথা আমি শুনেছি। তুমি একটু দ্বিধা ক'র না মাধুরী। আইনত বলপ্রয়োগ করে তোমার উপর আমি দাবী জানাতে পারি, কিন্তু আমাকে ততটা বর্ব্বর যদি মনে না কর তা হ'লে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এতটুকু কেলেঙ্কারিও আমি করবো না এই নিয়ে। তোমার বিয়েতে আমি সত্যি সুখী হবো। বিশ্বাস কোরো। অরবিন্দ চুপ করলো। মাধুরী কিছুই বুঝতে পারলো না ওর কথার তাৎপর্য্য। বিবাহের

কথাটা ইনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? একবার বিবাহ করেই কি তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি? দু'বার তার ঠোঁট নড়লো অরবিন্দকে কোনো কথা বল্‌বার জন্য কিন্তু বলা হলো না।

মাধুরীর বাড়ির দরজায় গাড়ি এসে থামতেই সুপ্রকাশ নেমে দরজা খুলে দিয়ে হেসে বল্‌ল, 'নিন এইবার আপনার শাস্তি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।' মাধুরী একটু ভদ্রতা ক'রেই বিদায় জানালো। সুপ্রকাশ আবার গাড়ি ছোটালো অরবিন্দর বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে অরবিন্দর যে কী হল, ভাল করে খেতে পারলো না, ঘুমুতেও পারলো না রাত্রিতে। তিন দিন পরে আপিসে গিয়ে পুরু এক খামে মাধুরীর লেখা এইটুকু এক চিঠি পেলো।

'মাননীয়েষু—আপনি যা শুনেছেন তা যে একান্তই মিথ্যে কথা সেকথা জানাবার জন্য আমাকে আজ এই চিঠিখানা লিখতে হল।

মাধুরী মিত্র।'

অরবিন্দ একবার দু'বার তিনবার, বোধ হয় লক্ষবার ঐ কথা কয়টি, পড়লো তারপর চিঠিখানা অতিশয় সযত্নে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে কাজে মন লাগাবার চেষ্টা করলো। আফিসের মধ্যে দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত সময় যে তার কি করে কেটেছিল তা সে নিজেও জানে না—এক সময় প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেকে সে মাধুরীদের হরিশ মুখার্জ্জি রোডের দরজার কড়া নাড়তে দেখে অবাক হয়ে গেল। ঘন ঘন পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছলো, ঘাড় মুছলো এবং ব্যাকুলভাবে মাথার চুলের মধ্যে দিশাহারা হয়ে আঙ্গুল চালাতে লাগলো।

দরজা খুলে দিয়ে অরবিন্দকে দেখে মাধুরী একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মিনিট খানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বল্‌ল, 'কাকে চান?'

'তোমার মা বাড়ি নেই, মাধুরী?' অরবিন্দ ক্ষীণ গলায় বল্‌ল।

'না।'

'ও,'—একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল, 'তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না?'

'না'—একটু থেমে—'কথা থাক্‌লে আমাকেও বলে যেতে পারেন।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে বল্‌বো?' হঠাৎ যেন সহজ সুর ফিরে এলো অরবিন্দর

গলায়। অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরে এসে বসলো সে। 'আমাকে যদি অস্বীকারই, করতে পার মাধুরী তবে আচরণটা একটু ভদ্রভাবে করাই তো উচিত।'

মাধুরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল দেয়াল ঘেঁসে।

'বসো না, বাঃ'—তারপর একান্ত স্বাভাবিক হয়ে, বল্‌ল, 'শোনো মাধুরী, সত্যি বল্‌তে তোমার মার সঙ্গে আমার কিন্তু একটুও দরকার নেই—আর আমি যে এখানে কেন এসেছি, কার কাছে এসেছি তাও বলা শক্ত। আপিস্‌ শেষ ক'রেই কালিঘাটের ট্রামের ভিড়ে বাদুড়ের মত ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে চলে এলাম। একগ্লাস জল খাওয়াবে?'

'চা খাবেন?'—মাধুরীর মৃতের মত রক্তহীন ঠোঁট ফাঁক হয়ে কথা বেরুলো।

'যদি দয়া কর তুমি—কিন্তু আগে একটু জল দাও—আমার গলা শুকিয়ে দেখ কাঠ হয়ে গেছে।' অরবিন্দ রুমাল দিয়ে মুখে হাওয়া করতে লাগলো। মাধুরী লজ্জিত ভাবে পাখাটা খুলে দিয়ে জল নিয়ে এলো। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জলটা খেয়ে অরবিন্দ গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, 'আর চা খাবো না, মাধুরী, আমি এক্ষুনি চলে যাব, তুমি বরং ততক্ষণ একটু এখানেই বসো।'

'একটা কথা বলি'—অরবিন্দ একটু দম নিয়ে বল্‌ল, 'আমি ধরমতলায় একটা ফ্ল্যাটে বৌদিকে নিয়ে আছি শুনেছ বোধ হয়, যদি তুমি আমাকে কখনো ক্ষমা কর, কখনো যদি দয়া কর আমাকে তবে তুমি অবশ্য যেয়ো সেখানে।' অরবিন্দ এবার উঠে দাঁড়াল টুপি হাতে করে—একটু থম্‌কে দাঁড়াল যেতে যেতে, তারপর একান্ত সহজভাবে মাধুরীর ঠাণ্ডা মসৃণ হাতের উপর নিজের কঠিন হাতখানা মুহূর্ত্তের জন্য ছুঁইয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। মাধুরী দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। এক সময় দু' চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো সেই হাতের উপরে।

প্রতিভা বসু
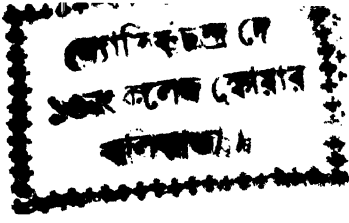
রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় পর্য্যায় *

যে-বাঙালীর বয়স এখনো পঞ্চাশের নিচে, তার মতিগতি প্রধানত রবীন্দ্র-প্রভাবিত; এবং যাঁরা তদূর্দ্ধে উঠেছেন, বিবেচক হলে, তাঁরাও মান্‌তে বাধ্য যে বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি একা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সেইজন্যেই আমাদের কাছে রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্রমবিকাশ আজ অবিশ্বাস্য ঠেকে; আমরা মনে রাখি না যে এমন এক দিন গেছে যখন তিনি বাংলা সাহিত্যের বিধাতা-পদবাচ্য ছিলেন না, বরং তাঁকে লোকের বিজাতীয় লাগতো। আসলে মহাকবিদের ভাগ্যে তৈরী শ্রোতা কমই জোটে; এবং রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে পাঠক-সাধারণের প্রতিবাদ জাগিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্য লেখকেরা অধুনালুপ্ত কৃকলাস জাতির সমগোত্রীয় নন্, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ পরিণতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মঘাতী স্বকীয়তার চিহ্নমাত্র নেই, তাঁর চেষ্টায় তথা দৃষ্টান্তে বঙ্গসাহিত্যের সামান্য পদবী বেড়েছে ব'লেই, তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুগপ্রবর্ত্তক। অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক কীর্ত্তিকলাপের সম্যক বিচারে তাঁর আপন রচনাবলীর নিঃসংশয় উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ব্যাপার; তাঁর অতুলনীয় অবদান এই যে তিনি কেবল নিজে অনবদ্য লেখা লেখেন নি, মেধা ও মনীষায় যারা নিতান্ত নগণ্য, তাদের শুদ্ধ নির্দ্দোষ লেখা লিখতে শিখিয়েছেন; এবং সেই ষাট-বৎসর-ব্যাপী শিক্ষায় বাঙালী এতই উপকৃত যে সাম্প্রতিক কবিযশঃপ্রার্থীদের অনেক কবিতা যেমন রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক কাব্যের চেয়ে ভালো, তেমনই মামুলী মানুষের রসপিপাসাও আর সাবেকী সাহিত্য মেটাতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্তেরা উক্ত সিদ্ধান্তে সায় দেন না; এবং তাঁদের মধ্যযুগীয় তর্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণ তো স্বয়ম্ভু বটেই, এমনকি তাঁরা রটান যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সত্তা জন্মবৃদ্ধ। কিন্তু এ-মতের শেষ রবীন্দ্রনাথের পদলাঘবে; কারণ প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর লেখকই সৎসাহিত্যের জনক; এবং অন্তত

* রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী)।

বাঙালীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যেকালে সত্যই অদ্বিতীয়, তখন তাঁর মূল সিদ্ধি নিশ্চয়ই নৈর্ব্যক্তিক। উপরন্তু তিনি স্থাণু নন, অথবা ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-এর মতো খানিক দূর এগিয়েই হাঁপিয়ে পড়েন নি ; এবং এ-কথার অর্থ এই যে তাঁর শৈশব রচনায় যেমন প্রৌঢ়শোভন নিপুণতা স্বভাবত অনুপস্থিত, তেমনই তাঁর পরবর্ত্তীদের কাঁচা লেখাতেও তাঁর পাকা হাতের স্বাক্ষর বর্ত্তমান। তথাচ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক ভুল-ভ্রান্তিই শেষ পর্য্যন্ত মর্য্যাদাবান; এবং তাঁর স্খলন-পতন-ত্রুটির প্রত্যেকটি পরীক্ষাপ্রসূত, প্রত্যেকটির পিছনে নিজস্ব উপলব্ধির অনিবার্য্য তাগিদ নিহিত আছে। সম্ভবত সেইজন্যেই বঙ্কিম "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-প্রণেতাকে সর্ব্বজনসমক্ষে বরণমালা পরিয়েছিলেন ; এবং ইদানীন্তন কাব্যের উন্নততর আঙ্গিক সত্ত্বেও, তাতে আন্তরিক প্রয়োজনে চিহ্নমাত্র নেই ব'লে, অদ্যাবধি কোনো আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুরূপ সম্মান পান নি। আসলে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রাগ্‌রৈবিক আদর্শের নাম-গন্ধ নেই, তার বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্য রবীন্দ্রনাথেরই সাধনালব্ধ ; এবং এই বাহ্য উপকরণসমূহের গুণ গাইলে, তাঁর মান আদৌ কমে না, শুধু মানা হয় যে তাঁর বাল্যকালীন রচনা তাঁরই প্রাপ্তবয়স্ক লেখার তুলনায় অপরিণত।

বিবেকী সমালোচকদের সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বল রচনা পরিমাণে অত্যল্প। এমনকি "প্রভাত-সঙ্গীত"-এও তাঁর স্বকীয় সুর শোনা গিয়েছিলো ; এবং "কড়ি ও কোমল"-এর ভূমিকায় কবি নিজেই লিখেছেন, "এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে"। অবশ্য এই উক্তিতে কবি নির্দ্দেশ করেছেন কেবল "কড়ি ও কোমল"-এর 'প্রাণ'-নামক প্রথম সনেটটির দিকে : এবং সমগ্র বইখানির প্রকাশকালে তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ছাব্বিশ বছর। কিন্তু পুস্তকটির যৌবনোচিত প্রাগল্‌ভ্য বাদ দিলে, সর্ব্বগ্রাহী জীবননিষ্ঠা ছাড়াও তাতে এমন অনেক প্রসঙ্গ ধরা পড়ে যা তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যের মূলসূত্র হিসাবে গণ্য ; এবং উদাহরণত তখনকার দেশাত্মক ও শিশুসংক্রান্ত কবিতাগুলি তো উল্লেখযোগ্য বটেই, উপরন্তু 'অস্তাচলের পরপারে', 'ক্ষুদ্র আমি', 'প্রার্থনা' ইত্যাদি সনেটের মনোভাবও তাঁর পরবর্ত্তী লেখায় নিতান্ত সুলভ। শুধু তাই নয়,

"কড়ি ও কোমল"-এর আঙ্গিকে সুদ্ধ ভবিষ্যতের সূচনা আছে; এবং তার চতুর্দ্দশপদী পয়ারে যদিও সাময়িক শৈথিল্যের অভাব নেই, তবু সেই গ্রন্থেরই 'বিরহ'-কবিতাটি বোধহয় বাংলা মাত্রাচ্ছন্দের আদি ও অকৃত্রিম নিদর্শন।

তৎসত্ত্বেও "কড়ি ও কোমল"-এ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় উহ্য নেই: তার তুলনামূলক উৎকর্ষ বিশেষ দেশ-কালের মুদ্রাঙ্কিত; এবং সে-বইয়ের অনেক কবিতাই আধুনিক বাঙালীর প্রশংসা পায় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত না থাকলে, তাকে অভিনন্দন করা আরো সহজ হতো। অর্থাৎ হেমচন্দ্রীয় ও নবীন সেনী মহাকাব্যের পাশে "কড়ি ও কোমল"-এর প্রতি পংক্তিকে লোভনীয় লাগলেও, শুধু সে-পুস্তক লিখে, মাইকেলকে ছাড়িয়ে যাওয়া দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতেই উঠতে পারতেন না; এবং মাইকেলের যে-কোনো কবিতার পরে "কড়ি ও কোমল" কেবল বিষয়ের বিচারে নিম্নপদস্থ নয়, ব্যঞ্জনার দিক থেকেও অনুন্নত। কারণ "কড়ি ও কোমল"-এর প্রণেতা যতই ছন্দোবৈচিত্র্য দেখান না কেন, সে-পুস্তকের মেরুদণ্ড পয়ার; এবং পয়ারকে, অন্ততপক্ষে চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ারকে, মাইকেল এমন এক পর্য্যায়ে তুলেছিলেন যার পরে তার উদ্‌গতি স্বভাবতই অসম্ভব। পক্ষান্তরে মহাকবি মাইকেলও মানুষ ছিলেন; এবং গোড়ায় গলদ মনুষ্যধর্ম্মের ভিত্তি। ফলত তিনি কোনো দিন বোঝেন নি যে বাংলা আক্ষরিক ছন্দ অযুগ্ম চরণে দাঁড়ায় না; এবং তাঁর সে-ভুল যদিচ হেমচন্দ্রও শুধরেছিলেন, তবু "প্রকৃতির পরিশোধ"-ই বোধহয় নির্দ্দোষ অথচ রসোত্তীর্ণ অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্ত।

বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরে শুধু নেতিবাচক শুদ্ধিই নেই, তার সদর্থক গুণ এই যে তার সঙ্গে কথ্য ভাষার আত্মীয়তা সুস্পষ্ট; এবং বাংলা নাটকের অন্যতম প্রবর্ত্তক হলেও, মাইকেল যেহেতু বাংলা লিখতে শিখেছিলেন সংস্কৃত অভিধানের অধ্যাপনায়, তাই তাঁর ছন্দে অর্থ সাধারণত আবেগের অগ্রগণ্য। না, এ-অভিযোগ হয়তো ন্যায্য নয়, কারণ আবেগই কাব্যের প্রাণ; এবং আমরা যদি এক বার মানি যে মাইকেলী কবিতায় আবেগ নেই, তবে তাতে কবিত্ব আছে—এ-কথাও আমাদের অস্বীকার্য্য। বস্তুত আবেগমাত্রেই হৃদ্‌গত বা ঐকান্তিক নয়, তার বুদ্ধিগত ও নৈর্ব্যক্তিক উদাহরণও বিশ্বসাহিত্যে যথেষ্ট সুলভ; এবং হৃদ্‌গত আবেগ মন্ময় ব'লে, তা যেমন

সর্ব্বজনবিদিত ভাবানুষঙ্গের সাহায্যেই প্রকাশ্য, তেমনই বুদ্ধিগত আবেগের তন্ময় অভিব্যক্তি স্বভাবত বর্ণনাত্মক ও অভিধাশ্রিত। মাইকেলের যতিবিরল অমিত্রাক্ষরেও তাঁর বেদনাবিমুখ তথা ভাবনাপ্রধান মতিগতি সুপ্রকট; এবং সেইজন্যে তাতে অপূর্ব্ব ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিচয় থাকলেও, তার অতিশ্রুতি শব্দতরঙ্গে পাঠকের মন বড় একটা ভেসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্তি ঠিক এর উল্‌টো; এবং তাঁর যতিভূয়িষ্ঠ ছন্দে পর্য্যন্ত ছেদের বালাই নেই, অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির নিরন্তর প্রবাহে তা সর্ব্বত্র বেগবান।

সত্য বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের মতো স্বভাবস্বচ্ছন্দ লেখকের পক্ষে অমিত্রাক্ষরের মুক্তি অনাবশ্যক; এবং তৎসত্ত্বেও যমকী পয়ার তাঁর উপযুক্ত বাহন নয় বটে, কিন্তু কৈশোরিক উচ্ছ্বাস কাটতে না কাটতে তিনি বুঝেছিলেন যে ছন্দোবন্ধে বাঙালীর পুরাকালীন স্বেচ্ছাচার প্রশ্রয় পেলে, তাঁর আত্মপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে। সেইজন্যে প্রথম দিকের রীতিমতো নাটক-কখানিতে ছাড়া অমিত্রাক্ষর তিনি ব্যবহার করেন নি; এবং যেখানে অবিচ্ছিন্ন ভাবাবেগের তাগিদে অথবা কথকতার গরজে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধু পদান্ত বিরাম তুলে দিয়ে তিনি সনাতনী পয়ারকেই কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি "বলাকা"-র পূর্ব্বে তাঁর পয়ারে পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যও বড় একটা দেখা যায় না; এবং "বলাকা"-তে দ্বাদশাক্ষর চরণের অনভ্যস্ত অভ্যাঘাত থাকলেও, তার তানবৈষম্য বোধহয় পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের পরিমাণসাপেক্ষ নয়, আনুপ্রাসিক অবকাশের হ্রাস-বৃদ্ধি-সঞ্জাত। আমার বিশ্বাস বাংলা ছন্দের প্রকৃতি এমনই অনমনীয় যে আর কোনো উপায়ে তার মধ্যে বৈচিত্র্যসঞ্চার নিতান্ত দুঃসাধ্য; এবং যত দিন অবধি গদ্য-পদ্যের মূলগত ঐক্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়ে নি, তত দিন তিনি ছন্দের বন্ধন ক্রমাগত বাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবু তাঁর পদ্যরচনা কোথাও একঘেয়ে নয়; এবং সর্ব্বত্র পর্ব্বমাত্রা সমান রেখেও তিনি কেবল অনেকান্ত চিত্রকল্পের জোরে পয়ারের মতো একটানা ছন্দে পর্য্যন্ত অভাবনীয় রকমের তারতম্য এনেছেন।

এ-সম্পর্কে এই কথাও স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ লিরিক্ কবি এবং খেয়ালী লেখকদের অন্যতম। সুতরাং তাঁর পক্ষে ঘন ঘন মতিপরিবর্ত্তন স্বাভাবিক: কৃত্রিম উপায়ে যতিপাতের তাল বদলে, ভাবান্তরপ্রকাশের প্রয়োজন তিনি

কখনো অনুভব করেন নি ; বরঞ্চ একাধিক অনুভূতির অন্তঃপ্রবেশে কবিতা-বিশেষের সংহতি যাতে নিপাতে না যায়, সেই দিকেই তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। মাইকেল-প্রমুখ ধ্রুপদী কবিদের চিত্তবৃত্তি বিপরীত ধরণের ; এবং পাঠকের ধৈর্য্য অপরিসীম নয় ব'লে, তাঁরাও যদিচ একই কবিতায় বিবিধ ভাবচ্ছবি এঁকেছেন, তবু তাঁদের কাব্যোপজীবিকা যেহেতু নিরাধার তথা অবিমিশ্র আবেগ, তাই তাতে ব্যক্তিগত বেদনার শাবল্য নেই। সেইজন্যে, প্রসঙ্গের নানাত্ব সত্ত্বেও, "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"-র স্বরবৈচিত্র্য "মানস-সুন্দরী"-র চেয়ে কম ; এবং তার পরেও না মেনে উপায় থাকে না বটে যে অন্তত আক্ষরিক ছন্দে মাইকেলের নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অগত্যা এটাও বুঝি যে মাইকেল সে-চাতুরীর সাহায্যে কল্পনা ও ভোগশক্তির ন্যূনতা ঢেকেছিলেন। তবে উধাও উদ্ভাবনা সব ক্ষেত্রে রত্নপ্রসূ নয় ; এবং রবীন্দ্রনাথের অসাবধান কবিতার বর্জ্জনীয় স্ফীতি অনেকেরই চোখে পড়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা এত বহুমুখী যে বিনা চেষ্টায় তার একাগ্রতারক্ষা প্রায় অসম্ভব ; এবং হয়তো সেই কারণেই তিনি জ্ঞানত তাঁর গানে রাগশুদ্ধির প্রয়াস পান নি, প্রথার অবরোধ ঘুচিয়ে ফেলে হৃদয়শতদলের সকল পাপড়িকে একত্রে ফুটতে দিয়েছেন।

সে যাই হোক, "লিপিকা"-রচনার আগে পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পদ্যচ্ছন্দের বাইরে স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেতেন না, বরঞ্চ মাইকেলী মাত্রাবৃত্তের অল্প-বিস্তর অনিয়মও তাঁর অসহ্য ঠেকতো ; এবং সেইজন্যে ভানুসিংহের সময় থেকে তিনি এমন এক জাতীয় ছন্দের পুনরুদ্ধার করছিলেন যার যতিপাতে ব্যক্তিগত নির্ব্বাচনের সুযোগ নেই। কিন্তু সে-সকল ছন্দের চাহিদা বৈষ্ণব যুগের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিলো ; এবং সম্ভবত ইতিমধ্যে মাতৃভাষার উচ্চারণপদ্ধতি বদলে যাওয়াতে ওই ছন্দসমূহের সূত্রও পরবর্ত্তী কবিদের মনে ছিলো না। কাজেই যাঁরা পয়ারের পীড়নে ধৈর্য্য হারিয়ে অগত্যা সে-রকম ছন্দের শরণ নিয়েছিলেন, তাঁরা সুদ্ধ বোঝেন নি যে তাতে অক্ষর আর মাত্রা সর্ব্বত্র এক ওজনের নয়। অথচ তাঁদের মধ্যে যাঁরা কানের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা জানতেন যে ছন্দ দ্রষ্টব্য সামগ্রী নয়, শ্রাব্য বস্তু ; এবং তাই সে-ধরণের ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ তাঁদের রূপকারী বিবেকে বাধতো। ফলত তাঁরা হয় তাকে

ব্যঞ্জনবর্ণের, স্পর্শ বাঁচিয়ে আধো আধো ললিত পদের সেবায় লাগাতেন, নয় তার বিশেষ গতিবিধি ভুলে তাকে চালাতেন সংস্কৃতের লঘু-গুরু চালে। তবে উভয়সঙ্কট সকলের পক্ষেই কর্ম্মনাশা ; এবং সুকবিরাও যেমন অহরহ শুদ্ধ স্বর জুগিয়ে উঠতে পারতেন না, তেমনই অকবিরাও জানতেন যে সংস্কৃত নিয়মে বাংলা পড়লে, ভাব জাগে না, হাসি আসে।

সুতরাং সে-কালের কোনো বড় কবিতাতে উক্ত ছন্দের আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত টিঁকতো না ; কার্য্যত সকলেই রীতিমতো পয়ারের প্রথম বা দ্বিতীয় পর্ব্বের অমিল বা সমিল দ্বিরুক্তি করতেন, এবং তার সঙ্গে বাকী অংশটা জুড়ে সমস্তটার নাম দিতেন ত্রিপদী বা লঘু ত্রিপদী। অবশ্য শুধু পয়ার ভেঙে একাবলী লেখা চলতো না ; এবং পয়ারের শেষ পর্ব্বেই যদিচ একাবলীর গোড়াপত্তন হতো, তবু তার অবশিষ্ট ভাগে পয়ারের বিজোড়ভীতি দেখা যেতো না। কিন্তু এই অবৈধ বৈশিষ্ট্যের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রাগ্‌রৈবিক যুগে কেউ বোধহয় বোঝেন নি ; এবং বিহারিলাল যখন "বঙ্গসুন্দরী"-তে লঘু ত্রিপদী আর একাবলীর সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তখনও মাত্রাচ্ছন্দের রহস্য তাঁর কাছে অনুদ্‌ঘাটিত ছিলো। বস্তুত দৃক্‌শক্তির এতখানি অভাব বিহারিলালের পক্ষে অমার্জ্জনীয়। কারণ তাঁর কাব্যে অন্য কোনো গুণ থাক বা না থাক, সে-সময়কার অপ্রাকৃত রচনারীতির পাশে তার প্রাকৃত চাল সত্যই বিস্ময়কর ; এবং "নারীবন্দনা"-র চতুর্থ স্তবকে ছন্দের খাতিরে "শূন্য শ্মশান" অর্থে "শূনো শ্মশান" লিখে তিনি অসাধারণ শ্রুতি-শুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি তিনি জানতেন যে লঘু-গুরু ছন্দে "মাভৈঃ" ত্রিমাত্রিক ; অথচ সেই ছন্দেই "বজ্রাঘাতে মম তব মূর্ত্তিময়"—পদটি যে দ্বাদশ মাত্রিক নয়, তা তাঁর মাথায় ঢোকে নি, অথবা "দ্রৌপদীর মতো রূপসী শ্যামা" কতটুকু অদল-বদলে আসল একাবলীর রূপ ধরে, তিনি তার সন্ধান পান নি।

পক্ষান্তরে শুধু এ-রকম কেন, আরো অনেক দোষ প্রাচীন বাংলা কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ ; এবং সে-কালের কবিতা যেহেতু জ্ঞানত সঙ্গীতের অনুগত ছিলো, তাই তার ভাবস্বল্পতা যেমন জনতার অনুমোদনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো, তেমনই তার ছন্দশৈথিল্য ঢাকা পড়তো গায়কের স্বরবিস্তারে। এমনকি বিদ্যাপতির মতো স্বভাবকবি পর্য্যন্ত ছন্দোব্যাপারে সুবিধাবাদী ; এবং বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়" ইত্যাদি পংক্তিগুলি সংস্কৃত বা

বাংলা বিধানের ধার তো ধারে না বটেই, উপরন্তু কোনো স্বরচিত নিয়মেও সেই চির সার্থক কবিতাকে বাঁধা যায় কিনা সন্দেহ। অবশ্য অল্প-বিস্তর অবৈধতা পুরাকালীন কাব্যের সার্ব্বভৌম লক্ষণ; এবং ভারতচন্দ্রের অন্যতম অবদান এই যে তিনি অব্যবস্থিত বাংলা ছন্দকেও শৃঙ্খলা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে-শৃঙ্খলা স্বায়ত্তশাসন থেকে জন্মায় নি, তার পিছনে ছিলো সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নির্দ্দেশ; এবং সেইজন্যে লঘু-গুরু ছন্দে ভারতচন্দ্র শুধু স্তোত্রই লিখেছেন, তাঁর অতুলনীয় বস্তুবিলাস ব্যক্ত হয়েছে পয়ারে বা পয়ারের অপভ্রংশে। অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় কলাকুশলীর কাছেও বাংলা মাত্রাবৃত্ত আত্মপ্রকাশ করে নি। তিনি বোঝেন নি যে বাংলা উচ্চারণ সংস্কৃত রীতিতে চলে না ব'লেই, তাতে গুরু স্বরের অভাব নেই: ঐকার, ঔকার, অনুস্বর, শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ ও যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বর্ণ বাংলায় স্বতই দীর্ঘ; এবং এ-কথা মনে রাখলে, দ্বাদশমাত্রিক লঘু ত্রিপদীতেও হলন্তের প্রয়োগ সম্ভব তথা ওজোগুণের প্রাদুর্ভাব সহজ।

"ভানুসিংহের পদাবলী"-তে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণের স্বধর্ম্ম মানেন নি। উপরন্তু সে-কবিতাগুলি তাঁর বাল্যরচনার অন্তর্গত। তথাচ প্রসঙ্গের দিক দিয়ে সে-বইখানির মর্য্যাদা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের চেয়ে বেশী। কারণ তার ছন্দ সর্ব্বত্র এক নিয়মের অধীন; এবং তৎসত্ত্বেও "মরণ রে"-শীর্ষক তার শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রথম স্তবকের উপান্ত পংক্তিতে "করে"-শব্দের একারটি যদিচ ছন্দের খাতিরে লঘু, তবু এই ব্যতিক্রম স্পষ্টত কিশোর কবির অক্ষমতাপ্রসূত, কোনো মতেই সুবিধাবাদীর স্বেচ্ছাচারসূচক নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব বরাবর উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপন্থী। তাঁর আত্মনিষ্ঠা আত্যন্তিক ব'লেই, তিনি অবিলম্বে বুঝেছিলেন যে নিয়ম বাঁচিয়ে চলার মতো নিয়ম এড়িয়ে যাওয়াও কাপুরুষের কর্ম্ম; এবং সেইজন্যে ছন্দের নিগড়ে যত দিন নূপুরের বোল বাজে নি, তত দিন তিনি একটার পর একটা বাঁধনে তাঁর পদ্যকে কেবলই বেঁধেছিলেন। কিন্তু যে-বিধানের অঙ্গীকারে সাধক সিদ্ধিতে পৌঁছয়, তা সদা-সর্ব্বদা প্রকৃতির অনুকূল; এবং "ভানুসিংহের পদাবলী"-তে শুধু বাংলা উচ্চারণই অস্বীকৃত নয়, বাংলা ব্যাকরণও অনুপস্থিত। অতএব শৈশবের অনির্ব্বচনীয় ও অনাত্ম উপলব্ধির উত্তরাধিকার ফুরোতে না ফুরোতে ভানুসিংহের মাত্রাচ্ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছে অব্যবহার্য্য ঠেকলো; এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিশেষ ক'রে

দেশকালাশ্রিত, তাই অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগত্যা কথ্য ভাষার বশে এলেন।

কিন্তু কথিত বাংলায় আ, ঈ, উ, এ, ও—এই স্বরগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ তো নিষিদ্ধ বটেই, তাছাড়া হসন্তের আধিক্যও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; এবং "প্রভাত সঙ্গীত" বা "ছবি ও গান"-এর মাত্রাচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম নিয়মের মর্য্যাদা রেখেছেন, তেমনই, ব্যঞ্জনবর্ণের প্রচলিত ব্যবহার তাঁর কানে বাজতো ব'লে, তিনি সাধ্যপক্ষে দ্বিতীয় নিয়মের অস্তিত্ব মানেন নি। ফলত তাঁর এই সময়কার মাত্রাবৃত্তে বিহারিলালের অনিচ্ছাকৃত প্রতিধ্বনি যেন প্রায়ই শোনা যায় ; এবং শুধু তাই নয়, তার ধ্বনিপ্রবাহ সুদ্ধ বিহারী কাব্যের মতো ক্লেশকর রকমের একটানা। তবে বালক রবীন্দ্রনাথও বয়স্ক বিহারিলালের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও অধিক সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন ; এবং সেইজন্যে হয়তো বা জ্ঞাতসারেই তিনি তখনকার দীর্ঘ কবিতাগুলি হয় এক ছন্দে লেখেন নি, নয় পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের দৈর্ঘ্য যথাসম্ভব বাড়িয়ে, অথবা পদান্ত মিলের মধ্যে অপ্রত্যাশিত অবকাশ ঢুকিয়ে, সেগুলির বৈচিত্র্যসাধন করেছেন। এমনকি সে-কালের কোনো কোনো কবিতা মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের সংমিশ্রণে বর্ণসঙ্কর ; এবং যাঁদের ছন্দোজ্ঞান আমার চেয়ে সূক্ষ্ম, তাঁদের কাছে উক্ত কবিতাগুলির সৌজাত্য যদি বা নিঃসংশয় ঠেকে, তবুও "ছবি ও গান"-এর 'দোলা', 'একাকিনী', 'আদরিণী', 'খেলা', 'বিদায়' প্রভৃতির ছন্দোলিপি বানাতে তাঁরাও বেশ খানিকটা বেগ পাবেন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তখনো বোঝেন নি যে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ইংরেজির বিপরীত ; এবং পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আকারে-প্রকারে খুশিমতো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে না পারলে, কোনো ইংরেজ যেমন ছান্দসিক-উপাধির যোগ্য নন, তেমনই যতি-মধ্যস্থ মাত্রাপরিমাণের সাম্য না রাখলে, বাংলা পদ্যরচনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। অবশ্য তৎসত্ত্বেও বাংলা কবিতা আদৌ পঙ্গু নয় ; এবং চরণের প্রথম পর্ব্বে না হোক, শেষ পর্ব্বে অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন না থাকলে, বাঙালীর কান সাধারণত অস্বস্তিবোধ করে। কিন্তু আগের চরণে দুটো পঞ্চমাত্রিক পর্ব্ব বসিয়ে পরের চরণে চার আর ছয় মাত্রার সংযোজন বোধহয় বাংলা ছন্দে চলে না ; এবং উল্লিখিত কবিতাসমূহে এই জাতীয় পদপরম্পরা অবিরল ব'লেই, সেগুলি স্বাধীন

নয়, স্বেচ্ছাচারী। অথচ সেগুলির গদ্যোচিত গতিভঙ্গী প্রায় যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত ; তাদের বিষয়বস্তু অত্যধিক, এমনকি অন্যায়, রকমের কবিত্বময় ; এবং সেই-জন্যে রবীন্দ্রনাথ এ-ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ছন্দোমুক্তির উপায় খুঁজে পান নি, জেনেছিলেন যে শুধু আধো আধো কথা কইতে গেলেই, দুঃসাধ্য স্বর-শুদ্ধির প্রয়োজন, নচেৎ ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার যত না প্রশস্ত, ততোধিক স্বাভাবিক। তবে হয়তো গণিতের মতোই ছন্দশাস্ত্রও স্বাবলম্বীর প্রমাদপুষ্ট ; এবং আমার বিশ্বাস "ছবি ও গান"-এর পরীক্ষালব্ধ ব্যর্থতা ব্যতীত "মানসী"-র বিস্ময়কর সাফল্য সত্যই অভাবনীয়।

অবশ্য ঠিক কী প্রণালীতে মাত্রাচ্ছন্দের চির রহস্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছিলো, তা শুধু তিনি নিজে বলতে পারেন ; এবং "মানসী" যেকালে ধাতুগত অর্থেই অভূতপূর্ব্ব, তখন সে-পুস্তকে কবিপ্রতিভার যাদৃচ্ছিক দিকটাই আপাতত সুপরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক আত্মোপলব্ধি "মানসী"-তে লিপিবদ্ধ ব'লেই, সে-বই অবিস্মরণীয় নয়, বাংলা ছন্দের নববিধানও সেইখান থেকেই শুরু ; এবং তাতে যদিও লেখক কোনো নূতন সূত্রের উদ্‌ভাবন করেন নি, তবু তার মধ্যে প্রচলিত ও পরিত্যক্ত বিধি-নিষেধের যে-সামান্যীকরণ ঘটেছিলো, তা বোধহয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে আইন্‌ষ্টাইনী কীর্ত্তির সমগোত্রীয়। কারণ প্রাগ্-আইন্‌ষ্টাইন্ গণনায় যেমন রবিনীচস্থ বুধের অপচার অব্যাখ্যাত থাকতো, তেমনই রবীন্দ্রপূর্ব্ব ছন্দঃপ্রকরণে বাঙালীর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ অনেক সময়েই মিটতো না ; এবং ক্ষেত্রানুসারে প্রতিমান না বদলে, ন্যুটোনীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা যতখানি গণ্ডগোল বাধিয়েছিলেন, অক্ষর, মাত্রা ও স্বরাঘাতের ব্যবহারিক প্রভেদ না বুঝে ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারীরা পড়েছিলেন তার চাইতে বেশী বিপদে। অর্থাৎ "মানসী"-প্রকাশের পরে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের দুষ্ট আঙ্গিক আর ঢাকা রইলো না ; এমনকি দেখা গেলো যে "মানসী"-প্রণেতার প্রাক্কালীন রচনাবলী পর্য্যন্ত গবেষণাসংক্রান্ত ভুল-চুকে ভরা ; এবং যেহেতু সেই গবেষণার ফলাফলই আধুনিক বাংলা কবিতার ভিত্তি, তাই আজকালকার অকবিরাও স্বভাবত রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক স্খলন-পতন এড়িয়ে যান।

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে উপরের প্যারাগ্রাফে অক্ষর, মাত্রা ও স্বরাঘাতের প্রভেদকে আমি ব্যবহারিক বলেছি ; এবং বাংলা ছন্দে ঐ পার্থক্য বস্তুত স্বীকৃত

কিনা, তা অনেকের মতে এখনো অনিশ্চিত। অন্ততপক্ষে ছন্দোবিজ্ঞানী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস যে সংস্কৃতের মতো বাংলা অক্ষরও ইংরেজী সীলেব্ল্-এর প্রতিশব্দ ; এবং এই অবিভাজ্য ধ্বনিপিণ্ডই সর্ব্ববিধ বাংলা ছন্দের অনন্য উপাদান। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূলে ত্রৈগুণ্য থাক বা না থাক, তার রচনাপদ্ধতির ত্রিত্ব, আমার বিবেচনায়, অলঙ্ঘনীয় ; এবং ধ্বনি ও বিরামের এককালীন সাম্য ও বৈচিত্র্য যদিও ছন্দোমাত্রেরই প্রাণ, তবু কেবল অক্ষর গুণলে, বোধহয় বোঝা যায় না চতুরাক্ষরা কাব্যলক্ষ্মী কেন পয়ারে মাত্রাবৃত্তের চেয়ে কম জায়গা জোড়েন। তবে বাংলা ছন্দ যে যতিপ্রধান, এ-সিদ্ধান্তে তর্কের অবকাশ নেই ; এবং এ-সত্য এ-দেশের প্রত্যেক সং কবি জানতেন বটে, তথাচ "মানসীর"-র 'নিস্ফল কামনা'-কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখান যে অগত্যা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আকার-প্রকার অপরিবর্ত্তিত রাখলেও, কেবল যতিস্থাপনার বৈলক্ষণ্যে পয়ারে অবধি আর্য্যার নিত্যনব ভঙ্গী জাগে। উপরন্তু ঐ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অষ্টম পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত দুটি ষড়াক্ষর পর্ব্বকে একটি চরণে একত্রে এনেছেন ; এবং এ-রকম পদরচনা সাধারণত মাত্রাচ্ছন্দেই শোভন। অথচ 'নিস্ফল কামনা'-র পরিণত সংস্করণ "বলাকা"-তে এই জাতীয় পংক্তি খুবই সুলভ ; এবং তাতে যখন আমি ছাড়া আর সকলে, এমনকি কবি নিজেও, খুশী, তখন অমূল্যধনের অনুমান হয়তো নির্ভুল—অক্ষরই বাংলা ছন্দের তন্মাত্র।

আমার নাতিক্ষুদ্র জীবনের অনেকখানি পদ্য লেখার ব্যর্থ চেষ্টায় কেটেছে ব'লে, আমি "মানসী"-র আঙ্গিকবিচারে এতটা সময় দিলুম ; এবং পণ্ডিতেরা যাই ভাবুন না কেন, আধুনিক বাংলার সকল কবিযশঃপ্রার্থীই জানেন যে অক্ষর ও মাত্রার প্রাঙ্‌"মানসী" ঐক্য মানলে, অন্তত বিদগ্ধসমাজে তাঁদের আসন জুটবে না। কিন্তু "মানসী"-র বিপ্লবী দিকটা বাদ গেলেও, তার অনেক কিছু অবশিষ্ট থাকে ; এবং সে-পুস্তকেও রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিস্বরূপ যদিচ সংশয়মুক্ত নয়, তবু তাতে দেশ-কালের প্রভাব প্রায় নগণ্য অথবা বিষয়-নির্ব্বাচনের মধ্যে আবদ্ধ : ব্যঞ্জনায় তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বিশেষ রকমে স্বকীয়, অর্থাৎ বঙ্গীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কারণ এত দিনে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে তাঁর মনের ধর্ম্ম লিরিক্। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন তাঁর কাছে এমনই সঙ্কীর্ণ লেগেছিলো যে এখানকার সর্ব্বগ্রাহী এপিক্ চিত্তবৃত্তিকে তিনি অতঃপর

আর প্রশ্রয় দেন নি ; এবং সেইজন্যে আত্মোপলব্ধির প্রথম উন্মাদনাতেও তিনি উল্লাস খুঁজে পান নি : "মানসী" ও "সোনার তরী"-র ভিতরে ভিতরে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিলো বিবিক্তির বিষাদ। অবশ্য এখানকার প্রকৃতিকে তিনি আবাল্য ভালোবাসতেন ; এবং নিসর্গের মহত্ত্ব তাঁকে স্থানীয় মানুষের ক্ষুদ্রতা ভোলাতো। কিন্তু "মানসী"-তে আমরা যে-প্রকৃতিকে দেখি, তার সঙ্গে বঙ্গীয় পল্লীশ্রীর সাদৃশ্য নিতান্ত বাহ্য ; এবং তাই রবীন্দ্রনাথ সে-প্রসঙ্গেও প্রাচীন কবিদের মতো স্বভাবোক্তি করেন নি, সাধারণত তিনি প্রাদেশিক রঙে বিশ্বপ্রকৃতির ভাবমূর্ত্তিই এঁকেছেন।

নিরাসক্ত নিসর্গবিলাসের মতো নিষ্কাম প্রেমও বাঙালীর চরিত্রবিরোধী ; এবং "মানসী"-তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান, দ্বিতীয়টির সাক্ষাৎ মেলে না। তাহলেও "মানসী"-র আদিরস "কড়ি ও কোমল"-এর চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ ; এবং "সোনার তরী"-র প্রণয়বিষয়ক কবিতাগুলিতে সাময়িক সমালোচকেরা যে অশ্লীলতার সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কারণ বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কাব্যে তখনো তাঁদের অভ্যাস জন্মায় নি। বস্তুত তাঁর ভাগবত কবিতাতেই সাধকোচিত সমর্পণের অভাব ধরা পড়ে, তাঁর প্রেমগাথায় দেহাতীত সংসক্তির অপ্রতুল দেখা যায় না ; এবং 'ব্যর্থ যৌবন,' 'প্রত্যাখ্যান' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে "খেয়া," "গীতাঞ্জলি," "গীতিমাল্য" ইত্যাদির একাধিক কবিতার পার্থক্য এইখানে যে "সোনার তরী"-র যুগে তাঁর মধ্যে ভূমানন্দের আভাস জাগে নি, তখনো পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিরহের অভিজ্ঞা তাঁকে অভিভূত ক'রে রেখেছিলো। উপরন্তু সেই অসদ্ভাবের জন্যে দায়ী ছিলো তাঁর নিরতিশয় অহংজ্ঞান ; এবং সোনার তরী"-র 'লজ্জা'-শীর্ষক কবিতায় উক্ত অহমিকা যেমন বৃথা সঙ্কোচের ছদ্মবেশ প'রে তাঁর পূর্ণ মিলনে প্রতিবন্ধক ঘটিয়েছিল, তেমনই সোনার তরীতে তাঁর জায়গা হয় নি আত্মপ্রসাদেরই ভারে। অতএব 'মানসী" ও "সোনার তরী-"কে একত্রে নিলে, রবীন্দ্রনাথের ভূত ভবিষ্যৎ দুইই আমাদের গোচরে আসবে, বাকী থাকবে শুধু তাঁর ক্ষণস্থায়ী প্রতর্ক, যার প্রজ্ঞাপারমিত রূপ 'ক্ষণিকা"-র অনুপম ঐশ্বর্য্য।

রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন গদ্য অনুরূপ সাফল্যে ও সম্ভাবনায় বঞ্চিত :

তার মধ্যে বিদ্রোহের উন্মাদনা নেই, তার গতিবিধি মোটের উপরে বঙ্কিমী; এবং তৎসত্ত্বেও তাতেই তিনি স্বীয় ব্যক্তিস্বরূপের ছাপ ফুটিয়েছেন বটে, কিন্তু অন্তত আরো বিশ বছর না কাটা পর্য্যন্ত তিনি বোঝেন নি যে সাধু বাংলার বাক্যগঠনপদ্ধতি এমনই অকষ্টবদ্ধ ও গতানুগতিক যে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাহন হিসাবে প্রায় অব্যবহার্য্য। পক্ষান্তরে তিনি শৈশবাস্তেই ঠিক করেছিলেন যে তাঁর পত্রালাপ শুদ্ধ সাহিত্যসাধনার অঙ্গ; এবং হয়তো সেইজন্যেই তাঁর অনেক চিঠি যেমন প্রবন্ধের মতো শোনায়, তেমনই তাঁর পোষাকী রচনাকে মাঝে মাঝে আটপৌরে রকমের অন্তরঙ্গ লাগে। অথচ তাঁর সাবেকী ভাষা বঙ্কিমের মতো গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট নয়; তাতে সর্ব্বনামের লিখিত ও কথিত রূপের শ্রুতিকটু সংমিশ্রণ বড় একটা নেই; এবং তিনি যেহেতু শুরু থেকেই জানতেন যে প্রাকৃত বাংলায় কৃ-ধাতু ছাড়া আরো বহু ক্রিয়াপদ চলে, তাই সাধু হয়েও তাঁর গদ্য কখনো স্থবির নয়, সর্ব্বদাই বেগবান। তবে শুধু ক্রিয়াধিক্য এই চলৎশক্তির একমাত্র কারণ নয়; দীর্ঘ সমাসের অভাবও উক্ত গদ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য; এবং ধ্বনির খাতিরে অথবা অর্থগৌরবের তাগিদে তিনি যদিও বার বার সংস্কৃত শব্দকোষের শরণ নিয়েছেন, তবু তিনি কদাচিৎ ভোলেন নি যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগত।

উপরন্তু গদ্য স্বভাবত পরজীবী: অন্ততপক্ষে পদ্যোচিত স্বাবলম্বন ও শুদ্ধি তার সার্থকতা বাড়ায় না; এবং তখনকার একাধিক দৌর্ব্বল্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গদ্য বক্তব্যের অসামান্যতাবশত অবিস্মরণীয় ও অনন্যসাধারণ। অবশ্য সে-বক্তব্যের অনেকখানিই তাঁর স্বরচিত নয়, তাকে তিনি পেয়েছিলেন পশ্চিমের জ্ঞান-ভাণ্ডার ঘেঁটে; এবং রামমোহনী যুগ থেকে পাশ্চাত্ত্য ভাবনার চর্ব্বিতচর্ব্বণ বুদ্ধিমান বাঙালীর আত্মকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তীদের তফাৎ এই যে তিনি তাদের মতো ভাব আর ভাষার মধ্যে ব্যবধান রাখেন নি, ভাবের গতিকে ভাষার গতিপরিবর্ত্তন অনিবার্য্য বুঝে সাধু বাংলার কাঠামোকে এমন ক'রে বদলেছিলেন যাতে তার স্বধর্ম্ম বজায় থাকে অথচ প্রসঙ্গের বিকার না ঘটে। হয়তো বা সেইজন্যেই "পঞ্চভূত" বা "আত্মশক্তি" কালে-ভদ্রে বৈদেশিক সুরে বাজে। কিন্তু যখন স্মরণে আসে যে

বাংলা গদ্যের উৎপত্তি পূর্ব্ব-পশ্চিমের সংঘর্ষে, তখন আর রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বিজাতীয় লাগে না, বরং তাঁর গদ্য সাধ্যপক্ষে মৌখিক ভাষার তালে চলে ব'লে তাকেই অপেক্ষাকৃত কম কৃত্রিম মনে হয়। সর্ব্বোপরি বিষয়মাহাত্ম্যে তার সকল দোষ খণ্ডায়; এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী প্রবন্ধাদিতে এই সব মূল প্রত্যয়ের প্রকৃষ্টতর অভিব্যক্তি যদিও মোটেই দুর্ল্ভ নয়, তবু অনভ্যস্ত মননশক্তির প্রথম উদাহরণ হিসাবে এই লেখাগুলিই অধিক বিস্ময়কর।

বস্তুত রবীন্দ্ররচনাবলীর উত্তরকাণ্ড একটু বেশী শুদ্ধ; এবং প্রকরণকে প্রসঙ্গের উপরে প্রাধান্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। অবশ্য সেজন্যে গত পঞ্চাশ বছরের প্রত্যেক লেখক তাঁর কাছে ঋণী; এবং তাঁর চেষ্টায় সমগ্র বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা এতখানি বেড়ে গেছে যে আজকালকার হৃদয়বান বাঙালীরা প্রায় সকলেই সাহিত্যিক। কিন্তু বাংলার পাঠকসাধারণ এখনো বোধহয় তাঁর বিষয়াশ্রিত রচনারীতির পক্ষপাতী। অন্ততপক্ষে তাঁর পুরাকালীন গল্প ও উপন্যাস যত সহজে আমাদের অবসরবিনোদ করে, তাঁর ইদানীন্তন কথাসাহিত্যে আমরা তত সহজে অভিনিবিষ্ট হই না। কারণ তাঁর সাম্প্রতিক উপাখ্যানে বাহ্য ঘটনার বাহুল্য নেই: বাইরের সামান্য অভিঘাতে মানুষের মন কতটা উলটে পালটে যায়, তার বর্ণনাই অনেক দিন যাবৎ তাঁকে কথকতার প্রেরণা যোগাচ্ছে; এবং পরের মনও যেহেতু আত্মদর্শনের সাহায্যেই জ্ঞাতব্য, তাই অনবদ্য আঙ্গিক সত্ত্বেও তাঁর এখনকার লেখা হয়তো একটু ক্লেশকর রকমের আত্মজৈবনিক। তার মানে এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী নায়ক-নায়িকারা তাঁরই অংশভাক; বরঞ্চ "ঘরে-বাইরে"-র সন্দীপ অথবা "যোগাযোগ"-এর মধুসূদন অনাত্মীয় উপাদানে তৈরী ব'লেই নিখিলেশ ও বিপ্রদাসের চেয়ে জীবন্ত। তবে রবীন্দ্রনাথ আগা-গোড়াই তাদের বিদ্বেষের চক্ষে দেখেছেন; এবং "চোখের বালি"-র বিনোদিনী শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বিচারসংবৃত অনুকম্পার পাত্রী।

আত্মবিশ্বাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়াসক্তিতে ভাঁটা না লাগলে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নাট্যরচনার প্রচলিত রীতি পরিহার করতেন না, আজীবন ধ্রুপদী উপায়েই নাটক লিখতেন; এবং প্রথম বয়সেও বিসদৃশ চরিত্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো ব'লেই, "গোড়ায় গলদ" বা

"চিরকুমার সভা" ইত্যাদি প্রহসনে পর্য্যন্ত কুশী-লবেরা গৌণ, নাট্যকারের শাণিত শ্লেষোক্তিই মুখ্য। তথাচ তাঁর এই সময়কার নাটক-কখানি, অন্তত আমার মতে, পরবর্ত্তী রূপকাদির চেয়ে প্রাণবন্ত; এবং তৎসত্ত্বেও "রাজা ও রাণী" ও "বিসর্জ্জন"-এর বাগ্‌বাহুল্য ও বয়নশৈথিল্য যদিও এত বেশী যে সে-দুটি আধুনিক কালের উপযোগী নয় ভেবে রবীন্দ্রনাথ উভয়ের নামটুকু ছাড়া আর সবই বদলে দিয়েছেন, তবু সাম্প্রতিক সংস্করণেও বই-দুখানি শুধু বুদ্ধিজীবীদের সাধুবাদ পায় না, সাধারণ দর্শককেও মাতিয়ে তোলে। এমনকি ঘটনাঘটনের ইচ্ছাকৃত অভাবেও "চিত্রাঙ্গদা"-র সক্রিয়তা হারিয়ে যায় নি; এবং "অচলায়তন", "রাজা", রক্তকরবী" প্রভৃতির মতোই তাতেও রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানত নীতিকারের ভূমিকা নিয়েছেন বটে, কিন্তু ভাবসম্বেগের প্রাবল্যে তথা অবৈকল্যে সে-নাটিকা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রায় অদ্বিতীয়। তবে আমার বিবেচনায় রাবীন্দ্রিক নাট্যপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা "মুক্তধারা"-তে; এবং "রবীন্দ্র-রচনাবলীর"-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে তাঁর আগামী পরিণতির অন্য সমস্ত দিক সূচিত থাকলেও, "মুক্তধারা"-র প্রতিশ্রুতি নেই।

"চিত্রাঙ্গদা"-র দুর্নীতি-সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমুখ সমালোচকদের দুরুক্তি স্মরণে এলে, আজ হাসি পায়; এবং তখন যদি মনে পড়ে যে অত্যাধুনিক সাহিত্যের কুরুচি-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ হঠোক্তিই করেছেন, তবে পুনর্ব্বাদী ইতিহাসের ব্যঙ্গে আমাদের উপভোগ আরো বাড়ে। তথাচ রবীন্দ্রনাথের দুর্হৃদ মনোভাবে শুধু অনুকম্পারই অভাব আছে; এবং যাঁরা "চিত্রাঙ্গদা"-র বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছিলেন, তাঁদের নির্ব্বুদ্ধি যুগধর্ম্মের নির্ব্বন্ধেও মার্জ্জনীয় নয়। কারণ "চিত্রাঙ্গদা"-র স্থানে স্থানে ইন্দ্রিয়াসক্তির গুণগান থাকলেও, সম্পূর্ণ নাটিকাখানি নিতান্তই নীতিপ্রধান; এবং তার সারমর্ম্ম এই যে কামনার পরিতৃপ্তি যেহেতু মানুষের আত্মপ্রসাদ জাগায় না, আত্মধিক্কার ঘটায়, তাই শারীরিক মিলনের চেয়ে আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ, কেবল ন্যায়ত নয়, কার্য্যতও ভালো। অবশ্য এই সনাতনী সিদ্ধান্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধ্রুবপদ; এবং এর আরম্ভ যেমন কৈশোরিক 'জাগরণ'-এ, এর চূড়ান্ত অভিব্যক্তি তেমনই "পূরবী" পেরিয়ে "শেষের কবিতা"-য়। তাহলেও "চিত্রাঙ্গদা"-য় কথাটাকে তিনি যত ঋজু, যত বিস্তারিত, যত রূপকবর্জ্জিত ভাবে বলেছেন, অন্যত্র তার তুলনা নেই;

এবং সেইজন্যে ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে বিশেষত এই বইখানিই বাঙালী বিবেচকদের কাছে অশ্লীল ঠেকেছিলো। অথচ এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প'ড়ে ই-এম্ ফষ্টর্র লিখেছিলেন যে এতে রবীন্দ্রনাথ বিরাট কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন নি বটে, কিন্তু প্রাচ্যসুলভ শালীনতার সংস্পর্শে এর প্রত্যেক পংক্তি সম্ভ্রান্ত ও সুন্দর; এবং ১৯১৪ সালেও ফষ্টর্র রবীন্দ্র-বন্দনার ঐকতানে সুর মেলান নি, বরঞ্চ আর কয়েক বৎসর কাটিতে না কাটতে তিনি বহুপ্রশংসিত 'ঘরে বাইরে"-তে রবীন্দ্রনাথের কুরুচিই দেখেছিলেন।

উপসংহারে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র সম্পাদনা-প্রসঙ্গে দু-চার কথা না বললে, এ-দীর্ঘ প্রবন্ধ যেন থামতে চাইছে না; এবং সে-কার্য্য কী উপায়ে আরো সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যেতো, তা আমি জানি না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীর একাধিক অসুবিধা আমার কাছে স্পষ্ট। প্রথমত, এ-সংস্করণ সম্পূর্ণ নয়: রবীন্দ্রনাথের জেদে তাঁর বাল্য রচনা এর থেকে বাদ পড়েছে; এবং তৎসত্ত্বেও এতে তাঁর রসোত্তীর্ণ লেখাই জায়গা পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক খণ্ডে গদ্য, পদ্য, নাটক ও গান একত্রে ছাপার ফলে অনেক সময়ে রচনাকালের পৌর্ব্বাপর্য্য থাকছে না; এবং সেইজন্যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার, ধারাবাহিক ইতিহাসে যাদের প্রয়োজন, আলোচ্য সংস্করণ তাদের উপকারে লাগবে না। তৃতীয়ত, এ-সংগ্রহের কালসূচীতে গ্রন্থপ্রকাশের সনই যেহেতু গণ্য, বিশেষ লেখার জন্ম তারিখ ধর্ত্তব্য নয়, তাই "ভানুসিংহের পদাবলী"—যার উৎপত্তি "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর বহু পূর্ব্বে—দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই সন্নিবিষ্ট, যদিও প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছিলো কবির ত্রিশ বৎসর বয়সের লেখা "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি"-তে। পক্ষান্তরে কোনো প্রথম সংস্করণ এখানে প্রামাণ্য নয়: বিষয়গত ঐক্যের খাতিরে গ্রন্থকর্ত্তা নিজে এক পুস্তকের রচনাবিশেষকে পরে অন্যত্র ছেপেছিলেন ব'লে, আজও সে-রচনা যথাস্থানে ফিরতে পারছে না। চতুর্থত, এ-সঙ্কলনের পাঠনির্ব্বাচন অত্যন্ত খামখেয়ালী: কবির অনুরোধে প্রথম পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত; অথচ কোথাও কোথাও—যেমন 'রাহুর প্রেম'-কবিতার প্রথম পংক্তিতে—আদিম ছন্দঃপতন সুদ্ধ সাদরে রক্ষিত।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দিগ্ধ মনে সাহস থাকে না, থাকে কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায়? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কি চাই? বিপদ হিসাবে কোনটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মত মনের জোর সে মন কোথায় পাইবে? দরজাটা ভেজানই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলাইয়া। দু'পাশে হাতের তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরেই শরীরের ভর দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে মেঝেতে তার ঝুলান পায়ের কাছে,— ঊর্দ্ধমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা। উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমত অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতেছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মত পালাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই একেবারে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

'এসো রতন।'

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল, সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলোট-পালট চলিতেছিল। অবস্থা বিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে জাগে!

'তুমি একা এসেছ রতন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবার—'

'দেখে আসি ওরা কি করছে?' সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীর বিব্রত ভাব দেখিয়া আবার বলিল, 'বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি না

গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছি, ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন? আশ্রম ত্যাগ করার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না রতন। যার গলায় খুসী মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যেও, আমি কিছু বলব না।'

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মত। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাই-এর মত, শালীর সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবার মত কি যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকায় লাগা নোংরা কিছুর মত পাক খাইয়া নীচে তলাইয়া যায়। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সকলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? মাধবীলতা তাই বলে, 'এবার থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।'

তারপর আবার তিন জনেই চুপ করিয়া থাকে, তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই বিপিন আসিয়া গম্ভীর মুখে খবর দেয় যে, চালার নীচে বসিয়া বসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দ যদি আশ্রমে না যায়, বিপিন তাদের খবরটা দিতে পারে।

'চল যাচ্ছি।' সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল।

তারপর দু'জনে চুপচাপ বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে, 'এখানে বসে থেকে কি হবে, চলো আমরাও যাই।'

'আশ্রমে থাকবে নাকি আজ?'

'থাকবার কি উপায় আছে ভাই? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দু'দণ্ড কথা বলিগে' চল।

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো হয় নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা জোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসির ধাকাতেই দারুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

'হঠাৎ এলে যে?'

'হঠাৎ এলাম? ও, হঠাৎ কেন এলাম? এমনি এলাম আর কি।'

'এমনি' এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বৌ সাজতে গেলি কেন? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল?'

'একজন সেধেছিল ভাই।'

ফাঁকি দেওয়া হাসি' হাসি' ভঙ্গির সঙ্গে হাল্কা কথা রতনকে রাগে যেন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন গ্রামের কে যেন কি উপলক্ষে এক বোঝা নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ক্রুদ্ধ চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিষ্টান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না জানিলেও মানুষের বড় বড় ভাবপরিবর্ত্তনের মধ্যে মনের পরিবর্ত্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রগৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্য্যন্ত অন্যায় মনে হইত, বন্ধুর এরকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন সয়তানি ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা ঘটিয়াছে বৈকি। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল?

'খা।'

'তুইও বোস ভাই, দু'জনে একসঙ্গে খাই?'

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরা ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কব্জির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

'হাতটা প্রায় ভেঙ্গে গেছে ভাই, গায়ে কি জোর মানুষটার!'

চিবানো ফলের সঙ্গে ঢোক গিলিয়া রত্নাবলী ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন?'

মাধবীলতা হাসিয়া বলে, 'রাগের চোটে, আবার কেন।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।'

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

সত্য কথা বলিতে কি, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশীক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোন কাজ হইত কি না সন্দেহ। মূর্চ্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথাটা সেই রকম বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুজিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ভূত দেখিলেও সে রকম ভয় পাইত কিনা সন্দেহ। তার মুখের সেই বীভৎস ভঙ্গি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মাধবীলতা হয়তো মূর্চ্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আরেকটু জোরালো হইলেই সে দেহের কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাৎ মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে—সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জ্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষণ্ডেরা যে রকম রসালো খুন করে সেরকম নয়।

মাধবীলতার ভয় পাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জ্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'একটা কথা শোন মাধু।'

মাধবীলতা কথা শুনিতে দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল, 'একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।'

তখন কথাটার দাম ছিল না। আজ মূর্চ্ছা যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল, সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কি?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে, 'কেন গিয়েছিলে?'

মাধবীলতা জবাব দেয়, 'তোমার পেছনে কেন পুলিশ লেলিয়ে দিল!'

মাধবীলতার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমেই দু'চোখ বুজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার ভরা আর্ত্তনাদ গুণগুণানো গানের মত মৃদু চাপা সুরে গুমরাইতেছে। কি হইয়াছে? কেন হইয়াছে? কোথায় হইয়াছে? কবে হইয়াছে? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময় সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই এটা 'কে তা জানিত'র পর্য্যায়ের।

[লেখকের মন্তব্য : কেউ বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটি-মাত্র নিয়মে। অবশ্য, মানুষের ভুল করা স্বভাব কিনা, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনের রীতিনীতি স্থির করিতে গিয়াও কত যে ভুল করিয়াছে তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতার তৃপ্তি উবিয়া যায় নাই, অবসাদের যন্ত্রণার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়।]

সে রাত্রে আর বেশী জেরা করা গেল না। কারণ, বিড় বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুর্ব্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কারণ মাধবীলতার অনেক কথার মানেটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিশ না লাগায়। কথাটা জটিলও নয়, দুর্ব্বোধ্যও নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে একটা হেঁয়ালি রচনা করিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘুঁষি, এক বাড়ীতে আর বাড়ীর কাছে আশ্রমে থাকার সময় মাধবীলতা তার ধারে কাছে ঘেঁষে নাই আর এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল সে যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিশ না লেলাইয়া দেয়! কচি খুকী তো সে

নয় যে এটুকু জ্ঞান তার নাই, এভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না? তার ভালর জন্য গিয়াছিল? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া? কথাটা ভাবিতে ভাল লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না! দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন দেশী সৃষ্টিছাড়া প্রেম, যে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায়? তা ছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোন লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই।

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই যেমন মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফাঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এপাশ ওপাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মত স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভোঁতা অনুভূতির মাথার মধ্যে মাথাধরার মত টিপ্ টিপ্ করাটাই বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অভিব্যক্তি, আজ তেমনি মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয় এই সত্যটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা একরকম কেন, এই দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওয়ায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখদুঃখ একই রকম কিনা এই কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটিয়া গেল স্নায়বিক বিপর্য্যয়। তখন, মৃদুস্বরে সে ডাকিল, 'মাধু?'

আজ অবসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকম সকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভানে মাধবীলতা এমন ভাবেই সাড়া দিল যে পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কি মৃদু আর সশঙ্ক সে আলিঙ্গন, পাঁজর যদি মাধবীলতার পাটখড়ির হইত তবু ভাঙ্গিবার কোন ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হয়তো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার "সাধটা মাধবীলতার অদম্য হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরী বলিল, 'চল মা একবার আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।'

না গেলেও চলিত, খুব বেশী ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা শ্বশুরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকাল বেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দের উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশী উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুরীকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরী চিরকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কি হইয়াছে কে জানে!

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আর সদানন্দের ঈঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরী বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে কে সদানন্দের কথা শুনিতেছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের, বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণকালের স্তব্ধতার শেষে সুরু হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আত্মসমর্পিত মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মত প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্ততঃ মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরও বেশী থতমত খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্ত্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটীরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাঁধে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।'

'সারা দিন?'

'সারা দিন তো বটেই, সারা রাতও থাকতে পারি।'

মাধবীলতা এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরী উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরী অবশ্য বুঝিতে পারিল যে নদীর দিকের খিড়কি দরজা দিয়া সদানন্দ কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটীরে ঢুকিল না। রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল, 'ওঁকে একবার ডেকে আন তো মাধু।'

মাধবীলতা অবাক।—'ডেকে আনব? এখানে?'

'হ্যাঁ। বলগে' আমি একবার দেখা করতে চাই।'

মহেশ চৌধুরী হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে! প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিয়াই মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরীর পাগলামীর মানে বুঝিবার ক্ষমতা এতদিন এক বাড়ীতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তার একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইয়াছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরী যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'চল আমরা ফিরে যাই মাধু।'

'সারা দিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে?'

'আর থেকে কি হবে? ভেবেছিলাম মানুষটা বুঝি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কি কখনো বদলায়?'

মানুষ যে বদলায় না, তার আরেকটা মস্ত বড় প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙ্গা গ্রামের কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশ ত্রিশ জন অর্দ্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ করিতেছে। মুখে ফেনা তুলিয়া এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যে কোন রকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথাটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে তবু আর এভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও?'

'সাধ করে কেউ জেলে যায়?'

বিভূতির মেজাজটা ভাল ছিল না।

'অমন করে ওদের ক্ষেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'নেয় নেবে।'

মহেশ চৌধুরী ডালমাখা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোন লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেক ভাবে ছেলেকে সে বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোন লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি—কাজের মত কোন কাজ করিয়া ছেলে তার হাজার বার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক মহেশ চৌধুরীর তাতে তো কোন আপত্তি নাই! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মত দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কাণ বুজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বুঝি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে—বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরীর মনে হইতে লাগিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে নাই।

একবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী এক চুমুকে জলের গ্লাসটা

প্রায় অর্দ্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে—

অথবা এসব কথা বুঝিবার নয়? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে?

অল্প দূরে মহেশের পোষমানা বিড়ালটি ঘুপটি মারিয়া বসিয়াছিল। মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারীর লেজে কি করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন সাড়ীখানি আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের থালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল— পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচর লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই কিন্তু চীৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়াছিল, দু'হাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারীর জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরীর মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেকে কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
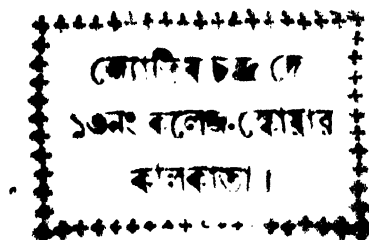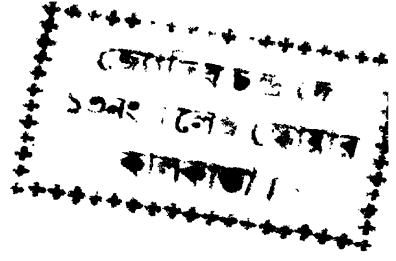
একটি কথা

যদিচ জড়তা সোনার শরীর ঘিরে,
অধরে আসুক সর্বহারাদের গান।
আকাশ যেখানে নেমেছে নদীর তীরে,
এখন সেখানে বোমারু বাষ্পযান।
বসন্ত এলো, সে-কথা বলে না কেউ।
হেসে নিয়ো কসে' দু'দিন বই তো নয়।
স্তিমিত অধরে অযুত হাসির ঢেউ।
রাখো কূটনীতি, এ ছাড়া সকলি সয়।

ইতিহাসে পাতা উল্টায় বুঝি ফের।
রাতের প্রলাপ দিনের আলোয় ম্লান।
দরিয়ায় আজো তীব্র ঢেউয়ের জের।
এখন সেখানে সমর-বাষ্পযান।
লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখা সার ?
পুরানো প্রয়াস ভেঙে-ভেঙে গুঁড়ো হয়।
সহসা পিছনে চকিত ছায়াটি কার !
তোমার গভীর চোখের পাতায় ভয়।

কোনো ভয় নেই খুলেই তাহ'লে বলি,
আগত বিপদ ; সেদিকে ফেরাও কান।
এসো না কৃষাণ মজুরের সাথে মিলি,
অধরে আসুক সর্বহারাদের গান !
সোনার ফসল, নেই তো আভাস তার।
পুরানো দিনের প্রলাপ না হয় থাক।

জমেছে যে সোনা এবারে চুলোয় যাক্।
হে শ্বেত বণিক, শুধু বাণিজ্য সার।

ভাঙা পাহাড়ের কিনারে নিঝুম বাড়ী।
ধ্বসে' পড়ে ভিত, বিরস করুণ ছবি।
আমাদেরো দিন পাথরের মতো ভারী।
আমরা বিরাগে ভুলেছি শোভন সবি।
রাতের প্রলাপ দিনের আলোয় ম্লান।
ইতিহাসে পাতা উল্টোয় বুঝি ফের।
আগত বিপদ, সে-দিকে ফেরাও কান।
আমার হৃদয়ে তোমার হাসির জের॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সমতল

যাত্রীরা এলো বহুদূর,
পাহাড়ে গিয়েছে চাঁদ অস্ত,
এখানে যে মাটি সমতল,
মনে তবু পাহাড়ের স্বপ্ন।

আকাশের রহস্যময়
ছিল কোন্ কাঞ্চনজঙ্ঘা,
উষ্ণীষ-তরবারি কার
বন্দনা করে গেছে সূর্য্য।

সে-স্মৃতির ঘন সৌরভ
সঞ্চিত যাত্রীর রক্তে—
সেখানে মেশেনি যেন আর
দীর্ঘ-পথের ধূলি-বাত্যা।

এখানে ত মাটি সমতল
সমতল সকলের তৃষ্ণা,
এখন যে অনেকের ভীড়
অনেকের হাসি আর অশ্রু।

আহত আকাশ নয় আর
তীক্ষ্ণ অভ্র-ভেদী শৃঙ্গে
এ-পাখীর পাখার হাওয়ায়
সরে গেছে দূরে দিক্-চক্র।

দিগন্তে ফসলের ঢেউ
উজ্জ্বল দিনে কত বর্ণ,
ছায়া আর আন্‌বে না রাত—
পাহাড়ে গিয়েছে চাঁদ অস্ত॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সাগরিকা
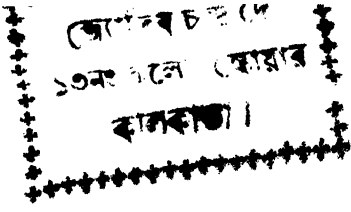
চতুর্থ অঙ্ক

(দৃশ্যঃ—ডাক্তার বাঙ্গেলের কক্ষ। ডাহিনে ও বামে অনেক-গুলি দরজা। পশ্চাতে দুই জানালার মধ্যস্থলে উন্মুক্ত কাচের দরজা;—পার হইলেই বারান্দার নীচে উদ্যানের একাংশ। বাম দিকে একখানি সোফা ও একখানি টেবিল। দক্ষিণ দিকে একটি পিয়ানো। আরো কিছু দূরে একটি বড়ো ফুলদানি রাখার টিপয়। টেবিলের উপরে একটি ফুটন্ত গোলাপের চারা এবং ইহার চারিদিকে অন্যান্য চারা গাছ। প্রভাতকাল। প্রকোষ্ঠে টেবিলের পার্শ্বে সোফায় বসিয়া বোলেত্‌ সূচী-কার্য্যে তৎপর। টেবিলের সম্মুখভাগে লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌ চেয়ারখানিতে উপবিষ্ট। বাগানে বসিয়া বেলেষ্টাড্‌ অঙ্কন-রত। তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হিল্ডে ছবি-আঁকা দেখিতেছে।)

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—(টেবিলের উপরে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বোলেতের কাজ লক্ষ্য করিতে করিতে) এ-রকম পাড় তোলা খুব কঠিন কাজ নিশ্চয়, মিস্‌ বাঙ্গেল্‌?

বোলেত্‌—না-না, খুব শক্ত নয়। তবে গুণতে ভুল করলে চলবে না।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—কি, গুণতে হয় নাকি?

বোলেত্‌—ফোঁড়গুলোর সংখ্যা রাখতে হয়। এই দেখুন।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—এই রকম বুঝি;—বাঃ! এ যে রীতিমতন আর্ট! আপনি পরিকল্পনা ত করেন?

বোলেত্‌—করি—নক্সা দেখে দেখে।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—নক্সা না পেলে?

বোলেত্‌—না, ও না হলে পারিনে।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—ও! তাহলে কিন্তু সত্যিকার আর্ট হলো না।

বোলেত্‌—না, একে বরং কারু-কলা বলুন।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, আপনি আর্ট শিখতে পারতেন।

বোলেত্‌—প্রতিভা নেই, তবু?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—নিশ্চয়, যদি আপনি কোন গুণী আর্টিষ্টের সঙ্গে সদা-সর্ব্বদা থাকতে পেতেন।

বোলেত্‌—তাঁর কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—শিখে নেওয়া মানে সাধারণ অর্থে বলছিনে। আমার ধারণা যে, আস্তে আস্তে আপনাতে ও বর্ত্তে যেতো—অনেকটা ভোজবাজির মতো, মিস্‌ বাঙ্গেল্‌।

বোলেত্‌—ভারি আশ্চর্য্য তো!

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—(ক্ষণকাল পরে) এই—কি যে বলে—বিয়ে সম্বন্ধে কখনো আপনি একান্ত মনে ভেবেছেন, মিস্‌ বাঙ্গেল্‌?

বোলেত্‌—(তাঁহার দিকে চট্‌ করিয়া নজর দিয়া) মানে?—না।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—আমি ভেবেছি।

বোলেত্‌—তাই নাকি?—ভেবেছেন?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—হাঁ, আমি তো প্রায়ই এসব ভাবি—বিশেষ, বিয়ে সম্বন্ধে। আমার ধারণা বিয়েকে এক প্রকার ভোজবাজি মনে করা উচিত;—আচ্ছা, এই যে কাণ্ডটা: নারী কি-রকম বদ্‌লাতে-বদ্‌লাতে শেষে স্বামীর একটা নকল হয়ে পড়ে, দেখুন দিকি!

বোলেত্‌—আপনি বলছেন, কি-রকম স্বামীর ভালো-মন্দ তারও ভালো-মন্দে রূপান্তরিত হয়—এই?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—তাই।

বোলেত্‌—আচ্ছা, স্বামীর বিদ্যা বুদ্ধি কৃতিত্ব—এসবের কি হয়?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—হুঁ, এখন প্রশ্ন এই যে, এসব-ও—

বোলেত্‌—আপনি বোধ করি, এ-ও বিশ্বাস করেন, পুরুষ মানুষ যা পড়ে, চিন্তা করে, তা-ও তার স্ত্রীর মধ্যে বর্ত্তে যায়?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—মনে তো হয়, বর্ত্তে যাবে—ধীরে ধীরে দৈবযোগে। কিন্তু, এ রকমটি হতে হলে চাই শ্রদ্ধা—প্রেম-মূলক প্রকৃত মধুর পরিণয়।

বোলেত্‌—আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, পুরুষও তো তার স্ত্রীর অনুপন্থী হতে পারে—অর্থাৎ যদি স্ত্রীর প্রতিরূপ হতে চেষ্টা করে।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—পুরুষ নারীর প্রতিরূপ হবে?—এ আমি কিছুতেই ভাব্‌তে পারিনে।

বোলেত্‌—কেন? একজন যদি হয়, আরেকজন হবে না কেন?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—কারণ, পুরুষের জীবনের গৌরব তার উপজীবিকা। ঐটিই পুরুষকে

এতো সপ্রতিভ এতো অপরাজেয় করে রেখেছে, মিস্ বাঙ্গেল্ জীবনে তার যে একটা পেশা আছে।

বোলেত্—সব পুরুষেরই আছে ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—না-না, আমি বিশেষ করে শুধু আর্টিষ্টের কথা বলছি।

বোলেত্—আচ্ছা, আর্টিষ্টের পক্ষে কি বিয়েটা একটা অপ্রয়োজন নয় ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—অপ্রয়োজন হবে কেন ? যদি এমন একজনকে তিনি পান যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারেন—

বোলেত্—তবু আমার যেন মনে হয়, তাঁর পক্ষে জীবনের একতম সাধনা আর্ট।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু বিয়ে করেও তিনি তাঁর সাধনা করতে পারেন।

বোলেত্—আর ওর কি হবে ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—কার ?—স্ত্রীর ?

বোলেত্—হাঁ, যাঁকে উনি বিয়ে করবেন, তাঁর জীবনের সাধনা কি হবে ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—তাঁর পক্ষেও উপজীব্য—তাঁর স্বামীর আর্টের সাধনা। আমার মনে হয়, এতেই নারীর পরম পরিতৃপ্তি।

বোলেত্—বলতে পারলুম না ঠিক—

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—মিস্ বাঙ্গেল্! বিশ্বাস করুন—এ-ই ঠিক। পত্নী যে শুধু স্বামীর মান-সম্মানের অংশভাগিনী হন, তা নয়। এ তো নিতান্ত তুচ্ছ। আসল কথা : তিনি স্বামীর সৃষ্টি-কার্য্যে সহায় হতে পারেন ;—স্বামীর সাহচর্য্য করে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁর জীবনকে মধুময় করে তুলতে পারেন। এতেই নারীর চরম আনন্দ, মনে হয়।

বোলেত্—উঃ! আপনি কী স্বার্থপর!

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—আমি স্বার্থপর ? হা ভগবান্! আপনি যদি আমায় আরেকটু ভালো করে জান্তেন! (কাছে ঘেঁসিয়া) মিস্ বাঙ্গেল্, আমি যখন চলে যাবো ;—আমার যাবার সময় তো ঘনিয়েই এলো—

বোলেত্—(সকরুণ দৃষ্টি) কেন মিছিমিছি যা নয় তাই ভাবছেন।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—না, নিছক দুর্ভাবনা নয়।

বোলেত্—যাচ্ছেন সত্যি ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—এক মাসের মধ্যেই রওনা দিচ্ছি এখান থেকে—একেবারে দক্ষিণ দেশে।

বোলেত্—বটে ! তারপর

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—তখন আমায় ভুলে যাবেন না, মিস্ বাঙ্গেল্ ?

বোলেত্—নিশ্চয়ই না।

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—(প্রোৎসাহিত) কথা দিলেন ?

বোলেত্—হাঁ।

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছেন, মিস্ বাঙ্গেল্ ?

বোলেত্—হাঁ, ধর্ম্ম সাক্ষী। (অতিষ্ঠ বোধ করিয়া) কিন্তু তাতে কি ? এমন কী লাভটা হবে এতে ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—লাভ ? আপনি এখানে বসে বসে আমার কথা মনে করছেন এ ভেবে আমার কতো সুখ হবে !

বোলেত্—বেশ, তারপর ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—তারপর আর কি !

বোলেত্—তবে ? আপনি যা ভাবছেন, তাতে কিন্তু অনেক বাধা ! অনেক কি ?—সবই বাধা।

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—কে জানে হয়তো গ্রহের ফেরে ঘটে গেলো ! পাকচক্রের কথা কে বলতে পারে ! আমার বিশ্বাস আছে, এখন আমার অদৃষ্টে শুভ ফল লেখা।

বোলেত্—(সোৎসাহে) সত্যি, বিশ্বাস করেন ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—নিশ্চয় করি—পুরোমাত্রায়। তাছাড়া, কয়েক বছর পরে যখন স্বাস্থ্য ও অর্থ লাভ করে বাড়ী ফিরে আসবো, নাম-করা একজন ভাস্কর হয়ে—

বোলেত্—আমরাও তো তাই আশা করছি।

৷—জানবেন, এ-আশা সফল হবেই হবে। শুধু যদ্দিন দক্ষিণে থাকবো, উপেক্ষা না করে যদি মনে রাখেন—, তা আপনি তো এখন কথা দিয়েছেন।

বোলেত্—কথা দিলুম বৈকি (শির সঞ্চালন করিয়া) কিন্তু জেনে রাখুন, লাভ কিচ্ছু নেই।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—কী বলেন, মিস বোলেত্! অন্যূন এতোটুকু তো হবে, আমি শিল্প-সাধনায় অবলীলা-ক্রমে দ্রুত এগিয়ে যাবো।

বোলেত্—এ-ও আপনি বিশ্বাস করেন?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—আমার মন যে সাড়া দিচ্ছে। আমার আরো মনে হচ্ছে, আপনিও এতে যার-পর-নাই তৃপ্তি লাভ করবেন। এই অজ্ঞাত অখ্যাত যায়গায় থেকে আপনি যে আমাকে সৃষ্টি-কার্য্যে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, এই ভেবে তৃপ্তি পাবেন।

বোলেত্—(তাকাইয়া) আচ্ছা, আপনি কি ভাববেন?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—আমি?

বোলেত্—(উদ্যানের দিকে চোখ তুলিয়া) চুপ! অন্য কথা হোক। মিঃ আর্নহল্ম্ আসছেন। (আর্নহল্ম্-কে নীচে বাগানের মধ্যে দেখা গেলো—দাঁড়াইয়া হিল্ডে ও বেলেষ্টাডের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন।)

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—আপনার এই ওল্ড্ শিক্ষকটিকে আপনি ভালবাসেন, মিস্ বোলেত্?

বোলেত্—ভালবাসা অর্থে?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—মানে, ওঁকে বেশ কেয়ার করেন—নয় কি?

বোলেত্—তা করি। উনি আমাদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু কিনা—সুপরামর্শ-দাতা। চাই-কি যথাসাধ্য সাহায্য করতেও কখনও পরাঙ্‌মুখ নন্।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—যা হোক, এখনো তিনি বিয়ে করলেন না;—এ বড়ো আশ্চর্য্য।

বোলেত্—আপনার কাছে আশ্চর্য্য লাগে বুঝি?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—তা আপনিই তো বলেন, ইনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক।

বোলেত্—তাই তো শুনি। বোধ হয় প্রণয়িনী মেলা কঠিন বলেই করেন নি।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—কেন?

বোলেত্—কেননা, তিনি যে-সমস্ত কুমারীদের সঙ্গে পরিচিত, তাদের প্রায় সকলেরই যে শিক্ষকতা করেছেন। এ তিনি নিজেই বলে থাকেন।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—তাতে কি হলো ?

বোলেত্—বাঃ রে ! টিচার-কেও আবার বিয়ে করে !

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—কেন ? কুমারীর কি টিচার-কে ভালবাসতে নেই ?

বোলেত্—না, বয়স্থা হলেই আর পারে না।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—তা বটে।

বোলেত্—(সতর্ক করিবার জন্য) হিস্ ! হিস্ !

(ইতিমধ্যে বেলেষ্টাড্ দ্রব্যাদি গুছাইয়া উদ্যানের বাহিরে ডান দিকে চলিয়া গেলেন। হিল্ডে গুছাইতে সাহায্য করিলেন। আর্ন্‌হল্‌ম্ বারান্দা হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন।)

আর্ন্‌হলম্—সুপ্রভাত, ডীয়ার বোলেত্ ! সুপ্রভাত, মিষ্টার—মিষ্টার—হুঁ (তাঁহাকে অপ্রসন্ন দেখাইতেছে। লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ডের উদ্দেশে অনাশক্ত ভদ্রাচরণ শেষ করিলেন। লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্ আসন পরিত্যাগ করিলেন।)

বোলেত্—(উঠিয়া, আর্ন্‌হল্‌ম এর নিকটবর্ত্তী হইয়া) সুপ্রভাত, আর্ন্‌হল্‌ম্ !

আর্ন্‌হল্‌ম্—এখানকার খবর সব ভালো তো আছে ?

বোলেত্—ভালো। ধন্যবাদ।

আর্ন্‌হলম্—সৎমা আজও নাইতে গেলেন ?

বোলেত্—না ; ওপর-তলায় নিজের কোঠায় রয়েছেন।

আর্ন্‌হল্‌ম্—কি, তেমন সুস্থ ন'ন ?

বোলেত্—বলতে পারলুম না। ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছেন।

আর্ন্‌হল্‌ম্—হুঁ, বটে ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—মিসেস্ বাঙ্গেল্ বোধহয় কাল ঐ আমেরিকের খবরে খুব ভয় খেয়ে গেছেন।

আর্ন্‌হল্‌ম্—তুমি কোত্থেকে জানলে ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—আমিই এসে তাঁকে বললুম, বাগানের পেছনে ওকে জ্যান্ত দেখে এসেছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্—ও !—এ-ই !

বোলেত্—(আর্ন্‌হল্‌ম্-এর প্রতি) আপনি ও বাবা কাল অনেক রাত জেগে কথাবার্ত্তা বলেছিলেন ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—হাঁ, ঢের রাত্‌ হয়ে গেছলো। সীরিয়স্‌ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো কিনা!

বোলেত্‌—আমার সম্বন্ধে বাবার কাছে কথা তুলেছিলেন?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—না, বোলেত্‌, সুযোগ পাইনি। অন্য একটি বিষয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন।

বোলেত্‌—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সে জানি। তাঁর ব্যস্ততার কোনো কালে ইতি হবে না।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—(অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া) আজ এক সময় বিশেষ ভাবে আলাপ তুলে দেখবো'খন।···এখন কোথায়? বাড়ী নেই?

বোলেত্‌—না। খুব সম্ভব অফিস ঘরে। দাঁড়ান;—ডেকে দিচ্ছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—দরকার নেই। তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।

বোলেত্‌—(উৎকর্ণ) একটু অপেক্ষা করুন, মিঃ আর্ন্‌হল্‌ম্‌। বাবাকে যেন ওপর-তলায় মনে হচ্ছে। তাই তো; বোধহয় ওঁকে দেখতে গেছেন।

(ইতিমধ্যে বাঙ্গেল্‌ বাম দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন।)

বাঙ্গেল্‌—(আর্ন্‌হল্‌ম্‌-এর করমর্দ্দন করিয়া) এই যে ভাই—তুমি এসে গেছো যে! শীগ্‌গির এসে ভালোই করলে। তোমার সঙ্গে কথা আছে আরো।

বোলেত্‌—(লিঙ্গষ্ট্রাণ্ডকে) চলুন আমরা বরং বাগানে হিল্ডের ওখানে যেয়ে বসি।

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌—সেই ভালো মিস্‌ বাঙ্গেল্‌।

(তিনি ও বোলেত্‌ উদ্যানে নামিয়া গেলেন এবং তরু-বীথিকার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া অন্তরাল হইলেন।)

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—(তাঁহাদিগকে চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিয়া বাঙ্গেলের দিকে মুখ ফিরাইলেন) ঐ যুবকটির সঙ্গে তোমার খুব জানা-শোনা আছে?

বাঙ্গেল্‌—আদপেই নয়। কেন বলো তো?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—মেয়েদের সঙ্গে অতো মাখামাখি ক'রতে দেওয়া ভালো?

বাঙ্গেল্‌—এসবে আমি মনোযোগ দিতে পারছি কই।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—তোমার একটু নজর রাখা উচিত।

বাঙ্গেল্—ভালোই বলছো তুমি। কিন্তু আমি কী-ই বা করি বলো! মেয়েরা এখন নিজেরাই নিজেদের তত্ত্ব-তালাসি করতে অভ্যস্ত। আমার কথা ওরা শুনবে কেন? এলীডার কথাও শুনবে না।

আর্ন্‌হল্‌ম্—ওঁর কথাও না?

বাঙ্গেল্—উঁহু। তাছাড়া, এলীডা অত ঝকি পোয়াতে যাবেন, তা-ই বা আমি আশা করি কোন্ মুখে। ওঁর দ্বারা এসব হবে না—(মাঝখানে থামিয়া) যাক্, এ নিয়ে কথা হচ্ছে না। বলো দিকিন্, আমি যা বলেছিলুম, সে-সম্বন্ধে ভেবে কিছু ঠিক কর্‌লে?

আর্ন্‌হল্‌ম্—কাল রাত্তিরে বিদায় নিয়ে অবধি এইটেই তো ভাবছি।

বাঙ্গেল্—কি কর্ত্তব্য ঠিক করলে?

আর্ন্‌হল্‌ম্—ভাই বাঙ্গেল্, তুমি ডাক্তার। আমার চেয়ে তুমি নিশ্চয় ভালো বোঝো।

বাঙ্গেল্—হায়, ডাক্তারের পক্ষে তার প্রিয়জনের ব্যাধি-নির্ণয় যে কী কঠিন, তা যদি বুঝতে! তাছাড়া, এ ব্যামো নিত্যি চোখে পড়ে না। সাধারণ ডাক্তার কি সাধারণ ওষুধে সারবার নয়।

আর্ন্‌হল্‌ম্—আজ কি রকম দেখলে?

বাঙ্গেল্—এইতো অল্পক্ষণ আগেও ওপর-তলায় তাঁরই কাছে ছিলুম। বেশ শান্ত মনে হচ্ছিলো। কিন্তু তার সমস্ত ভাব-ভঙ্গীর মূলে যে কী আছে, বের করতে গিয়ে হার মেনেছি। অধিকন্তু, ও যে কী চঞ্চল লঘু-স্বভাব;—কী বলবো!—কথা নেই বার্ত্তা নেই, এক লক্ষণের পর আরেক লক্ষণ দেখা দিচ্ছে!

আর্ন্‌হল্‌ম্—ব্যাধিগ্রস্ত মনের লক্ষণই ঐ—এতে কিছু সন্দেহ নেই।

বাঙ্গেল্—এই কি? তলিয়ে দেখলে কিন্তু এ রোগ এলীডার স্বভাবের সামিল। আসলে এলীডা সাগর-পরিবারের মানুষ।

আর্ন্‌হল্‌ম্—কথাটা বুঝতে পারলুম না, ডাক্তার।

বাঙ্গেল্—দেখোনি তুমি?—ঐ অবারিত বারিধি-পুলিনের আবাসিকেরা যেন এক আল্‌গা রাজ্যের মানুষ: যেন তারা সমুদ্দুরের জীবন-নাট্য আগা-গোড়া অভিনয় করে যাচ্ছে: তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটার ওঠা-

নামা, এসব তাদের চিন্তায়, তাদের মর্ম্মে মিশে এক হয়ে গেছে। এ অবস্থার অদল-বদল এদের পক্ষে অসহ্য। ও! আমার আগেই ভাবা উচিত ছিলো ;—এলীডাকে ঐ পরিবেষ্টন থেকে ছিনিয়ে এনে তাঁর প্রতি কী অন্যায়ই না করেছি!

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—শেষটায় এই মত হলো ?

বাঙ্গেল্‌—হাঁ, দিনের পর দিন এই বিশ্বাসই বাড়্‌ছে। হায়রে, গোড়ায়ই যদি এ-ধারণা মনে জাগতো! মনে ভালো করেই জানতুম বৈকি। তবু মনোযোগ দিইনি। কারণ, তাঁকে আমি ভয়ানক ভালোবাসতুম। তাই সর্ব্বাগ্রে নিজের দিক্‌টাই ভেবেছি। এ অপরাধের জন্যে আমায় কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—তবে কিনা এহেন ব্যাপারে সকলেরই কিছু না কিছু স্বার্থপর হতে হয় ;—এই তো আমার বিশ্বাস। অবশ্যি তোমার মধ্যে স্বার্থপরতা আমি কখনো পাইনি, বাঙ্গেল্‌।

বাঙ্গেল্‌—(কক্ষের চারিদিকে বিভ্রান্ত ভাবে পায়চারি করিতে) তাইতো! এদ্দিন্‌ একসঙ্গে রইলুম! বয়সেও আমি তার চেয়ে ঢের বড়ো। আমার উচিত ছিলো, পিতার মতো, অভিভাবকের মতো তাকে গড়ে তোলা— তার মনকে বিকশিত জ্ঞানদীপ্ত করার জন্যে যথাযথ চেষ্টা করা। বিধির বিধান! আমি আমার কর্ত্তব্য কিছুই করিনি। যখন তাকে গ্রহণ করলুম তখনো আমার ভাঙা মন জোড়া লাগেনি—সে তো তুমি জানো। তাকে যেমনটি পেলুম তাতে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন কিছুই করলুম না। ফলে, তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে-হয়ে এমন হলো যে, এখন আমি দিশেহারা। (মৃদুতর কণ্ঠে) সেই জন্যেই আমার বিপদের সময় তোমায় আসতে লিখেছিলুম।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—(বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া) এই জন্যে আসতে লিখেছিলে ?

বাঙ্গেল্‌—চুপ, চুপ। আবার ঢি ঢি পড়ে যাবে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বেশ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমি—আমি কি উপকার করতে পারি ভাই ? —আমি তো জানি নে।

বাঙ্গেল্‌—সত্য কথাই বলেছো। তোমার জানার বিশেষ কারণ নেই।

আমারই ভুল : আমি ভেবেছিলুম, এলীডা এককালে তোমার প্রতি আসক্তা হয়েছিলেন বরং আজ অবধি সঙ্গোপনে তোমার স্মৃতির পূজো করে আসছেন ;—তাই তোমার সঙ্গে দেখা হলে নিজের বাড়ীর কথা, পুরোণো দিনের কথা আলাপ করে নিরাময় হয়েও যেতে পারেন।

আর্ন্হল্ম্—তাহলে চিঠিতে তোমার স্ত্রীর নাম করে আমায় জানালে যে, তিনিই আমাকে আসতে অনুরোধ কচ্ছেন এবং দেখা করার আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হয়ে আছেন ;—এর অর্থ এই !

বাঙ্গেল্—হাঁ।

আর্ন্হল্ম্—(বিব্রত) বুঝেছি, বুঝেছি। তখন টের পাইনি।

বাঙ্গেল্—না পাওয়াই স্বাভাবিক। এই যে বল্লুম, ভুল আমারই হয়েছিলো।

আর্ন্হল্ম্—তবু নিজেকে স্বার্থপর বলছো ?

বাঙ্গেল্—দেখো এ আমার ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা মাত্র। ভেবে দেখলুম, ওর মনের এক কণা শান্তির জন্যে কোনো অসম্ভব উপায়ও হাত-ছাড়া করা উচিত হবে না।

আর্ন্হল্ম্—আচ্ছা, এঁর মনে ঐ বৈদেশিককে নিয়ে তোলাপাড়া করার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলে ?

বাঙ্গেল্—বন্ধু ! এমন গুটিকয়েক ব্যাপার আছে যা কিছুতেই বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় না।

আর্ন্হল্ম্—তুমি বলতে চাও, এতে এমন কি আছে যা স্বতই দুর্জ্ঞেয়—সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য ?

বাঙ্গেল্—যদ্দূর বুঝতে পারছি তাতে বলা চলে যে, এর কোনো কোনো দিক একদম বুদ্ধির অগম্য।

আর্ন্হল্ম্—ভেতরে তবে একটা রহস্য কিছু আছে ?

বাঙ্গেল্—তাই যে বিশ্বাস করি এমন বলিনে। আবার অস্বীকারও করতে পারিনে। শুধু বলতে ইচ্ছা করে—জানিনে। সেই জন্যেই হাল ছেড়ে বসে আছি।

আর্ন্হল্ম্—একটা কথা : খোকার চোখ সংক্রান্ত সেই আজগুবি বিসদৃশ অর্থ ধরতে পারলে ?

বাঙ্গেল.—(সমুৎসুক) এর এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করিনে। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না ;—তার নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কাল যখন লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলে ?

বাঙ্গেল্‌—অবিশ্যি দেখেছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কোনো রকম সাদৃশ্য পাওনি ?

বাঙ্গেল্‌—(উন্মনা) জানেন ধর্ম্ম। কী বলবো !—যখন তাকে দেখি তখন যথেষ্ট আলো ছিলো না। আর এলীডা এই সাদৃশ্য নিয়ে থেকে থেকে এতো কথা বলছিলো যে, সাদা মন দিয়ে লক্ষ্য করতে পেরেছি কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—যাক।—কিন্তু ঐ যে আরেকটা কাণ্ড! যখন পরদেশী বাড়ী ফিরছিলো, ঠিক তখনি যত বিভীষিকা যত যন্ত্রণা তাঁকে পেয়ে বসলো।

বাঙ্গেল্‌—এরও সবটুকু তার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার ছোপে রঙীন। এই রোগ যে একদিন অজান্তে অকস্মাৎ তাকে পেয়ে বসলো, তা নয় ;—ও যদিও এখন তাই বলছে। লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌ ছেলেটির কাছ থেকে যেই জানতে পেলো যে, জনষ্টন বা ফ্রিমেন্‌ বা যে নামই হোক ঐ লোকটা তিন বছর আগে মার্চ্চ মাসে এই পথে রওনা দিয়েছিলো, অমনি নির্ব্বিচারে ভেবে নিলে যে সেই সময়ই তার অসুখের সূচনা।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—সে সময়ে নয় তবে ?

বাঙ্গেল্‌—কখ্‌খনো না। আগে থেকেই লক্ষণ দেখা গেছলো—যদিও দৈব-চক্রে একবার তিন বছর আগে মার্চ্চ মাসে তাঁকে খুব খানিকটা ভুগতে হয়েছিলো।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—শেষাশেষি তাহলে—

বাঙ্গেল্‌—কিন্তু তার কারণও তো রয়েছে—সে-সময়কার পরিবেশের মধ্যে : তখন তার ঐ রকম ভোগার মতন অবস্থাও ছিলো।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—অতএব অকারণে হয়নি।

বাঙ্গেল্‌—(আঙুলে মোচড় দিতে দিতে) না। তবে তাকে সান্ত্বনা দিতে

পারছিনে যে! সলাপরামর্শই বা কী দিই? একেবারে অথই জলে পড়ে গেছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—এখন যদি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও এমন পরিবেশের মধ্যে যেতে পারতে, যেখানে তাঁর মনের সহজ খোরাকের কমতি নেই, তাহলে বোধহয় ভালো হতো!

বাঙ্গেল্‌—বন্ধু! তুমি কি মনে করো আমি তাঁকে চেঞ্জে যাবার কথা বলিনি? বলেছিলুম, চলো স্কিওলভাইকেনে যাই। বল্লে যাবে না।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কেন?

বাঙ্গেল্‌—বল্লে, এতে ফায়দা নেই। হয়তো ওর কথাই ঠিক।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—তুমিও তাই বলো?

বাঙ্গেল্‌—যখন আদ্যন্ত ভেবে ভেবে দেখি তখন আদৌ মনে হয় না, চারদিক সামলে যাওয়া সম্ভব। দেখো, মেয়েদের দিক থেকে বিচার করলে ঐ রকম একটা নির্জ্জন স্থানে যাওয়া ক্ষতিকর। এদের এমন জায়গায় থাকা দরকার যেখানে একদিন তাদের জীবনের অন্তত একটা গতি হতে পারে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—এখনি তুমি তাই ভাবছো?

বাঙ্গেল্‌—হা ভগবান্‌! না ভেবে উপায় কি? আবার রুগ্না এলীডারও একটা হিল্লে করা চাই;—বেচারী! প্রকৃতপক্ষে আমার অবস্থা, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—আমি কি বলি, জানো?—বোলেতের জন্যে তোমার ভাবনা অনাবশ্যক। (মধ্যখানে থামিয়া) ও—ওরা গেলো কোথায় এখন? (উন্মুক্ত দরজার নিকটে গিয়া বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।)

বাঙ্গেল্‌—ও! আমায় যদি কেউ বলে দিতো, এদের তিন জনের-ই জন্যে কী স্বার্থ আমায় ত্যাগ করতে হবে!—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখতুম।

(এলীডা বাম দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইব্‌সেনের "The Lady from the sea" হইতে অনূদিত

পুস্তক-পরিচয়

পৃথিবী—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য (পূর্বাশা প্রেস) দাম: একটাকা।

এই কবিতার বইটি পড়ে সবিশেষ আনন্দলাভ করলাম। আজকের দিনে কোনো কবিতা সম্বন্ধে এ-কথা বলতে পারা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, যতটুকু বুঝতে পারি, মনে হয়, আজকের দিনে কবিতার উদ্দেশ্য অনাবশ্যক খুসি করা নয়, অনাবশ্যক চমকে দেয়া। যতটুকু বুঝতে পারি বলছি, কেননা বোধগম্যতা আর আধুনিক কবিতার ভূষণ নয়। পাঠক যদি বুঝতে পারলো তবে, আধুনিক কবি তার কাছে অবিসম্বাদিত ছোট হয়ে গেল; তাই চার লাইন লিখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন মুছে ফেলে দেয়াই হচ্ছে আধুনিক কবিতার কৃতিত্ব।

সমস্ত সার্থক আর্টই চেষ্টাকৃত, ব্যায়াম-সাপেক্ষ। কিন্তু সে-চেষ্টাটা নিশ্চেষ্ট দেখানোই হচ্ছে আর্টিষ্টের কাজ। টবে না বাগানে সেটা দেখবার নয়, দেখতে হবে ফুলের ফুটে-ওঠাকে। তাই, কবিতা গদ্যে না পদ্যে, বিষয়ে না ভঙ্গিতে, সেটা বিচার্য নয়, বিচার্য হচ্ছে সেটা সব কিছু সত্ত্বেও কবিতা কি না। আজকের জীবনের ভাষা গদ্য হোক তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দাবি আছে যে সেটাকে কবিতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর, গদ্য বলেই তার উপর দাবি বেশি। পদ্যে কবিতা লেখাটা অনেকাংশে সহজ—তার প্রধান সুবিধেই হচ্ছে মিল, সেটার থেকে কবিতা একটা কৃত্রিম মূল্য আহরণ করে। গদ্যে সেই সুবিধে নেই বলেই গদ্যে কবিতা লেখাটা নির্দয়রূপে দুঃসাধ্য। একমাত্র প্রতিভাবানই তার অধিকারী। কিন্তু গদ্য কবিতার বাহনরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে শুনে কয়েক বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যে কাব্যযশলিপ্সুদের ভিড় অনেক বেড়ে গেছে। সেটা সত্যিই খুব সুখের হত যদি সে-সব গদ্যকে সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে কবিতা বলতে পারতাম। যদি সেখানে পেতাম একটা খাঁটি আন্তরিকতা। যদি কৃত্রিম অলঙ্কার দেবার চেষ্টায় মিলের বদলে অভিধান বা পাণ্ডিত্যের আশ্রয় না নিতে হত। বস্তু পরিহার করে এখন নিয়ে

পড়েছি আমরা বিষয়ের চাকচিক্য। আর আমাদের দুবুদ্ধি হয়েছে দুর্বোধ হবার।

সঞ্জয়বাবুর কবিতাতেও আধুনিক কবিতার কৃত্রিমতার অনিবার্য্য সংস্পর্শ লেগেছে, তা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে যে যে-গুণে কবিতা কবিতা সেই কবিত্ব রয়েছে তাঁর লেখাতে। 'সব কিছু সত্ত্বেও' অধিকাংশ লেখা কবিতায় উপনীত হয়েছে। এবং তারি জন্যে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারলাম, আনন্দিত হয়েছি। জনতার মধ্যে থেকে নিজেকে চিহ্নিত করবার জন্যে যে তিনি বিকৃতির আশ্রয় নেননি এতেই তাঁর কাব্যাশ্রয়ী মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

আজকালকার একদিককার কবির গোষ্ঠীচিহ্ন হচ্ছে 'বামপন্থা'। পন্থাটা বামই হোক বা দক্ষিণই হোক, কবিতার বেলায় পন্থা শুধু একটি, তা হচ্ছে কবিতা হওয়া। আজকের দিনে ভাষা রূঢ় ও নিরাবেগ, ভঙ্গি নির্বাষ্প ও মোহহীন, জীবন বৈষম্যব্যঙ্গময়—তার আস্বাদ আসুক কবিতাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই আস্বাদটা কাব্যের আস্বাদ হোক সেইটেই বাঞ্ছনীয়। সঞ্জয়বাবুর কবিতাতে সেই কাব্যাস্বাদ পাওয়া গিয়েছে বলেই 'পৃথিবী' সার্থক রচনা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গোলাপ : শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী। (গুরুদাস লাইব্রেরী)।

সবার সাথে : শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। (বরেন্দ্র লাইব্রেরী)।

উপন্যাসের কাব্য-প্রবণতা 'শেষের কবিতা'য় চূড়ান্তভাবে ব্যক্ত হবার পরও বাংলা সাহিত্য তার প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে নি। কেননা 'শেষের কবিতা'ই আমাদের প্রথম কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস এবং রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের ঔপন্যাসিক সম্প্রদায় এই নতুন পথের সন্ধান পেয়ে কিছুকাল পরম উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তাতে অবশ্য 'শেষের কবিতা' জাতি-বিচারে অদ্বিতীয় থাকবার সৌভাগ্য লাভ করেনি কিন্তু গুণ-বিচারে এখনও তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে বুদ্ধদেববাবুর বা অচিন্ত্যবাবুর এ-ধরণের উপন্যাস সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় যে মূলত তা তাঁদেরই উপন্যাস, দ্বিতীয়ত তার কাব্যপ্রবণতা। নিজেদের

প্রতিভা বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁরা 'শেষের কবিতা'র আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। অনুপ্রেরণা সেখানে অনুকরণ হয়ে ওঠেনি যেমন হয়েছে 'রক্তগোলাপ' উপন্যাসখানিতে। নিঃসন্দেহ যে, লেখিকার কাব্যবোধ তীক্ষ্ণ, সুচারু সুঠাম এবং অভিজাত বর্ণনা-ভঙ্গী, স্বকীয়তার পরিচয় দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র দুরূহ ছিল না কিন্তু তবু প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় তিনি পাঠকদের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসখানাকে স্মরণ করবার সুযোগ দিয়েছেন। তাছাড়া 'রক্তগোলাপ' হাওয়ারই হর্ম্ম্য, শেষের কবিতার মত ভাবাদর্শের পাকা ভিত্তি তার নেই; 'শেষের কবিতা' রক্তগোলাপকে দেহ দিয়েছে, প্রাণ দেয়নি। অনুকরণ যে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যদি লেখিকা তা হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন তবে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য এঁর কাছে অনেক আশা করতে পারে।

'সবার সাথে'র লেখক আধুনিক যুগের উদারনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাবসম্পন্ন। তাঁর গল্পগুলোতে বাস্তবতার চিত্র আছে, সে-চিত্র যেম্নি ফিকে তেম্নি আবার তাতে ভাববিলাসের দুচারটে আঁচর আঁকা। যে শক্তি-সমূহের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমাজ-জীবন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে তার সম্বন্ধে হয়ত লেখক জ্ঞাতসারেই উদাসীন রয়েছেন, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ কেবল সে-ক্রিয়ার ফেনময় পরিণতির দিকেই। তাই সদসৎ বিচার করবার প্রবৃত্তিও তাঁর নেই, সবার প্রতি একটা সহৃদয়তার ভাব নিয়ে গল্পগুলোকে তিনি অগভীর, অস্মরণীয় করে তুলেছেন। অবশ্য গল্পনেশাসক্ত পাঠকের নিকট যে 'সবার সাথে' সুখপাঠ্য হবে না এমন নয় কিন্তু বইখানি সাহিত্যের সত্যিকারের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারেনি।

জগদীশ আচার্য্য

This War—Thomas Mann (Secker & Warburg).

আমরা আশা করতে পারি, মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রায় এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যে যুদ্ধকে মানুষ অনায়াসেই বর্জ্জন করতে পারে। বিচার-বুদ্ধিতে, নীতিজ্ঞানে এবং যান্ত্রিক পারদর্শিতায় সমাজসত্তার এখন সৌম্য, শান্ত, সংযত হয়ে আসবারই কথা। কেবল চিন্তাশীলের মনেই

নয় অতি সাধারণ লোকের মনেও এ কথাটা অবলীলাক্রমে উদয় হয় যে যুদ্ধ মানুষের জীবনযাত্রার পথকে সরল করে আনতে পারে না। 'যুদ্ধ সভ্যতার প্রসববেদনার মতই'—মুসোলিনির এ উক্তি ভাববিলাসীদের মনে উদ্দীপনা দিলেও অন্তঃসারশূন্য। কেননা গত মহাযুদ্ধের প্রসববেদনা কল্যাণকর সমাজব্যবস্থার জন্ম না দিয়ে এ-যুদ্ধেরই জন্ম দিয়েছে দেখ্‌তে পাই।

টমাস্ ম্যান শান্তিবাদী; এ শান্তিবাদ ভীরুতার স্বাভাবিক পরিণতি নয়, মনঃপ্রকর্ষদ্বারা তা অর্জ্জিত। নাৎসী-শাসিত জার্ম্মেণীর সংস্কৃতিসম্পন্ন সত্তার প্রতিবাদ হিসাবে 'This War' বইখানাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। নাৎসী শাসকদলের যুদ্ধমত্ততা যে জার্ম্মাণ সাধারণ্যের সহানুভূতি পেতে পারে না টমাস ম্যান এই পুস্তকটিতে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মিত্রশক্তির শান্তিকামনায় তিনি যথার্থই আস্থাবান যেহেতু তাঁরা যুদ্ধের অনিবার্য্যতাকে গ্রহণ করেছেন মাত্র। তাঁর মতে নাৎসীরা জার্ম্মাণ জাতিকে মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত করে সভ্যতার যে ক্ষত উৎপাদন করেছে তার বিষ কেবল বিজিত য়ুরোপের রক্তেই সঞ্চারিত হবে না জার্ম্মেণীর শিরায় এবং স্নায়ুতেও তা মৃত্যুর বীজ বপন করে যাবে। নাৎসী-সাফল্যের আপাত ঔজ্জ্বল্যে যারা মুগ্ধ তাদের মোহমুক্তির ব্যবস্থাও টমাস্ ম্যান পুস্তিকাটিতে করেছেন। তবে জার্ম্মেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেখক নিরাশ নন। জার্ম্মেণীর বর্ত্তমান লুব্ধ ও দুঃসাহসিক শাসকসম্প্রদায়ের অপসারণে যে রাষ্ট্রে এবং সমাজে নবসূর্য্যোদয় হবে এ সম্বন্ধে টমাস্ ম্যান নিঃসন্দেহ। এই নবসূর্য্যোদয়—নূতন সমাজব্যবস্থা কেবল জার্ম্মেণীরই নয় সমগ্র য়ুরোপেরই তা ভাগ্যলিপি বলে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। য়ুরোপের রাষ্ট্রসমূহ নাকি একই স্বার্থে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার এবং পারস্পরিক দায়িত্বজ্ঞানের একটি অভিনব, সৃষ্টিশীল পরিণতির দিকে ধাবিত হবে, সেখানে একাধিপত্য বিসর্জ্জন দিয়ে গ্রহণ করতে হবে সামাজিক সাম্য, আত্মবোধকে ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপত্তায় মিশিয়ে দিতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকেও এই পরিবর্ত্তনে দেহ-শুদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে এ সাবধানবাণী লেখক উচ্চারণ করেছেন।

সম্ভবত বইখানার কলেবর অতিমাত্রায় হ্রস্ব বলেই হিটলারবাদের সুচারু

বিশ্লেষণ না করে’ নাৎসীদ্বারা উৎপীড়িত লেখক স্থানে স্থানে আক্রোশ প্রকাশ করে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন—বইখানার যা সামান্য ত্রুটী শুধু এখানেই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

The Yearling—by Marjorie Kinnan Rawlings. (The Reprint Society Ltd, London).

শ্রীমতী রলিঙ্‌স্‌-এর এই মনোরম উপন্যাসখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের শেষে। আলোচ্য সুলভ সংস্করণ ছাপা হয়েছে সম্প্রতি। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহের হাঙ্গামায় বিলাতী গ্রন্থের আমদানী প্রায় বন্ধ হতে চলেছে, এবং আমাদের দেশের পাঠকসম্প্রদায় এই মূল্য হ্রাসের সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সারা কলিকাতা সহর তল্লাস ক’রে আলোচ্য গ্রন্থের একখানিও সংগ্রহ করতে পারিনি। প্রকাশকের ক্ষতি নাই কারণ গ্রন্থখানি কোন সাময়িক চাহিদা মেটাবার জন্যে রচিত হয় নি। মানবচিত্তের মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য্য বা বৈচিত্র্য অপরিবর্ত্তনীয় ও শাশ্বত সেইটুকু মাত্র অবলম্বন করে কাহিনী বিবৃত হয়েছে ব’লে কালের পরিবর্ত্তনে পুরাতন বা বাতিল হয়ে যাবার কিছু নাই। বরং উত্তর কালে যখন হিংস্র মানুষের অত্যাচারে অন্যান্য জীবকুল উৎসাদিত হবে তখন এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অমূল্য হয়ে উঠবে। এতে পশু, পক্ষী, মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ্য ও বিরোধের কথা অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কাহিনীটি গ’ড়ে উঠেছে একটি অশিক্ষিত চাষী, তৎপত্নী ও পুত্রকে অবলম্বন ক’রে। উদ্ভট কল্পনার বা বর্ণনার আতিশয্যের লেশমাত্র নাই। শব্দের মিতব্যয়িতা বিস্ময়কর, অথচ সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হয়েছে অজস্র ধারায়।

প্রায় আশী বছর পূর্ব্বের কথা। উত্তর-আমেরিকার ফ্লোরিডা অঞ্চলে তৎকালীন নির্জ্জনতম ও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে জনৈক নিরীহ ব্যক্তি বসতি স্থাপন করে। তার সাহস দেখে দূরের নদীতীরবর্ত্তী গ্রামবাসীরা অবাক; অনেকে বল্লে বাতুল। লোকটির শরীরের গঠন ছিল বালকের মত ক্ষুদ্র, তাই সকলে তাকে ডাকত ‘পেনি ব্যাক্সটার’—আসল নাম হচ্ছে এজরা এজেকিয়াল ব্যাক্সটার। একমাত্র প্রতিবেশী, দুর্দ্দান্ত ফরেষ্টার পরিবার, থাকতো ক্রোশ দুই

দূরে। তারা নবাগত লোকটিকে ভালমানুষ দেখে তাকে অনুর্ব্বর ঝোপ জমি গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু পেনি সহজে টলবার লোক ছিল না। সে বল্‌লে ও জমি হচ্ছে নেকড়ে আর শেয়াল ছানা পোষবার উপযোগী, আর তাকে লালন করতে হবে মানুষের ছেলেপিলে।

এ কথা শুনে ফরেষ্টারদের দাড়ি উচ্চ হাসিতে নেচে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একজন কটুভাষী বলেছিল—'বলি, এক পেনিতে কতগুলো হে-পেনি হয়, তোমার ঔরসে শেয়াল বাচ্ছা ছাড়া আর কি জন্মাতে পারে।'

পেনি নির্ব্বিরোধ ভাল মানুষ হ'লেও বুদ্ধিমান আর কর্ম্মকুশল ছিল। পাইন বনের উঁচু জমি পরিষ্কার ক'রে সে আবাদ সুরু ক'রে দিল। খেটেখুটে ঘর খাড়া ক'রে তুললো। তার সঙ্কল্পের জোর আর অধ্যবসায় দেখে ফরেষ্টাররাও বিস্মিত হলো। সব গুছিয়ে রেখে পেনি বিবাহ ক'রে নিয়ে এল নিজের দ্বিগুণ আকৃতির এক মেয়েকে। 'ওরা' ব্যাক্সটার-এর চেহারায় বহু সন্তানের জননী হবার সুলক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট, আর পেনিরও সাহস ও উদ্যমের অভাব ছিল না। যথাক্রমে অনেকগুলি সন্ততি ভূমিষ্ঠ হলো কিন্তু বাঁচলো না কেউ। ওক জঙ্গলটির মধ্যে পেনি তাদের কবর দিয়েছে সযত্নে। সংখ্যা বেড়ে যেতে বেড়া তুলে দিয়েছে। কাঠের ফলকে ছুরি দিয়ে খুদে খুদে লিখেছে—এজরা জুনিয়ার, লিট্‌ল ওরা, উইলিয়াম টি ; কতকগুলির আবার নামকরণই হয় নি। তাদের বেলায় লিখেছে—'বেবি ব্যাক্সটার, বয়স তিন মাস ছয় দিন' ; 'এই মেয়েটি দিনের আলো দেখেনি' ইত্যাদি।

তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত 'ওরা' ব্যাক্সটার সন্তানবতী হয় নি। জনশূন্য স্থানটির নীরবতা যখন পেনিকে আতঙ্কিত ক'রে তুলতে সুরু করেছে আর তার স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনার বয়স বিগত তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে হলো জডির জন্ম ! সে কিন্তু রীতিমত শাঁসে জলে বেড়ে উঠলো।

জডির জননী তার কনিষ্ঠতম সন্তানকে গ্রহণ করলো নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে। যেন যত কিছু ভালবাসা আর যত্ন মজুত ছিল সব পূর্ব্ববর্ত্তীদের দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেছে সে। কিন্তু পেনির অন্তঃকরণ তার পুত্রের প্রতি অনুরাগে উদ্বেল হয়ে থাকতো। পিতার দেয় বাৎসল্যের অতিরিক্ত দিয়ে এসেছে সে।

এই জডির বয়স যখন বারো তখন থেকে কাহিনীটি সুরু হ'য়ে শেষ হয়েছে এক বছর পরে। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে-বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া সম্ভব নয়। এপ্রিল হতে মার্চ-এর শেষ পর্য্যন্ত একটি সর্ব্বাঙ্গীন বছরের মধ্যে নৈসর্গিক অবস্থান্তরে যত রকম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে সব ধরা পড়েছে লেখনীতে। অধিকন্তু ফল, ফুল, ফসল ও উদ্ভিদের পরাবর্ত্তন : পশু পক্ষীদের যাওয়া আসা, ইত্যাদি এত বিবিধ ব্যাপারের সঙ্গে ব্যাক্সটার-এর চাষী জীবন বিজড়িত যে বাছাই চলে না। মোটকথা সরাসরি অনুবাদ না ক'রে গেলে গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এবং সমালোচনার স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে সে চেষ্টা করাও অনুচিত। অবশ্য পরিকল্পনার একটি মোটামুটি নক্সা দেওয়া চলে।

পেনি ব্যাক্সটার-এর জমির আয়তন হচ্ছে মাত্র একশত একার। স্ত্রী পুত্র ছাড়া তার আর কোনও সহকারী নাই। ফসল লাগায় ভুট্টা, রাঙা আলু, মটর, আখ, তামাক আর তুলো। শেষের দুটি ফসল সফল হ'লে তার বিনিময়ে সংসারে আবশ্যক জিনিষ পত্র আসে, বাকিগুলি সারা বছর মানুষ ও পশুর আহার্য্য যোগায়। গৃহপালিত জীবের মধ্যে আছে মুরগী, গরু, ঘোড়া, শুয়োর আর কুকুর। ঘোড়া আছে মাত্র একটি। কুকুর তিনটিই শিকারী হ'লেও তার মধ্যে একটি ছিল অপদার্থ। পেনি তার বদলে একটি বন্দুক জোগাড় করলো বেশ মজা ক'রে।

একদিন ভোরে উঠে সে দেখে শুয়োরের ঘরে রক্তারক্তি ব্যাপার। সবচেয়ে বড়টি অদৃশ্য হয়েছে। পায়ের দাগ দেখে বুঝলো দুর্দ্দান্ত 'শ্লু-ফুট'-এর কাজ। এই আঙুল-কাটা ভালুকের জ্বালায় বহু দূর দূর গ্রামের লোকেরাও আতঙ্কিত। জাঁতিকলের মধ্যে একটা আঙুল রেখে আসা পর্য্যন্ত সে এত ধূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যে তাকে বাগে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পেনি রক্ত অনুসরণ ক'রে শুয়োরটির ক্ষতবিক্ষত দেহ আবিষ্কার ক'রে টেনে নিয়ে এল। সবে শীতের শয্যা ত্যাগ ক'রে এসেছে বলে বেশী খেতে পারে নি। ভালুকের পাকস্থলী এই সময়ে কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে থাকে।

পেনি প্রতিকারের জন্যে বদ্ধপরিকর হলো। প্রথমে পাতলো ফাঁদ কিন্তু "শ্লু-ফুট' সে-মুখো হলো না। তখন গাদা বন্দুক, রসদ, জডি আর কুকুর সঙ্গে নিয়ে জঙ্গল ভেঙ্গে অগ্রসর হলো। জডির এই প্রথম মৃগয়া দেখা। সে

উত্তেজনায় ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এল কিন্তু পশ্চাৎ গমনের উপায় নাই। সে তার পিতার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জানতো। শেষ পর্য্যন্ত অনেক লুকোচুরির পর হাউণ্ড জুলিয়া দুর্দ্ধর্ষ ভালুকের নাগাল পেল। কিন্তু পেনির বন্দুক সহসা অকেজো হয়ে গেল কল কব্জার দোষে। নখাঘাতে আহত কুকুর দুটিকে হাতে ক'রে ছিনিয়ে নিতে হলো। তৃতীয় কুকুরটি নিরাপদ তফাতে দাঁড়িয়ে কণ্ঠনাদে সাহায্য করছিল। পেনি আহতদের ক্ষতস্থান ধুইয়ে শুইয়ে রেখে সেটিকে নিয়ে চললো ফরেষ্টারদের বাড়ী।

জডি সঙ্গে গেল। তার আনন্দের অবধি নাই। ফরেষ্টারদের বিকলাঙ্গ বিকৃতমস্তিষ্ক ভ্রাতা ফডারউইঙ্‌ হচ্ছে তার সমবয়স্ক ও একমাত্র বন্ধু, ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয়, তখন ফডারউইঙ্‌ তাকে নিজের উদ্ভট দিবাস্বপ্নের কথা বলে। এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ব'কে যায় যেন আজগুবী কথাগুলি ধ্রুব সত্য। জডি তার গল্প শুনতে ভালবাসে। আরও ভালবাসে তার পোষা বন্য পশু পক্ষীর বাচ্ছা দেখতে। বালকটি যখন আরও অনেক ছোট তখন দুটি খড়ের ডানা রচনা করে উড়তে চেষ্টা ক'রে হাড়গোড় ভেঙে পড়েছিল। সেই থেকে ফরেষ্টাররা তার খেলবার সাথী যোগাড় ক'রে এনে দিয়েছে অবিরত। ডাক নাম দিয়েছে 'ফডারউইঙ্‌'।

জডির মা পোষ্য জানোয়ারের নামে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠে, তাই বালকের ঐকান্তিক বাসনা অপূর্ণ থাকে। ছেলেটি ছিল ভাবপ্রবণ। এপ্রিল মাসের বসন্তের আবেশ তাকে পেয়ে বসে সহজেই। আনন্দের আবেগে সে ছুটে যায় যেদিক পানে পারে। হয় ত' মৌমাছি অনুসরণ ক'রে চাকের সন্ধান করতে গিয়ে কাজের কথা ভুলে আকাশ পানে চেয়ে দাঁড়ে থাকে। সে সময়ে হরিণের বাচ্চা হ'তে আরম্ভ হয়েছে। যমজ শিশুর পদচিহ্ন দেখলে পিতাকে বলে— 'ওর মায়ের ত' একটা থাকবেই—নিই না একটা।'

পেনি উৎসাহ দেয় না স্ত্রীর ভয়ে।

ফরেষ্টাররা ভালুক শিকারের রোমহর্ষক গল্প শুনে কুকুরটিকে ক্রয় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সম্মুখ সমরে অক্ষত থাকা অদ্ভুত বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপার। জডি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে শুনলো সে গল্প। এক বর্ণও মিথ্যা নয় অথচ সত্যের চেয়ে চমকপ্রদ। পেনি ফিরলো তার অভীষ্ট বন্দুক নিয়ে।

অতিরিক্ত কুল খেয়ে জ্বরে পড়লো জডি। বেশ আরামের পীড়া। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবে। পাখিদের সঙ্গে কথা বলে। অবাক হ'য়ে দেখে দরকার হলে তার মায়ের স্থুল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতখানি ক্ষিপ্র ও কার্য্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

আরোগ্যের পর পেনি জডিকে নিয়ে মাছ ধরতে গেল। মাছ শিকারে শ্রম আর উত্তেজনার চেয়ে আনন্দ বেশী। তাছাড়া কথা বলা চলে। তারা নিভৃতে থেকে দেখতে পেল এক পাল সারস পাখির নাচ—অদ্ভুত সুন্দর! পিতাকে গল্প বলবার জন্যে অনুরোধ করে জডি যখন তখন। নিঃসঙ্গ বনবাসে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে পেনির। জডি নিবিষ্ট হ'য়ে শোনে সামান্য ব্যাপারকে কতখানি মনোরঞ্জক ক'রে বলা যায়। পীড়িত বা বিহার-রত পশুকে দেখলে পেনির হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়ে যায়। 'স্লু-ফুট' যেদিন হানা দেয় সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিতা পুত্রে আলোচনা চলে শয্যার উপর। পেনি বলেছিল, "ও কি জানে শুয়োরগুলো গেলে আমাদের অনাহারে থাকতে হবে, সে বেচারা শুধু নিজের পেটের জ্বালা বোঝে।" সে রাত্রির গভীর অন্ধকারে জডি ভাবছিল তাদের ছোট্ট কুঁড়েটা হচ্ছে একটা কেল্লা আর চারদিক থেকে ক্ষুধার তাড়নায় নিশাচরেরা দিচ্ছে হানা। অনেক সময় জানালার কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে পায় জোড়া জোড়া লাল, নীল আর হলুদ চোখ।

একদিন পেনির নতুন বন্দুকের গুলিতে মস্ত এক হরিণ পড়লো। পিতা পুত্রে গেল নদীতীরের ভলুসিয়া গ্রামে মাংস বিক্রয় করতে। সেখানে বৃদ্ধা আত্মীয়া হাটো-র বাড়ী। আদর যত্ন পেল অপর্য্যাপ্ত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃদ্ধার নাবিক পুত্রের পক্ষপাতিতায় ফরেষ্টারদের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ হয়ে গেল।

তারপর জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে পেনির শূকরদের দল একদিন চরতে গিয়ে আর ফিরলো না। প্রতিহিংসাপরায়ণ ফরেষ্টারদের কাজ এই সন্দেহ ক'রে পেনি জডিকে নিয়ে অনুসন্ধানে বার হলো। অপ্রীতিকর চিন্তায় সে অন্যমনস্ক ছিল—সহসা আঙুর ঝোপের ভেতর হতে বিষাক্ত সাপে মারলো ছোবল। পেনি সাপটিকে গুলি ক'রে মেরে জঙ্গলের মধ্যে ছুটলো। দ্বিতীয় গুলিতে পড়লো সদ্যঃপ্রসবা এক হরিণী। জডি ভাবলো তার পিতা উন্মাদ

হয়ে গেছে। পেনি চকিতের মধ্যে হরিণীর দেহ চিরে যকৃত বার ক'রে লাগিয়ে দিল নিজের ক্ষতের উপর। জডিকে পাঠিয়ে দিল ফরেষ্টারদের কাছে। রোরুদ্যমান বালক ছুটে গেল ঊর্দ্ধশাসে।

ফরেষ্টারদের চেষ্টায় পেনির প্রাণ রক্ষা হলো। সে যতদিন শয্যাশায়ী রইলো ফরেষ্টারদেরই একজন তার ক্ষেতের কাজ ক'রে দিত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে। শূকরের পাল ফিরে এল একটি অতিরিক্ত সঙ্গী নিয়ে। পেনি এটিকে সন্ধির সর্ত্ত ভেবে গ্রহণ করলো সাদরে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য পুনরপি প্রতিষ্ঠিত হলো।

জডি সেই সদ্যঃভূমিষ্ঠ হরিণশাবকের কথা ভুলতে পারেনি। পিতার জীবনের আশঙ্কা কেটে গেলে তাকে নিয়ে এসে পালন করবার অনুমতি ভিক্ষা করলো। ওরা-র ঘোরতর আপত্তি পেনির নৈতিক কর্ত্তব্যমূলক যুক্তির কাছে দাঁড়াতে পারলো না। জডি অরণ্যের সেই স্থানটি তোলপাড় ক'রে তাকে খুঁজে নিয়ে এল।

এই হরিণশাবকের নামে গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে, সুতরাং এরপর আখ্যায়িকার মধ্যে তার স্থান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

জডির আদরের আতিশয্যে শাবকটি নধরকান্তি ও চঞ্চলমতি হয়ে উঠলো লাগসই একটি নামের জন্যে ফডারউইঙ্-এর শরণাপন্ন হ'তে গিয়ে জডি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সেদিন প্রভাতেই তার বন্ধু পরলোকযাত্রা করেছে। হরিণশাবককে বাইরে রেখে ভেতরে প্রবেশ ক'রে দেখলো বঙ্কিম দেহটি দিব্যি ঋজু হয়ে পড়ে আছে নিস্পন্দ নিঃসাড়ে। জডির এই প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। দুর্দ্দান্ত ফরেষ্টাররা ভেজা বেরালের মত মুহ্যমান কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গেছে।

পেনি তখনও দুর্ব্বল। সে শকটারোহণে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা আর পৌরহিত্য করলো। প্রার্থনার সময় সে বললে—"ভগবান, আমরা সামান্য মানুষ, ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। আমাদের হাত থাকলে ছেলেটিকে খোঁড়া করে রাখতাম না আর মাথাও বিকৃত হতে দিতাম না। তুমি ওকে সাধারণ মানুষ করে পাঠাও নি। বনের পশু পক্ষীর মনের কথা বোঝবার শক্তি দিয়েছিলে ওকে। প্রশান্ত ও ভদ্র করেছিলে। এখন ওকে ডেকে নিলে:

তা নাও, তবে ওকে খেলার সঙ্গী দিও কয়েকটি লাল পাখী, একটি কাঠবেড়ালি, একটি বেজি আর একটি খরগোস।”

এই অশিক্ষিত লোকটির প্রার্থনা শুনে ভগবান হেসেছিলেন কি কেঁদেছিলেন সে সংবাদ গ্রন্থে নেই কিন্তু পাঠকের চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

জডি প্রকৃতিস্থ হলে মৃত বন্ধুর পালিত পশুপক্ষীদের খাইয়ে বিদায় নেবার সময় শুনলো যে ফডারউইঙ্ রোগশয্যায় তার হরিণ-শাবকের নামকরণ করে গেছে ‘ফ্ল্যাগ’।

অগাষ্ট মাসে গরম পড়লো অসহনীয়। সুবিধার মধ্যে ক্ষেতের কাজ ছিল কম। শস্য পূর্ণাঙ্গ হয়ে গাছের ওপর শুখচ্ছে। এবার ভাঙতে হবে। রাঙা আলু হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। মুরগীর খাদ্য সান্‌ফ্লাওয়ার হয়েছে থালার মত বড়।

সেপ্টেম্বারের প্রথম সপ্তাহে দেখা দিল জলকষ্ট। একমাত্র আগাছা ছাড়া সকল উদ্ভিদ জ্বলে গেল। কুকুরগুলি বিষণ্ণ ও বিরক্ত হয়ে উঠলো। সাপ বেরিয়ে এল পথে ঘাটে। একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের সাদা পাখী উড়ে যেতে দেখে পেনি বললে “গতিক ভাল নয়, ঝড়ের লক্ষণ।” জডির মন আনন্দে নেচে উঠলো সকাল সন্ধ্যায় আলো বাতাসের মধ্যে সে ঋতু বদলের আভাস পেয়েছে কিন্তু সামুদ্রিক ঝটিকার উত্তাল রূপ কখনও দেখেনি। সেদিন সন্ধ্যার সময় সূর্য্যাস্ত হলো অদ্ভুত ভাবে। পশ্চিম দিগন্ত লাল আর গোলাপী না হ’য়ে সবুজ বর্ণ ধারণ করলো। পরদিন দুপুরে আকাশ এমন ঘনঘটায় অন্ধকার হয়ে এল যে মুরগীরা গেল ঘরে ফিরে। ডিম পাড়া বন্ধ ক’রে দিল। তারপর তীব্র গর্জ্জনের সঙ্গে নামল মুষল ধারা। আকাশ হতে পৃথিবী পর্য্যন্ত একটি নিরেট জলের দেওয়াল। বৃষ্টি কমলে হয় বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য। সাত দিন সাত রাত্রির অবিশ্রান্ত ঝড় জলে ফসল গেল নষ্ট হ’য়ে। বন্যাতে ভেসে গেল চতুর্দ্দিক। বিরামের দুদিন পরে ফরেষ্টাররা এল সংবাদ নিতে। সকলে একত্রিত হয়ে পরিদর্শনে বেরিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। মৃত ও অর্দ্ধমৃত পশু, পক্ষী ও সর্পের দেহে অরণ্যের নিম্নভূমি সমাচ্ছন্ন।

কয়েক দিন পর বন্যার জল নিষ্কাশিত হ’লে অবশিষ্ট বন্য পশুদের মধ্যে মহামারী দেখা গেল। পথে ঘাটে পীড়িত ও মৃত হরিণ নেকড়ে দেখতে পাওয়া যায়। সকলে পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। খাদ্যাভাব হলো প্রকট।

বছরের প্রথম তুষার পড়লো নভেম্বার মাসের শেষে। গাছে গাছে রঙ বদল হলো। অনাহারে মরিয়া নেকড়ের অত্যাচার ব্যতীত সকল ভীতি ক্রমশঃ উপশমিত হলো। নভেম্বার যখন ডিসেম্বারে পড়লো তখন জঙ্গলী হাঁসের মনস্তাপ-ব্যঞ্জক প্রখর চিৎকার ছাড়া আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বড়দিনের উৎসব আসন্ন। ব্যাক্সটার ও ফরেষ্টার পরিবার কতকগুলি ভালুক শাবক বিক্রয় ক'রে অর্থ সঞ্চয় করলো। জডি তার মাকে উপহার দেবে বলে লুকিয়ে লুকিয়ে মালা গাঁথলো জঙ্গলী বীজের। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে কি পুরস্কার দেবে মনে মনে স্থির করে নিল। ভলুসিয়াতে যাবে সকলে এই ব্যবস্থা পাকা হয়েছে এমন সময় গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল পুরাতন শত্রু 'শ্লু-ফুট।' পেনি সকালে উঠে দেখলো তার শেষ বাছুরটি অপহৃত। পায়ের দাগ সুস্পষ্ট। ক্রোধে দুঃখে মরিয়া হয়ে উঠলো সে। কঠোর সঙ্কল্প করে বসলো ভালুক না মেরে কোথাও যাবে না। জডিও চললো হরিণ শাবককে সঙ্গে নিয়ে।

ফ্ল্যাগ আর অসহায় দুগ্ধপোষ্য নাই। দিব্যি নেচে নেচে জঙ্গলের কচি পাতা খেয়ে চলে। লেশমাত্র ক্লান্তি নাই তার। লেক জর্জ্জ-এর কাছে গিয়ে জডি অবসন্ন হয়ে পড়লো। দ্বিতীয় দিনে ভালুকের সন্ধান পাওয়া গেল কিন্তু জলাভূমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হওয়া হলো দুঃসাধ্য। পরদিন ক্রিষ্টমাস, স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—তবুও পেনি ফিরলো না। রাত্রি কাটলো এক পুরাতন বন্ধুর পরিত্যক্ত কুটীরে। প্রভাতে একটি শতছিদ্র নৌকা পাওয়া গেল। শীত ও শ্রান্তি অগ্রাহ্য ক'রে চললো অনুসন্ধানে। শেষ পর্য্যন্ত হলো পেনির জয়। সৌভাগ্যক্রমে ফরেষ্টাররা উৎসবে চলেছিল সেই পথে। বিরাট ভালুকের মেদ ও মাংসের প্রাচুর্য্য তাদের ঈর্ষান্বিত করে তুললো কিন্তু অশ্বের ওপর স্থান দিতে ইতস্ততঃ করলো না তারা।

'শ্লু-ফুট'-এর অখ্যাতি ছিল সুদূরব্যাপ্ত। পেনির প্রশংসায় সকলেই শতমুখ হয়ে উঠলো। উৎসব তখন পূর্ণ আনন্দে চলেছে। ফরেষ্টারদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল নেশার সঙ্গে। রাত্রি শেষে তারা বৃদ্ধা হাটোর বাড়ীতে দিল আগুন লাগিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল না, কিন্তু ব্যাক্সটার পরিবারের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য গেল চূর্ণ হ'য়ে।

এদিকে হরিণশাবকটি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। জডি পিতার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে উৎকণ্ঠিত হয় কিন্তু হদিস পায় না তাঁর মনের কথার। ফ্ল্যাগকে সে নিভৃতে আলিঙ্গন ক'রে বলে, "ভয় কি, বাবার অভয় থাকলে মা কি করতে পারে"। মাকে খোসামোদ ক'রে সে ভুলিয়ে রাখতে চায় কিন্তু চপল হরিণ একটা না একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। তার বেহায়াপনা দিন দিন যেন বেড়ে চলেছে। জডি যখন শয়ন ঘরে চুরি ক'রে নিয়ে আসে তাকে, তখন আগের মত শান্ত থাকে না আর। সেদিন স্বয়ং ওরার ঘুমন্ত মুখের ওপর ভিজা নাকটি দিল ঘসে। আর এক দিন ভাঁড়ারে প্রবেশ ক'রে মটরের ডালা দিল উল্টে। বেঁধে রাখলে শ্বাসরোধের ভান করে, জডি তখন না খুলে দিয়ে পারে না।

ফেব্রুয়ারি মাসে পেনি বাতের ব্যাথায় বড় কাবু হয়ে পড়লো। অনেকদিনের অযত্ন ও তাচ্ছিল্যের ফল। বসন্তের ফসল বোনার কথা ভেবে সে চিন্তিত হয়ে উঠলো। একদিন সে লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে ক্ষেত পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলো তামাকের চারাগুলি হরিণের পায়ের চাপে গেছে নষ্ট হয়ে। জডির মনে কষ্ট না দিয়ে সে করলে বেড়ার ব্যবস্থা। মুখে বললে শুধু, "তোমার হরিণ ছানা বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে।"

মার্চ-এর ঝলমলে সোনালী রৌদ্রে চারিদিকে গেল ছেয়ে, গাঁদার হলুদে, পাকা পিচ ফলে, জঙ্গলী প্লামের রঙে রঙে হলো ছয়লাপ। লাল পাখিরা সারাদিন ধরে গান গেয়ে গেয়ে যখন বিরাম নেয় তখন সন্ধ্যার পাখিরা ভিন্নসুরে তাদের কণ্ঠসঙ্গীত আরম্ভ করে। পেনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েছে কিন্তু একটি গাছের গুঁড়ি উপড়ে ফেলতে গিয়ে তার কোমর গেল ভেঙে। তার আর শয্যাত্যাগ করবার সম্ভাবনা রইলো না। জডির ঘাড়ের ওপর পড়লো ক্ষেতের তত্ত্বাবধানের কাজে। প্রতিদিন প্রভাতে এসে সে পিতাকে সংবাদ দিয়ে যায়। সম্প্রতি এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় পেনির স্বহস্তে পোঁতা বীজ হতে অঙ্কুর বেরিয়ে আঙুল প্রমাণ ঠেলে উঠেছে। সুসংবাদ শুনে বালিশের ওপরের মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। পরদিন জডির আর পা সরে না। শ্যামল কলিগুলি ইন্দ্রজালের মত অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ফ্ল্যাগ-এর পদচিহ্ন। পেনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে—"এই ভয়ই করছিলাম—আর একার চেষ্টা করবার

সময় এখনও আছে, বড় বড় বীজ পুঁতে উঁচু করে বেড়া খাটিয়ে দাও।” ফ্ল্যাগকে বিতাড়িত করা হলো না।

জডি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফ্ল্যাগকে আলিঙ্গন ক'রে অনেক কথা বললো। ওরা-ব্যাক্সটার স্বামীর সঙ্গে তর্কে পরাজিত হ'য়ে রুষ্ট হয়ে রইলো! জডি আহার নিদ্রা ভুলে কার্য্যে মেতে গেল। শস্যের বীজ বোনা হলো নূতন ক'রে। বেড়া রচিত হলো পাঁচ ফুট উঁচু। পুত্রের সাধনা দেখে পেনি প্রীত হ'য়ে তাকে জানিয়ে দিল সে কতখানি গর্ব্ব অনুভব করছে। পেনি এত স্বল্পভাষী যে তার কাছ থেকে সামান্য উৎসাহ পেলে জডি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যায়। দু'বার বৃষ্টি হয়ে অঙ্কুর দেখা যেতে জডি ফ্ল্যাগের পা বাঁধতে চেষ্টা করলো কিন্তু সে আছাড় খেয়ে এমন বিভ্রাট বাঁধিয়ে তুললো যে না খুলে দিয়ে পারলো না! রাতারাতি বেড়া তুললো আর এক ফুট উঁচু।

পরদিন ফ্ল্যাগ অনায়াসে বেড়ার সর্ব্বোচ্চ জায়গা দিয়ে ডিঙিয়ে এসে জডির চোখের সামনেই ক্ষেত উজাড় ক'রে দিল।

এবার পেনি পুত্রকে শয্যাপ্রান্তে ডেকে বললে “যত কিছু করা সম্ভব ছিল সব করা গেল। আমরা তো আর অনাহারে মরতে পারবো না। তুমি ওকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে গুলি করে মারো।”

জডি বললে সে কখনই তা করতে পারবে না। সারাদিন ফ্ল্যাগকে সঙ্গে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ফরেষ্টারদের দ্বারস্থ হলো, কিন্তু তারা তখন অশ্ব ক্রয় করতে গেছে বিদেশে। গভীর রাত্রে হতাশ হয়ে ফিরলো সে। সঙ্গে তার ফ্ল্যাগ।

পেনি স্নেহভরে বললে—“কথা শুনলে না কেন?”

জডি বললে যে সে আদেশ পালন করতে পারলে না।

তাকে সরিয়ে দিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর এক দফা হলো মৃদু তর্কযুদ্ধ। তারপর অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠে ছুটে গেল জডি। তার মায়ের হাতে বন্দুক, আর আহত হরিণশাবকটি প'ড়ে প'ড়ে উঠছে। 'ওরা' বল্‌লে, “আমি মারতে চাইনি, আমার হাতে যে টিপ নাই”—জডি ছুটে গেল ফ্ল্যাগের কাছে কিন্তু সে তাকে আর বন্ধু ব'লে চিনলো না। যন্ত্রণায় আতঙ্কে রুধিরাক্ত ভাঙ্গা পা টেনে টেনে কুরঙ্গ ছুটেছিল, তারপর গড়িয়ে পড়লো গর্ত্তের মধ্যে।

পেনি নিজেকে কোন প্রকারে টেনে এনেছিলো শয্যা হ'তে—চিৎকার ক'রে বললে, "আমি দাঁড়াতে পারলে নিজে মারতাম—তুমি ওর যন্ত্রণা শেষ ক'রে দাও জডি।"

বালক বন্দুকের নলটি মসৃণ গলার ওপর রেখে ঘোড়া টিপে দিল। তারপর বন্দুক ফেলে দিয়ে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে উপর্য্যুপরি বমনোদ্গার করতে লাগলো। উন্মাদের মত আঙুলে ক'রে মাটি খুঁড়লো, বুকে করাঘাত ক'রে বলতে লাগলো, "কেন তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে বাবা ?"

নিদারুণ অভিমানে, দুর্ম্মদ শোকে চ'লে গেল সে নদীর পানে। ভালুক শিকারের সেই জীর্ণ নৌকা সংগ্রহ ক'রে ভেসে গেল স্রোতের মুখে।

পরদিন সূর্য্যালোকের তাপে ঘুম ভেঙে দেখলো হ্রদের বিরাট বিস্তারের মধ্যে এসে পড়েছে। চারদিকের জনশূন্য নীরবতা তার মনে তীব্র শঙ্কা জাগিয়ে তুললো। প্রাণপণে সে তীরের দিকে বেয়ে যেতে চেষ্টা করলো। প্রখর দুঃসহ ক্ষুধার উদ্রেক হলো। আর একদিন কাটলো অনাহারে। অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে শূন্য পাকস্থলীর উৎকট যন্ত্রণা অনুভূত হলো নিরন্তর, তারপর তার ভাসমান অচেতন দেহ উত্তোলন করলো সরকারী জাহাজ।

বালক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে দেখলো পেনি একাকী কম্বলাবৃত হয়ে পড়ে আছে চুল্লীর পাশে। তার অনাহারক্লিষ্ট অস্থিসার অবস্থা দেখে পেনি আহার্য্যের ব্যবস্থা ক'রে জডির কথা শুনে ধীরে সুস্থে বললে, "তোমার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম—মা গেছে রসদ সংগ্রহ করতে—তুমি তাহলে উপবাস কাকে বলে জেনেছ, এখন তাহলে বুঝেছ কিসের আশঙ্কা করছিলাম।"

সেদিন রাত্রে জডি ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলো 'ফ্ল্যাগ'। সে কণ্ঠস্বর কিন্তু তার নিজের নয়। সেটি হচ্ছে একটি বালকের। ঝর্ণার গর্ত্তের পিছনে, ম্যাগনোলিয়া গাছের আড়ালে, ওক গাছের তলায় একটি বালক আর একটি হরিণ শাবক পাশাপাশি ছুটে ছুটে জন্মান্তরে চলে গেল।

গ্রন্থখানির একটি কঙ্কালসার বিবৃতি দেওয়া গেল। দুঃখের বিষয় অস্থি-সংযোজনা করতে এতখানি স্থান গ্রহণ করলাম যে মেদ মাংসে ভরাট ক'রে রচনার সৌন্দর্য্যময় প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হলো না।

তিনটি কমনীয় চরিত্রের কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয়ে ওঠে নি। তাদের

মধ্যে একটি হচ্ছে মাতাল ডাক্তার, আর একটি বৃদ্ধা হাটোর মেরুদণ্ডহীন প্রণয়ী 'ইজি ওজেল' ও তৃতীয়টি পেনির প্রথম যৌবনের প্রণয়িনী নেলী। এত অল্প কথায় ও লঘুভাবে এই চরিত্রত্রয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে যে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ব'লে মনে হয় কিন্তু গ্রন্থখানি বন্ধ করলে দেখা যায় প্রত্যেকে কাহিনীর সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে যেন।

ওরা-ব্যাক্সটার-এর চরিত্রে নরম ও গরমের এত ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ ঘটেছে যে বিশ্লেষণ করা কঠিন। কথায় বলে স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারও অজ্ঞেয়—সে হচ্ছে এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু এই চরিত্রের প্রণিধানেই গ্রন্থকর্ত্রীর লিপিসংযমের মহত্ত্ব উপলব্ধি হয়। মাতৃস্নেহের মত ভাবপ্রবণ ব্যাপার লিপির কঠোর অনুশাসনে নিছক স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পেনির বাৎসল্য বোধে অনুমাত্রও আতিশয্য নাই, আছে তার আত্মার স্বরূপ প্রকাশ। জডির পশুপ্রীতি সঙ্গীহীন ও প্রাণবন্ত বালকের পক্ষে স্বাভাবিক। ফরেষ্টাররা অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর ও মদ্যপায়ী হ'লেও নৈতিক কর্ত্তব্য সাধনে সাড়া দিত অপ্রত্যাশিত তৎপরতার সঙ্গে। এরাই যে বর্ত্তমান উদ্যমশীল মার্কিন জাতির উপযুক্ত অগ্রগামী তাতে সন্দেহ থাকে না।

পেনির অনাবিল রসিকতা হচ্ছে গ্রন্থখানির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

প্রতিকূলে বলবার মত একটি মাত্র বড় কথা আছে। শিকারের বিবৃতিগুলি চিত্রকল্প হ'লেও স্বাভাবিক নয়—যে-কোন অভিজ্ঞ পাঠক বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রাচুর্য্যে ও অনায়াসলভ্য পশুর সমাগমে বিরক্ত হয়ে উঠবে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

বাংলায় ভ্রমণ (১ম ও ২য় খণ্ড)—অমিয় বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত (ই, বি, রেলওয়ের প্রচার বিভাগ)। ১॥০।

সমগ্র বাংলার এবং বাংলার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির যে-যে অংশের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠতা আছে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণী, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বইখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইখানি রেলযাত্রীদের সুবিধার জন্য লিখিত হইলেও সাধারণ পাঠক পড়িলে উপকৃত হইবেন। "বাংলায় ভ্রমণ" চিত্রাবলীতে সমৃদ্ধ এবং ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

'সমসাময়িক'

বাংলা পত্রিকার আসরে নবতম আগন্তুক ত্রৈমাসিক 'সমসাময়িক'। নয়টি গদ্য-রচনা, পাঁচটি কবিতা ও দুইটি পুস্তক-সমালোচনা বহন ক'রে সম্প্রতি এর আবির্ভাব হয়েছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত, পরিচালক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার সান্যাল একেবারে অপরিচিত নন। নীরদবাবুর সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা আছে, কেননা এক সময়ে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনা করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির গোড়াপত্তন হয় ঐ পত্রিকায় লিখিত একটি রচনায়—যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিকের খ্যাতি যে নিতান্তই ভুয়ো তা প্রমাণ করা। এই সাধু উদ্দেশ্য সফল না হ'লেও শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখনী যে বিদ্বেষ ও বৈদগ্ধ্য উদ্গারে সমান দক্ষ তা ঐ রচনাটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিল।

কিন্তু নীরদবাবু শুধু বিদগ্ধ নয়, পণ্ডিত। বাংলাদেশের সাংবাদিক মহলে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রায় কিম্বদন্তীর মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই কিম্বদন্তী তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির সহায় না অন্তরায় বলা কঠিন। যাই হোক, নবপ্রকাশিত 'সমসাময়িক'-এ তিনি যে সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয় সাধনের সুযোগ পেয়েছেন তার প্রমাণ 'যুদ্ধের নূতন টেক্‌নিক্' প্রবন্ধ। কেননা, তাঁর জ্ঞানচর্চা বহুমুখী হ'লেও, তার প্রধান আশ্রয় যুদ্ধ-শাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের একাধিক রাষ্ট্র-নেতা নীরদবাবুকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মসীর সঙ্গে অসির শব্দগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও ব্যবহারিক ব্যবধান অপরিমেয়। এই ব্যবধান নীরদবাবু সঙ্কুচিত করবেন এ রকম উদ্ভট আশা আমার অবশ্য নাই। তবে এই আশা করা অসঙ্গত হবে না যে তাঁর লেখনী মারফৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক গূঢ় রহস্য যে-ভাষায় আমাদের কাছে ব্যক্ত হবে তা সাহিত্যিকের ভাষা, পণ্ডিতের নয়। 'যুদ্ধের নূতন টেকনিক্' প্রবন্ধে যে এই আশা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে তা বলতে পারি না, কেননা সুলিখিত হ'লেও এই প্রবন্ধটি যথেষ্ট সারবান নয়—অর্থাৎ লেখকের খ্যাতির অনুপাতে।

'সম্পাদকীয় আলোচনা'ও যে ঠিক আশানুরূপ লাগেনি তার প্রধান কারণ বোধ হয় সম্পাদকের এই খ্যাতি। সম্পাদক মশায় যদিও প্রথমেই স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও 'পলিসি' প্রসঙ্গে তাঁর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই, তবু তিন পাতা জুড়ে এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে 'নিষ্কাম জ্ঞানযোগ'ই পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "এই মানসিক 'লেসে ফেয়ার' হাল ফ্যাসানের বিরোধী।" হাল ফ্যাশান বলতে যদি তিনি 'যুগধর্ম্ম' বোঝেন তাহ'লে তাঁর উক্তি না মেনে উপায় নাই। কিন্তু 'ফ্যাশান' বলতে বাংলায় যা বোঝায় এই মানসিক 'লেসে ফেয়ার' মোটেই তার

বিরোধী নয়। কেননা, বুদ্ধির মুখোস প'রে প্রগতির আবেগকে ব্যঙ্গ করা যে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের চিরকালের ফ্যাশান ইতিহাসবিৎ নীরদবাবুর তা জানা উচিত। নীরদবাবু যে এই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দলভুক্ত তা আমার কল্পনারও অতীত। কিন্তু, তাঁর এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে যে-সব প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে সেগুলির গূঢ় অভিপ্রায় তিনি যতক্ষণ পরিষ্কার ক'রে ব্যক্ত না করেন ততক্ষণ পাঠকের মনে তাঁর উদ্দেশ্য ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তবু, নিষ্কাম জ্ঞানযোগে সিদ্ধি লাভের পথ 'সমসাময়িক' যদি সুগম করে আমাদের সকলের পক্ষেই তা অত্যন্ত শুভ সংবাদ হবে, কিন্তু বাংলাদেশে বোধ হয় এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নাই যে নিষ্কলুষ নির্বিকার নির্লিপ্ত বুদ্ধির চর্চা নৈয়ায়িক নিষ্ফলতায় বা আত্মরতির বিচ্ছিন্ন বিলাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি এবং এর একমাত্র প্রতিষেধক সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদকে জ্ঞানমার্গ থেকে একেবারে বহিষ্কৃত না করা।

সম্পাদক মশায়ের আরও একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "ব্যক্তি বা দল হিসাবে আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও সাহস অত্যন্ত কম, সেজন্য আমাদের পক্ষে একটা মানসিক বা শারীরিক ভঙ্গী লইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নাই।" শারীরিক ভঙ্গীসহ সম্পাদকীয় উপস্থিতির দুরাশা বা দুঃস্বপ্ন কোনো পাঠক পোষণ করেন কিনা জানি না, কিন্তু এই জাতীয় অঘটন সম্ভাব্যতার বাইরে ব'লে অন্তত আমার ভরসা আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মানসিক ভঙ্গী সম্বন্ধে সম্পাদকীয় আশ্বাস মেনে নেওয়া একটু কঠিন। তার কারণ ভঙ্গী বলতে মত বোঝায় না—মতের ন্যায় ভঙ্গী প্রকাশ করা বা না করা ঠিক ইচ্ছাধীন নয়। ভঙ্গীর জন্ম অনেকটা অবচেতন লোকে, অনেকটা ইচ্ছানিরপেক্ষ অভ্যাসে। সুতরাং এর ওপর কর্তৃত্ব চলে না। আর যদি আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ভঙ্গীর অন্তরায় হয়—তাহলে এ বিষয়ে নীরদবাবুর বিনয় অত্যুক্তি। ট্রামে অপরিচিত আরোহীর মুখে "প্যারিস কি প'ড়ে গেছে?" এই প্রশ্ন শুনে যিনি মাতৃভাষার অপপ্রয়োগে তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য বিস্মৃত হ'ন, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে ব'লে আক্ষেপ করার কোনো কারণ তাঁর নাই, আর সম্পাদকীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবে এই তুচ্ছ ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে তাতে একেবারেই ভঙ্গীর অভাব সূচিত হয় না।

কিন্তু ভঙ্গীর প্রকাশ শুধু সম্পাদকীয় মন্তব্যে নয়, আর একটি প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—'ইওরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে'। অকারণ উচ্ছ্বাস, অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য, কপট বিনয় ও অকপট রসোপলব্ধির বিচিত্র উপাদানে সংমিশ্রিত এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী ভঙ্গীসত্ত্বেও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে লেখকের অসাধারণ মুন্সিয়ানার গুণে। 'সমসাময়িক'-এর আর একটি উপভোগ্য রচনা—'হস্তী শিকারে অভিজ্ঞতা'। কিন্তু এর মধ্যে কোনো ভঙ্গী নাই—লেখক অত্যন্ত সরলপ্রাণ, যদিও তাঁর লেখার হাত খুবই পাকা।

বুদ্ধিমান জীব ব'লে যদিও হস্তীর খ্যাতি আছে, তবু হস্তী-শিকার কাহিনীকে ঠিক নিষ্কলুষ বুদ্ধিমূলক রচনার আদর্শ বিষয় ব'লে মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু এই কারণে কেউ যেন মনে না করেন, 'সমসাময়িক' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবৃতির ফলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত জ্ঞানমার্গ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছে—কেননা এই সংখ্যার বাকি রচনাগুলি সবই অল্পবিস্তর নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানচর্চার পরিচায়ক। এই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে চেতনার যোগ হয়েছে দুটি পলিটিক্যাল প্রবন্ধে। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার লিখিত 'বাংলার আধুনিক পলিটিক্‌সের নিষ্ফলতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশা করি ভবিষ্যতে এই রকম প্রবন্ধ আরো ছাপিয়ে 'সমসাময়িক' নিজ নামের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবে।

এই সংখ্যায় পুস্তক-সমালোচনা যে দুটি আছে, দুটিই উচ্চশ্রেণীর ত্রৈমাসিক পত্রিকার মর্যাদা রক্ষা করবে—সমালোচকদের মতামত সম্বন্ধে আপত্তি হ'লেও। কিন্তু 'ক্লাইভ বেল'-রচিত 'সভ্যতা' পুস্তকের যে অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ হয়েছে তার জন্যে পরিচালককে আমরা প্রশংসা করতে পারলাম না। তাঁর অনুবাদ খুবই দক্ষ হয়েছে সন্দেহ নাই, বিষয়টিও গুরুতর, কিন্তু সভ্যতা সম্বন্ধে ক্লাইভ বেল-এর বাণী বিশেষ সার্থক ব'লে মানতে আমি রাজি নই। পরিচালক মশায় কি অনুবাদের যোগ্যতর বই পেলেন না?

'সমসাময়িক'-এর পাঁচটি কবিতার মধ্যে দু'টি রবীন্দ্রনাথের—একটি মৌলিক রচনা, অপরটি চার্লস্ এণ্ড্রুজ-এর রচিত কবিতার অনুবাদ। যদি মূল কবিতাটি এই অনুবাদের কাছাকাছিও পৌঁছায়, তাহলেও বলতে হবে সেটি সত্যি মহৎ কবিতা।

বাকি তিনটি কবিতাই দীর্ঘপয়ারে রচিত। আঙ্গিকের দিক থেকে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত-রচিত 'বৈশাখী পূর্ণিমা' উল্লেখযোগ্য—ছেদ ও যতি স্থাপনে বৈচিত্র্যের জন্যে।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—"আমার মরণে হবে"—কবিতায় মৃত্যুর পরে কি হবে তা' কল্পনা ক'রে লিখছেন:

> তারপর মোরে লয়ে বিশ্বের এ রসায়নাগারে
> চলিবে অপূর্ব্ব খেলা। দেহমন ভাঙি তিলে তিলে,
> প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় পাবকে শোধন করি তারে,
> সৌন্দর্য্য কণিকারূপে ছড়াইবে সমগ্র নিখিলে।

এই পংক্তিগুলি প'ড়ে স্বভাবতই ওয়ল্‌ট্ হুইট্‌ম্যান্-এর This Compost কবিতাটি মনে পড়ে। নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে এই দুটি কবিতার সাদৃশ্য পরিষ্কার হবে:

What chemistry !......Now I am terrified at the Earth, it is that calm & patient, It grows such sweet things out of such corruptions, It turns harmless on its axis, with such endless succession of diseased corpses, It distils such exquisite winds out of such infused fetor. * * * *

হ

ন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৪৭

পরিচয়

জীবন্মুক্তির পরে

উপনিষদের ঋষিরা অদ্ভুত মনীষাবলে যে অপূর্ব সাধন-মন্দির রচনা করিয়াছেন—যাহার চূড়া জীবন্মুক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—সেই সুগঠিত সুপ্রাচীন মন্দিরের পরিকল্পনার উৎস কে ? উৎস ব্রহ্মণ্যদেব—ঋষি মহর্ষিরাও যাঁহার প্রভব জানেন না—যিনি মহর্ষিদিগেরও আদি, যিনি পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ (যোগসূত্র, ২।১৭) অর্থাৎ, যিনি পরমগুরু পরাৎপর গুরু—যিনি ত্রিকালাতীত, যিনি চিরন্তন সনাতন (Eternal Now)—সেই অনাদি-নিধন ব্রহ্মণ্যদেব। উপনিষদের ঋষিরা সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের পরিকল্পনার অনুসরণ করিয়া ঐ সাধন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন মাত্র।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ঐ মন্দিরের গোপুরের অভিমুখে নানা দিক্ দেশ হইতে বহুবিধ পথ প্রবাহিত হইয়াছে—কেহ কর্মের পথ, কেহ জ্ঞানের পথ, কেহ ধ্যানের পথ, কেহ ভক্তির পথ ইত্যাদি। সকল শ্রেণীর সাধকই ঐ মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু যিনি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইয়াছেন তাঁহারই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার। অপরে ঐ মন্দিরের চূড়াস্থিত আলোক দেখিয়া আশ্বাসিত উৎসাহিত হন বটে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না।

ঐ সাধন-চতুষ্টয় কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। বিবেক কি ? বিবেক অর্থে আত্মা ও অনাত্মার, সৎ ও অসতের ভেদ-উপলব্ধি। যিনি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহার চিত্তে বিষয়-ভোগের উপর বিরক্তির ভাব উৎপন্ন হয়। উহারই নাম বৈরাগ্য। ষট্‌সম্পত্তি যথাক্রমে —শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। বহিরিন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম এবং অন্তরিন্দ্রিয়-সংযমের নাম শম। হৃদয়ে বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইলে ইন্দ্রিয়েরা আর মাত্রা-স্পর্শের লোভে বাহ্য বস্তুর অভিমুখে ধাবিত হয় না। তখন সাধক অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ চিত্ত-নিরোধ করিতে সক্ষম হন। এইরূপে দুর্নিবার চঞ্চল মন বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করে।

তিতিক্ষা সহিষ্ণুতারই নামান্তর। যে গুণ আয়ত্ত হইলে সাধক সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ সমান জ্ঞান করিতে পারেন, অবস্থার বিবিধ বিপর্যয়, সম্পদ-বিপদ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তুল্য বোধ করেন, সেই গুণের নাম তিতিক্ষা। তিতিক্ষা অর্জিত হইলে সাধক রাগদ্বেষের অতীত হন ; তখন তিনি আর প্রিয় লাভে প্রহৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না।

উপরতি অর্থে অসীম উদারতা—সেই ভাব, যাহা আয়ত্ত হইলে শত্রু-মিত্র, উচ্চ-নীচ, ইষ্ট-দ্বিষ্ট সকলের প্রতি একটা সমতা, একটা উপেক্ষা-বুদ্ধি জাগরিত হয়। সংসার-চক্র বিধাতার নিয়মে পরিচালিত—তাঁহার পথে প্রধাবিত—এই ধারণা সাধকের হৃদ্‌গত হওয়াতে তিনি আর কিছুতে বিচলিত হন না। তিনি সকল বস্তু সকল ব্যক্তি সকল অবস্থার প্রতি সমান উদার অবিচলিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন।

শ্রদ্ধা অর্থে নির্ভরের ভাব—ভগবান্ বা গুরুর প্রতি এবং সাধকের আপনার উপর নির্ভর। গুরু যে সাধন-মার্গ উপদেশ দিয়াছেন, সেই ঠিক পথ ; সেই পথ ধরিয়া গেলে আমি তমসের পরপারে পহুঁছিব, আর ঐ পথ দুর্গম হইলেও উহা আমি অতিক্রম করিতে অবশ্য সমর্থ হইব—সাধকের এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

সমাধান অর্থে স্থৈর্য—বিক্ষিপ্ত চিত্তের সাম্যাবস্থা। যে অবস্থায় মনে সন্তোষ, শান্তি, স্বচ্ছ ভাব ফুটিয়া উঠে—তাহার নাম সমাধান। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে অবিচলিত সাগর-শৈলের সহিত এই সমাধান তুলনীয়।

সাধক যখন এই ষট্‌সম্পত্তি আয়ত্ত করেন তখন তাঁহার চিত্তে মুমুক্ষুত্ব আপনি জাগরিত হয়। এই ভঙ্গুর নশ্বর জগতে সকলই অস্থায়ী—এই তুচ্ছ সংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল, এ চক্রে একবার জড়িত হইলে অনন্তকাল ভ্রমণ করিতে হয়। সাধক এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং পৃথিবীতে বারংবার গতাগতিতে নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়া সংসার-নিবৃত্তির পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহারই নাম মুমুক্ষুত্ব।

বৃহদারণ্যক ঐ সাধন-চতুষ্টয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—

তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরত তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্‌মা তরতি, সর্বং পাপ্‌মানং তরতি। নৈনং পাপ্‌মা তপতি, সর্বং পাপ্‌মানং তপতি। বিপাপো বিরজো হবিচিকিৎসা ব্রাহ্মণো ভবতি। (৪।৪।২৩)

"শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া এবংবিৎ আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন। পাপ তাঁহাকে তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন—পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। বিপাপ বিরজঃ বিসংশয় তিনি 'ব্রাহ্মণ' হন।"

এইরূপ চরিতার্থ পুরুষকে বৃহদারণ্যক 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন অকামহত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

আর একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঋষিদিগের রচিত ঐ সাধনমন্দির সপ্ত-তল এবং এক একটি তলা উত্তীর্ণ হইয়া তবে তাহার উপরিতন তলে উঠিতে হয়। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক তলের সংসৃষ্ট একটি উপযোগী দীক্ষা আছে এবং এক একটি তল অতিক্রম করিতে হইলে সাধককে একটি একটি স্বতন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। মন্দিরের প্রথম তলে সাধক যে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাহার নাম 'কুটীচক' দীক্ষা। দ্বিতীয় তলের দীক্ষার নাম 'বহূদক' দীক্ষা। তৃতীয় তলের দীক্ষার নাম 'হংস' দীক্ষা এবং চতুর্থ তলের দীক্ষার নাম 'পরমহংস' দীক্ষা।*

এ প্রসঙ্গে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অথ খলু সৌম্য! কুটীচকো বহূদকো হংসঃ পরমহংস ইত্যেতে পরিব্রাজকাঃ চতুর্বিধা

* এই দীক্ষা-চতুষ্টয় প্রাপ্ত সাধকের বৌদ্ধ পরিভাষায় নাম স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। খৃষ্টানেরা ঐ চারি দীক্ষার নাম দিয়াছেন—Baptism, Transfiguration, Crucifiction ও Resurrection.

ভবন্তি। × × তদ্ এতদ্ ঋচা অভ্যুক্তম্ কুটীচকো বহূদকশ্চাপি হংসঃ পরমহংস ইতি—শাঠ্যায়িণী, ১১

পরমহংস পঞ্চম দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে 'ঋষি'-পদবী প্রাপ্ত হন। ঋষি-অর্থে দ্রষ্টা (Seer)—করকলিত কুবলয়বৎ তত্ত্বসকল যাঁহার পূত দৃষ্টির সমক্ষে অবদাত হয়। ষষ্ঠ দীক্ষা 'মহর্ষি'-দীক্ষা—ঋষির উপর মহর্ষি। তাঁহারও উপর পরমর্ষি—পরমর্ষি-দীক্ষাই সপ্তম দীক্ষা—চরম দীক্ষা। উপনিষদ্ নানাভাবে এই পরমর্ষি-দিগকে প্রণাম করিয়াছেন—'নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ'।

এই দীক্ষা-সপ্তকের বিস্তৃত বিবরণ সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নয়—আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, সাধক পর পর ঐ সপ্ততল অতিক্রম করিয়া যখন সাধনমন্দিরের চূড়ায় উপনীত হন, তখন তিনি দেখেন সে চূড়া অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বলিত। ঐ আলোকের স্নিগ্ধ কমনীয় জ্যোতিঃ বর্ণনার অতীত। সেই জ্যোতির নামই "জীবন্মুক্তি"।

জীবন্মুক্তির পরে কি? জীবন্মুক্ত দেখেন সাধনমন্দিরের আকাশস্পর্শী চূড়া হইতে দুইটি পথ দুই ভিন্ন মুখে প্রবাহিত—একটি নির্বাণ-মুক্তির পথ, অন্যটি নির্মাণমুক্তির পথ। জীবন্মুক্ত কোন পথ অবলম্বন করিবেন? এ সম্পর্কে তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সংকলিত 'অনাদ নাদে' (Voice of the Silence-এ) সুন্দর নির্দেশ আছে:—

"The Shangna robe (অর্থাৎ নির্বাণ-মুক্তি), 'tis true, can purchase light eternal.

The Shangna robe alone gives the Nirvana of destruction; it stops rebirth, but, O Lanoo, it also kills compassion. No longer can the perfect Buddhas, who don the Dharmakaya glory, help man's salvation. Alas! shall selves be sacrificed to self; mankind, unto the weal of units?

Know, O beginner, this is the open path, the way to selfish bliss shunned by the Bodhisattvas of the secret heart, the Buddhas of compassion.

To live to benefit mankind is the first step. To practise the six glorious virtues is the second.

To don Nirmankaya's humble robe (নির্মাণ-মুক্তি) is to forego eternal bliss for self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on renunciation's path.

Know, O disciple, this is the secret path, selected by the Buddhas of perfection, who sacrificed the self to weaker selves."

প্রাচীন ব্যাসভাষ্যেও আমরা 'তে নির্মাণচিত্তম্ অধিষ্ঠায়' এইরূপ কথা শুনিয়াছি। শ্রীধর স্বামীও ভাগবতের টীকায় 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কুর্বন্তি' এই বচন শ্রুতিবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন—উহারও লক্ষ্য বোধ করি নির্বাণমুক্তির পরিবর্তে নির্মাণমুক্তি।

যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি, গীতার ভাষায়, সর্বদা 'সর্বহিতে রতঃ'। তাঁহার নিত্য প্রার্থনা এই—'সব্বে সত্তা সুখিনো হোন্তু'। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আত্মীয় করিয়া বহুবচন-প্রয়োগে বলেন—সত্যং পরং ধীমহি—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। অতএব তিনি নির্বাণ-মুক্তি বরণ করিয়া এবং তাহার ফলে বিশ্বের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া নিজের ভূমানন্দে নিমগ্ন থাকিবেন কিরূপে ?

এসম্পর্কে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ সেই প্রাচীন যুগে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ভাগবতে দেখিতে পাই যখন ভগবান্ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রহ্লাদকে মুক্তিবর গ্রহণ জন্য নির্বন্ধ করিলেন, তখন প্রহ্লাদ এই বলিয়া মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদন্য-শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥

—ভাগবত, ৭।৯।৪৪

'দেবগণ ও মুনিগণ প্রায়ই স্ব স্ব মুক্তি কামনাতেই বিজনে তপস্যা করেন; তাঁহারা পরের কার্যে বিমুখ রহেন। আমি কিন্তু দীনহীন বিশ্বের জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একলা মুক্তির ইচ্ছা করি না; হে নাথ! তুমিই আমার অনন্য গতি।'

মুক্তি-প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের এই উক্তি সযত্নে স্মরণীয়। অন্যথা মুক্তি-পথের পথিকের বিশেষ বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব তিনি 'স্ব বিমুক্তি-কাম' হইয়া যেন স্ব-চিত্তকে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় কলুষিত না করেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়—ইদানীং ঐ স্বার্থপরতা আমাদের ধর্মজীবনে কলুষসঞ্চার করিতেছে। তাই দেখি যাঁহারা সাধকের শীর্ষস্থানীয়, সেই মুনি-যতি-গণ স্ব স্ব নির্বাণ মুক্তির চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। তাঁহাদের পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই। এক্ষণকার অধিকাংশ সন্ন্যাসী-পরমহংসেরা 'স্ববিমুক্তিকাম' নহেন কি? তাঁহাদের মধ্যে পরার্থনিষ্ঠার অবকাশ কই? জগৎ উৎসন্ন যায় যাক্, জগতের জীবগণ অনন্তকাল সংসারপাশে আবদ্ধ থাকে থাকুক্, মানবজাতি অবনতির অধস্তন সোপানে অবতরণ করে ক্ষতি নাই—আমার মুক্তির যেন কোন কিছু ব্যাঘাত না ঘটে, আমি যেন কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া বিশ্বের বন্ধন এড়াইয়া নির্বাণ-পথের পথিক হইতে পারি। ইহাই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। যতদিন না হিন্দু জাতির মর্মস্থান হইতে এই বিষ ক্ষালিত হইতেছে, ততদিন উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত 'সামাজিক প্রবন্ধে' এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট এক সাধু-মহাত্মার গতিবিধি ছিল—তিনিই এসম্বন্ধে ভূদেববাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহাকে লোকে 'অত্যাশ্রমী' বলিত। তিনি বলিতেন, ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমেই স্বার্থপরতা প্রবেশ করিয়াছে। তার মধ্যে চতুর্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার কেন্দ্র হইয়াছে। সেইজন্য তিনি নিজেকে আশ্রমচতুষ্টয়ের বহির্ভূত বলিয়া খ্যাপন করিতেন। অত্যাশ্রমী মহাশয়ের এই অভিমত ছিল যে, যেদিন সনাতন ধর্মে ঐ আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই দিন হইতে তাহার অবনতি।

পূর্বযুগে কিন্তু এরূপ ছিল না। পুরাণ-ইতিহাসে দেখিতে পাই জীবন্মুক্ত পুরুষেরা নানা ভাবে জগতের হিত সাধনে ও পরার্থ পালনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রে ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগকে 'আধিকারিক' বলিয়াছেন—

যাবদধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্।

অর্থাৎ, ঐরূপ অধিকারী পুরুষগণ অধিকার-সমাপ্তি পর্যন্ত স্ব স্ব অধিকারের ভার বহন করেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন:—যে সকল সিদ্ধজীব (জীবন্মুক্ত পুরুষ) সাধনবলে ভগবানের জগদ্ব্যাপার-কার্যে সাহায্য

করিতেছেন (তে ঈশ্বরাঃ পরমেশ্বরস্য নিদেশেন)—তাঁহারা—যিনি যে কার্যের অধিকারে নিযুক্ত, সেই অধিকারের সমাপ্তি পর্যন্ত স্ব স্ব ভার বহন করিবেন। দৃষ্টান্ত স্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য সূর্যদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন বর্তমান কল্পে যে সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বমণ্ডলে উত্তাপ ও আলোক দানের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কল্পপরিসমাপ্তিপর্যন্ত ঐ ভার বহন করিবেন। শঙ্করাচার্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাসদেবেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন অপান্তরতমা নামে এক জন পুরাতন ঋষি জীবন্মুক্তিলাভ করিয়াও বেদবিভাগরূপ গুরুতরকার্য সাধন জন্য ভগবানের আদেশক্রমে ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই সকল সিদ্ধ মহাত্মাগণ ইচ্ছা করিলে নির্বাণের ভূমানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার প্রত্যাখ্যান-দ্বারা জীবের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিয়া পরার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় কোন্ মন্বন্তরে কে কে ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, মনু, গণদেবতা প্রভৃতির অধিকার পালন করিবেন, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা সকলেই জীবন্মুক্ত পুরুষ ; কিন্তু পরার্থনিষ্ঠ হইয়া নির্বাণের চরম সুখকেও অবহেলা করিয়া তাঁহারা জগতের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একজন মহাত্মার পূর্ববিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুরথরাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও দুর্মন্ত্রী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মেধস ঋষির পরামর্শ অনুসারে মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে আরাধনায় যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখন মুক্তি তাঁহার করতলগত হইল। কিন্তু তিনি সে মুক্তিফলের আস্বাদ না করিয়া, ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে মনু হইবার গুরুভার বহনে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইনিই সাবর্ণি মনু। আগামী মন্বন্তরে ইনিই মূল-মনুর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এইরূপে করতলগত নির্বাণ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া জীবের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ পরার্থপরতার চরম।

ইন্দ্রাদি দেবগণও মুক্তপুরুষ। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক অধিকারের ভার বহন করিতেছেন। পূর্বকল্পের সাধনায় যখন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তখন নির্বাণ তাঁহাদের অনায়াসলভ্য হইয়াছিল ; কিন্তু জগদ্ব্যাপার নির্বাহের জন্য তাঁহারা নির্বাণ তুচ্ছ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবত্বের ভার

বহন করিতেছেন। অধিকার-পরিসমাপ্তি-পর্যন্ত তাঁহারা ঐ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তার পর অপর সিদ্ধ পুরুষ সেই ভার বহনে ব্রতী হইবেন। এইরূপ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে "বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি"—বলি কোনও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে ইন্দ্রত্বলাভ করিবেন; "দ্রোণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি"—অশ্বথামা আগামী মন্বন্তরে বেদব্যাস হইবেন।

দেবতারা যে মুক্তপুরুষ, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সাংখ্যেরা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন বেদে যে সকল ঈশ্বর-প্রতিপাদক মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে মুক্ত পুরুষেরই প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা

—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৫

অনেকের ধারণা দেবতারা কেবল ভোগসুখ উপভোগ করেন, তাঁহাদের কোনরূপ দায়িত্ব বা কার্যভার নাই। এ দৃষ্টিতে ইন্দ্র শচী-সনাথ হইয়া কেবল পারিজাতের আঘ্রাণ ও স্বর্গের সুধা পান করিতেছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। দেবতাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম-কারকের দায়িত্ব ও গুরুভার বহন করিতে হয়। সে ভারের পরিমাণ মনুষ্যবুদ্ধির কল্পনাতীত। তাহার তুলনায় পৃথিবীর প্রধানতম সাম্রাজ্যের প্রধান সচিবের কার্যভার নগণ্যমাত্র। অথচ, তাঁহারা কোনও প্রত্যাশায় এই ভার বহন করেন না। কারণ, তাঁহারা মুক্তপুরুষ; তাঁহাদের কোন কিছু অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য নাই। ভগবান্ গীতাতে নিজের কর্মসম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সেই কথা বলিতে পারেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ বর্ত্তএব তু কর্ম্মণি ॥—গীতা

পরার্থে আত্মত্যাগের ইহা বরণীয় দৃষ্টান্ত নহে কি?

এইরূপ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যখন তিনি পরিনির্বাণের অধিকারী হইয়া সাধনমন্দিরের গর্ভগৃহের অর্গল উন্মোচনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, এমন সময় নিখিল বিশ্বের মর্মভেদী আর্তস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। বুদ্ধদেব চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যেন অগণ্য জীব—পাপক্লিষ্ট, দুখদগ্ধ, দীনহীন, মলিন জীব তাঁহার উদ্দেশে বলিতেছে, 'প্রভু!

আপনি ত' জগতের সম্পর্ক ছাড়িয়া নির্বাণের অনন্তসুখে নিমগ্ন হইতেছেন। কিন্তু আমাদের কি গতি হইবে?' বুদ্ধদেবের আর নির্বাণ গ্রহণ করা হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন একটী জীবও অমুক্ত থাকিবে ততদিন তিনি জগতের মধ্যে থাকিয়া জীবের হিতার্থে উদ্‌যুক্ত থাকিবেন।* তদবধি বুদ্ধদেব নির্মাণকায় গ্রহণ করিয়া পরার্থনিষ্ঠ হইয়া সর্বভূতের হিত-সাধনায় নিযুক্ত আছেন। মানবের দুর্ভাগ্য এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে থাকিতেও, সে নিজের মুক্তির জন্য প্রয়াসী হইয়া আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার বিড়ম্বনা ভোগ করে। বুদ্ধদেবের মহাত্যাগের অনুসরণ না করিয়া বৌদ্ধেরা এক্ষণে "প্রত্যেক বুদ্ধযান" আশ্রয় করিয়াছে। এমতে প্রত্যেকে নিজে নিজে বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে; অপরের কল্যাণের প্রতি দৃক্‌পাত করা আবশ্যক বোধ করিতেছে না। ইহাই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। আমরা যেমন দেবতা ও ঋষিদিগের দৃষ্টান্তের অবহেলা করিয়া "স্ববিমুক্তি-কাম" হইয়াছি, বৌদ্ধেরাও সেইরূপ বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিয়া "প্রত্যেক বুদ্ধত্বের" নিষ্ফল সাধনায় চেষ্টার অপব্যয় করিতেছে।† তাহার ফলে, উভয় ধর্মসম্প্রদায়েরই বর্তমান মলিন দশা।

তাই বলিতেছিলাম, মোক্ষকামীকে এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

যাহা হউক, এবিষয়ের আর বিস্তার করিব না। জীবন্মুক্তি সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে—আগামী অধ্যায়ে তাহা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* Never will I seek nor receive individual salvation, never will I enter into final peace alone but for ever and everywhere will I live and strive for the redemption of every creature throughout the world.

—The Pledge of Kwan-yin.

† এ সম্পর্কে মাদাম্ ব্লাভাট্‌স্কি লিখিয়াছেন—*Pratyeka* Budhas are those Bodhi-sattvas who strive after and often reach the Dharmakaya robe, after a series of lives. Caring nothing for the woes of the world or to help it, but only for their own bliss they enter Nirvana and—disappear from the sight and the hearts of men. In Northern Buddhism a "Pratyeka Buddha" is a synonym of *spiritual selfishness.*

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জটিল, খাপছাড়া সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মত মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলো উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এরকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরী কথা বলে না। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে বিচার বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। আত্ম-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে? সেটা প্রায় সর্ব্বনাশের সামিল। কেন সর্ব্বনাশের সামিল তা অবশ্য মহেশ চৌধুরী কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীব মাত্রেই ভয় করে। নিজের সুখদুঃখকে পরের সুখদুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম্ম। রাগে দুঃখে অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব কিন্তু উচিত কি অনুচিত না জানিয়া পোষা একটা বিড়ালকে মারার জন্য বিভূতিকে চড় চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী একেবারে চুপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটি শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মত শেষ হয় সেইখানে।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ মড়া বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবী-লতা প্রথম ভয়ে ভয়ে কথা বলে, 'কেন মারলে? কি নিষ্ঠুর তুমি!'

'যেখানে যেখানে আঁচড়ে দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।'

'আঁচড় লাগেনি।'

কথাটা বিভূতি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই? একেবারে না? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে তো বিড়ালটাকে না মারিলেও চলিত। বোকার মত একটু হাসে বিভূতি, মড়া বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই

মুখ ফিরাইয়া দেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় সে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে,—বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোন আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরীর নির্ব্বাক থাকার চেয়ে বড় সংযম যেন বিভূতির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্ব্বিকার ভাবটা বজায় রাখিতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারীর নাই। মনের কোমল দুর্ব্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া যায়? সেটা প্রায় সর্ব্বনাশের সামিল। কেন সর্ব্বনাশের সামিল তা অবশ্য বিভূতি কখনও ভাবিয়া ছাখে নাই, তবে অন্যায়-বিরোধী মানুষ মাত্রেই নিজের দুর্ব্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও একমাত্র বর্ম্ম। অনুতাপে থতমত খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়, বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসম্বরণ করিতে থাকে। আত্ম-সম্বরণ করিতে সময় তার বেশীক্ষণ লাগে না, খাওয়া দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বৌ-এর সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আর আটার মত চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আর নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ওরকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধের বাটি হাতে। মহেশ এক রকম কিছুই খায় নাই।

'খাও।'

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়াছে? শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়, 'কেন জ্বালাতন করছ? এখন কিছু খাব না।'

'কেন খাবে না?'

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ দেয় যে, মনের উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়—বিভূতির মার মেজাজ রীতিমত গরম হইয়া উঠিয়াছে।

'কচি খোকার মত কি যে কর তুমি!'

ভাল করিয়া কথা বলিলে, এমন কি রীতিমত ঝগড়া করিলেও, হয়তো বিভূতির মা তখনকার মত শুধু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এভাবে কথা পর্য্যন্ত বলিতে না চাহিলে কি মানুষের সহ্য হয়? বিভূতির মা তো আর জানিত না, নিজের মনের সঙ্গে মহেশ বুঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার বিশ্লেষণ চলিতেছে তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়া দুধের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরীর বড় খারাপ হইয়া গেল। কি দোষ করিয়াছে বিভূতির মা? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায়? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটীরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কি লাভ হইবে? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কি না, এই কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে, কখনও বদলাইবে না এটা সে ভাল করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়ীতে থাকিতে দেওয়ার অর্থই কি তাকে সমর্থন করা নয়? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কাণ বুজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনও তার সংশোধন সম্ভব? বিনা প্রতিবাদে এখন চুপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে সে যা খুসী করিতে পারে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যায় করার

যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তার নিজের অন্যায় করার মধ্যেই বা পার্থক্য কি ? মনে মনে মহেশ চৌধুরী স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কি অনুচিত এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মা'র চাদর মুড়ি দেওয়া মূর্ত্তি এই আসল সমস্যাটাকে তাই একটু বেশী রকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মা'র ছেলেকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় অধিকার কি তার আছে ?

ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে— গ্রামে আর এমন ছেলে নাই। কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত—ভাল মন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া তার আনন্দ, দু'দিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে আর কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা এর কোনটার জন্য নিজেরও অবশ্য তার ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আরেকটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে বলিয়া আর মতের সঙ্গে মত মেলে না বলিয়া তার উপর বাপের অধিকার খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরী নির্ব্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিন দিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদাস নয়, শুধু নির্ব্বাক। বিভূতির মাও নির্ব্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড় বেশী গম্ভীর, বিষণ্ণ আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে, 'কি হয়েছে মা ?'

বিভূতির মা বলে, 'কিছু হয় নি।'

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চুপি চুপি বলে, 'শোন, আমার জন্যে ভেবো না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে সব ছেলেমানুষী বোকামীর দিন কেটে গেছে।'

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মন-মরা ভাব কাটিতে চায় না। বরং বাড়িবার উপক্রম হয়। কারণ, একদিন মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে, 'বেশতো, তাড়িয়ে দাও ?'

'তুমি কি করবে ?'

'আমি ? গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।'

'সত্যি ? না, তামাসা করছ ?'

ছোট ছেলেকে প্রথমভাগ পড়ানোর মত ধৈর্য্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে, 'ভ্যাখো পষ্ট কথা বলি তোমাকে শোনো। তুমি না থাকলেও আমার একরকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।'

মহেশ তা জানিত, এতদিন খেয়াল করে নাই।

'এই কথা ভাবছ বুঝি ক'দিন ?' বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরী নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, 'কেন শুনি ? কি জন্যে শুনি ? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি শুনি ? ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে-থা' দিয়েছ, তার যা খুসী সে করুক। তোমার তাতে কি ? তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, তার কাজ সে করুক—তুমি কেন ওর পেছনে লাগতে যাবে ?

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে, 'নিজের কাজ করার জন্যেই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো।'

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরীর দিন কাটে। মানুষটার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল করার ধাক্কায়। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাঁধাঁর মত মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে! জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটিমাত্র রাজপথ ধরিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধিবিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। 'বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা যে

প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তার তুলনা নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলার পর সেটা করা সত্যই উচিত কিনা সে বিষয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত জানিয়াও তা না করা এক কথা—নিজের অনেক দুর্ব্বলতার মধ্যে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয়! অনেক বিষয় বিবেচনা না করিয়াই সে যে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার-বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে? কেবল উপস্থিত প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া আদালতের চোখ কাণ বুজিয়া বিচার করার মত নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি তার নিরপেক্ষতা? একটা প্রশ্নের সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজের ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কি সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে? চিরজীবন সে কি এমনি ভুল করিয়া আসিয়াছে? মানুষ কি এমনি ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আর নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে?

এবং হয় তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিয়া মহেশ চৌধুরী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙ্গাইলে তো চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

[লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরীর আসল সমস্যার কথাটা আমি একটু সহজভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরীর মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বুঝা সম্ভব, ধাঁধাঁটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোন প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত, এই কথাটা মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে। কথাটা

গুরুতরও বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু মুস্কিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়; জগতে এমন কি আছে যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থই তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে সেখানে এক সময় একটির বেশী সমগ্রতার স্থান হয় না—অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিক ভাবে বিচার করিয়া কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। দু'টি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া দুটি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে, চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসর হওয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটিমাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কিনা, ভবিষ্যতে কোনদিন পারিবে কি না জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনি ভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনি ভাবে। তাছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি, আজও করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয় তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের জ্ঞান হয় তো অনেক বেশী টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনও যেমন আর টুকরাগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা ঘামাইতাম না আজও ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মত, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মত, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আর নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপীলের ভরসা করা অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপীলের ফলটাও হয় তো মন মানিতে চায় না—শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্ব্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কিনা যেদিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কি ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত ?]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু রাত্রি ? পরের দিনের দুপুরটা ? তার পরের দিনরাত্রিগুলি ? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মত, শেষ হওয়ার সঙ্গে জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মাতলামির ক্ষুধায় ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্নায়বিক বিকারের ভাটিখানায় বড় বেশী খামখেয়ালী চলে।

তাই আর কোন কারণ, কোন তুচ্ছতম নূতন ঘটনা, না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুসী থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব ?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে, 'কই সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তাতো বললে না ?'

মাধবীলতা ভয় পাইয়া বলে, 'বললাম যে ?'

'কই বললে ?'

'ওই যে সেদিন বললাম ?'

'হুঁ' বলিয়া বিভূতি চুপ করিয়া যায়।

গভীর বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদুস্বরে ডাকিলে বলে বড় ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মত তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার

নীচে সর্ব্বাঙ্গে পেটের অম্বলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পরদিন যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গতরাত্রে, অবিশ্বাসের সব কিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ সকালে সে যেন চোখের আড়ালে সংসারের কায করিতে গিয়াছে। আগের রাত্রের ধারণা আজ বিভূতির নিছক ছেলেমানুষী মনে হয়। এমনি তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে ও বিষয়ে একটু চিন্তা করাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদিবা একটা দুর্ব্বোধ্য আতঙ্কের জের এখনও আছে, পেটে অম্বলের শক্রতা নাই, দেহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারি মনে হইতেছে দেহটা। বোধ হয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপা-পড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিস্‌ফাস্ করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধী মত চুপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, 'আসেন। বসেন। বিড়ি খান?' বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই, মাথা নাড়িয়া বলে, 'বিড়িতো আমি খাই না।'

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে, 'ঠিক বটে, সহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তাতো নেই দাদাবাবু!' তারপর কোথা হইতে কি করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গাম্ভীর্য্য মুখে টানিয়া আনে সেই জানে, একটা অদ্ভুত আপশোষের শব্দ করিয়া বলে, 'সহর ভাল। জানেন দাদাবাবু, মোদের এসব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে সহর ঢের ঢের ভাল। বৌঝি নিয়ে নিভ্‌ভাবনায় ঘর তো করা চলে—ঘরের বৌঝিকে তো কেউ জোর করে ধ'রে নিয়ে যায় না।'

যারা ফিস্‌ফাস্ করিতেছিল তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে, 'আপনি তো ব'লে

খালাস দাদাবাবু, মরি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কি বলেন ?'

ক্রমে ক্রমে নানারকম আপশোষমূলক মন্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙ্গাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারও বৌঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এরকম একটা ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটিয়া গিয়াছে। সকলের বর্ত্তমান রাগ দুঃখ আর আপশোষের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাটমন্দিরের অভাব মিটানর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নীচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও, যাত্রাগান, কীর্ত্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুস্কিল হয় ভাল দলের যাত্রা বা নাম করা কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন বা ঐরকম কোন প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে। তখন চালার নীচে অর্দ্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোন আপত্তি ছিল না, যদি ওগ্রামের ভদ্রলোকেরা এগ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

'যায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা সতরঞ্চিতে বসতে পারি না সামনের দিকে ? চাঁদা দিই না আমরা ? ওকি তোদের বাপের সম্পত্তি যে শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস ?'

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরও অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে অনেকটা যায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা। কে একজন শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আরেকজন রামলোচনের বাবরি ধরিয়া দিয়াছিল টান।

'শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনি।'

বিভূতি আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'তারপরেও যাত্রা শুনলে ?'

'শুনব না ? চাঁদা দিই নি আমরা ?'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা কি বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে ?'

জবাব দিল শ্রীধর। 'কি আর বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছন দিকে তোমাদের জন্যে বসবার যায়গা থাকে, আগে এসে বসতে পার না ?'

'একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—'

'একটা দিন ? প্রত্যেক বার এমনি হচ্ছে, একটা দিন কি দাদাবাবু! মোদের গাঁয়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে চায় না।'

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করার মত ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া গ্রামের কয়েকজন বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে ? তবু বসিবার স্থানের উপর এ গ্রামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদের বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে, 'সামনের জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না ?'

শ্রীধর বলে, 'তিন রাত্তির হবে, অনেক মজা আছে দাদাবাবু।'

বিভূতি বলে, 'তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যেও, দেখি কেমন বসতে না দেয়।'

একজন একটু সংশয় ভরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করবেন ?'

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে, 'আমি একা কি করব ? তোমরা সবাই করবে—যায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে। আবার কি ?'

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষা ও আচরণতত্ত্ব

মানুষের আচরণ যদি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও দৈহিক গঠন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সে নিয়ন্ত্রণের কথা মানুষের ভাষার পক্ষে আরও প্রবল সত্য। বানরজাতীয় জীব থেকে মানুষ এসেছে সে-তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিকও নয় অগ্রাহ্যও নয় কিন্তু হোমো-স্যাপায়েনের ভাষা আর তারই বংশধর বিংশশতাব্দীর মুসোলিনীর ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। অথচ এ এক দিনের ব্যাপার নয়; ক্রমে—কালক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নানা যোগবিয়োগে নানাপ্রকার অঙ্কন পারিপাট্য লিপিকৌশল পার হ'য়ে আজ যে ভাষা হয়েছে তা প্রাথমিক ভাষা থেকে কতই না পৃথক! গোঁড়া ভগবানবাদীরা কিছুতেই কি একথা বিশ্বাস করতে চায় যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জীবজগতের বাইরে তো নয়ই, তাদেরই রূপান্তরিত বংশধর? তেমনি এও আশ্চর্য শোনায় যে আজকের 'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি' অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর ভাষা-অ্যামিবারই বর্তমান বিকাশ! কে জানত রামমোহনের শুষ্ক অবোধ্য মিসনরী ভাষায় এত রস জমে' উঠবে?

ডারুইন ব'লেন, "বিভিন্ন ভাষা ও প্রজাতির গঠন এবং তাদের ক্রমবিকশিত হওয়ার প্রমাণ অদ্ভুত রকমে সমান্তরাল।"

মস্ত বড় পৃথিবী; ধর্মসমন্বয়ীরা বলেন, ধর্ম মূলত এক, তবু লাখো ধর্মধ্বজীর পাঁয়তাড়া: ভগবান আর বিশ্বাস নাকি, এক কিন্তু ধার্মিকদের মারামারি দেখে সেকথা বিশ্বাস করা শক্ত; পৃথিবীতে শাসন রকমারি, সভ্যতা রকমারি, রূপের অবধি নাই—ভাষারও অবধি নাই। এদের সবার ইতিহাস আছে, সবার জন্ম-ঠিকুজি আছে আবার অনেক মৃত লুপ্ত বিনষ্ট ধর্ম, বিশ্বাস, শাসন, ভাষা, রূপ, আয়তনেরও খবর পাওয়া যায়। এদের সবাইকে ডিঙিয়ে আজকের ইতিহাস, আজকের গুঞ্জন।

কিন্তু গুঞ্জন এক নয়। চাটগাঁর লোকের কাছে চাটগাঁর ভাষা কত সহজ, কত আপন, কত নিজস্ব কিন্তু ক'লকাতার যে-লোক শশী (Show-she)-কে Sow-see বলে তার পক্ষে চাটগাঁর ভাষা শুধু বিড়ম্বনা নয়, বিসদৃশ ব'লে ক্যারিকেচার মনে হয়। বিশ্বের ভাষা থাক, সে-তালিকা আমাদের জানাও নেই, দরকার নেই, কিন্তু জেনেসিসের দিকে তাকিয়ে বলতে হয় যে একই হোমো-

স্থাপায়নের সন্তান ফরিদপুরের একই ভৌগলিক সীমায় থেকে কেউ কথা কয় বিক্রমপুরী ভাষায় ও সুরে এবং কেউ কয় বরিশালীয়া অত্যন্ত আভিধানিক ধমকে। হেকেল বলেছেন,—

'বিশেষ ক'রে য়েনার অগাষ্ট শ্লাইখের প্রমাণ ক'রেছেন যে ভাষার ঐতিহাসিক সৃষ্টি অন্যান্য দৈহিক গুণ ও প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশের মতো একই জাতীয় ইতিহাসের নিয়মাধীন।"

ভাষা মৃত নয়, কেবলমাত্র লিপি নয়; তার একটা নিজস্ব ভঙ্গি, ছন্দ, ধ্বনি ও সুর আছে। লোকে বলে শান্তিপুরী ঝগড়াও মিষ্টি,—বরিশালের প্রেমালাপও মারামারি।

ডারুইন কর্তৃক উদ্ধৃত ব্যারিংটনের মতটা এখানে উল্লেখযোগ্য। 'টাইরলে বর্ধিত সুস্বর ক্যানারি-পাখীর মতো কোনো একটি বিশেষ প্রজাতীয় পাখীর ছানা নিজে যে গান শিখেছে সে তার বংশধরদের শিখিয়ে ও হস্তান্তরিত ক'রে যায়। বিভিন্ন জেলার অধিবাসী অথচ একই প্রজাতির মধ্যে গানের যে সামান্য সহজ পার্থক্য কানে ঠেকে, ব্যারিংটনের মতে তা "প্রাদেশিক চলতি-ভাষার" সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে। স্বতন্ত্র অথচ গোষ্ঠি-প্রজাতির সঙ্গীত বিভিন্ন মনুষ্য জাতির ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আমরা বলতে চাই, সঙ্গীত যদি এভাবে নির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত হয় এবং বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে, তবে ভাষাও সঙ্গীতের পথ নেবে। পাখী শেখায় গান বা ডাক, মানুষ শেখায় গান, কথা, ভাষা। বাংলা ভাষার কত যে রূপ তার আর হিসেব নেই। কুচবিহার থেকে ক'লকাতা আসতে কুচবিহারী ভাষার সঙ্গে প্রথম সংঘাত ঘটে লালমনিরহাট জংসনে; সেখানে আসে আসাম থেকে লোক, তাদের ভাষা আলাদা; আবার আসামীদেরই মধ্যে ধুবড়ী গোয়ালপাড়ার ভাষা পৃথক; পার্বতীপুর জংসনে আসে দিনাজপুরের ভাষা, আসে ঈশ্বরদী—রাজসাহী পাবনার ভাষা, তারপর ধীরে ধীরে রাণাঘাট—নদীয়ার ভাষা—শেষ ক'লকাতার ভাষা! এরই মধ্যে পোড়াদহ হ'য়ে ঢাকার ওদিককার লোকেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে—খুলনা, যশোর তো পড়েই রইলো, রইলো বরিশাল, মাদারীপুর, চাটগাঁ, সিলেট! সবই বাংলাভাষা কিন্তু!

'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকায়" শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

লিখেছেন, "বাঙ্গালাভাষার শত শত প্রাকৃতজ ও দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য (মোন-খ্মের, কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্যভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কৃষক ও নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহুস্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারশীর চালে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে।"

শহরের ভাষা আবার অনেকাংশে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রভাবে রূপান্তরিত হয়। সে ভাষাটা কি? গদ্যের সাধুভাষা। এবং "গদ্যের সাধুভাষাই আদর্শ ভাষা থাকায় এতাবৎ খাঁটী বাঙ্গালাকে সাধু-ভাষার আওতায় পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া সাধুভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য হইয়া আছে।"

এই ভাষা আমাদের অভিভাবকের তাড়া খেয়ে এবং শিক্ষকের বেতের ভয়ে শিখতে হয়, জন্মাবধিই আমরা এ ভাষা বলি না। সাধুভাষা অধ্যুষিত বাংলায় আজ ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিত হউক বা অনুচিত হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের, ভদ্র-সমাজের কথ্য ভাষা, আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে; এমন কি, সাধুভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে।"

সুনীতিবাবু নিজেই তা' করেছেন।

ভাষা অবস্থা বিশেষে নির্দিষ্ট হয়, যে কথা কয় তার ভাষা নির্দ্দিষ্ট হয়; এমনি ক'রে ভাষা ও ভাষীর রূপান্তর ঘটেই চলেছে, সে যে কেবল ভাষীর ইচ্ছাতেই ঘটছে তা কিন্তু নয়। অনিচ্ছাতেও অভ্যাস ক'রতে হয়।

আজ যে আমরা ইংরেজি শিখি সে কি কেবলই ইচ্ছে ক'রে? আমাদের ঠাকুর্দা যে পার্শী শিখতেন সে কি ওঁর নিজের খেয়ালে? ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার ভাগ্যবিপর্যয় পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন ঠেকাতে পারা যায়নি, ইংরেজি ভাষাকেও তেমনি মেনে নিতে হয়েছে। শেষে এমন হ'ল যে তরু দত্ত ও মাইকেলের মতো কবি, কেশব সেন, সুরেন বন্দ্যো'র মতো বক্তা, সরোজিনী নাইডুর মতো কবি ও বক্তাও জন্মালো। সরোজিনী নাইডু আজ ইংরেজি আর উর্দু এমন সুরে ও ভঙ্গিতে বলতে পারেন যে তাঁকে বাঙালী বলে বোঝবার জো নেই আচরণের দিক থেকেও অনেকাংশে অবাঙালী হ'য়ে গেছেন।

এসব কি ক'রে সম্ভব হ'লো ?

যে সুরেন ব্যানার্জির সংস্কৃত পাণ্ডিত্য করা উচিত ছিলো আর যে ব্রজেন্দ্র শীলের শাস্ত্রালোচনার অপরাধে রামচন্দ্রের হাতে মাথা দিতে হোতো, তাঁরা এমন ইংরেজি পণ্ডিত হ'লেন কি ক'রে ? ওঁরা কি ইংরেজ হ'য়ে জন্মেছিলেন। [ইংরেজের আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন বললেও তেমনি হাস্যকর ; কেননা, কি ইংরেজ কি বাঙালী সবাইকে শিখে ভাষা আয়ত্ত ক'রতে হয়, তবেই তা হয় মাতৃভাষা।] যুগপরিবর্তনের দাপটে ধর্মান্তর গ্রহণ যেমন ছিল স্বাভাবিক, ভাষান্তর গ্রহণও ছিল তেমনি অনিবার্য। মাইকেল তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আজ যতই ঘরের পানে তাকাই, বার্ণার্ড শ'কে বাদ দিতে পারি না, সেক্সপীয়ার পড়ে' একটা অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করি ; কন্টিনেন্টাল লিটারেচারের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে' খুসি হই। অথচ কৃষ্টির কোন কথাই ছিল না, আমরা ছিলাম কেরাণীর বংশধর। কেরাণীরা হ'য়ে উঠল সাহিত্যিক। সত্যি, এমনই হয়, গোড়াকার কথা আমরা ভুলে যাই ব'লেই পরবর্তী কালটা আমাদের রহস্যময় ঠেকে, যেমন বিস্ময়কর ঠেকে এই "বিস্ময়কর" শব্দটা কি ক'রে আদিম নাদ (sound) ও শব্দ (word) থেকে উদ্ভূত হ'লো। এ-বি-সি-ডি শিখে (মানে মুখস্থ ক'রে) যদি আজ দু'কলম শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে পারি তবে বিস্ময়কর শব্দযোজনাটাও বিস্ময়কর নয়। অসুবিধে এই words....travel like Indians on the war-path, wiping out their foot-marks as they go. [Anthropology. Tylor.]

বাট্রাণ্ড রাসেল বলেন : প্রথম প্রথম শিশুদের ধ্বনি-উৎপাদনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে ; অর্জিত সহযোগের অভাব একটা কারণ বটে। আমাদের দৃঢ় ধারণা মা-মা ও দা-দা শব্দগুলোর যে অর্থ আছে তার কারণ সেগুলো শিশুদের শৈশবাবস্থার স্বতস্ফূর্ত-ধ্বনি। সেই হিসেবে এগুলোতে অর্থ আরোপ করতে বড়দের ভারী সুবিধে। কথা-বলার একেবারে প্রারম্ভে বড়দের অনুকরণ থাকে না, থাকে এই আবিষ্কার যে স্বতস্ফূর্ত-ধ্বনি থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। অনুকরণটা পরে আসে, যখন শিশু আবিষ্কার করে যে ধ্বনির একটা মানে থাকতে পারে। এতে সর্বত্র যে-ধরণের কৌশল দরকার হয় তা ঠিক খেলা খেলতে বা বাইসাইকেল চড়তে যে কৌশল দরকার হয় তারই সামিল।

সার্ ই-বি টাইলরের মতে—

ভাষা—চিহ্নকরণ বা চিহ্ননির্বাচন কলাকৌশলের একটা শাখা মাত্র এবং এর কাজ হচ্ছে প্রত্যেক চিন্তার উপযোগী চিহ্ন বা প্রতীকরূপ একটা ধ্বনি গ্রহণ করা। যখনই এমন একটা ধ্বনি নির্বাচিত হ'য়েছে তার পেছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ থেকে গেছে। কিন্তু তাতে ক'রে এ বোঝায় না যে প্রত্যেক ভাষাই কি ধ্বনি বেছে নেবে। শিশুদের ভাষা বা খোকা খুকুর ভাষায় এই ধরণের শব্দ থেকেই বেশ বোঝা যায়। খোকাখুকু (baby) শব্দটাও তাদের অন্যতম। শিশুরা প্রথম যে সব সরল অবান্তর ধ্বনি ক'রেছিল তাই থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র এই শব্দগুলোর সৃষ্টি হয়েছে; মা, বাবা, দাই, খেল্না, ঘুম [mother, father, nurse, toy, sleep] ইত্যাদি কল্পনার প্রকাশে এগুলো যেমন তেমন ক'রে নির্বাচিত হ'য়েছে।

আর্ণষ্ট হেকেল বলছেন: চলতি শতাব্দীর অন্যতম হৃদয়গ্রাহী বিজ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দেখিয়েছে যে বিভিন্ন জাতির অসংখ্য-বিস্তৃত-ভাষা-গুলো ধীরে এবং ক্রমশঃ অতি সাধারণ কয়েকটি আদিম মাতৃভাষা থেকে এসেছে।

ডার্উইন বলছেন, সংলগ্ন ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে একদিকে মিঃ হেন্স্লে ওয়েজউড্, রেভাঃ এফ্ ফেরার ও অধ্যাপক শ্লাইখেরের হৃদয়গ্রাহী তথ্য এবং অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের বিখ্যাত বক্তৃতার পর আমার আর কোন সন্দেহ নেই যে সহজ ধ্বনি, অন্যান্য জন্তুর স্বর এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত চীৎকার ও তৎসঙ্গে আকার ইঙ্গিতের অনুকরণ ও সংস্কারে ভাষার জন্ম।

এখানে ভাষাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা active, চলিত আর একটা passive বা গ্রান্থিক। গ্রান্থিক ভাষা বইয়ের পাতায় মত কিন্তু তা রূপায়িত ও ধ্বনিত হয় পাঠকের মুখে। শরৎবাবুর বই বরিশালের খাঁটি গ্রাম্য অথচ সেন্সাসমতে শিক্ষিত কোন ভদ্রলোক যদি পড়েন তবে তাঁর পঠন আর মার্জিত পশ্চিম বাংলা ভাষায় অনুরূপ শিক্ষিত কোন ব্যক্তি যদি পড়েন তবে তাঁদের উভয়ের পঠনের মধ্যে ভীষণ পার্থক্য ঘটবে—সুরে ছন্দে ও ঢুলে।

"আর সবাই করে কিন্তু আপনি কি করে করলেন?" পূর্ববঙ্গী যেমন

লেখা আছে তেমনই পড়বেন, প্রথমটাও পড়বেন করে, শেষটাও পড়বেন করে (এবং করলেন); কিছুতেই, ক যে কো হতে পারে এ কল্পনা তাঁর মাথায় আসবে না। ভাষা লেখার সঙ্গে উচ্চারণের এ সঙ্গতি নেই, বিশেষ শরৎবাবু প্রমুখ অনেকে করে-কে কোরে বোঝাবার জন্য নিদেন একটা উপর-কমা দিতেও নারাজ। পূর্ববঙ্গীর দোষ কি ? তিনি তাঁর আপন উচ্চারণই তাতে আরোপ ক'রবেন।

রাসেল বলেন, অধিকাংশ শব্দ অনুকরণেই শিক্ষা হয়; তার সঙ্গে থাকে বস্তু ও শব্দের সংযোগ আর শৈশবে বাপ-মার ইচ্ছাকৃত আরোপিত শব্দগুলো। …ইঁদুরের গোলকধাঁধা শেখার সঙ্গে এ ব্যাপারের মূলত কোনো তফাৎ নেই।

এই যে যখন লিখি—পড়বেন, করবেন, এমন, তেমন—তখন আমরা আশা করি লোকে প-কে পো, ক-কে কো, এ-কে য়্যা, তে-কে ত্যা পড়বে। ক'লকাতার লোকেও যা বলে বা যে উচ্চারণ ও সুরে কথা বলে তা' লেখে না। তার কারণ ব'লেছি, ভাষা দু'রকম, মৃত আর অমৃত (যার স্বাদ কাণে আর জিহ্বায়)। আমার পিসীমা বিক্রমপুরী, তিনি 'আ-ছি-ছি' না ব'লে বলেন, 'আ ছিছ্যৎ' অথবা 'আউ' অথবা 'অচ্চা'।

রাসেলের মতে শিশুদের প্রথমকার কথাগুলো নিঃসন্দেহে অন্যের কাছ থেকে তারা যে-সব কথা শোনে তারই অপরিবর্তিত পুনরুক্তি।

আমার সেই পিসীমাকে শরৎবাবুর 'দেনাপাওনা' পড়ে শোনাচ্ছিলাম; হঠাৎ কৌতূহল বশত জিগ্‌গেস করি তিনি সব বুঝতে পারছেন কি না। তিনি জবাব দেন: 'গীতাও তো হুনি, হগল কথাই কি বোঝন যায়? কানে গ্যালেই অইল।' আমার বাড়ীওয়ালা নিজের ছেলেকেই বলেন, 'গুখাইকোর ব্যাটা', 'আটকুড়ের পো' ইত্যাদি; আমার পিসীমার মতে বাড়ীওয়ালার আচরণেই বোঝা যাবে ওগুলো গালাগাল; কিন্তু পিসীমার মুখে ওগুলো সহজে আয়ত্তে আসবে না, আসলেও সুর ও ধ্বনি হবে পৃথক—হবে ক্যারিকেচার! কিন্তু পিসীমা যদি এই বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে তাঁরই তত্বাবধানে পিসীমার মার পেট থেকে প'ড়ে এখানে থাকতেন, তবে? তবে আশ্চর্য ব্যাপার হ'তো। তিনি অনায়াসে 'কাপড় পরে নাচতে নাচতে• হঠাৎ প'ড়ে গেল, বারণ ক'রলেও শুনল

না, মারব চড় !'—কথাগুলো যথাযথ উচ্চারণ ক'রতে পারতেন। 'ড়' আর 'র' এক হ'য়ে যেত না, বেশ পৃথক থাকতো, বেড়ানো আর বেরোনো দু'টোরই উচ্চারণ হ'তো।

টাইলর বলেন, "যদিও কোনো মানুষের কথাবার্তা থেকেই তার পিতৃ-পরিচয় পাওয়া যায় না, জানা যায় সে কোথায় লালিত পালিত হ'য়েছে, তবু, একথা সত্য যে অধিকাংশ শিশুই তাদের বাপ-মার কাছেই থাকে এবং তাদের ভাষা এবং আকৃতি পায়। একই ভাষা ও একই বংশের লোকেরা যদি একই জাতির অধীনে বসবাস করে তবে তাদের ভাষায় একটা বংশগত চিহ্ন সবার মধ্যে পাওয়া যাবে।

ভাষার এই জীবন্ত দিক্‌টা, ধ্বনি বা নাদ-এর দিক্‌টাও ঠিক তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন ক'রে আমরা টেক্সট্ বুক মুখস্থ করি। কথাটা মুখস্থ (মুখে স্থিত) না হ'য়ে বোধহয় মগজস্থ বলাই ঠিক। কিন্তু মুখস্থ শব্দটা বেশ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

ভাষার বাক্ বা নাদ একটা দিক—আর লিপি বা চিত্র আর একটা দিক। আমরা বলি ভাষা আয়ত্ত ক'রতে হয়। সত্যিই ক'রতে হয়।

ডার্‌উইন বলেন, এ কক্ষণো প্রকৃত স্বতঃস্ফূর্তি নয়, কারণ প্রত্যেক ভাষাই শিখতে হয়।···অধিকন্তু কোনো ভাষা কেউ উদ্ভাবন ক'রেছে এমন ধারণা কোনো ভাষাবিদের নেই ; ভাষা মন্থর গতিতে এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে বহু স্তর ভেদ ক'রে পুষ্ট হ'য়েছে।

এ ব্যাপারে স্বজাত বিজাত ব'লে কোনো পার্থক্য নেই। সবাইকেই সমান আয়ত্ত ক'রতে হয়। 'শব্দে'র ইংরেজী যদি 'ওয়ার্ড' হয় তবে 'সাউণ্ডে'র বাংলা 'নাদ' করাই উচিত! আর্তে যদি নাদ করে তবে সে আর্তনাদ, আর গঙ্গা কলকল ক'রলে সে হয় কলনাদ, রাবণের ছেলে একেবারে মেঘনাদ। এই নাদের রকমফেরটা, দেহ, দেশ ও ব্যষ্টির বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে। তাই ডার্‌উইন ব'লছেন : কণ্ঠস্বরের যতই ব্যবহার হ'তে লাগলো, বংশানুক্রমিক ব্যবহারের ফলে বাকযন্ত্র ততই দৃঢ় ও সম্পূর্ণ হ'তে থাকলো। এভাবে বাক-শক্তির ওপর এর প্রতিক্রিয়া হ'য়ে থাকবে। কিন্তু ভাষার অপ্রতিহত ব্যবহার ও মগজের পুষ্টির মধ্যে যে যোগসূত্র সেটি নিঃসংশয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

স্থূলকায় লোকের কণ্ঠধ্বনি ('গলা') অত্যন্ত সরু ও মিহি হ'তে পারে আবার পিউবার্টির পরেই পনের বছর ছেলের গলা এমন হ'তে পারে যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় 'হেঁড়ে'।

ব্যাকরণ মতে যত নাদ আছে তাদেরকে কয়েকটা বিশেষ ধ্বনিতে ভাগ করা হয়। কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্দ্ধণ্য, দন্ত্য, ঔষ্ঠ্য ইত্যাদি, অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির যে কোনো একটিকে আশ্রয় ক'রে যখন যেরূপ নাদ হয় তখন তার অনুরূপ নামকরণ হয়। কিন্তু কোন ধ্বনিকেই একান্তরূপে কণ্ঠ্য বা দন্ত্য বলা চলে না। নাক যার বোঁচা বা কুষ্ঠে উড়ে গেছে, তার ধ্বনি যেখানটা আশ্রয় ক'রেই গোঙাক সে অবোধ্যই থেকে যাবে। আলজিভ নেই বা বড়জিভ কাটা এমন লোক কথা বললে আমরা কাগজ-পেন্সিল এগিয়ে দেব, কারণ তার কথা শোনার ধৈর্য বা ক্ষমতা আমাদের খুব বেশী নেই। কণ্ঠনালীর গঠনের ওপরেও তেমনি ধ্বনির প্রকৃতি নির্ভর ক'রবে। লাংসও চাই, হার্টও চাই। রক্তাল্পতায় যে ধুঁকছে তার ভাষার আওয়াজ ফিসফিস-এর উপর যাবে না।

তাই রাসেল বলেন, কোনো কথা বলার মানেই হ'চ্ছে বাগযন্ত্র ও মুখের একটানা আন্দোলন; তার সঙ্গে চলে নিশ্বাস। লাফানো বা ঝাঁপানো বা দৌড়োনোর মতো কথা বলা এক রকম আচরণ; এর নিগূঢ় কোনো সীমা নেই।

ভাষার এই দিকটা একেবারেই দৈহিক। কিন্তু এটা কেবলই নাদ-এর দিক—উচ্চারণের দিকটা আলাদা; প্রায় একই রকমের দৈহিক গঠন থাকতেও রামধন চাঁটগার উচ্চারণ চালাচ্ছে আর শ্যামধন কুচবিহারী কথা বলছে। ব্যাকরণের উদ্ঘাটিত তথ্য তাদেরকে একীকরণের চেষ্টায় আছে বটে কিন্তু দু'জনেই মাতৃভাষায় একেবারে দিলদরিয়া। ভাষার এই উচ্চারণের দিকটাকে আমরা বলতে পারি স্থূলভাবে দেশজ, সূক্ষ্মভাবে সামাজিক, সূক্ষ্মতরভাবে পারিবারিক, সূক্ষ্মতমভাবে ব্যষ্টিক (মানে আঙ্গিক বা দৈহিক)।

সেদিক থেকে রাসেলের বক্তব্য হ'চ্ছে এই: আমি নিজে মনে করি যে 'মানে' কেবলই তখনই বোঝা যাবে যখন আমরা ভাষাকে দৈহিক অভ্যাস ব'লে গণ্য ক'রবো। ফুটবল খেলা বা বাইসাইকেল চড়ার অভ্যাস মতোই এও শিখতে হয়। আমার মতে ডাক্তার ওয়াট্‌সন যেভাবে ভাষাকে ব্যাখ্যা

ক'রেছেন, ভাষাকে ব্যাখ্যা ক'রবার সেটিই একমাত্র সন্তোষজনক প্রণালী। বাস্তবিক, ভাষার সিদ্ধান্ত আচরণতত্ত্বের পক্ষে সব চাইতে শক্তিশালী নজির।

স্পষ্টতই মনে হ'চ্ছে, ভাষার দৈহিক দিকটা বড়; কেবল বড় নয়, প্রাথমিক; কিন্তু এর সামাজিক দিকটাও নেহাৎ নগণ্য নয়। আমরা বলি সমান। দেহের গঠন যেমনই থাক যদি তার ব্যবহার না হয় তবে অব্যাহত অংশ ক্রমে অকেজো হ'য়ে যেতে পারে। যে-সন্ন্যাসী ঊর্ধ্ববাহু হ'য়েছে তার হাতটা সর্বাংশেই বিড়ম্বনা হ'য়ে পড়ে, দেহতত্ত্ব যাকে বলে ডিস্‌ইউজ য়্যাট্রোফিড। সেদিক থেকে টেনিস খেলোয়াড়ের ডাল হাতের গড়নটা যদি বাঁ হাতের চাইতে পৃথক হ'য়ে পড়ে তবে তার কারণও হবে ব্যবহার। সঙ্গীতের প্রচেষ্টায় কণ্ঠে যদি কায়দা এসে যায় তবে সেও কসরতের ফলেই। দেহ ভাষার সুর দেয় সন্দেহ নেই কিন্তু ব্যষ্টির সমাজও দেহে সুর আরোপ ক'রে আঙ্গিক গঠনকে দেয় বদলে; এক 'স'-কেই হিন্দুস্থানীরা একরকম উচ্চারণ করে, বাঙালীরা (বাঙালরা) আর এক রকম উচ্চারণ করে ও অসমীয়া ভিন্ন রকম উচ্চারণ করে। বাঁকুড়ার ছেলে Busকে বলবে বাস্, Systemকে বলবে শিষ্‌টেম্ আর বাগবাজারী কালীকেষ্ট বলবে Cessটায় (মানে শেষটায়)।

রাসেল বলেন, কথা ব্যবহার ক'রবার আগে শিশুরা কথায় সাড়া দিতে শেখে। ঠিক অন্য যে কোনো দৈহিক সহযোগ-প্রণালী শেখার মতো শিশু শব্দার্থ বোঝে। কোনো শিশুকে বোতল দেবার সময় যদি আপনি সর্বদা 'বোতল' এই শব্দোচ্চারণ করেন, তবে আগে সে যেমন বোতল-দৃষ্টে সাড়া দিত, শীঘ্রই সে এই বোতল শব্দটা শুনলে সাড়া দেবে।...উভয়ের যে পরিণতির জন্য শব্দ ও বস্তু দায়ী তা নির্ভর করে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত অথবা নির্দিষ্ট প্রতিভাস অথবা অর্জিত প্রতিক্রিয়ার ওপর।

তাহ'লে প্রথমত বাক্‌স্ফূর্ত ভাষায় এই দৈহিক খবরটা আগে নিয়ে নি। গোড়াতেই আচরণতত্ত্বের এই কথাটুকু ব'লে রাখা ভাল যে কেউ খোঁচা দিলে যে আমরা একটা নাদ ক'রে উঠি সেটা আমার শরীরেই একটা ভঙ্গি। খোঁচা মানেই যে কাঠি দিয়ে স্পর্শ করতে হবে, তা নয়। বজ্রের শব্দেও চমকাই, বিদ্যুৎ দেখলেও ইস্ করি, ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেও দেহ সঙ্কুচিত করি, গরম

লাগলেও হা হুতাশ করি। বাইরের এই অঙ্কুশ পেয়েই আমরা একটা সাড়া দি। আচরণতত্ত্বে এই অঙ্কুশ আর সাড়া-ই মৌলিক কথা। বাইরের অঙ্কুশের প্রভাব আবার নির্ভর করে যে সাড়া দেবে তার ক্ষমতা বা গঠনের ওপর। সেজন্যই দেহতত্ত্বকে আনা; তার কারণ, ভাষার মূলসৃষ্টির উপাদান হ'চ্ছে এই বাইরের অঙ্কুশ আর তার প্রত্যুত্তর। যেমন, উঃ! আচমকা হাতটায় আঘাত পেয়েছি, আচমকা দেহে লেগেছে কম্পন, স্নায়ু হয়েছে উত্তেজিত, এমনি ক'রে সমগ্র কেন্দ্রীভূত এনার্জি বাগযন্ত্রে একটা নাদ ক'রে বেরিয়ে গেল, কণ্ঠ ইত্যাদির অবস্থিতির জন্য শব্দটা শ্রোতা শুনে রাখল—উঃ! রেলগাড়ীতে চ'ড়ে আমি আর আমার দিদি একবার তর্ক ক'রেছিলাম; আমি ব'লেছিলাম, গাড়ীটা বলছে—'থাক বেটা থাক, থাক বেটা থাক,' ছোড়দি বললেন, না, গাড়ীটা বলছে—'চল বেটা চল, চল বেটা চল'। মিলিয়ে দেখলাম দুই-ই সত্যি। কেননা, উঃ না ব'লে কেউ বলে ওঃ, কেউ ইঃ, কেউ ইস্, কেউ ওপ্—একই ব্যথার প্রকাশ। যেটা প্রচলিত হ'য়ে যায় সেইটাই পরবর্তীকালে হ'য়ে দাঁড়ায় নিদারুণ ও অনড় সত্য। মোটকথা, ভাষার মূলসূত্র হ'চ্ছে এই অতি সরল অ আ ই (একটু জোরে) ঈ, উ (আর একটু জোরে) ঊ, বিসর্গ—যেমন অং অঃ! অথবা এ ঐ ও ঔ—ইংরেজীর এ-ই-আই-ও-ইউ! পৃথিবীর যত আদিম চীৎকার, ভর্ৎসনা, আমন্ত্রণ, ভীতি, হিংস্রতা সবই অতি সহজ এমন দুই একটি অক্ষরে প্রকাশ পেতো!

ডারউইন বলেন, ভাষাবিদেরা এখন স্বীকার করেন যে ধাতুরূপ, শব্দরূপ ইত্যাদি মূলত স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ছিল, পরে সংযোজিত হ'য়েছে; এভাবে বস্তু এবং ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ ক'রে, প্রায় প্রত্যেক জাতিই একেবারে প্রথমাবস্থায় এদের ব্যবহার ক'রেছে।...খুব সুশৃঙ্খল এবং জটিল ভাষাও অসম্বদ্ধ সংক্ষিপ্ত জারজ ভাষার উর্ধ্বস্তরে নয়। শেষোক্ত ভাবগুলো বিভিন্ন বিজয়ী, বিজিত বা আগত পরদেশীর সুপ্রকাশক শব্দ ও প্রয়োজনীয় ভঙ্গি গ্রহণ করেছে।

টাইলর বলেন, বস্তুত যে যে-ভাষারই কথা বলুক না কেন এ ধরণের উচ্চারণ মনুষ্যজাতির প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত। মিছে নয়, অধিকাংশ অসভ্য-বর্বর জাতিরা কি ভাবে 'আঃ! ওঃ!' ইত্যাদি ভাব-প্রকাশক সুর ক'রে মনের

বিস্ময়, বেদনা, অনুরোধ, ভীতিপ্রদান, ঘৃণার আভাষ দিতে হয় জানে এবং আমাদের মতোই রাগের গর্‌গর্‌ নাদ এবং তাচ্ছিল্যের 'ছো!' বুঝতে পারে।

তাই সাড়া দেবার এই দেহবস্তুটাকে বিশদভাবে জানা দরকার :

আমাদের মগজের একটা অংশ বিশেষের নাম 'ব্রোকা'র স্তর। ব্রোকা নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক এই উপসংহারে পৌঁছোন যে মগজের একটা বিশেষ স্তর ক্ষতদুষ্ট হ'লে বাকশক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়। এই ব্রোকার স্তরের ঠিক পেছনেই আছে জিভ, কণ্ঠনালী ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের শক্তিক্ষেত্র। সচরাচর যে ডান হাতে কাজকর্ম করে তার মগজের বাঁ-দিকে এই ব্রোকার স্তর। ব্যাপক-অর্থে কথা-বলাকে আমরা ব'লতে পারি যে একজন আর একজনের কাছে যে অনুভূতি প্রকাশ করতে চায় তারই উপায় মাত্র।

কথা বলার প্রণালীটাকে তিনটি ভাগে ভাগ ক'রতে পারি।—

(১) পরিগ্রাহী যন্ত্র—এর সংস্পর্শে যে কোনো অনুভূতি আসতে পারে। সচরাচর অবশ্য দেখা-শোনাটাই স্বাভাবিক। এরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট আছে সম্মিলন ক্ষেত্র। সম্মিলন ক্ষেত্রই ধৃতি স্মৃতির ভাণ্ডার।

(২) সম্মিলন যন্ত্র—এর সন্মুখ ভাগ প্রকাশকের কাজ করে, পশ্চাৎ ভাগ গ্রহীতার কাজ করে। একটা বিশেষ অবস্থিতির মধ্যে একটা বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রত্যেক অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যদি কোনো ধারণা প্রকাশ ক'রতে হয় অথবা কোনো কিছুর জবাব দিতে হয় তখন সম্মিলন যন্ত্রের সেই জায়গায় প্রেরণাটি পৌঁছোয় যেখানে যথার্থ প্রকাশের উপায় নির্ধারিত হয়।

(৩) প্রসবী যন্ত্র—মগজের যে-অংশটা ধ্বনি নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে ঐ অস্ফুট বাণীটি পৌঁছায়। অবস্থাবিশেষে এমন হ'তে পারে যে সেটি হয়তো হাত অথবা অন্য কোন প্রত্যঙ্গ নাড়ার ক্ষেত্র। মাথা নাড়া অথবা মুখে আঙুল চেপে দিয়েও কথা বলার চাইতে বেশী সার্থক হ'তে পারে। যখন আমরা কথা ব'লতে শিখি আমরা তখন ঐ একই উপায়ে ভাবতে ও কল্পনা ক'রতে শিখি। আমরা জানি বোবা লোকদের মনোভাব প্রকাশ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই সেজন্য তাদের সাধারণ মনোবৃত্তিও পঙ্গু হয়।

ভাষা শিখতে হয়। শেখাটার মধ্যে অনুকরণই বড় অংশ। বাইরের কম্পন

দেহে সাড়া জাগায়—সুরতালে জাগে শিহরণ। দেহ শব্দিত হ'য়ে ওঠে। অনুকরণ বা শেখাশেখির ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণাধীন। যা নিয়ন্ত্রণাধীন, যা নির্দিষ্ট হ'তে পারে, তা-ই আচরণতত্ত্বের আওতায় পড়ে। অথবা ভাষার জন্মেতিহাস আচরণতত্ত্বকে স্পষ্ট সংজ্ঞা দেয় ও সহজসাধ্য করে।

এক একটা প্রবৃত্তির যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কি ভাবে কে তা' অর্জ্জন ক'রেছে। মগজের গঠনের ওপর যেমন অনেক কিছু নির্ভর করে—ব্যষ্টির চারিত্রিক আচরণও মগজের বিভিন্ন জটিলতার সমাবেশ আনে।

শ্বাসনালীর মাথায় তরুণাস্থি নির্মিত একটি বাক্স আছে, তাতে দুটো তার আছে; বহির্মুখী বাতাসের স্রোত এই তারে কম্পন জাগায়, তাই থেকেই কণ্ঠের মৌলিক সুর প্রকাশ পায়। এই বাক্সকে বলে বাগ্‌যন্ত্র বা ল্যারিংস। এই ধ্বনি জিভ্, দাঁত, ঠোঁট ইত্যাদির আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে সংস্কৃত বা রূপান্তরিত হয়।

জীবন্তাবস্থায় ফ্যারিংস, বাগ্‌যন্ত্র ও শ্বাসনালী পর্যবেক্ষণের জন্য এক রকম যন্ত্রের ব্যবহার হয়। তার নাম ল্যারিংগোস্কোপ। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে এবং উচ্চারণে গঠনপ্রণালী কত রূপ পরিগ্রহ করে তা এ যন্ত্রে ধরা পড়ে। আমরা কথা বলার সময় বুঝতে পারি মুখের ভেতরের সর্বত্র কত রকম আকার হ'চ্ছে। খাদে গাইতে হলে যে রূপটি আমাদের চোখে পড়ে চড়াই গাইতে হ'লে তা' থেকে অনেকাংশে পৃথক্ রূপ আমাদের চোখে পড়ে। গিট্‌কিরি গায়কদের পক্ষে একটা কস্‌রৎ, যাকে বলে গলা সাধা বা সার্গম ভাজা।

কণ্ঠধ্বনির জন্য চমৎকার ব্যবস্থা আছে। এক গুচ্ছ তার আছে তাদের নাম দেওয়া যেতে পারে প্রকৃত সুরতার, তাদের দু'দিকে একটু উঁচুতে লাল্‌চেপানা নকল সুরতার এক গোছা আছে; এ ছাড়া আরও অনেক যন্ত্র আছে যাদেরকে পরিভাষার অভাবে ঠিক্ ঠিক্ বাংলায় প্রকাশ করা যায় না।

সাধারণ শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে সুরতারগুলোর অবস্থিতির সঙ্গে পেশীগুলো নিজেদের চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। দীর্ঘ বা দ্রুত শ্বাস নিলে মুখটা একটু বড় হ'য়ে অনেকটা লোজেঞ্জের আকার গ্রহণ করে।

প্রকৃত সুরতারগুলোর রং শাদা এবং চক্‌চকে, তাদের মাঝখানে আছে একটা জিনিষ যেটা খুব উঁচু পর্দায় গাইলে সংকুচিত হয় আর দীর্ঘশ্বাসে বিস্তার

লাভ করে। কথা বলবার সময়ও সেটি সঙ্কুচিত হয় এবং কি পর্যন্ত স্বরতারের স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তিত হ'তে পারে কোনো একটা সুরের বিস্তার প্রধানত তার পরিমাপের ওপর নির্ভর করে।

সঙ্গীতধ্বনি গ্রাম, উচ্চতা ও চরিত্রে একটা আর একটা থেকে স্বতন্ত্র। কম্পনের হারের ওপর গ্রাম নির্ভর করে; সূতোর টানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বৃদ্ধি পায় এবং সূতোর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। পুরুষের চাইতে মেয়েদের সুরতার হ্রস্বতর, এই জন্যই মেয়েদের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামের। মেয়েদের তারের বিস্তার গড়পড়তা ১১'৫ থেকে ১৪ মিলিমিটার পর্যন্ত; পুরুষের তারের বিস্তার ১৫'৫ থেকে ১৯'৫ মিলিমিটার পর্যন্ত। উচ্চতা কম্পনের প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে এবং প্রশ্বাসের তোড়ে যে তারগুলো স্পন্দিত হয় তাতেই বৃদ্ধি পায়। চরিত্র তাকেই বলে যার দ্বারা এক স্বর থেকে অন্য স্বর, এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রের পার্থক্য ধরা যায়।

ঐ সুরতারের ওপরে প্রতিধ্বনিমূলক গহ্বরের দ্বারা বাক্‌যন্ত্রের মৌলিক সুর-সৃষ্টির সংস্করণেই বাণী উত্থিত হয়। ফ্যারিংস, মুখ ও নাকের আকার ও পরিধির সংস্করণেই কোনো কোনো মিশ্র সম্মিলিত সুর স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে: তাই থেকেই স্বরবর্ণের নাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন অবস্থায় বহির্মুখী বায়ুর আংশিক বা সম্পূর্ণ বিঘ্নের ফলে ব্যঞ্জন বর্ণের সৃষ্টি।

তারপর ক্রমে ভাষা।

তাই রাসেল বলেন, কতকগুলো বাগ্‌যন্ত্র যদি থাকে এবং কোনো সাড়া দেবার প্রবৃত্তি যদি থাকে তবে এরকম গুণসম্পন্ন জীব প্রায়ই পুনঃকৃত যে-যে ধ্বনি তার কানে আসবে সে সেগুলোর অনুকরণ ক'রতে চাইবে।

দেখা যাচ্ছে, ভাষার রহস্যজাল একমাত্র আচরণতত্ত্বই ছিন্ন ক'রতে পারে।

পুলকেশ দে সরকার

রাজকন্যা

গির্জ্জের ঘড়িতে সাতটা বাজতে তখনও সতেরো মিনিট। কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে ট্রামটা পার্ক সার্কাসে ঠিক সময়েই পৌঁছাবে। অমলেন্দু একটা সিগারেট ধরালে। কাল রাত্রে সে তার টালীগঞ্জের বাড়ী থেকে পার্ক সার্কাসে সংবাদ নিতে গিয়েছিলো রাজা বাহাদুরের সঙ্গে কখন দেখা হওয়া সম্ভব! সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ করবার নিয়ম। প্রথমেই যেন সে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, তাহ'লে কথাবার্ত্তা বলবার একটু সময় মিলবে। অনেক লোক যদি দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে অপেক্ষা করে ভদ্রলোক তার জন্যে বেশী সময় কেমন করেই বা দিতে পারবেন।

সিগারেটে দীর্ঘ কয়েকটা টান দিয়ে তার বেশ আমেজ লাগছিলো। চমৎকার দিন, কাল সারারাত বৃষ্টি হয়ে গেছে, অন্ধকার রাত্রি আর অবিশ্রাম ভিজে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ! আজও আকাশে থমথমে মেঘ, এলোমেলো হাওয়ায় বৃষ্টির কণা! এই দুর্য্যোগের দিনে এত ভোরে (যতই কাজ থাক) কে আর তাড়াহুড়ো করে লোকের বাড়ী ধন্না দেবে? প্রত্যেকেরই সংসার আছে, নিজের সুখ সুবিধে আছে!

রাজা বাহাদুরের বিরাট অট্টালিকার সামনে অমলেন্দু ছাতা মাথায় যখন দাঁড়ালো তখন বৃষ্টি বেশ চেপে এসেছে।

প্রবেশ পথের বাঁ-ধারেই বসবার ঘর, চুপচাপ নিস্তব্ধ বাড়ী! যাক্ বাঁচা গেছে, লোকের ভিড় নেই। বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকবে কি না তাই সে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে। পেছনে পায়ের খস্ খস্ শব্দ শুনে সে প্রায় চমকে উঠতে যাচ্ছিলো, মাথায় জরির কাজ করা পাগড়ী এবং চাপকান পরিহিত বেয়ারা তাকে পাশের ঘরটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

অমলেন্দু জিজ্ঞেস করলে, 'রাজা বাবু কি এখুনি নিচে নামবেন?'

'রাজা বাবু' কথা দু'টি ব'লে তার ভিখিরিদের কথা মনে পড়লো।

বেয়ারা তার কথার কোন জবাবই না দিয়ে আবার আঙ্গুল দিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিলে; বোধহয়—অমলেন্দু এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলে—উত্তর দেওয়াও

প্রয়োজন বোধ করে না। সে নিজের অর্দ্ধমলিন পরিচ্ছদের দিকে একবার তাকিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো; ঘরের মধ্যে আরও তিনটি লোক বসে আছে উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায়; বাইরে অস্পষ্ট গলার শব্দ শুনে তারা প্রত্যেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো সন্দেহ নেই; ওদের মুখের দিকে না তাকিয়েও অমলেন্দু বুঝতে পারলে সবারই মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিরক্তির কুটিল রেখা। নিঃশব্দে সে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো, চমৎকার কুশান-দেয়া চেয়ারগুলো; পাশে প্রকাণ্ড টেবল্, এ্যাস্-ট্রে থেকে আরম্ভ করে রূপোর ফ্রেমে মহাত্মা গান্ধীর ছবিটি পর্য্যন্ত নিখুঁত ভাবে সাজানো, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলেও বোধহয় এক কণা ধূলো মিলবে না! দেয়ালে মনীষী, কৃতবিদ্যদের ছবি! চক্‌চকে আলমারীতে থাকে থাকে সাজানো বই—নূতন জাপানী খেল্‌নার মত। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ঘড়িতে সাতটা বাইশ!

ঘরের মধ্যে চারটি মানুষ যেন ক'টি পাথরের মূর্ত্তি। চোখের পাতা ছাড়া তাদের জীবনের আর কোন আভাষ নেই, সার্টিনের সোনালি পর্দ্দার দিকে তাদের দৃষ্টি একান্ত, উৎসুক! মেঘলা দিন হলেও ঘরের মধ্যে বেশ গরম, মাথার ওপরেই পাখা—কিন্তু সুইচের দিকে একটি হাতও প্রসারিত হ'ল না।

ইতিমধ্যে অমলেন্দু অপর দর্শনপ্রার্থীদের একে একে দেখতে লাগলো। সে নিজে এসেছে একটি চাকরীর জন্যে, রাজাবাহাদুরের শুধু একটি মুখের কথা; সাদা কাগজে দুটো ছত্র বা টেলিফোনের অপর প্রান্তে কয়েকটি কথা ছুঁড়ে মারলেই তার জীবনের একটা হিল্লে হয়ে যায়, শুনেছে ভদ্রলোক কোটিপতি হলেও গরীবদের প্রতি দয়া তাঁর অসীম। কলম পেশবার উপযুক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় তাকে ত করেইছে, তা ছাড়া শুধু যৎসামান্য মৌখিক পরিশ্রম ব্যতীত তাঁকে আর কোন অনুরোধও সে করছে না, ক্রমেই সে উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলো। পাস করবার পর তিনটি বছর সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, এদ্দিন পরে তার ভাঙ্গা নৌকো তবু পৌঁছালো কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের চোখ এড়িয়ে সে অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে শেষ সিগারেটটি বার করলে, দেশলাইর কাঠির ফস্ ক'রে শব্দ হ'তে তিনটি লোক এক সঙ্গে চমকে উঠলো, ততক্ষণে তার ধরানো হ'য়ে গেছে! এক মুহূর্ত্তে সে স্থির ক'রে ফেললে—পর্দ্দার ওপাশে জুতোর খস্ খস্ শব্দ কানে এলেই সিগারেটের

টুকরোটা সে জুতার তলায় অনায়াসেই চিঁড়ে-চ্যাপটা ক'রে দিতে পারবে, গন্ধটা অবশ্য মিলিয়ে যেতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু কি ক'রেই বা তিনি টের পাবেন চার জনের মধ্যে কে ধূমপান করছিলো! পর্দ্দার দিকে চোখ রেখে সে ঘন ঘন টান দিতে লাগলো। এই উদ্ধত এবং অশিষ্ট লোকটির নিতান্ত বিপজ্জনক আচরণে অন্য ভদ্রলোক তিনটি সচকিত হ'য়ে উঠলেন, মুখ দেখে মনে হ'ল তাঁরা নিজেদের রীতিমত উৎপীড়িত বোধ করছেন। শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন ও'রা, যদি সিগারেটের 'গন্ধ' পেয়ে রাজা বাহাদুর অসন্তুষ্ট হন, তা'হলে কারুরই যে কোন সুবিধে হবে না, এবং ভবিষ্যতেও কোন কারণেই তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না এ-সামান্য কথাটা কেন যে অমলেন্দুর মাথায় ঢুকলো না এটা তাঁরা বুঝতে পারলেন না!

বাইরে—কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো; যাক্! বাঁচা গেছে, অমলেন্দু ভাবলে, লোকের ভীড় আর বাড়বে না। এদিকে দেখতে দেখতে সমস্ত ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেল, রাজা বাহাদুরের আসবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, যে-কোন মুহূর্ত্তেই তিনি এসে পড়তে পারেন।

অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় বয়স্ক লোকটি—চোখে সোনার চশমা, গলায় সিল্কের চাদর, গিলে-করা পাঞ্জাবী, পরিষ্কার দাড়ি গোঁপ কামানো সম্পূর্ণ গোলাকার একখানি মুখ, তিনি বললেন, 'সিগারেটটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিন মশাই, এখুনি এসে পড়লে শেষকালে মুস্কিল হবে।'

'কি আর মুস্কিল বলুন!' তাচ্ছিল্যের স্বরে অমলেন্দু উত্তর দিলে, 'কতক্ষণ আর চুপ করে বসে থাকা যায়!'

ভদ্রলোক—বেশ বোঝা গেল—বিরক্ত হয়েছেন, 'পকেটে আমারও সিগারেট আছে, বুঝেছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই দেখুন!' সোনার একটি কেস্, ওপরে লেখা সত্যেন্দ্র! 'আমি কি আর সিগারেট খেতে পারি না মনে করেছেন?'

'তাই খান না কেন?' অমলেন্দুর মুখে কৌতুক দেখা দিল।

'না, সেটা ভদ্রতা নয়, মান্য ব্যক্তিদের সামনে ধূমপানের মত অনিষ্ট

আচরণ আর নেই কিছু!' সত্যেন বাবু বললেন (বোধ হয় ওঁর নাম সত্যেন বাবু)।

'কিন্তু তিনি ত এখানে নেই।'

'তা নাই বা থাকলেন, কিন্তু এসেও পড়তে পারেন যে কোন মুহূর্ত্তেই।'

'তখন লুকিয়ে ফেলা যাবে।' অমলেন্দু বাঁকা হাসি হাসলে।

'সিগারেট না হয় লুকোলেন, কিন্তু গন্ধটা ত আর লুকোতে পারবেন না!' সত্যেন বাবু তাঁর সিগারেট কেসটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

'তিনি জানছেন কি ক'রে কে তামাক খাচ্ছিলো,' অমলেন্দু বললে।

'বা রে! দোষ করলেন আপনি, আর অযথা অন্য লোকের ওপর সন্দেহ হবে?'

'সিগারেট খাওয়া তিনি ত দোষের নাও মনে করতে পারেন।'

'রাজা বাহাদুরকে আপনি জানেন না কিনা তাই ওকথা বলছেন অজ্ঞের মত, তিনি নিজে কোন নেশা করেন না, পান পর্য্যন্ত না।'

'সে আপনি বলতে পারেন না!' তৃতীয় ভদ্রলোকটি এবারে কথা বললেন, 'উনি কলকাতার বিখ্যাত ডিনার পার্টি, ডান্স ইত্যাদিতেও যাতায়াত করেন, আর একটুও নেশা করেন না এ কখনও সম্ভব?'

অপর তিন জনে বক্তার দিকে তাকালো, দীর্ঘ, শ্যামবর্ণ চেহারা, পোষাক পরিচ্ছদে অর্থের আনুকুল্যই সূচিত হয়। 'তা ছাড়া,' তিনি পুনরায় বললেন, 'রাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ বিজন হালদারের নাম শুনেছেন ত? তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তিনি নিজে বলেছেন ড্রিঙ্ক করা তাঁর অভ্যেস আছে।'

'তিনি নিজের চোখে দেখেছেন?' সত্যেন বাবুর আত্মসম্মানে বোধ হয় আঘাত লাগলো।

'না নিজে কি ক'রে দেখবেন!' তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'বড় লোকরা প্রকাশ্যে কিছু করে শুনেছেন?'

'ওঃ তাই বলুন!' সত্যেন বাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'আসল ব্যাপার কি জানেন? পয়সা-ওয়ালা লোকদের প্রতি আমাদের একটু স্বাভাবিক ঈর্ষা আছে, সে-জন্যেই আমরা তাদের নামে যা-তা রটিয়ে আমোদ পাই।'

'বিনা কারণে বদনাম রটিয়ে যারা আনন্দ পায় আমি তাদের একজন নয়। পয়সা এক সময়ে আমারও ছিলো মশাই, ঝিনাইদহের লাহাদের নাম শুনেছেন ত? আমি তাদেরই শেষ উত্তরাধিকারী। মে ফেয়ারে থাকবার সময় এই আপনাদের রাজা বাহাদুর আমার কাছ থেকে পাঁচ শ' পাউণ্ড ধার করে-ছিলেন। মেফেয়ার কোথায় জানেন ত? লণ্ডনে। সে-টাকা খরচ করেন কোন্ এক লর্ডের মেয়েকে খেসারত দিয়ে। তাঁর অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের দরুন ঐ টাকাটা সে-মেয়েকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে তাঁকে পালাতে হয়েছিলো ভিয়েনায়, সেখানকার এক রাজবংশের মেয়ের সঙ্গে আর এক কীর্ত্তি ক'রে বসেন। কিন্তু এ সব কিছুর মূলে কি জানেন? তাঁর ইন্দ্রের মত চেহারা! পৃথিবীর অনেক জায়গা আমি ঘুরেছি কিন্তু এমনি সুদর্শন পুরুষ আমার চোখে পড়েনি।'

'তিনি খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই', চতুর্থ লোকটি এবার কথা বললে, 'কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই তাঁর সব নয়, অন্তর তার সুন্দরতম।' অপর তিন জন ছেলেটির দিকে তাকালো; বয়সে তরুণ, মাথার চুলে বা পরিচ্ছদে পারিপাট্য নেই, পরণে মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি, স্বাস্থ্যবান, খালি পা। হাতে একখানি লম্বা খাতা। 'জীবনে আমার যতখানি রাজা বাহাদুরকে জানবার সুযোগ এবং সুবিধে হয়েছে—সন্দেহ হয় আপনারা তাঁর সম্বন্ধে তুলনায় কিছুই জানেন না, বেলুড় এবং বারাসতে যে ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদ বিদ্যালয় আছে তার প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক কে জানেন? এই যাঁর সম্বন্ধে আমরা এত আলোচনা করছি তিনি। টালিগঞ্জে ভিখিরিদের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবার জন্যে যে বিরাট বাড়ী তৈরী হবে তার ভিত্তি-স্থাপন করেছেন ইনি, নিজে কত টাকা দান করেছেন জানেন? তিরিশ হাজার! ব্যস্! আর কিছু আমি বলতে চাই না, এবারে তাঁর সম্বন্ধে বিচার আপনারা করুন!'

অমলেন্দু চমৎকৃত হল। নলিনীকান্ত সম্বন্ধে নানা স্থানে বহু আলোচনা সে শুনেছে, তাঁর সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল তার মনে জাগরূক। কেউ বলে তাঁর বয়েস তেত্রিশ কেউ বলে তেতাল্লিস। দেখা যাক্! নামবার সময় ত অতীত হল, যে-কোন মুহূর্ত্তেই পর্দ্দা ঠেলে ঘরে আসবার সম্ভাবনা। সাড়ে ছ'ফুট ঘড়িতে আটটা বাজতে সতেরো মিনিট বাকী।

বাইরে বৃষ্টি কমে এসেছে! দূরে ট্রাম-লাইনে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঝিনাইদহের লাহা পকেট থেকে এসেন্স-মাখানো রুমালটা বার কয়েকবার বুলিয়ে নিলেন মুখের ওপর, উগ্র গন্ধে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে ঘরের বাতাস উঠলো ভারাক্রান্ত হয়ে। সত্যেন বাবু বাঁ হাতের অনামিকা দ্বারা কপালের একটা অদৃশ্য ব্রণ খুঁটছিলেন, সে আঙ্গুলটায় যে আংটি তাতে প্রকাণ্ড একটা হীরে বসানো! বেদ-বিদ্যালয়ের ছেলেটি তার মোটা খাতায় ফাউণ্টেন্ পেন দিয়ে কি লিখছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দে অমলেন্দু চমকে উঠলো, ভেলভেটের চটির মৃদু আওয়াজ!

কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে গেল, সার্টিনের সোণালি পর্দ্দায় শিথিল আলস্য! কয়েকটা মিনিট।

ঘড়িতে পিয়ানোর স্বরে আটটা বেজে গেল।

পর্দ্দা এক সময়ে কেঁপে উঠলো, ঘরের মধ্যে দ্রুত চেয়ার সরাবার শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকলো বেয়ারা।

'যাইয়ে বাবু, আজ দেখা নেহি হোগা!' পর্দ্দাটা সে একপাশে তুলে ধরলো।

'আজ কি রাজা বাবু নিচেই আসবেন না?'

'নেহি!'

'আজ আর কখন দেখা হবে বলতে পারো?'

'মালুম নেহি।'

কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে বিনা বাক্যব্যয়ে একে একে দর্শন-অভিলাষীরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। ভিজে রাস্তায় ময়লার একটা সোঁদা গন্ধ!

অমলেন্দু রাস্তাটা অতিক্রম ক'রেই তুটো বাড়ী ছাড়িয়ে একটা পানের দোকানের কাছে এসে দাঁড়ালো। ভাবছিলো দেড় পয়সার সিগারেট কিনবে না এক পয়সার?

প্রকাণ্ড একখানা মোটার এসে দাঁড়ালো রাজা বাহাতুরের দরজায়। ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে দরজা খুলে দেবার আগেই তকমা-আঁটা বেয়ারাটা ছুটে এলো।

গাড়ী থেকে নামলো একটি তরুণী মেয়ে। দেড় পয়সা আর এক পয়সা সে ভুলে গেল। ফুটপাতে একটি পশ্চিমা লোক প্রাণপণে তোলা উনুনে হাওয়া দিচ্ছিলো। আগুণের উদ্ধত, লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে অমলেন্দুর মনে হল, পম্পির আগুণ এখনও নেবেনি। মেয়েটির সাড়ীর প্রান্তটা মিলিয়ে গেল।

ভিয়েনার রাজকুমারীর চুলে কি রাত্রির ইসারা পাওয়া যেতো ?

রজত সেন

ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

ভারতবর্ষ যখন আন্তর্জাতিক ইতিহাসের রাজ্যে আবির্ভূত হয়, তখন পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি অস্তমিত হইয়াছে। তিনটি মহাদেশ ব্যাপিয়া পারস্যের আখমিনিদের যে বিশাল সাম্রাজ্য ছিল তাহা ধ্বংস করিয়া এবং গ্রীশ দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বর্ব্বর ম্যাসিডোনিয়া জাতির তরুণ রাজা আলেকজাণ্ডার অজ্ঞাত জগত জয়োদ্দেশ্যে ধাবমান হইয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম এশিয়াস্থিত বিপুল বাহিনী জয় করিতে আলেকজাণ্ডারের যে শ্রম করিতে না হইয়াছিল, পারস্যের পূর্ব্বদিকের সগড়িয়ানা প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইরানী সামন্তবর্গকে এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে জয় করিতে তাহার অধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। এমন কি মুলতানে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক মাহাফি বলেন, পশ্চিমের সেমিটিক জাতীয় সৈন্যদলকে আলেকজাণ্ডার অবলীলাক্রমে জয় করেন; কিন্তু পূর্ব্বের ইরানী ও ভারতীয় আর্য্য সামন্ত রাজাদের জয় করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল (১)। ভারতে আসিয়া উহার অধিবাসীদের অন্য প্রকারের সভ্যতা দেখিয়াও তাঁহার দল আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের সহগামী গ্রীক্ পণ্ডিতগণ ভারতের কতিপয় দেবদেবীর সহিত নিজেদের দেবদেবীর সৌসাদৃশ্য দেখিতে পান। ভারতের বলরামকে তাঁহাদের হেরাক্লেসের সহিত সনাক্ত করেন; অপর একটি দেবতাকে তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের দেবতা বাক্কুসের (Bacchus) সহিত সনাক্ত করেন। তাঁহারা আরও বলেন হেরাক্লেস নাকি এই দেশে আসিয়াছিলেন। গ্রীক জাতীয় ধর্ম্ম প্রচারক ডিওনিসিউস্ (Dionysius) এই দেশে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম—Dionysius Cult বা Eleusinian Mysteries—প্রচার করতঃ একটি সম্প্রদায় স্থাপন

১। Mahaffy দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন (১)। অবশ্য গ্রীক পণ্ডিতদের (বর্ত্তমান ভারতের 'প্যান' হিন্দুদের ন্যায়) একটা দোষ ছিল যে পৃথিবীর যেস্থানে ধর্ম্ম সংক্রান্ত বা সভ্যতা সম্পর্কিত কোন বিষয় তাঁহাদের দেশের প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের সহিত মিলিত তাহা তাহাদের দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করিত এবং তাহাদের জাতীয় জিনিষ বলিয়া তাহা প্রচার করিতেন। সম্ভবতঃ ভারতের কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানের সহিত স্ব দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহারের মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া অমনি এদেশেও নিজেদের ধর্ম্ম-নেতার আগমনের বিষয় জাহির করিয়া বসিলেন! এইরূপ বিশ্বাস ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক কোন কোন ইউরোপীয় লেখক উত্তর পশ্চিম সীমান্তস্থিত নিসা (Nyssa) নামক সহরে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব্বে গ্রীক উপনিবেশ ছিল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। তখন ভাষা ও সমাজতত্ত্বের তুলনা-মূলক পাঠ ছিল না বলিয়াই এই সব ভ্রম-প্রমাদ হইত।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সঙ্গে প্রতীচ্য জগতে ভারতবর্ষের নাম প্রচারিত হয়। বোধ হয় গ্রীকদের মুখে উচ্চারিত 'হিন্দস্' কিন্তু লিখিত 'ইন্দস্' (Indos বা Ind) * পরে লাটিন ভাষায় India রূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় India নাম ধারণ করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতের এক নাম ছিল না বলিয়াই অনুমিত হয়। আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহাদেশের বিভিন্ন নামকরণ হয়। বৈদিক যুগে কাবুল বা সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত বিভিন্ন আর্য্য কৌমের জনপদ সেই সব কৌম বা কুলের নামে প্রচলিত ছিল। যেমন, পক্তদেশ, কুরুদের দেশ, শিবিদের দেশ ইত্যাদি। বেদে আবার আজকালকার পঞ্জাবকে "সপ্ত সিন্ধব" বলিত। এই নাম প্রাচীন ইরানী পুস্তকে "হপ্ত হিন্দ" বলিয়া পাওয়া যায়। অবশ্য পঞ্জাব

১। Coward—দ্রষ্টব্য।

* বোধ হয় পারশ্যবাসিদের সংস্কৃত 'শব্' পরিবর্ত্তে 'হ' উচ্চারণের ফলে সিন্ধুদেশ "হিন্দু" বা 'হিন্দ্' দেশ বলিয়া পশ্চিম এশিয়াতে পরিচিত হয়। গ্রীক্ ভাষায় লিখিবার কালে 'Hind'-র পরিবর্ত্তে 'Ind' লেখা হয়, কারণ স্বর বর্ণের উপর aspirate sound দিয়া তাহারা ইহাকে উচ্চারণ করিত। যথা,—(লিখিত) 'Ellenes' (উচ্চারিত) 'Hellenes': তদ্রূপ (লিখিত) 'Ind' (উচ্চারিত) 'Hind.' এই Ind-কেই লাটিনে India করা হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

"সপ্ত সিন্ধব" কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। স্মৃতিকারেরা পূর্ব্ব পঞ্জাবকে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" (১) বলিতেন এবং কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টি দেশকে "ব্রহ্মর্ষি" দেশ (২) বলিতেন। পূর্ব্ব-পশ্চিম সমুদ্রদ্বয় ও উত্তর দক্ষিণে হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরি—ইহাদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত। কিন্তু রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা পরিবর্ত্তিত হইত বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদের সুচিন্তিত অভিমত। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে বিস্তৃত স্থলভাগকে 'দক্ষিণাপথ" বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা অভিহিত করিতেন। উপরোক্ত নাম ব্যতীতও বৌদ্ধ পুস্তক ও পুরাণে সমগ্র দেশকে জম্বুদ্বীপ বলা হইত। পুরাণে সমগ্র দেশটিকে 'ভারতবর্ষ"—অর্থাৎ ভরত বংশীয়দের দেশ বলিয়া বর্ণিত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভারতবর্ষ' নামটা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। এক্ষণে 'ভারতবর্ষ' 'হিন্দুস্থান' ও 'ইণ্ডিয়া' এক অর্থেই ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষ ও তাহার সীমানা যে সংস্কৃতির সংজ্ঞাপক শব্দ তাহা ঋক্‌বেদের "নদী স্তুতি" (১০,৭৫) ও তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া পৌরাণিক নদী-স্তুতি যাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ নদী কাবেরী সংযোজিত হইয়াছে তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এক সময় বেদের পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহাদের দেশ কাবুল ও সিন্ধু উপত্যকার নদীসমূহের দ্বারা সীমা নির্দ্দিষ্ট ও আবদ্ধ ছিল (নদী-স্তুতিই তাহার প্রামাণ্য)। পরে সমগ্র ভারতে যখন আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে, তখন কাবেরী নদী পর্য্যন্ত এই স্তুতির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়।

মুসলমান আরবেরা বর্ত্তমানে আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরের দেশকে অর্থাৎ ভারতকে 'হিন্দ সিন্দ দেশ' (Land of the Hind and Sind) নামে অভিহিত করিয়াছিল। আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান ও বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশকে 'সিন্দ' দেশ ও তাহার পূর্ব্বের দেশকে 'হিন্দ্' বলিত এবং এতদুভয় দেশকে সম্মিলিত করিয়া 'সিন্দ্ হিন্দ্' দেশ বলিত। প্রাচীন মুসলমান আরবী ও ফার্সী সাহিত্যেও এই নাম প্রচলিত ছিল। আবার ইহুদি-

---

১। মনু সংহিতা—২।১৭

২। " " —২।১৯

দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাতন বাইবেলে ভারতবর্ষের নাম "হানুদদে"র দেশ বলিয়া অভিহিত আছে। ইহুদিগের জনশ্রুতি বলে, জগতে মহাপ্লাবনের (Deluge) পর পৃথিবীতে আবার যখন মানবের বসতি স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন নোয়ার (Noah) এক পুত্র হামের (Ham : কৃষ্ণকায়) বংশধর 'হানুদ" নামে পরে পরিচিত হয়। এই হানুদ" অর্থ নাকি 'কৃষ্ণকায়"; এই কৃষ্ণকায় হানুদের বংশধরেরাই ইহুদি জনশ্রুতি অনুসারে কৃষ্ণবর্ণ হিন্দি বা হিন্দু! আবার মুসলমান ফার্সী সাহিত্যে নাকি হিন্দু" অর্থে কৃষ্ণকায়, চোর প্রভৃতি বলা হইয়াছে (১)। এই সব গালাগালি তুর্কি-মুসলমানদিগের দ্বারা ভারত বিজয়ের পরই সৃষ্ট হয়। ফার্সী "হিন্দ" (২) শব্দ হইতেই "হিন্দু" এবং "হিন্দুস্থান" নাম হইয়াছে।

ভারতবর্ষ বা 'ইণ্ডিয়া' শব্দ দ্বারা বর্ত্তমানের ইংরেজ সাম্রাজ্যাধীন ভারতের অংশকেই বোঝায়। প্রাচীন সীমানার মধ্য হইতে গান্ধার ও কাবুল প্রভৃতি জনপদ নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর আধুনিক 'আফগানীস্থান' নাম ধারণ করিয়া এশিয়ার একটি স্বতন্ত্র দেশরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেশকে আজকাল 'বেলুচিস্থান' বলিয়া অভিহিত করা হয়, উহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেলুচিদের আক্রমণ ও রাজ্যাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে যে প্রাচীন আরাকোসিয়া (আবেস্তার 'হারাত্তটি'—কাহার কাহার মতে ইহাই বৈদিক 'সরস্বতী', যাহা অধুনা 'কান্দাহার') প্রদেশে (৩) আলেকজাণ্ডারের বাহিনী

১। ফিরদৌশির 'শাহানামা' দ্রষ্টব্য।

২। কবি আমির খশরো তাঁহার 'খলিকবারী' নামক অভিধানে 'হিন্দবী' বা 'হিন্দি' এই উভয় শব্দেরই ভারতীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

৩। বর্ত্তমান 'কান্দাহার' নামটি প্রাচীন 'গন্ধার' নামেরই রূপান্তর। বর্ত্তমান পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডি মধ্যস্থিত জনপদকে সংস্কৃত ভাষায় 'কান্দাহার' বলা হইত। এই জনপদের বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নাকি বর্ত্তমান 'কান্দাহার' উপনিবেশ স্থাপিত হয়। শকেরা এইস্থানে বুদ্ধের রক্ষিত ভিক্ষাপাত্র কাড়িয়া লইবার জন্য আক্রমণ করিলে, সেখানকার বহু বৌদ্ধ নিভৃতে পর্ব্বতময় পশ্চিম অঞ্চলে পালাইয়া গিয়া এই নূতন 'গান্ধার' স্থাপন করে। 'পুস্তু' ভাষায় ইহা বর্ত্তমান 'কান্দাহার' রূপ ধারণ করিয়াছে।

পারস্য বিজয় করিয়া সর্ব্বপ্রথম 'ইণ্ডিয়ানদের' (১) সাক্ষাৎ লাভ করে। ইহাদিগকে তাহারা "Para men ton Indon" (যাহারা ভারতীয়দের আড়াআড়ি বা অপর পার্শ্বে বাস করে) বলিয়াছেন। তাহা হইলে ইহার অর্থ এই হয় যে ইহারা খাঁটি ইণ্ডিয়ান নয়; খাঁটি ভারতবাসীদের (২) সহিত ম্যাসিডোনীয় বাহিনী পারোপামিশুস্ (বর্ত্তমান 'হিন্দুকুশ') পর্ব্বতমালার উপর সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহারা কাবুল উপত্যকার লোক। সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের (৩) মত এই যে বৈদিক যুগে আর্য্যগণ বর্ত্তমান আফগানীস্থানের অন্তর্গত পূর্ব্ব কাবুলিস্থান জনপদ ও পঞ্চনদের উপত্যকায় বাস করিতেন। বেদে 'কুভা' (বর্ত্তমান 'কাবুল'), গোমতী (বর্ত্তমান 'গোমাল'), ক্রুমু (বর্ত্তমান 'কুরম') নদী সমূহের উল্লেখ আছে। অপর একটি নদীর উল্লেখ আছে—ইহার নাম 'রসা' (৪) (Rasa)। কাহার কাহার মতে বৈদিক 'রসা' বা 'রাসা', আভেস্তার 'রানহা' এবং হেরোডেটাস বর্ণিত মধ্য এসিয়ার (বর্ত্তমান 'তুর্কিস্থান') Arazes নদী আজকাল Jaxartes নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই বিতর্কের এখনও সুনিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যায় নাই।

আলেকজাণ্ডার যখন পারশ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি সিন্ধুদেশ দিয়া গেড্রোশিয়ার মরুভূমির মধ্য হইয়া স্বস্থানে যান। ইহার অর্থ তিনি আজকালকার বেলুচিস্থানের 'জোকরান' মরুভূমির মধ্য দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় আলেকজাণ্ডারের অনুচর গ্রীক্ লেখকগণ বলেন বেলুচিস্থানের বর্ত্তমান পোরালি (৫) নদী ভারতের পশ্চিম সীমানা ছিল। ইহাতে বোঝা যায় যে বর্ত্তমান 'লাসবেলা' নামক জনপদ ভারতের এই অংশের পশ্চিম সীমান্ত ছিল। এই স্থানের লোকেরা আজও সিন্ধি ভাষার অপভ্রংশ ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে পারশ্য সম্রাট প্রথম দারাউসের বেহিস্থান প্রস্তর

১। Arian—'Anabasis' III, P 28. Judika—1-1-1 ; Strabo—XV. 1.

২। Arian—'Anabasis' III. P 23. ,, P 14

৩। Zimmer—Altindisches Leben—P 14.

৪। Zimmer—Altindisches Leben : P. 15-16.

৫। Vincent Smith—Early History of India.

ফলকে (১) ভারতের পশ্চিম সীমা তাহার রাজত্বের অন্তর্গত ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহার প্রস্তর ফলকে 'হিদ্দু' (সিন্ধু প্রদেশের লোক), গাদার (গান্ধারী), মোকা (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মেকরাণী) জাতিসমূহের উল্লেখ আছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব্বে আদি গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (২) বলেন, ভারতের সীমায় "পক্তিকা" জনপদে 'সত্তগিডে (Sattagydae), গান্ধারী, ডাডিকা বা ডাডি ও আপারিটে (Aparytae) কৌমচতুষ্টয় বাস করিত। ইহাদের মধ্যে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত গান্ধারীদের নাম পাই; অপর একটি কৌম আজও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের সীমান্তবর্ত্তী 'আপ্রিদি' কৌম। (ইহারা নিজদিগকে 'আপ্রিদি' বলে; কিন্তু ইংরাজীতে ইহাদিগকে 'আফ্রিদি' নামে অভিহিত করা হয়।) বেল্যুর (৩) মতে বর্ত্তমানের 'খটক' কৌমটি প্রাচীন সত্তগিডেদের বংশধর; এবং ডাডিরা নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আবার ইহাদিগকে 'দরদ' জাতির সহিত সনাক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

হেরোডেটাসের 'পক্তিকা' জাতিকে আমরা বেদে (ঋক ৭, ১৮, ৭) 'পক্ত' বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাই। বেদে 'পক্তরাজ' অশ্বিনীকুমার নামক যমজ দেবতাদের আশ্রিত বলিয়া উল্লিখিত আছে (ঋক ৮, ২২, ১০, ৪৯, ১০; ১০, ৬৬১)। বেদে পক্তরাজকে আর চারি আর্য্যজাতীয় রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া 'এৎসু-ভারত' রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার কথা উল্লেখ আছে। আবার মোগল সম্রাট শাহজাহানের পাঠান বংশীয় কর্ম্মচারী খাঁজাহান লোডির দ্বারা প্রণোদিত নিয়ামৎউল্লার লিখিত 'আফগানদের ইতিহাস' (৪) নামক পুস্তকে 'গান্ধারী' নামক কৌমের উল্লেখ আছে।

১। Rawlinson—"The Great Inscription of Darius at Behistan" in "History of Herodotus" Vol. II.

২। Herodotus—BK. VII. P. 67.

৩। Bellew—'Races of Afghanistan' and 'Imperial Gazetteer of India.'

৪। Neamatulla—'History of the Afghans.' Translated by Dorn.

গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সেলিউকাস তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বভাগের সেই অংশ ভারতের রাজা চন্দ্রগুপ্তকে খৃঃ পূঃ ৩১০ সালে প্রদান করেন—যাহাতে খাঁটি 'ইণ্ডিয়ান লোকসমূহের বসতি ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের (১) মতে বর্ত্তমান সমগ্র আফগানিস্থান এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থান এই প্রকারে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কী বংশীয় মুসলমান রাজার রাজত্বকালে সুলেমান পর্ব্বতোপরি অধিবাসী 'আফ্‌গান্‌' নামক একটি পার্ব্বত্য জাতির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। মামুদের ঐতিহাসিক আল-বেরুনী বলেন, ইহাদের সর্দ্দারেরা মামুদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণান্তর তাঁহার সৈন্যদলে প্রবেশ করতঃ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন কার্য্যে যোগদান করে। মামুদই ভারত আক্রমণের রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য (২) ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী ভারতীয় জাতিগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া সেই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির বসতি স্থাপন করায়। এই সময়ের ইতিহাসে ইহাও পাওয়া যায় যে মামুদ চিতোর আক্রমণ করিলে সীমান্তদের 'সুবাস্তু' (বর্ত্তমান সুয়াত, Swat) উপত্যকার লোকেরা চিতোরের সাহায্যকল্পে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। এই 'সুয়াতে'র অধিবাসিগণ সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ এক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। ৩ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পর হইতে আহমদশা আবদালীর সময় পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়া হইতে নানা জাতীর আক্রমণ দ্বারা স্থানীয় কুলসমূহ স্বীয় বাসচ্যুত হওয়ায় এবং পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার ফলে তাহাদের ভাষারও প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটে। ফলে জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব হিসাবে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান আজ ভারতবর্ষ হইতে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। এবং অবশিষ্ট মহাদেশটিও নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর বর্ত্তমান 'ইণ্ডিয়া' (ভারত)-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বৈদিক যুগ হইতে গণনা করা হয়। বেদে সংস্কৃত

১। Vincent Smith—Early History of India.

২। E. Oliver—Across the border or Pathan and Beluchi.

৩। Akhund Darweza Babu—Tatkhira : I. Darmestetar—Charts Populaires des Afghans দ্রষ্টব্য।

ভাষাভাষী একটি জাতি যাহারা নিজেদের "আর্য্য" বলিয়া পরিচয় দিত, তাহাদের উল্লেখ আছে। বেদে এই আর্য্যদের দেবতাদের 'শ্বেতকায়' (ঋক্‌বেদ ২, ২০, ৮) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর একটি জাতির উল্লেখও বেদে আছে—তাহাদিগকে 'দস্যু' বা 'দাস' বলা হইয়াছে। এই দস্যুদের কৃষ্ণকায় (২, ২০, ৭), অ-নাসা (২৯, ১০), অব্রাহ্মণ (৪, ১৬, ৯), অ-দেবায়ু (৮, ৭০, ৩), অ-ব্রত (১, ৫৮, ৮) প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। এই দস্যুদের আবার অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুও (১, ৩৪, ৭; ১০০,১৮, ২, ১৩৯) বলা হইয়াছে। আবার তাহাদের "আয়স দ্বারা আবৃতপুর"ও (২-২০-৮) উল্লেখ আছে। এতদ্বারা বোঝা যায় যে এই সকল দস্যুদের সভ্যতা তৎকালীন 'বৈদিক আর্য্য'দের অপেক্ষা বড় ছিল। 'আর্য্য' ও 'দস্যুদে'র পার্থক্য ধর্ম্ম (১) নিয়াই ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, তাহারা বৈদিক আচার ও ক্রিয়া মানিত না বলিয়াই উপরোক্ত বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নর-তত্ত্বে এই বৈদিক আর্য্যদের ও তথাকথিত 'দস্যু' বা 'দাস'দের স্থান কোথায় এই নিয়া বহুকাল তর্ক চলিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভাষার তুলনামূলক পাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা ও ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তির মূল এক আবিষ্কার করিয়া ভাষা-তত্ত্ববিদেরা এই ভাষাগুলিকে 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' বা 'আর্য্যজাতীয়' ভাষা বলিয়া নামকরণ করেন। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক জার্ম্মান বংশোদ্ভব ম্যাক্সমূলার এই জাতীয় ভাষাভাষী 'আর্য্য' নামধারী একটা নরজাতির কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি পরে ইংরেজ এবং উত্তর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বাধ্য হইয়া বলিলেন,—"আমি 'আর্য্য' অর্থে একটা নরজাতি বুঝি না,—একটা ভাষাকেই বুঝি (২)।" এই সময় হইতে জার্ম্মান স্বজাতি প্রেমিক (Pan-Germanist) পণ্ডিতেরা এবং তৎসঙ্গে উত্তর ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'আর্য্য' অর্থে নিজেদের উত্তর-ইউরোপীয় পূর্ব্ব পুরুষগণকে বুঝিতে আরম্ভ করেন। উত্তর ইউরোপের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ

১। Vedic Index—Vol. I

২। Max Mueller—'Biographies of Words and the Home of the Aryans' P. 120.

(blonde), নীল চক্ষু, লাল বা কটা চুল, লম্বা মাথা, সরু নাক, দীর্ঘ দেহাকৃতি বিশিষ্ট লোক যাহাদের তাঁহারা নর্ডিক (Nordic : উত্তর ইউরোপীয়) নামকরণ করিয়াছেন—তাহাদিগকে আসল খাঁটি আর্য্য জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জার্ম্মান পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে German (গার্ম্মান) বা 'টিউটন' বলেন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই নর্ডিকের সন্ধানে খুঁজিয়া বেড়ান। তাঁহাদের বৈদিক আর্য্যগণও এই 'নর্ডিক' বংশীয় ; পরে তাহারা ভারতের 'কালা' জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

এই সকল জাতীয়তা-বাচক গবেষণা রাজনীতিক রূপ (Political colour) প্রাপ্ত হইয়াছে (১)। ইউরোপের প্রত্যেকটি বড় জাতি নিজেদের আসল আর্য্য জাতি বলিয়া দাবী করেন। ফরাসী ও ইতালীয়েরা (২) জার্ম্মানদের মতের প্রতিবাদ করেন। জার্ম্মান ভাষাভাষী জাতিসমূহের ভাষায়, বিশেষতঃ আমেরিকায়, 'আর্য্য' মানে 'ককেসীয়' বা 'শ্বেত জাতি' বলিয়া ধরা হয়। এখন পাশ্চাত্যেরা ভারতবাসীদের 'আর্য্য' বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ 'আর্য্য' জাতি তাঁহাদের নিকট, হয় 'উত্তর ইউরোপীয়,' না হয় 'ইউরোপীয় শ্বেতজাতি'র বংশধর। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাষার দিক হইতে 'আর্য্য' শব্দটি পারস্যবাসী ও ভারতের সংস্কৃত-ভাষীদের প্রতি প্রয়োগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অধুনা ভারতবর্ষেও, অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ইউরোপীয়দের এই তথ্যের রোমন্থন করিয়া প্রাচীন ভারতে 'নর্ডিক' জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় তাঁহারা ব্রাহ্মণের স্বরূপ পানিনী উল্লিখিত, "গৌরঃ পিঙ্গলঃ কপিল কেশঃ (৩) (Panini—Vol. 1. P. 115) শ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতে উত্তর ইউরোপীয় 'নর্ডিক' অথবা একটা অভারতীয় শ্বেত জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় এ সংবাদ রাখেন না যে পামীর পর্ব্বতের উপরে ইরানী-ভাষী সাদা-গোলাপী গাত্রবর্ণ, কটা চক্ষু ও কটা চুল বিশিষ্ট এক জাতির অস্তিত্ব সার্

১। Riplay—"European Races." Chapter on. 'Aryan Controversy.'

২। Serji—The Mediterranean Race.

৩। পাণিনি গান্ধার দেশের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই এই বর্ণনা তথাকার লোকের প্রতি প্রয়োজ্য হওয়া সম্ভব।

আউরেল ষ্টাইন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জাতিকে নরতত্ত্ববিদ্ জুয়স্ 'লাপুজ' (Lapouge) 'আলপিন' বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। যে জাতিটি 'পামীর' পর্ব্বত হইতে মধ্য ইউরোপের 'আল্পস্' পর্য্যন্ত বাস করে ইহাকে ইউরোপে 'আলপিন' (Alpine) নামে অভিহিত করা হয়। জার্ম্মাণ নরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক লুসান (Luschan) এসিয়ায় এই জাতির অংশের Armenoid (১) (আরমানীর ন্যায়) এই নাম ধার্য্য করিয়াছেন। ইনি এসিয়া মাইনরের 'আরমানী' জাতির মধ্যে এই জাতির শারীরিক লক্ষণ বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হন। ইহার শারীরিক লক্ষণ,—A white-rosy race, very brachycephalic, stature above average, with prcminent nose, hair brown, usually dark, eyes medium in the moin.—(২) এই স্থলে তিনি আরও একটি জাতির সংবাদ দিতেছেন :—Brown, mesoticephalic, tall, prominent and aquiline nose, black wcrdy hair, dark eyes. This race may be termed 'Indo-Afghan using Deniker's nomenclature. (৩) এতদ্দ্বারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুইটি আর্য্য ভাষা-ভাষী জাতির শারীরিক লক্ষণের বিষয় অবগত হওয়া গেল (৪)। বর্ত্তমান বিভিন্ন হিন্দুজাতিসমূহের শারীরিক লক্ষণ বিশ্লেষণ করিলে উপরোক্ত এই জাতিদ্বয়ের শারীরিক লক্ষণ তাহাদের মধ্যেও পাওয়া যায় (৫)।

জয়েসের (Joyace) অনুসন্ধান দ্বারা আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে পাণিনীর "গৌরঃ পিঙ্গলঃ কপিশ কেশঃ" ব্রাহ্মণ ইরানী রক্তের লোক হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহাকে উত্তর-ইউরোপ হইতে আমদানী করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার ইহাও সম্ভব হয় যে, জাতির মধ্যে যে লক্ষণটি দুষ্প্রাপ্য সেইটিকেই লেখকগণ আদর্শ করিয়া ধরেন। সেইজন্যই ভারতের

১। Von Luschan—Huxley Memorial Lectures.

২। Joyace—I. A. I. BK. 33. P. 468.

৩। Joyace—I. A. I. BK. 33. P. 468.

৪। এই বিষয়ে Dr. B. S. Guha—"Census of India" Vol. 1. Pt. III.

৫। B. N. Datta—Die Indische Kasten System in "Anthropos." Band XXII. 1927.

ব্রাহ্মণকে উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে! বেদে 'আর্য্য' ও 'দস্যু'কে এক জাতীয় বলা হইয়াছে। 'বৈশ্বামিত্র দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ"। আবার 'আর্য্য' ও 'দাস'কে নহুষের সন্তান বলা হইয়াছে (৬-২২-১০)। উভয় জাতির সহিত মধ্যে এত বিবাদসত্ত্বেও ইন্দ্রকে উভয় জাতির সহিত সমভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায়: যথা,—"হে ইন্দ্র, তুমি আর্য্যের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ, এবং 'দস্যু'কে তোমার বাম পার্শ্বে বসাইয়াছ" (২-১১-১৮)। অন্যত্র, ইন্দ্র বলিতেছেন, "এই আমি যজ্ঞে যজমানদিগকে দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। দাস এবং আর্য্যকে বিশেষভাবে চিনিতেছি: তাহাদের পাক করা হব্য এবং অভিষুত সোম গ্রহণ করিতেছি" (১০—৮৬—১৯)। এই সকল বচনে আমরা উভয় জাতিকে এক দেবতারই ভক্ত বলিয়া দেখি। এই সব হইতে অনুমান হয় প্রথমতঃ এই উভয় জাতির বিবাদ ধর্ম্মের বিভিন্নতা ও পার্থক্য নিয়াই ছিল (১)। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির বিবাদ দেখিয়া থাকেন। আজকাল জগতে উত্তর ইউরোপীয় জাতিদের দ্বারা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেমন 'সাদা ও কালা' জাতির মধ্যে ঝগড়া কলহ চলিতেছে, তাহারা বেদে তাহার পুনরভিনয় হইতে দেখেন। আর আমাদের দেশের লোকেরাও তাহা বদ হজম করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে তাহারই অনুসরণ করেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে—এই দস্যুগণ কাহারা? এই প্রশ্নের অনুসন্ধানের পূর্ব্বে পারশ্যের প্রাচীন পুস্তকে জাতি বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পারশ্যের সর্ব্বপ্রাচীন ভাষা 'জেন্দে' লিখিত 'আবেস্তা'তে আমরা 'আইরিয়া' বা আইরান (২) বলিয়া একটি জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই। এই 'আইরান' শব্দই 'পহ্লবী' ভাষায় 'ইরান' রূপ ধারণ করে এবং বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সেই নামে পারশ্যদেশ পরিচিত হইয়া আসিতেছে। 'আইরান' বেদের আর্য্যের অনুরূপ; আবেস্তায় 'দহ' এবং প্রাচীন ফার্সীতে 'দহিয়াউস্' ('Dahyaus').

১। Vedic Index.

২। Darmesteter— জেন্দ ভাষার পুস্তক সমূহের অনুবাদ দ্রষ্টব্য। Encyclopaedia Britannica—Vol. 17, p. 565 : 1929. দ্রষ্টব্য

পুরাতন বক্রীয় ভাষায় 'দনহু' ('Danhu'), 'দককু' (Daque) (১) নাম পাওয়া যায়। এই শব্দের (২) প্রথমে অর্থ ছিল—'শত্রু ধ্বংসকারী'; পরে ইহা ('আইরিন' শব্দ) দ্বারা 'জেলা, জনপদ বা প্রদেশ' অর্থ বুঝায়। 'ইরান'গণ নিজেদের শত্রুদিগকে প্রথমত এই নামে অভিহিত করিত; পরে এই নাম দ্বারা পরাজিত শত্রুদের জনপদকে একটি 'প্রদেশ' বলিয়া অভিহিত করিত। উদাহরণত, দারায়ুস "ক্ষয়থিয় পার্সে, ক্ষায়থিয় দাহিউনাম (৩) (Kshayathiya Parssay, Kshayathiya Dahyunam) বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই স্থলে 'দাহিউনাম' অর্থ 'প্রদেশসমূহ' বুঝাইতেছে। এই 'দহ'দিগকে পরে ইরানী কৃষকগণ (৪) শক (Scythian) বলিয়া অভিহিত করিত। পারশ্যের সীমানার বাহিরে যে সকল অসভ্য যাযাবর জাতি (nomadic tribe) ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহারা এই নামে অভিহিত হইত। কিন্তু কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'স্কলেটি' নামক যে সব শকেরা বাস করিত, তাহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ হেরোডোটাসের লেখার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। ষ্টিউস্ (Zeuss) ও মুলেন ডর্ফ নামক জার্ম্মাণ পণ্ডিতদ্বয়ের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই শব্দগুলি ইরানী ভাষার অন্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (৫)। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন-তুর্কিস্থানের তুরফান নামক স্থানে জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে ভারত আক্রমণকারী শক জাতির ভাষাও ইরানী ভাষার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্বারা এই স্থিরীকৃত হয় যে 'দহ' বা 'দক্কু' এবং খৃষ্টের জন্মের পরের শতকের ঐতিহাসিক শকেরাও ইরানীয় আর্য্য ভাষার লোক ছিল। এই সঙ্গে আউরেল ষ্টাইন প্রভৃতি বলিতেছেন যে মধ্য এশিয়ার আদিম মূল জাতি (৬) (basic race) ইরানী ভাষা-ভাষী "আলপিন"(৭) মূল জাতীয় ছিল।

১। Zimmer—"Altindisches Leben," pp. 110, 112.

২। Zimmer—"Altindisches Leben'.

৩। Zimmer—'Altindisches Leben'.

৪। Encyclopaedia Britannica—Vol. 17, p. 565 : 1929 Edn.

৫। Encyclopaedia Britannica—Vol. 17, p. 565 : 1929 Edn.

৬। (a) Joyace—I. A. I. BR. 33. (b) Riplay—'European Races': Vide chapter on Central Asia.

৭। F. W. K. Mueller—"Toxri und Kuisan' in Sitz d. Kgl. Pr. Akad. d. w.

এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীরা আর্য্য-ভাষা-ভাষী ও শ্বেতবর্ণের লোক ছিল। তাহারা আধুনিক নরতত্ত্ববিদের ভাষায় অ-শ্বেত (non-white), অ-ককেসীয় (Caucasian), প্রাচ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় বা দক্ষিণ এশিয়ার 'অষ্ট্রোলয়ড' (Austroloid) বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ন্যায় কোন জাতি ছিল না। আবেস্তার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশ্বাসী সভ্য ইরানীরা মরুভূমি বা নিজেদের কৌমের বাহিরের লোক-দিগকে 'দহ', 'দক্যু', 'শক' প্রভৃতি ঘৃণাবাচক বিশেষণে বিশেষিত করিত। আসলে এই বিভিন্নতা সংস্কৃতির বিভিন্নতা বা পার্থক্য হইতে সৃষ্ট হয়। পারস্যের 'দহ' ও 'দক্যু'দের মধ্যে বেদোক্ত কৃষ্ণবর্ণের 'দস্যু' বা 'দাস'দের আমরা পাই না।

বেদে 'অ-মানুষ', পর্ব্বতের 'দস্যু' (৮, ৭০, ১১) এবং 'দাস' (১০, ৬২, ১০) উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। এই দস্যুদের 'আর্য্যগণ' দেবতাগণের সাহায্যে জয় করিতেন; নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্যে ইহাদিগকে জয় করা বৈদিক লোকদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। বেদে আবার 'দাস বর্ণ' বলিয়া এক বর্ণের বর্ণনা আছে (সাংখ্য ২, ১২, ৪ এবং শ্রৌত সূত্র ৮, ২৫, ৬); অনেকস্থলে তাহাদিগের 'কৃষ্ণত্বক' (১, ১৩০, ৮, ৯, ৪১, ১) বলা হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই 'দাস'গণ পরাজিত হইয়া গোলামীতে আবদ্ধ হওয়ায়—'দাস' শব্দের অর্থ পরে 'গোলাম' হয় (৭, ৮৬, ৭ ; ৯, ৫৬, ৩ ; ১০, ৬২, ১০)। এই দাস জাতীয় স্ত্রীলোকেরা উপপত্নীরূপেও গৃহীত হইত। কবষ ঋষিকে 'দাস্যা পুত্রা' বলিয়া ঠাট্টা করার কথাও উল্লিখিত আছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১৯ ; কৈষিতকী ব্রাহ্মণ ১২।৩)।

কাহার কাহার মতে ইরানী 'দনহু' (Danhu), 'দক্যু' এবং বৈদিক 'দস্যু' শব্দ—এইগুলির এক উৎপত্তি ছিল। প্রথমে ইহার অর্থ ছিল 'শত্রু'; পরে ইরানীরা এই শব্দের অর্থ 'পরাজিত দেশ' বা 'প্রদেশ' বলিয়া ব্যক্ত করে। বৈদিক লোকেরা ইহার প্রথমোক্ত-অর্থ রাখিয়া তদ্দ্বারা অমানুষিক 'শত্রু'ও (demon and foe) বুঝিত (১)। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত রথের মতে

Zimmer—Altindisches Leben : P. 110.

দেবতা ও অসুরদের বিবাদকে মানব সমাজে প্রয়োগ করিয়া ইহার অর্থ 'মানুষের শত্রু' ধরা হইয়াছে। লুডভিগ (Ludwig) বলেন, (১) দাস রাজগণকে হিন্দু গ্রন্থসমূহে দানব বা অসুররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যদিকে লাসেন বলেন,—যেমন সংস্কৃত 'দেব' ও আবেস্তার 'দেবা' বা 'দায়েরার' মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, তদ্রূপ 'দক্ক' ও 'দস্যু' শব্দের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এতদ্দ্বারা তিনি একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কলহকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। আদিতে এই শব্দটির একটি সম্মানজনক অর্থ ছিল, পরে অসম্মানসূচক অর্থ হয়।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, 'দস্যু' শব্দের ন্যায় 'দাস' শব্দেরও একটা ইরানী অনুরূপ শব্দ আছে। লাসেন প্রভৃতি বলেন—'দাস' শব্দ ইরানী 'দহ' বা 'দাহ' (Daha) শব্দেরই অনুরূপ। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণের শকদের হেরোডোটাস্ 'দহ' নামেই জানিতেন (২)। রোমান লেখক প্লিনিও (Pliny) ইহাদের 'দাহে' (৩) (Dahae) নামে জানিতেন। পারস্যের ধর্ম্মপুস্তকে (বুন্দেহেস, ১৫) ইহাদের জনপদ বর্ণিত আছে। এই জন্য জিমার (৪) বলেন —"ইহা সন্দেহাতীত যে 'শত্রুর' সাধারণ ইণ্ডো-ইরানী নাম ছিল 'দাস'। এই নামটি ইরানীরা পরবর্ত্তীকালে একটি নির্দ্দিষ্ট তুরানী জাতির (মধ্য এসিয়ার জাতি) প্রতি প্রয়োগ করে। ইহা দ্বারা 'দস্যু' শব্দের ইণ্ডো-ইরানী অর্থও নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হয়।"

এক্ষণে আমরা এই তথ্যে উপনীত হইলাম যে আর্য্যেরা যেমন নিজ সমাজের এবং প্রাচীন কালের কৌমগত অবস্থার সংস্কার সাধনোদ্দেশ্যে তাহাদের শত্রুদের 'দনহ' বা 'দক্ক' বা 'দাহে' বলিয়া অভিহিত করিত, বৈদিক আর্য্যেরাও এই শব্দদ্বয়ের কথঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া নিজেদের সমাজের বহির্ভূত শত্রুদের উপর আরোপ করিত (৫) কিন্তু ইহার দ্বারা 'দস্যু' বা 'দাস'দের সম্বন্ধে কোন নরতাত্ত্বিক

১। Ludwig—Nachrichten : P. 32.
২। Herodotus—I. 126.
৩। দাহেরা ঐতিহাসিক জাতি।
৪। Zimmer—P 112.
৫। ফার্সী 'হ'-এর উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষায় 'স' হয় বলিয়াই কি ইরানী 'দহ' বা 'দাহ' সংস্কৃতে 'দাস' হইয়াছে।

সংবাদ• পাওয়া যায় না। অথচ বেদে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। বেদে 'আর্য্যম্ বর্ণং' এবং 'দাসং বর্ণম্' বলিয়া দুই জাতিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋক্‌বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, "যে 'দাস বর্ণ' জয় করিয়াছে, হে মনুষ্যগণ সে হইতেছে ইন্দ্র" (২।১২।৪), আবার "সে দস্যুদের জয় করিয়া 'আর্য্যবর্ণ' সাহায্য করিয়াছে" (৩।৩৪।৯)। জিমার বলেন, অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ না থাকায় এবং স্পষ্ট বিরুদ্ধতা থাকায় 'বর্ণ' শব্দের অর্থ (১) 'লোকসমূহ' (people) বলিয়া ধরিতে হইবে। যথা ;— "দেবতাগণ দাসদের ক্রোধ দাবাইয়া ছিলেন ; তাঁহারা আমাদের লোকদিগকে (না বর্ণম্) সৌভাগ্যজনক অবস্থায় উপনীত করিবেন (ঋক্ ১।১০৪।২)।" ইহা হইতে পাওয়া যায়—'বর্ণ' অর্থে 'লোকসমূহ' ; হয়ত গাত্রবর্ণ হইতে এই অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কারণ, ইন্দ্র তাহার পূজক আর্য্যদের সকল যুদ্ধে সাহায্য প্রদান করিয়াছে…(আর্য্য) লোকেদের জন্য সে বিধিশূন্য লোকদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছে এবং কৃষ্ণকায় লোকদিগকে (ত্বকং কৃষ্ণং) পরাজিত করিয়াছে (১।১৩০।৮)। আবার আর্য্যদিগের দেবতাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"সে দস্যু ও সিম্যুকে প্রচলিত ভাবে হত্যা করিয়াছে…সে জমি তার শ্বেত বন্ধুদিগের সহিত দখল করিয়াছে (১।১০০।১৮)।" যে সকল আর্য্য-কৌম নিজদিগকে 'যদু বংশীয়' বলিয়া দাবী করিত বেদে তাহাদেরও উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগের সহিত প্রথমাগতদের বিবাদও হইয়াছিল।

এইরূপ অনুমিত হয় যে দেবতাদিগের সম্পর্কে যে-লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, এই সব শারীরিক লক্ষণ তাহাদিগের ভক্তবৃন্দের প্রতি আরোপ করা খুব অবৈজ্ঞানিক। ইতালীয় নরতত্ত্ববিদ্ সার্গি (২), গ্রীস ও রোমের দেবদেবীদের উত্তর-ইউরোপীয় জার্ম্মানভাষী ভাষা-তত্ত্ববিদেরা "blonde Tetonic" বা নর্ডিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তজ্জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই চেষ্টাকে ভাষার অর্থের অপব্যবহার ও অপ্রপ্রয়োগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতীয় দেবদেবীদের বেলায়ও সেইরূপ

১। Zimmer—P. 113.

২। Sergi—The Mediterranean Race.

হইয়াছে। কেহ কেহ (১) ভারতীয় দেবতাদের 'ব্লণ্ড টিউটন' রূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; আবার কেহ কেহ সেই সঙ্গে সমস্ত বৈদিক জাতিকে হয় সুইডেন (২), না হয় উত্তর-জার্ম্মাণী, না হয় বল্টিক সমুদ্রের উপকূলের কোন স্থান হইতে আসিয়াছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ইহা একটি অতি বড় বৈজ্ঞানিক সত্য যে ভারতের তথা আদিম অধীবাসীরা অ-শ্বেত বা মলিন বর্ণের ব্রাউন (Brown) বা কৃষ্ণকায় লোক। ইহাও সত্য হইতে পারে যে বৈদিক কৌমগুলি এজাতীয় লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। আবার ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে ইহাদিগের কতক লোক বিজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সেইজন্যে 'দাস' অর্থে 'ক্রীতদাস' 'গোলাম' (৩) ধরা হইয়াছে। তত্রাচ ইহা প্রমাণিত হয় না যে, যে দস্যু ও দাসদের "আয়সী" পুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—যাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে বৈদিক জাতিগুলির চেয়ে অধিকতর বলিয়া স্পষ্ট

১। (ক) Zenaide Ragozin—Vedic India; (খ) Samuel Johnson—Vedic India (বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আর্য্যকে আদর্শ জার্ম্মাণ রূপে হাস্যকর চেষ্টার সম্পর্কে Encyclopaedia Britannica—Vol. 12. Pp. 263—264: 1929 দ্রষ্টব্য)।

২। Penka—"Der Arier"; Much, Von Lauschan, Poeche, Wilser প্রভৃতির অভিমত দ্রষ্টব্য।

৩। অন্ধকার যুগে (Dark Age) ইউরোপে টিউটন বা জার্ম্মান জাতীয় লোকেরা পূর্ব্ব-ইউরোপীয় লোকদের ধৃত বা জয় করিয়া গোলাম বা ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিত। এইজন্য তাহাদিকে লাটিন ভাষায় Sclava (গোলাম বা ক্রীতদাস) বলা হইত। সেই সময় হইতে পূর্ব্ব-ইউরোপের শ্বেত বর্ণের এবং ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষায় 'শাতেম' (Satem) বিভাগীয় ভাষাভাষী লোকদিগের মূল জাতীয় নাম আজ পর্য্যন্ত Sclave, Slave, Slav, Serv প্রভৃতি হইয়াছে। এইরূপ সন্দেহ হয়, হয়ত উপরোক্ত প্রকারে ইরানী 'দাহ'-র অনুরূপ ভারতীয় 'দাস' জাতীয় লোকেরা পরাজিত হইয়া 'গোলাম' বা 'ক্রীতদাস' হইত বলিয়া সমস্ত জাতিটাই সেই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জার্ম্মানদের দ্বারা জন কতক পূর্ব্ব-ইউরোপীয় বন্দী হইয়া 'ক্রীতদাস' রূপে পরিণত হইবার ফলে যেরূপ অর্দ্ধ ইউরোপের জনসমূহ 'গোলামীত্ব' প্রাপ্ত হয় নাই, সেই রকম জন কতক 'দাস' জাতীয় লোক বিজিত হইয়া 'ক্রীতদাস রূপে পরিণত হইলেও, সমগ্র দাসজাতি ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত হয় নাই। দাসদিগকে জয় করিতে আর্য্যদের বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। নরতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে 'শুক্লবর্ণ' আর্য্য-ই ভারতে লোপ পাইয়াছে।—কৃষ্ণবর্ণের প্রাধান্য ভারতে আজ পর্য্যন্ত প্রবল। দাসদের প্রতাপ ও ক্ষমতা বেদ হইতেই প্রত্যক্ষ হয় ;—কণ্ব ঋষি কৃষ্ণ বর্ণের ; কবচ ঋষি দাসী পুত্র ছিলেন। বেদে উল্লিখিত কতিপয় রাজাও তথাকথিত শূদ্র ছিলেন।

প্রতীয়মান হয়, তাহারাই কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী যাহাদিগকে আজ-কালকার নরতত্ত্ববিদেরা Proto-Austroloid (অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ) বা Austroloid Proto-Veddaid বা Proto-Dravidian (ভেদ্দা দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্বের জাতি) প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন।

বেদের ও সংস্কৃত সাহিত্যের বাখ্যা প্রসঙ্গে এই প্যান-জার্ম্মানিষ্ট পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া গ্রীস ও ইতালীর দেবদেবীদের ন্যায় ভারতের দেবদেবীদেরও অবস্থা হইয়াছে। তৎসঙ্গে প্রাচীন ভারতের আর্য্য-ভাষা-ভাষীদেরও অবস্থা হইয়াছে ঐ দুই দেশের লোকদিগের ন্যায়। ইহার অর্থ, জার্ম্মানভাষী পণ্ডিত-গণের হাতে পড়িয়া যেমন এথেনা দেবী ও আখিলিউস্ বীর নীলচক্ষু ও লাল চুলবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য প্রাচীন হেলেনিক জাতিও উত্তর-ইউরোপের নর্ডিক জাতীয় হইল, ভারতের প্রাচীন দেব-দেবীগণও তদ্রূপ জার্ম্মাণীর ওডিন দেবতার জ্ঞাতি হইয়াছিল; তজ্জন্য প্রাচীন বৈদিক জাতিও প্রাচীন জার্ম্মান বা টিউটনিক নর্ডিকদের জ্ঞাতি হইয়াছেন। আর এই তালে কতিপয় ভারতীয় পণ্ডিতও নাচিতেছেন!

সংস্কৃতজ্ঞ উত্তর-ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন বেদে নর্ডিক জাতি আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ভারত গভর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ গ্রিয়ারসন (১) তেমন ভারতে দুইটি আর্য্যজাতির অভিযান আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একটিকে—Mid-land (মধ্য দেশীয়) বলিয়াছেন এবং অপরটিকে Outer-Group (মধ্য দেশের বহিঃস্থিত) বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাপ্রসূত ভাষাসমূহের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে একদল আর্য্য আফগানীস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। অপর একদল বেলুচিস্থানের উপর দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমোক্তদের বাসস্থানের বাহিরে চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে, কোন আর্য্য জাতির বিষয় আমরা বেদে পাঠ করি, এবং কাহাদের নর্ডিকত্ব বা 'শুক্লত্ব' প্রমাণ করিবার জন্য অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর চেষ্টা চলিতেছে (২)?

এতদ্দ্বারাও সন্দেহের নিরসন হইল না; বরং আরও গোলমাল হইল। সাহিত্য হইতে লেখা উদ্ধৃত করিয়া নরতত্ত্বের শরীর সম্বন্ধীয় কোন প্রমাণ

১। Grierson—Linguistic Survey of India.

২। অবশ্য এই নর্ডিকত্ব সম্বন্ধে সকল জার্ম্মান পণ্ডিত একমত নন। জার্ম্মানীর এডোয়ার্ড মায়ার, ফাইষ্ট, ফ্রিডরিস, ব্রাউন প্রভৃতি; ফ্রান্সের ব্রোকা, মর্টিয়ের দল; ইতালীর সার্গি; ইংলণ্ডের টেলর প্রভৃতি মনিষীগণ এতদ্ভিন্ন মত পোষণ করেন।

হয় না। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন। যাঁহারা বেদের শ্লোক দ্বারা 'অ-নাসা' ও 'কৃষ্ণ বর্ণের' লোকদের সহিত এবং বর্ত্তমান ভারতের তথাকথিত 'অষ্ট্রোলয়ড্' বা দ্রাবিড় পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) একটা জাতির সহিত এই আয়সীপুরবাসী জাতিকে সনাক্ত করিতে চান, তাঁহারা নিজেরাই পরস্পরবিরুদ্ধ মত পোষণ ও প্রকাশ করেন। বেদ পাঠ করিয়া একদিকে দেখা যাইতেছে যে আর্য্যদের শত্রুগণ সমৃদ্ধিশালী এবং উভয় বর্ণের (জাতির) লোকদের ঐশ্বর্য্যের তথ্য ও বিবরণ তুলনামূলক পাঠ দ্বারা বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই আর্য্য-শত্রুদেরই সভ্যতা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে আরূঢ়। তাহা হইলে কোন হিসাবে আমরা তাহাদিগকে ভেদ্দা-পূর্ব্ব বা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিগুলির সহিত সনাক্ত করি? শেষোক্ত জাতিগুলি আজ পর্য্যন্ত নিজেদের সভ্যতা অভিব্যক্ত করিতে পারে নাই—তাহারাই কি বেদের আয়সীপুরের অধীশ্বর ছিল?

(ক্রমশঃ)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

একটি ছবি

(শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের সৌজন্যে)

স্থবিরের স্থিতি চাও, স্বভাবজঙ্গম,
আত্মঘাতী স্থাবরের আশা !
ঋতুচক্রে চংক্রমণ, নীল শূন্যে ভাসা
ছেড়ে চাও শান্তি, বিহঙ্গম !
মিলাক্ সে আশা।
নীলিমার শূন্যস্রোতে যতো, বিহঙ্গম !
খোঁজো সত্য সুন্দর ও শিবে ;
পাখায় যতোই ঝাড়ো তড়িৎ জঙ্গম
তবুও নদীর তটে,
তেপান্তরে, ধূমাঙ্কিত মৃত্যুঞ্জয় বটে
কিম্বা কোনো প্রতীক্ষামধুর সলজ্জ কবাটে
তীব্র পাখসাটে
বিরাট ত্রিদিবে
মিলিবে না পৃথুল পার্থিবে।
ছাড়ো সব আশা।
ভাগ্যে আছে নীল শূন্যে লীন হয়ে' ভাসা
—যদি না জটায়ু ভাগ্যে একদিন থেমে' যায়
পক্ষবিধূনন আর অকস্মাৎ নেমে যায়
ঊর্ধ্বগ্রীব আশা ! হায় রে আমার
স্বভাবজঙ্গম ভীরু বিহঙ্গম !

বিষ্ণু দে

প্যারাডিম

সময়ের সুতো নিয়ে কেটে গেছে ঢের দিন ;
এক আধ বার শুধু নিশিত ক্ষমতা
এসেছিল,—তারপর নিভে—মিশে গেছে ;
হৃদয় কাটাল কাল।
বালুঘড়ি ব'লে গেল : সময় র'য়েছে ঢের ।
সেই সুর দূর এক আশ্চর্য্য যক্ষের
চোখের ভিতরে গিয়ে স্বর্ণ দীনারের
অমোঘ বৃত্তের মত রূপ নিয়ে নড়ে।

বালুঘড়ি বলে যায় : সময় র'য়েছে ঢের ।
সময় র'য়েছে ঢের ইহাদের—উহাদের ;
সমুদ্রের বালি আর আকাশের তারার ভিতরে
চ'লেছে গাধার পিঠ,—সিংহ, মেষ, বিদূষক,
মূর্খ আর রূপসীর বিবাহে কটক,
ক্রীতদাস কাফ্রিরা তেল ব'য়ে আনে ।
সময় র'য়েছে ঢের—সময় র'য়েছে ঢের
সরবরাহের সব অগণন গণিকারা জানে।

চারিদিকে মৃগয়ার কলরব—সময়ের বীজ ।
অনেক শিকারী আজ নেমেছে আলোকে ।
আমিও সূর্য্যের তেজ দেখে গেছি বহুক্ষণ
ভারুই পাখির মত চোখে ;
ঘুরুনো আলোয় ঘুরে সংস্কারে ;—উড়িবার হেতু
যদিও নেইক' কিছু ক্ষিতিজ রেখার পথে আর ।
বহু আগে রণ ক'রে গিয়েছিল বুদ্ধ আর মার ;
অগ্নির অক্ষরে তবু গঠিত হতেছে আজো সেতু ।

ব্রহ্মার ডিমের মাঝে একসাথে জন্মেছিল যারা ভালোবেসে
সেই স্বর্গ নরককে আবার ক্ষালন ক'রে—প্রামাণিক দেশে
তারাই তো রেখে দেবে ;—মাঝখানে যদিও র'য়েছে আজ বিরক্ত সাগর,
বিশ্বাসীরা চোখ বুজে ব'য়ে নেয় মুণ্ড আর কঙ্কালের কেতু।

সম্রাটের সৈনিকেরা পথে পথে চ'রে
খুঁজে ফেরে কোনো এক শুভলাঞ্ছন ;
সফেন কাজের ঢেউয়ে মৃত্যু আছে—জানে ;
তারো আগে র'য়ে গেছে জীবন-মৃত্যুর অমিলন ;
যেন কোনো নরকের কর্ণিশের থেকে ধীরে উঠে
কোনো এক নিম্নতর আঁধারের বিজৃম্ভিত কাক
আবার সাজাতে পারে দুমুহূর্ত্ত ময়ূরের মতন পোষাক,—
সৈকতে বালির কণা নক্ষত্রের রোলে যদি একসাথে জুটে
আবছায়া, অগ্নিভয়, অন্ধকার—সময়ের হাতে ঠেলে ফেলে
অনাবিল অন্তঃসার নিতে দেয় খুঁটে।

সৈনিকের সম্রাটেরা স্থিরতর—তবু ;
চারিদিকে মাতালের সাবলীল কাজ শেষ হ'লে
প্রতিধ্বনিও আর থাকে থাক' যখন আকাশে
জলের উপরে হেঁটে মায়াবীর মত যায় চ'লে।
(গভীর সৌকর্য্য দেখে মানবীয় আত্মা জাগে জন্তুদের ভিড়ে ;)
অবিস্মরণীয় সব ইতিহাস পর্য্যায়ের দিকে
চেয়ে দেখে সর্ব্বদাই পৃথিবীর প্রবীণ জ্ঞানীকে
ডেকে আনে তারা নিত্য নতুন তিমিরে ;
'নিপুণ ছেলের হাতে লাটিমের মত ঘোরে' দ্বৈপায়ন বলে
ঘুরায়ে নিবিড় সেই প্যারাডিমটিরে।

*　　*　　*　　*

'যখন চিনির দাম বেড়ে গেছে ভয়ঙ্কর
তারা খায় স্বেচ্ছায় নুনের পরিজ।

সমস্ত ভণ্ডুল হয়ে গেলে সব পৃথিবীর,
মসৃণ টেবিলে ব'সে খেলে যায় ব্রিজ।
জীবনকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মত মেনে নিয়ে'
মঞ্চে বক্তৃতা দেয় কর গুণে—কুকুর ক্ষেপিয়ে'।
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে ;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মত হেসে।

'সমস্ত সভার মাঝে তারপর
দম আর থাকে নাক' কোনো কুকুরের ;
একটি মাছিও আর বসে নাক' বক্তার নাকে
একটি মশাও তাকে পায় না ক' টের ;
এবং পায়ের নিচে পৃথিবীরো মাটি আর নেই
তবু সবি পাওয়া যাবে চালানির মাল ছাড়ালেই।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে ;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মত হেসে।

'আমরা সকলে জানি বানরাজা নক্ষত্রের থেকে
সে জাহাজ এসে গেছে মৃগশিরা তারকার দিকে ;
হয় তো সরমা তাকে তুলে ধ'রে সারমেয়দের
নিকটে পাঠায়ে দেবে নির্জ্জন তারিখে।
সম্প্রতি রুটিন তবে শেষ ক'রে—ঘুমাবার পরে
আবার সে দেখা দেবে আমাদের স্বাভাবিক সুবিধার তরে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে ;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মত হেসে।

জীবনানন্দ দাশ

অলকা

সে কি ছিল প্রিয়া ক্ষণিকের পরমাদ
বরষণ-রাতে বেয়াকুল আবাহন,
অশ্রুআকুতিমণ্ডিত সে-লিপিকা :
নিশ্চয় এসো,—এসো, এসো নিশ্চয়ই ?
তম্বিকা তব তনুতট কূলে কূলে
নীলাম্বরিত লাবণি যে উছলায় :
প্রয়াসপ্রয়াত অবলীল প্রসাধনে
অধিক মনোজ্ঞতা :
প্রাবৃষাবিষ্ট অভিমান নয়নেতে,
স্মিত মার্জনা ললিত অধরপুটে :
আঘাত হানিয়া অভিঘাত ফিরে চাওয়া,
প্রত্যাখ্যানে বিপুল অঙ্গীকার—
সে কি প্রহেলিকা লীলাবিভঙ্গ সুধু
মীনকেতনের অনিকেত অভিযান ?

কালের উজানে কোথা তারে রেখে এলে
পালে লাগে আজ মন-কেমনের হাওয়া ?
কেশনীলিমায় শুক্লা তারার মালা
নিশিগন্ধার সঙ্কেতসৌরভি—
শিশিরনিশীথে বেপমানা বাতায়নে
দৃষ্টিআলোকে তাহারে সন্ধানিছ
অমানিমগ্ন নারিকেল-সারি-পারে

বিস্মরণীর ঝাপসা তেপান্তরে ?
রামগিরিশিরে যক্ষ বিরহ যাপে,
অলকায় তব কেমনে পাঠাবে বাণী—
আষাঢ় তাহার পলাতক চিরতরে
মরাল কোথায় মার্গশীর্ষহিমে ?……

রোমাঞ্চিত অন্ধকার : সূচিপর্ণ দেবদারু কাঁপে : নক্ষত্র-প্রান্তর শিহরায়।
পার নাই, পারমিতা ॥

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

সাগরিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ অঙ্ক

এলীডা—(ব্যাকুল ভাবে বাঙ্গেল্‌কে) আজ সকালে বেরিয়ে যেও না। মনে থাকে যেন।

বাঙ্গেল্‌—না-না, বেরোবো কেন? বাড়ীতেই থাকবো—তোমার কাছে। (আর্ন্‌হল্‌ম্‌ আসিতেছেন—তাঁহাকে দেখাইয়া) বন্ধুটির সঙ্গে দু'টো কথা বলবে না?

এলীডা—(ঘুরিয়া) মিঃ আর্ন্‌হল্‌ম্‌? (হস্ত প্রসারিত করিয়া) সুপ্রভাত!

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—সুপ্রভাত, মিসেস্‌ বাঙ্গেল্‌! আজ তোমার নিত্যিকার স্নানে যাচ্ছো না?

এলীডা—না-না-না, আজ সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই উঠতে পারে না। একটু বসো না।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—না ধন্যবাদ। অন্য সময় বসবো। (বাঙ্গেলের দিকে তাকাইয়া) বাগানে মেয়েদের কাছে একবার যেতে হবে, বলে এসেছি।

এলীডা—ওদেরকে ওখানে গিয়ে পাও যদি, ঢের সৌভাগ্য। কোথায় হয়তো টো টো করে ঘুরছে, কে জানে!

বাঙ্গেল্‌—খুব সম্ভব পুকুর পারে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—আমি খুঁজে নিচ্ছি।

(অভিবাদন করিয়া বারান্দা দিয়া বাগানে গিয়া পড়িলেন।)

এলীডা—এখন ক'টা বাঙ্গেল্‌?

বাঙ্গেল্‌—(ঘড়ি দেখিয়া) এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট।

এলীডা—এগারোটা বেজে গেছে? রাত্তিরে ঠিক এগারোটায় কি সাড়ে এগারোটায় ষ্টীমার আসছে। ঐটি শেষ হয়ে গেলেই রক্ষা!

বাঙ্গেল্—(কাছে আসিয়া) একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ডীয়ার।

এলীডা—কী ?

বাঙ্গেল্—পরশু দিন বিকেলে "View-তে বলেছিলে যে, গত তিন বছরের মধ্যে বহুবার তুমি লোকটিকে সশরীরে দেখেছ।

এলীডা—দেখেছি বৈকী। বিশ্বাস করো।

বাঙ্গেল্—বলো দেখি, কি-রকম দেখতে ?

এলীডা—কি-রকম !

বাঙ্গেল্—মানে যখন তুমি চোখ চেয়ে দেখলে বলে ভাবছো, তখন তাকে কী রকম মনে হতো ?

এলীডা—প্রিয়তম, তুমি তো নিজেই তাকে দেখেছো।

বাঙ্গেল্—অবিকল এই রকমটি দেখাতো ?

এলীডা—হাঁ।

বাঙ্গেল্—কাল বিকেলে বাস্তব যেমনটি দেখেছিলে, হুবহু তেম্‌নি ?

এলীডা—হাঁ গো।

বাঙ্গেল্—তবে দেখেই তখনি তাকে চিনতে পারলে না যে ?

এলীডা—চিনি নি ?

বাঙ্গেল্—নাঃ। তুমি তো নিজেই পরে বল্লে, ঐ পরদেশীকে দেখে প্রথমত চিনতে পারোনি।

এলীডা—(হতভম্ব) কি জানি বাপু, তুমি যখন বল্‌ছো ! এ বড়ো আশ্চর্য্য—নয় ? কী কাণ্ড, বলো তো ?—তক্ষুণি চিন্‌তে পার্‌লুম না !

বাঙ্গেল্—তুমি শুধু চোখ দু'টির কথা বল্‌ছিলে।

এলীডা—হাঁ হাঁ, চোখ ! চোখ !

বাঙ্গেল্—"View-তে" কিন্তু বলেছিলে যে, সে যখন এসে তোমার সামনে দাঁড়াতো—তখন দশ বছর আগেকার শেষ বিদায়ের সময়েও যেমনটি ছিলো, দেখে মনে হতো, আগাপাস্তলা সেই।

এলীডা—তাই বলেছিলুম ?

বাঙ্গেল্—তাই তো।

এলীডা—তাহলে নিশ্চয়ই তখন তাকে এখনকারই মতো দেখাতো।

বাঙ্গেল্—আবার পরশু দিন বাড়ী ফেরার পথে তুমি আরেক বিবরণ দিয়েছো। দশ বছর আগে তার দাড়ি ছিলো না, তুমি বলেছো। তার বেশ-ভূষাও সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিলো। বিশেষতঃ সেই মণিওলা বুকপিন্?—কাল তো ও রকম কিছু পরে আসেনি!

এলীডা—না!

বাঙ্গেল্—(জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাইয়া) একটু ভেবে দেখো, এলীডা। হয়তো তোমার মনে পড়ছে না। ব্রাথাম্মেরে ও যখন তোমার পাশে এসে দাঁড়াতো, তখন তার চেহারা কী ছিলো।

এলীডা—(চিন্তান্বিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য চক্ষু বুজিয়া) পরিষ্কার মনে জাগছে না। না! আজ আর মনে আসবে না। কী আশ্চর্য্য!

বাঙ্গেল্—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এখন তুমি যে নতুন সত্যিকার মূর্ত্তি দেখেছো সেইটে পুরোণো স্মৃতিকে আবছা করে দিচ্ছে। তাই তুমি অস্পষ্ট দেখছো।

এলীডা—তাই নাকি?

বাঙ্গেল্—হাঁ। তোমার ব্যাধিত কল্পনাও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই এই সত্য মূর্ত্তিটা এসে ভালোই হলো।

এলীডা—ভালো হয়েছে? সত্যি ভালো হয়েছে?

বাঙ্গেল্—হাঁ, এসে ভালোই হলো। এখন যদি তোমার স্বাস্থ্যোদ্ধার হয়!

এলীডা—(সোফায় বসিয়া) বাঙ্গেল্! আমার কাছে এসো, বসো। মনের কথা তোমায় খুলে বলি।

বাঙ্গেল্—বলো বলো, এলীডা, লক্ষ্মিটি!

(টেবিলের অপর দিকে একখানি কেদারায় বসিলেন।)

এলীডা—বাস্তবিক আমাদের উভয়েরই দুরদৃষ্ট, এতো লোক থাকতে শেষে কিনা তুমি আর আমি একসূত্রে আবদ্ধ হলুম!

বাঙ্গেল্—(বিস্মিত) এ কী বলছো?

এলীডা—যেমন দুর্ভাগ্য, তেমনি ফলও হলো। এহেন মিলনের ফল শুধু মনস্তাপ ছাড়া আর কি হতে পারে?

বাঙ্গেল্—'এহেন' অর্থাৎ?

এলীডা—শোনো বাঙ্গেল্, এ রকম দিন গুজরানোর কোনো অর্থ নেই ; এ আত্ম-বঞ্চনা, পরজন্মের প্রতি মিথ্যাচার।

বাঙ্গেল্—বটে ? মিথ্যাচার ?

এলীডা—মিথ্যাচার নয়তো কি ? আমরা সত্যকে চাপা দিয়ে রেখেছি। নয়তো, সত্য—দিবালোকের মতন প্রত্যক্ষ সত্য হচ্ছে : আমি বিবাহ বাণিজ্যে তোমার ক্রীত পণ্য মাত্র।

বাঙ্গেল্—পণ্য !—ক্রীত পণ্য !!

এলীডা—আমিই কী তোমার তুলনায় ভালো ছিলুম ? তা না হলে, তোমার প্রতিপণ মাথা পেতে নিই ? তোমার কাছে আত্ম-বিক্রয় করি ?

বাঙ্গেল্—(ক্লিষ্ট ভাবে চাহিয়া) এলীডা ! এই তোমার অন্তরের কথা ?

এলীডা—তা-ছাড়া আর অন্য কী ভাষায় বলা যেতে পারে, বলো ?···তখন তোমার ঘর-দোর খাঁ খাঁ করছে। শূন্যতা তোমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। একটি নতুন গিন্নীর তোমার আবশ্যক ছিলো।

বাঙ্গেল্—আর মেয়েদের জন্যে একজন মায়ের-ও তো দরকার ছিলো, এলীডা ?

এলীডা—ও-ও একটা চাহিদা ছিলো বটে। কিন্তু, তুমি একটুও জানতে না, ঐ চাহিদা মেটাবার পক্ষে আমি উপযুক্ত কিনা। তুমি তো মোটে বার কয়েক দেখা-মেলা কথাবার্ত্তা সেরেই অম্নি আমাকে চেয়ে বস্লে, আমিও—

বাঙ্গেল্—এরকম বলাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, বলো।

এলীডা—আর আমিও এতো অসহায় ছন্নছাড়া নিঃসঙ্গ হয়েছিলুম যে, যেই তুমি এসে আমার আমরণ ভরণ-পোষণের ভার নিতে প্রস্তাব করলে, অমনি নিঃসঙ্কোচে প্রতিপণ গ্রহণ করলুম—রাজী হয়ে গেলুম।

বাঙ্গেল এলীডা ! আমি কিন্তু ব্যাপারটিকে শুধু তোমার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হিসেবে নিইনি। আমি সরল ভাবেই তোমাকে বলেছিলুম যে, মেয়েদের ও আমার আপনার বলতে যা-কিছু আছে—তার ভেতরে তোমার স্থান যদি পাও, অবে অধিকার করো।

এলীডা—হাঁ তুমি বলেছিলে। কিন্তু বল্লে কি হয় ? রাজী হওয়াই আমার ভুল হয়েছে অযথা অতিরিক্ত মূল্যও যদি তুমি দিতে চাইতে, তবু আমার

রাজী হওয়া অনুচিত হতো। আত্ম-বিক্রয় করা যে অধর্ম্ম। তার চেয়ে যে-কোনো হীনতম বৃত্তিও ভালো, রিক্ততম জীবন-ও শ্রেয়স্কর; ওতে তবু স্বাধীন প্রেরণা আছে।

বাঙ্গেল্—(দাঁড়াইয়া) তাহলে, এই যে আমরা দু'জনে পাঁচ-ছয় বছর একসঙ্গে কাটালুম তা তোমার কাছে সর্ব্বত ব্যর্থ হয়ে গেছে?

এলীডা—ওগো! অমন কথা আমি বলিনি। মানুষে মানুষের কাছ থেকে যতোখানি আদর-যত্ন প্রত্যাশা করতে পারে, তার সবটুকু তোমার কাছে পেয়েছি। কিন্তু তোমার ঘরে আমি আত্ম-প্রেরণায় ঘরণী হয়ে আসিনি;—এই যা।

বাঙ্গেল্—(চোখে চোখ রাখিয়া) আত্ম-প্রেরণায় নয়?

এলীডা—না গো, তোমার যাত্রাপথে আমার মিলন আত্মকৃত নয়—প্রক্ষিপ্ত।

বাঙ্গেল্—(মৃদুকণ্ঠে) ও! তোমার কালকের কথাগুলি মনে পড়ছে।

এলীডা—হাঁ, কথাগুলির ভেতরেই পাবে আলোক! তারই অগ্নি-শিখায় ব্যাপারটিকে সম্যকরূপে দেখতে পাচ্ছি।

বাঙ্গেল্—কী দেখছো?

এলীডা—বলবো?—আমরা দু'জনে যে-জীবন কাটাচ্ছি তাকে ঠিকঠাক বিবাহিত জীবন বলা উচিত নয়।

বাঙ্গেল্—(তিক্তস্বরে) খাঁটি কথা বলেছো। বর্ত্তমানে যে-জীবন যাপন করছি তাকে বিবাহ বলা উচিত নয়।

এলীডা—পূর্ব্বতন জীবনকেও নয়। বিয়ে মোটেই হয়নি;—একেবারে গোড়া থেকেই নয়! (বরাবর মুখোমুখি তাকাইয়া) সেই প্রথমটিই হয়তো সর্ব্বাঙ্গ সত্য বিবাহ হতে পারতো!

বাঙ্গেল্—প্রথমটি মানে?

এলীডা—ওর সঙ্গে আমার।

বাঙ্গেল্—(বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাকাইয়া) তোমার কথা হেঁয়ালির মতো ঠেকছে।

এলীডা—দেখো বাঙ্গেল্, পরস্পরকে ঠকিয়ে লাভ নেই;—আমাদেরও না।

বাঙ্গেল্—আর কিছু বলার আছে?

এলীডা—দেখো, কিছুতেই এই সত্যটিকে এড়িয়ে যাবার যো নেই,: একবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাগদান করলে সর্ব্বত বিবাহ বলেই গণ্য।

বাঙ্গেল্—একথা বলে লাভ—

এলীডা—(উদ্বেলিত ভাবে দাঁড়াইয়া) বাঙ্গেল্! আমায় মুক্তি দাও!

বাঙ্গেল্—এলীডা! এলীডা !!

এলীডা—হাঁ গো, আমায় মুক্তি দাও। ঠিক জেনো, মুক্তি একদিন দিতেই হবে—যেমন করেই হোক। আমাদের যা-করে মিলন হয়েছে, তার পরিণামই ঐ।

বাঙ্গেল্—(শোক চাপিয়া) শেষে এই?

এলীডা—এই হলো শেষে। এর থেকে নিস্তার নেই।

বাঙ্গেল্—(বিষণ্ণ ভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া) এদ্দিন একত্র বাস করেও আমি তোমায় জয় করতে পারিনি। তোমারে একান্ত আমার করে পাইনি, কখনো পাইনি।

এলীডা—আহা বাঙ্গেল, তোমায় যদি ভালোবাসতে পারতুম! তোমার যোগ্য প্রতিদান যদি দিতে পারতুম! ও! সত্যি, কী আহ্লাদই না হতো আমার! কিন্তু, বেশ বুঝতে পারছি—প্রতিদান দেবার ফাঁক বন্ধ হয়ে গেছে।

বাঙ্গেল্—ডিভোর্স, তাহলে? রীতিমতো আইন-সঙ্গত ডিভোর্স্ই তবে তোমার উদ্দেশ্য?

এলীডা—ডীয়ার, তুমি আমায় এতো কম বোঝো কেন? লৌকিকতার আমি এক কাণাকড়িও দাম ধরিনে। বহির্ব্যবস্থা দিয়ে কি হবে? আমি চাই স্বেচ্ছায় আমরা পরস্পরকে নিষ্কৃতি দেবো।

বাঙ্গেল্—(তিক্ত স্বরে, ধীরে শির দোলাইয়া) বটে, প্রতিপণ প্রত্যাহার করতে চাও?

এলীডা—(ব্যস্ত ভাবে) যা বলেছো! এই প্রতিপণ প্রত্যাহৃত হোক।

বাঙ্গেল্—তা না হয় হলো, এলীডা। তারপর? ভেবে দেখেছো, আমাদের দু'জনের জীবনের ধারা কোন নিয়মে প্রচলিত হবে?—তোমার এবং আমার জীবনের কী গতি হবে?

এলীডা—যাক, সে পরের কথা। তোমার কাছে আমার সানুনয় আবেদন যা করলুম, তাই সবার সেরা কথা, বাঙ্গেল্। বুঝলে?—আমায় মুক্তি দাও! আমার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আমায় ফিরিয়ে দাও!

বাঙ্গেল্—এলীডা! কি বীভৎস অনুরোধ তোমার! মতামত দেবার আগে অন্তত একটু সময় দাও। প্রকৃতিস্থ হয়ে ভেবে দেখি। তোমার সঙ্গেও আরো বিস্তারিত আলোচনা হোক। তুমিও এপথে পা বাড়াবার আগে আরেকবার ভাবো।

এলীডা—কিন্তু আর যে কালাতিপাত অসম্ভব। আজই আমার স্বাধীনতা ফিরে চাই।

বাঙ্গেল্—কেন, বলো তো?

এলীডা—আজ রাত্রে ও আসবে।

বাঙ্গেল্—(চমকিত) ও আসবে? এলোই বা! ঐ ভিনদেশী লোকটার সঙ্গে এর কী-সম্পর্ক?

এলীডা—আমি বন্ধনমুক্ত হয়ে, তবে তার সঙ্গে দেখা করবো।

বাঙ্গেল্—আর—আর কিছু করতে চাও?

এলীডা—'আমি পরস্ত্রী'—এই মিথ্যার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো না। নির্ব্বাচনক্ষম নই বলেও ছল করতে চাইনে;—নইলে, প্রকৃত কর্ত্তব্য-স্থির অপূর্ণ থেকে যাবে।

বাঙ্গেল্—নির্ব্বাচনের কথা বলছো? নির্ব্বাচন! এই ক্ষেত্রেও নির্ব্বাচন, এলীডা?

এলীডা—হাঁ, নির্ব্বাচনক্ষম হতে হবে আমাকে, স্বাধীন হতে হবে;—তা যে-পথই বেছে নিই না কেন! হয়, তাকে প্রত্যাখ্যান করবো—হয়তো তার অনুগামিনী হবো। কিন্তু নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আমারই হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গেল্—কি বলতে কি বলছো? কার অনুগামিনী হবে? কার হাতে আস্ত জীবন সঁপে দেবে?

এলীডা—কেন, আমি কি আমার জীবন তোমার হাতেও একদিন সঁপে দিইনি? টুঁ শব্দটিও তো করিনি!

বাঙ্গেল্—মানলুম। কিন্তু ওকে কেন? ওই ভিনদেশীকে কেন? ওর সম্বন্ধে প্রায় সব-কিছুই যে তোমার অজানা!

এলীডা—যাই বলো, তোমাকে কিন্তু এর-ও কম জানতুম। তবু তো তোমার সঙ্গে যাত্রা সুরু হলো।

বাঙ্গেল্—না-না, একটু-আধটু জানতে বৈকী—তোমার জীবনের স্রোত কোন দিকে বইবে। কিন্তু, এখন? কী জানো তুমি? কিছুই তো জানো না! ও কে? কি করে?—কিছুই না!

এলীডা—(সম্মুখে তাকাইয়া) তা ঠিক। আমার ওখানেই যতো ভয়।

বাঙ্গেল্—কী ভয়ঙ্কর!

এলীডা—তাই তো ইচ্ছে হয়, ওতে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বাঙ্গেল্—ভয়ঙ্কর বলে?

এলীডা—হুঁ।

বাঙ্গেল্—(কাছে আসিয়া) এলীডা! একটা কথার উত্তর দেবে? আচ্ছা, ভয়ঙ্কর বলতে তুমি কি বোঝো?

এলীডা—(চিন্তিতা) ভয়ঙ্কর হচ্ছে সেই—যা একাধারে ব্যাহত করে আবার আকর্ষণ করতে-ও ছাড়ে না।

বাঙ্গেল্- আকর্ষণও করে?

এলীডা—আকর্ষণই তো তার প্রবল হচ্ছে।

বাঙ্গেল্—(গম্ভীর) ঐ সাগরের সঙ্গে তোমার অমিল নেই।

এলীডা—সেই আরেক বিভীষিকা।

বাঙ্গেল্—এই বিভীষিকা আত্মসাৎ করেছো তুমি নিজে: তুমিও একবার করো প্রলুব্ধ, আবার দেখাও ভয়।

এলীডা—সত্যি তাই, বাঙ্গেল্?

বাঙ্গেল্—মূল কথা, তোমার স্বরূপ—আমি যথাযথ জানিনি—কখনো জানিনি। এখন সবে জান্তে সুরু করেছি।

এলীডা—তবে আর কেন? আমায় মুক্তি দাও এবার। তোমার আপনার ও তোমার সম্পর্কিত সব কিছুর দায় থেকে আমায় বিমুক্ত করো। তুমি

যে আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা পুষে আসছিলে, তা নিজেই যখন বুঝতে পারছো, তখন হোক্ আমাদের বিচ্ছেদ—বন্ধুভাবে, স্বেচ্ছাক্রমে।

বাঙ্গেল্—(বিমর্ষ) তোমার আমার বিচ্ছেদ হলেই বোধ করি ভালো হতো। কিন্তু সইতে পারবো না, এলীডা। আমার কাছে তুমি সেই ভয়ঙ্কর। তোমার মধ্যেও একই দুর্ব্বার আকর্ষণ।

এলীডা—বটে ?

বাঙ্গেল্—আজকের দিনটা নেহাৎই খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে শান্ত ভাবে কাটাতে হবে। আজ আমার এমন দুঃসাহস নেই যে, তোমার মুক্তিবিধান করে তোমায় ছুটি দিই। ছুটি দেবার দাবী আজ কিছুতেই খাটানো যায় না ; —সে তোমারই মঙ্গলের জন্যে এলীডা। তোমার পরে আমার যা দাবী, তোমার প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য—তা আমাকে প্রয়োগ করতে দাও। তোমার সংরক্ষণই আমার একমাত্র অভীষ্ট।

এলীডা—আমাকে সংরক্ষণ ? কেন, আমার বিপদ কি শুনি ? বাইরের কোন শত্রু থেকে তো আমার ভয় নেই, বাঙ্গেল্। আমার ভয়ের উৎস অন্তরের অন্তঃস্থলে। আমার মনের মধ্যে যে আকর্ষণ ওই হলো ভয়ঙ্কর। এর বিরুদ্ধে তোমার সব তুক্‌তাক্ বিফল হ'য়ে যায়।

বাঙ্গেল—কেন ? এই ভয়ের বিরুদ্ধে বীরদর্পে বিদ্রোহ করতে তোমায় প্রেরণাও দিতে পারি নে ?

এলীডা—পারতে—যদি বিদ্রোহের অভিপ্রায় আমার অন্তরে থাক্‌তো।

বাঙ্গেল্—অভিপ্রায় নেই ?

এলীডা—কি জানি, বলতে পারি নে।

বাঙ্গেল্—আজ রাত্তিরেই একটা হেস্তনেস্ত হবে, এলীডা—

এলীডা—(উচ্ছ্বসিত) উঃ! সময়ের কি তর সয় না গো ? আরেকটু পরেই জন্মের শোধ, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, নিরূপণ করে ফেলতে হবে !

বাঙ্গেল্—তারপর কাল—

এলীডা—আর কাল! হয়তো আমার প্রতীক্ষিত ভবিষ্যৎ স্রেফ কেলেঙ্কারীতে পরিণত হয়ে যাবে।

বাঙ্গেল্—তোমার প্রতীক্ষিত—

এলীডা—হয়তো, জীবনের স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা সব জলাঞ্জলি দিতে হবে ;—আমাকেও দিতে হবে, ওকেও দিতে হবে।

বাঙ্গেল্—(তাঁহার মণিবন্ধ ধরিয়া—নরম সুরে) এলীডা, তুমি কি সেই পরদেশীকে ভালোবাসো ?

এলীডা—ওগো, কি করে বলি ! আমি শুধু অনুভব করি, ও আমার কাছে যেন বিভীষিকা এবং যেন—

বাঙ্গেল্—কী ?

এলীডা—(হস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া) যেন আমি তারই।

বাঙ্গেল্—(শির অবনমিত করিয়া) অল্পে অল্পে বুঝতে পাচ্ছি।

এলীডা—এর প্রতিকার কিছু জানো ? একটা পরামর্শ দাও না গো !

বাঙ্গেল্—(বিষণ্ণ ভাবে তাকাইয়া) কাল সে চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে কুগ্রহও তোমার কাটবে। তখন আমি তোমার মুক্তির বিধান করতে রাজী আছি। এলীডা ! কাল আমাদের প্রতিপণ প্রত্যাহার করে নেবো।

এলীডা—বাঙ্গেল্ ! কাল ?—সে যে অনেক দেরী।

(উদ্যানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া) বাছাদের তবে কী হবে ? আর থাক্—যা হয় হবে পরে।

(আর্ন্‌হলম্, বোলেত্, হিল্ডে এবং লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্ বাগানে প্রবেশ করিলেন। লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্ বাগানেই বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অন্য সকলে কক্ষাভ্যন্তরে ঢুকিতেছেন।)

আর্ন্‌হল্ম্—ওহে, আমাদের প্ল্যানটা তোমায় জানাতে হচ্ছে।

হিল্ডে—রাত্তিরে আজ আমরা ফিওর্ডে বেড়াতে যাচ্ছি। এর পরে -

বোলেত্—এই ! বলে ফেলিসনি।

বাঙ্গেল্—আমরাও দু'জনে প্ল্যান আঁটছিলুম।

আর্ন্‌হল্ম্—বটে ?

বাঙ্গেল্—কাল এলীডা কিছুদিনের জন্যে স্কিওলভাইকেনে যাচ্ছেন।

বোলেত্—সত্যি যাচ্ছেন ?

আর্ন্‌হল্ম্—শুভ অভিপ্রায় মিসেস্ বাঙ্গেল্ !

বাঙ্গেল্—এলীডা যাচ্ছেন স্ব-গৃহে—সমুদ্রায়তনে।

হিল্ডে—(এলীডার দিকে লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইয়া) যাবে চলে ?—আমাদেরকে ছেড়ে ?

এলীডা—(ভীত) হিল্ডে ! কী হলো তোর ?

হিল্ডে—(আত্ম-সংবৃত) না, কিচ্ছু না। (মুখ ফিরাইয়া, নীচু স্বরে) একলাই যাচ্ছো ?

বোলেত্—(উদ্বিগ্ন) বাবা, স্কিওলভাইকেনে যাচ্ছো তুমিও ?—বুঝে ফেলেছি।

বাঙ্গেল্—না-না ! আমি কখন্-সখন ঝটপট যেয়ে দেখা করবো—এই যা।

বোলেত্—আমাদের কাছে ফিরে আসবে তো ?

বাঙ্গেল্—আসবো, নিশ্চয়ই—

বোলেত্—প্রায়ই আসবে তো ?

বাঙ্গেল্—যাদু আমার, আসবো বৈকি। (কক্ষের অপর প্রান্তে পদচারণা করিয়া গেলেন।)

আর্ন্‌হল্‌ম্ (ফিস ফিস করিয়া) পরে কথা হবে, বোলেত্। (কক্ষপ্রান্তে বাঙ্গেলের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুইজনে অনুচ্চ কণ্ঠে আলাপ করিতে করিতে মঞ্চের উপরে দরজার কাছে পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলেন।)

এলীডা—(বোলেত্‌কে, জনান্তিকে) হিল্ডের কি হয়েছে রে ? অমন আঁৎকে উঠলো কেন ?

বোলেত্—কখনো লক্ষ্য করোনি ?—হিল্ডে কিসের জন্যে নিশিদিন লালায়িত হয়ে ঘোরে ?

এলীডা—লালায়িত ?—কেন ?

বোলেত্—সে কি আজ থেকে ? তোমার এ-বাড়ীতে আসার সুরু থেকেই যে—

এলীডা—কেন শুনি ?

বোলেত্—তোমার মুখের দু'টো মিষ্টি কথা শুনবে বলে।

এলীডা—ও ! এই একটা কর্ত্তব্য ! কিন্তু, কী করি !

(নিজের হস্তদ্বয় একত্র মস্তকের উপরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বরাবর সম্মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিলেন এবং বিরুদ্ধ চিন্তা ও প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে যেন চৌচির হইয়া গেলেন। বাঙ্গেল্ এবং আর্ন্‌হল্‌ম্ চুপি-চুপি কথা কহিয়া কক্ষের মধ্য দিয়া আসিতেছেন। বোলেত্

পার্শ্বস্থ কক্ষে গিয়া একবার ভিতরের দিকে তাকাইয়া দরজাটি খুলিয়া দিলেন।)

বোলেত্—বাবা, খাবার তৈরী করে রেখেছি। তোমরা এখন এলেই—

বাঙ্গেল্—(কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য টানিয়া) তৈরী বাছা ? বেশ।···আর্ন্‌হল্‌ম্! ভেতরে চলো। "সাগরিকা"র সঙ্গে বিদায়-বেলার পান-ভোজনটা সমাধা করা যাক। (সকলে দক্ষিণ দিকে বাহির হইয়া গেলেন।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইব্‌সেনের "The Lady from the Sea" হইতে অনূদিত

পুস্তক-পরিচয়

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন। মডার্ন বুক এজেন্সি। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে এই সত্য কথাটি বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, তা ঐতিহাসিকের মেজাজ-নিরপেক্ষ বস্তু নয়; এবং নির্বিকার দৃষ্টিভঙ্গী অন্ততঃ সাহিত্যের প্রসঙ্গে যে কৈবল্যবোধক নয়, এ-কথাও সর্বজনস্বীকৃত। আর ইতিহাস যদি শুধু ঘটনার নির্ঘণ্ট রচনাতেই পর্যবসিত হয়, তবে তা' আর যা-ই হোক, সুখপাঠ্য হয় না। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এখানি ইতিহাসও হ'য়েছে এবং সুখপাঠ্যও হ'য়েছে—যদিও পণ্ডিত মহলে সন তারিখ নিয়ে বাদানুবাদের প্রচুর অবকাশ এতে আছে।

ইতঃপূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের যেসব ইতিহাস প্রকাশিত হ'য়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইখানিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' শ্রেষ্ঠতা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বইখানির অন্তর্নিহিত কয়েকটি ত্রুটি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গালা চর্যাপদগুলি সম্পর্কে দীনেশবাবুর সার্থ মৌনতার কথা উল্লেখ করা চলে। নেপালে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এগুলি আবিষ্কার করেন। তিনি একাধিক প্রবন্ধে এই পদগুলিকে দশম-একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। তা' ছাড়া ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ গুণী ব্যক্তিরা এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ক'রেছেন এবং সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বের বিচারে আলোচ্য চর্যাপদগুলির ভাষা যে বাঙ্গালাই—এ কথাও প্রমাণ ক'রেছেন। তথাপি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' নবতম সংস্করণেও এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়নি। সুকুমার বাবুর গ্রন্থে বাঙ্গালা চর্য্যাপদের অকৃপণ আলোচনা দেখে

সত্যই আশ্বস্ত হওয়া যায় এবং আমাদের ভাষার শৈশব সীমান্ত যে সব 'শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেই অনুশাসনগুলির কথাও যে বিস্মৃত হন নি, এটিও সুখের বিষয়। আর সাহিত্যকে তিনি যে সমাজ-নিরপেক্ষ ভুঁইফোঁড় সামগ্রী মনে করেন না, তার প্রমাণ গ্রন্থান্তর্গত 'উপক্রমণিকা', 'বাঙ্গালা সমাজের বিবর্ত্তন ও আধুনিক বাঙ্গালী জাতি, প্রভৃতি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা বস্তুগত ভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য"—ভূমিকায় এই উক্তিটি থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে অনুমান করা যায় এবং আদ্যন্ত বইখানি প'ড়ে বিষয়ের ক্রমানুসরণের জন্য তাঁর প্রশংসাই করতে হয়, কারণ পূর্বপ্রকাশিত এই শ্রেণীর একটি বইয়েও যে প্রণালীবদ্ধ প্রকাশরীতি দেখা যায় নি, একথা আশা করি অসঙ্কোচেই বলা চলে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে দীনেশবাবুর তুলনায় বর্ত্তমান গ্রন্থকারের ভাষা মন্থর ও উচ্ছ্বাসহীন এবং "ভাঁড়ুদত্ত আবার ঘনাইয়া ঘনাইয়া আসিল" (পৃঃ ৪৫১) প্রভৃতি স্থল পাঠকের পক্ষে অবাধ নয়। কিন্তু এ জাতীয় বিচ্যুতি সত্যই বিরল এবং ছিদ্রান্বেষণ দোষৈকদর্শীরই পেশা। স্বভাব-তরল বাঙ্গালীর পক্ষে সংযতভাষণ অনভ্যস্ত হ'লেও অপ্রার্থিত নয়। প্রাগুক্ত অল্প কয়েকটি অপব্যবহার ব্যতীত সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই বইখানিতে মোটের উপর সংযত, ঋজু, প্রাণবান প্রকাশভঙ্গী দেখা গেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রই চণ্ডীদাস-সমস্যার আবর্ত সম্বন্ধে কতকটা সচেতন থাকলেও, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্যপরিষদের চৌহদ্দী অতিক্রম ক'রে এখনও বাঙলা দেশের শিক্ষিত সাধারণ্যে এগুতে পারেনি। ডক্টর সুকুমার সেন এই বইখানির যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদভাজন। তবে, এই ভাবে পরিচয় প্রদানে বিশেষ মনোযোগী হওয়াতে কিছুটা বাড়াবাড়ি না ঘটেছে, এমন নয়, যেমন 'গঙ্গামঙ্গল' (পৃঃ ৪১৬—১৮) অথবা 'মুরলীবিলাসের' (পৃঃ ৫০৭—৫,১) সূচী সন্নিবেশ। তথাপি লাভালাভের বণিকযোগ্য সূক্ষ্ম বিচারেও এই বইখানি সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে এবং বিশেষ ক'রে মুরারিগুপ্তের বিরলপ্রচার দুটি বাঙলা পদের (পৃঃ ২১০—২১১) সাক্ষাৎ লাভ ক'রে নিতান্ত সন্তোষবিমুখ পাঠকও নিঃসন্দেহে খুশী হবেন।

বৈষ্ণব কবিদের প্রসঙ্গে লেখকের অল্পোক্তি কিন্তু সত্যই অশোভন। হয়তো বহুপরিচিতদের প্রতি স্থানসঙ্কোচ স্বল্পপরিচিতদের স্থানসঙ্কুলানের জন্যই ঘটেছে, কারণ, এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ পদাবলীর দু'একটি নমুনাও নেই, যদিও হায়াৎ মামুদের 'মহরমপর্ব্ব' (পৃঃ ৯২৫) অথবা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরী মঙ্গলের' (পৃঃ ৯৮৮-৮৯) প্রচুর উদ্ধৃতি এতে স্থান পেয়েছে। সেন মহাশয় এই অনুল্লেখের কারণ লিখেছেন, 'প্রথমতঃ মৎপ্রণীত 'A History of Brajabuli Literature' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে, দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য কবিদিগের মত করিয়া বৈষ্ণব পদকর্তাদের আলোচনা করিতে গেলে বইয়ের আকার দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে।' কিন্তু এই ধরণের বর্জন-বর্দ্ধনের নীতিতে রচিত গ্রন্থে ভারসাম্য বা মাত্রা বজায় থাকে কি ?

মৈমনসিংহ গীতিকার প্রাচীনতা সম্পর্কে গ্রন্থোক্ত মতামত বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য (পৃঃ ১০৪৩-৪৫)। কবিওয়ালা সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মনোজ্ঞ রচনাটির (A History of Bengali Literature : 1800-25) পরে এই শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের আলোচনা বোধহয় একমাত্র সুকুমার বাবুর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বাউল সাহিত্য সম্পর্কে ছোট একটি অধ্যায় যোজনা করার জন্যও তিনি ধন্যবাদভাজন।

মোটের উপর চর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশ্বর গুপ্তের রচনা অবধি বাঙলা সাহিত্যের এই কালানুক্রমিক ইতিহাসখানির সার্থকতার তুলনায় এর ত্রুটিগুলি নিতান্ত নগণ্য, কারণ পরঞ্জয় প্রখ্যাতি যেমন ইন্দ্রেরও অনায়ত্ত, বিসংবাদের ব্যতিক্রম তেমনি ঐতিহাসিকের অলভ্য।

হরপ্রসাদ মিত্র
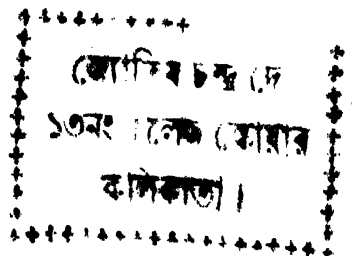
মৈনাক—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা-ভবন।
দাম—এক টাকা।

কবির শ্রেষ্ঠ রচনাতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সে হিসেবে 'মৈনাক' কাব্যগ্রন্থে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা' তৃপ্তিকর। কাব্যপাঠকের কাছে এইটুকুই যথেষ্ট, এবং কামাক্ষীপ্রসাদের বইয়ের সমালোচনাও প্রথমে তাঁকে কবি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েই কর্‌তে হবে।

আঙ্গিকের দিক থেকে কামাক্ষীপ্রসাদ কয়েকজন সমসাময়িক শক্তিশালী কবির প্রভাব এড়াতে পারেন নি; ভাবের দিক থেকে কিন্তু তিনি রবীন্দ্রপন্থী ব'লে মনে হয়।

কঙ্কন আজি ধ্বনিয়া উঠুক গানে
নীল অঞ্চল ফেনায়িত আহ্বানে
কম্পনে গানে ছিঁড়ে ফেলো যত
শঙ্কিত ভীরুতায়
বেজে ওঠো আজ হাল্কা মুখরতায়।

এ-সুরই কামাক্ষীপ্রসাদের প্রধান এবং নিজস্ব সুর ব'লে আমার বিশ্বাস। তাঁর কবিতায় যেখানে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, বিদ্রোহ এবং ব্যঙ্গ সেখানেই মূলগত আবেগ কবির মনে তত গম্ভীরভাবে সত্য কি না সাবধান পাঠকের মনে এ-প্রশ্ন জাগবার অবকাশ আছে। কিন্তু আমি বলি আপাতত এ-প্রশ্নও অবান্তর। মনের আবেগ নিজস্ব পথে পরিণতি লাভ করবার সময় কামাক্ষী-প্রসাদের আসবে। আপাতত বিচার্য্য হ'চ্ছে কবি তাঁর বক্তব্য কতখানি সুন্দর এবং তীক্ষ্ণ ক'রে বলতে পেরেছেন, আমাদের মনে তা' কতখানি বিঁধলো। সুখের বিষয় আলোচ্য বইয়ে এরকম অংশ অনেক আছে যা মনে লাগে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

যেদিন সে ফাল্গুনের আরক্ত প্রহরে
জ্বলন্ত জীবন যেন মৌমাছির পাখা
মর্ম্মরিত, উচ্চকিত, যৌবনচঞ্চল

মর্ম্মরিত উর্ম্মি বাণীময়
গেয়েছিল জীবনের জয়,
আজ তারা মিসরের মমীর মতন
বিস্মৃতির নিস্পন্দ শিশিরে
কেন জেগে রয় ?—(মৈনাক, সৈনিক হও)।

কিংবা

এখানে বিশাল শালবন আর
রাত্রি মশাল বয়
ভয়
কাল সন্ধ্যায় তবুও পেয়েছি ভয়,
ইস্পাত গলা আকাশ রাঙানো চোখ
আগুন ধরালো ধারালো তীক্ষ্ণ নখ—(ভয়)।

স্বীকার করতে হবে এ বর্ণনা সুন্দর—এবং কবিতাই। বিশেষ ক'রে কয়েকটি উপমায় কামাক্ষীপ্রসাদ যে শক্তি এবং মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা কাব্য-পাঠকমাত্রকেই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত ক'রে তুলবে। যেমন,

বনের ধনুক থেকে
তীক্ষ্ণ তীরের মত
হরিণের দল
মিলে যায় দিগন্ত সীমায়। (চাঁদ)।

আবার,

পাহাড়ে পাহাড়ে শিলাময় যৌবন
আকাশে আবির ভীড়—(ভয়)।

এ বই পড়তে পড়তে ভাব ও রীতির বৈষম্যে পদে পদেই একথা মনে হওয়া সম্ভব যে কামাক্ষীপ্রসাদ এখনো তাঁ'র স্বকীয় পথ খুঁজে পাননি—সে-পথ সন্ধানের চেষ্টা তাঁর কবিতায় পরিস্ফুট। আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁ'র কবিতাকে উৎকৃষ্ট আখ্যা দেওয়া চলে—যদিও এখানেও তাঁর দ্বন্দ্বের অবসান

হয় নি। কিন্তু দ্বন্দ্বের অবসান যে বহুদূরে নয় একথা আর অস্পষ্ট নেই। 'মৈনাক' সম্বন্ধে এইটুকুও বলা যায় যে এর দ্বারা কামাক্ষীপ্রসাদ বাংলা কাব্যে একটি নিজস্ব স্থান ক'রে নিতে পেরেছেন।

অজিত দত্ত

Parole D'honneur—By Martin Freud. (Victor Gollancz Ltd. 7/6 d.

গ্রন্থকার হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত মনোবিৎ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্‌-এর পুত্র। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি অষ্ট্রিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দান করেন এবং ক্রমে প্রথম-লেফ্‌টেনেন্ট-এর পদে উন্নীত হন। যুদ্ধবিরতির পরেও তাঁকে নয় মাস কাল ইতালীয় বন্দীশালায় আটক থাকতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থ-খানিতে সেই যুদ্ধ ও কারাকাহিনী বিবৃত হয়েছে ব্যারন নিয়ুষ্টাটেন্ নামক এক অভিজাত বংশীয় গোলন্দাজ সেনানায়কের বেনামে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন যে পাণ্ডুলিপিটি তাঁর হাতে দৈবাৎ এসে পড়ে, কিন্তু সে কথা যে সত্য নয় তা বলবার ভঙ্গীতে বোঝা যায়। স্বনাম গোপনের একটি কারণ হচ্ছে যে কাহিনীটি দুর্নীতিপরায়ণ ক্রিয়াকলাপে সমৃদ্ধ এবং পাঠকের মনোরঞ্জনকল্পে অতিরঞ্জিত।

আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে প্রথম পুরুষে, কিন্তু নায়কের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। নিজের চরিত্র অঙ্কনে আভিজাত্যের সকল গুণই তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন একাধারে ধনী, লম্পট, সুদর্শন, বীর্য্যবান ও সৌভাগ্যশালী। তাঁর শুভ-অদৃষ্ট পুরুষ পাঠকমাত্রকেই ঈর্ষান্বিত ক'রে তুলবে।

পটোন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠলগ্ন হয়ে দেখা দিল বিজিত ইতালীয়ান গ্রামের শ্রেষ্ঠতম কৃষাণ সুন্দরী। রীতিমত রোমান্টিক ব্যাপার। বিজেতা অষ্ট্রিয়ান শিবিরে গোলন্দাজ বিভাগের অস্থিরমতি তরুণ অফিসার-এর সঙ্গে যখন অন্যান্য সেনানায়কদের কলহ প্রবল হয়ে উঠল তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাকে

বদলি করে দিলেন ছোট একটি ইতালীয় গ্রামে। অশ্বারোহী যুবক গন্তব্যস্থানে পৌঁছেই একটি স্বল্প-ভূষিতা সুন্দরী গাড়োয়ানীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেল্লেন। দীর্ঘাকৃতি তন্বী যুবতীর রূপের ঝলক তার হৃদয় দগ্ধ করে দিল; তারপর সে যখন সেই রাত্রে গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নালোকের মাদকতায় অস্থির হ'য়ে নানাবিধ উদ্ভট চিন্তায় নিমগ্ন তখন তার উদ্ভটতর কল্পনাকেও পরাজিত ক'রে তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করল সেই চাষী কৃষক-কন্যা। যুবতী স্বেচ্ছায় অপ্রত্যাশিত-ভাবে অভিসারিণী হ'লে কি হয়, এই তার প্রথম প্রেমের আস্বাদন।

নায়কের শৈশব জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। তার সৌভাগ্য দেখা যার আবাল্য। চার ভাই বোন প্রত্যেকেই ভিন্নাকৃতি ব'লে অনেকে বলতো যে তাদের প্রকৃত জন্মদাতা হচ্ছে পল্‌টনের ভিন্ন ভিন্ন উপনায়ক। সে যাই হোক তার নিজের শুভাদৃষ্ট সুরু হয় কৈশোরে। নির্ব্বিরোধ ভালমানুষ পিতা স্ত্রীর দৌরাত্ম্যে সন্তানদিগের সঙ্গ হতে বঞ্চিত ছিলেন, আর তাদের মানুষ হতে হয়েছে ভৃত্যকুলের মধ্যে। বালক ব্যারন অচিরেই সঙ্গীতানুরক্ত ও সশব্দ চুম্বন ও সুনিবিড় আলিঙ্গনে পারদর্শী হয়ে উঠল। তারপর ধনী সংসারের বৈঠকী আদব-কায়দায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পালিয়ে গিয়ে উঠল এক চাষীর ক্ষেতে অনাথ বালকের ছদ্মবেশে। সেখানে চাষী গৃহিনী তার শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিল সমবয়স্ক এক কিশোরীর সঙ্গে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সুরু হয়েছে প্রথমটির সূত্র ধ'রে। নায়ক তার নবলব্ধ উপপত্নী মার্সিলাকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব'লে চলেছে শয়ন ও বিহারের ফাঁকে ফাঁকে। বর্ণনা হচ্ছে অপরূপ সুন্দর। সিগ্‌ফ্রিড্‌ সেসুন্‌-এর রচিত গ্রন্থাবলীর কথা মনে পড়ে। কিন্তু ব্যারণ নিয়ুষ্টাটেন্‌ হচ্ছে আরও নির্ব্বিকার, আরও উদার। আধুনিক যন্ত্রযুদ্ধের নৃশংস ধ্বংস ও সংহারের বেদনা-কাহিনী দুঃসহ হ'লে কথকতা বন্ধ হয়ে ছুটির কথা ওঠে।

ব্যারন একটি জাল ছাড়পত্র সংগ্রহ করে তার প্রণয়িণীকে সঙ্গে নিয়ে চলল ভিয়েনাতে। সেখানে রাজপথে তাদের দেখতে পেলেন তার এক কুৎসাপ্রিয় খুড়ী। তাঁর কাছ থেকে এল চায়ের নিমন্ত্রণ। ধনী সংসারের আপ্যায়ন পাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল মার্সিলা, কিন্তু ব্যারন তার আত্মীয়াকে চেনে ব'লে সর্ত্ত করলো যে যথোচিত আহার্য্যের ব্যবস্থা না হলে সে-মহিলাকে অপমান

ক'রে ফিরতে হবে। প্রথমে কথার বহরে মার্সিলা কৃতার্থ হয়ে গেল কিন্তু চায়ের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা দেখে ব্যারণের সঙ্কেত মত সুরু করল—'ঘোড়া চড়তে পারি কিনা জানতে চাইছেন, পারি বৈকি—আমাদের গ্রামে অনেক ঘোড়া ছিল আর আমরা ছোট ছোট মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে থাকতাম কখন সে-গুলো চ'রে ফিরবে আর আমরা চ'ড়ে বসবো তাদের পিঠে। ইজের পরা না থাকলে পাদ্রী সাহেব আপত্তি করতেন বটে কিন্তু শুনতাম না। গরীব মানুষ, কোথায় পাব ইজের। তা আপনার ঘোড়া চড়ার কথা মনে হ'ল কেন বলুন ত? গায় গন্ধ পেয়েছেন, না? আশ্চর্য্য নয়! দেশে থাকতে সহিসগুলো ঘোড়ার বুরুশ দিয়ে আমাদের পিঠ ঘষে দিত। ভারী আরাম, আর তা ছাড়া রক্ত চলাচলের পক্ষেও ভাল। আপনি চমকে যাচ্ছেন যে? তারা ছেলেমানুষ যুবক হলে কি হয়—আমরা এক একটা পেটিকোট পড়ে নিতাম আর বুক ঢাকতাম হাতে। আমার হাত বেশ বড় আর স্তন ত' ছোট। সহজেই ঢাকা পড়ে। আপনি হলে অবশ্য মুস্কিল হ'ত কেন না আপনার ইয়ে—হাত ছোট—'

ভদ্র মহিলার সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হ'য়ে এসেছিল। কিছু ধাতস্থ হলে প্রতিঘাত করবার চেষ্টায় ব্যারনের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন—'আচ্ছা তুমি কি মেয়েগুলোকে বাছাই করো সাইজ দেখে—সব কটাই দেখি এক মাপের।' অনুমাত্রও অপ্রতিভ না হয়ে ব্যারন বল্লে যে তার একান্ত সখ যে সে মারা গেলে কফিন-বাহক হবে প্রণয়িণীরা আর তাদের দেহের মাপ হবে এক। এদিকে মার্সিলা হঠাৎ উঠে প'ড়ে আক্রমণ করলো ব্যারণের আঠার বছর বয়স্ক ভাল মানুষ ভাইকে। হতবুদ্ধি যুবককে আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে বল্লে, 'হ্যাঁ ভাই, তুমি কি এখনও প্রেমে পড় নি, আহা হা বেচারাকে একেবারে নিজের চেষ্টার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।' খুড়ীমা তাঁর শেষ শক্তিটুকু নিয়োজিত ক'রে নিজের কিশোরী কন্যাকে আড়ালে ঠেলে দিলেন। তারপর অতিথিদের বিতাড়িত করবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছেন, কিন্তু নিমেষের মধ্যে মার্সিলা সেখানে প্রচণ্ড একটা চুম্বন দিয়ে স'রে পড়লো ব্যারনকে নিয়ে।

এই খাপছাড়া ঘটনাটির সবিস্তার বর্ণনায় সমালোচনার পরিসর সংক্ষেপ করলাম ইচ্ছা ক'রে। এরূপ যুদ্ধের বিবৃতি প্রখর ও উলঙ্গ হ'য়ে একটানা

বিষাদ রচনা ক'রে গেছে। গত মহাযুদ্ধের রোমান্টিক আবহাওয়া আজকের দিনে অর্থশূন্য। বিশেষ বলবার কিছু নাই। মার্সিলাকে লুকিয়ে পড়তে হ'ল। ব্যারন তার গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে তৃণের মত ভেসে গেল সেই যুদ্ধের প্রবাহে। ক্ষুদ্র মানুষের স্বার্থ, আত্মম্ভরিতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, দুঃসাহস ও বর্ব্বরতা প্রবল যন্ত্রশক্তির সাহায্যে উদ্দাম প্রলয়কাণ্ডে মেতে উঠল। তারপর উত্তেজনার অতিক্রান্তে এল গ্লানি আর ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী।

ইতালীয় শক্তির প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যারন হলো বন্দী। মার্সিলা তার সঙ্গে ভিড়ে গেল অষ্ট্রিয়ান সৈনিকের ছদ্মবেশে। পীড়ার প্রকোপে, পথের দুঃসহ কষ্টে ও অনাহারে অধিকাংশ কয়েদী বিনষ্ট হ'ল। ব্যারন-এর সৌভাগ্য তখনও তার সঙ্গ ছাড়া হয় নি। সে প্রণয়িনীর তাপদগ্ধ অচেতন দেহ বহন ক'রে ছটকে গিয়ে পড়ল এক হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। সেখানে আশ্রয় ও শুশ্রূষা ত' মিললই অধিকন্তু তার রূপমুগ্ধ এক নার্স-এর কল্যাণে মার্সিলার ছদ্মবেশ বজায় রইল।

তারপর ব্যারন-এর ভাগ্যলক্ষ্মী বিদায় নিলেন। মার্সিলা সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরপুরুষের আনুকূল্য পাবার চেষ্টায় সে তার শারীরিক সৌন্দর্য্যের জাল বিস্তার ক'রে বসল। তাদের গোপন কথা ক্রমে কয়েদীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। হাসপাতাল ছেড়ে কয়েদখানায় গিয়েও ব্যারন মার্সিলার শয্যা কাছাকাছি রেখে কড়া পাহারায় রেখেছিল তাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নূতন কারাধ্যক্ষ এসে তাদের শ্রেণী বিভক্ত ক'রে পাঠিয়ে দিল ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। মার্সিলা মহানন্দে চল্লো তিন তলায় নিম্নপদস্থ কয়েদীদের সঙ্গে। তার হাবভাবের মধ্যে বিরহের কোন লক্ষণ না দেখে ব্যারন ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত হ'য়ে গেল। দাঁত তোলাবার অছিলায় ছুটি নিয়ে প্রহরীদের মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে উঠল এক বারবনিতার ঘরে।

শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় যে চিত্তের স্থৈর্য্য ফিরে পেয়েছে সে। মার্সিলার বহুপুরুষ-প্রীতি সে দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে দেখতে শিখেছে। এমন কি নূতন ক'রে তাকে ভালবাসছে। অধিকন্তু পূর্ব্বতন কোন অভিজাত বংশীয় ধনী প্রণয়িনীর মুক্তি চেষ্টার অনুরোধও প্রত্যাহার ক'রে মার্সিলার প্রণোদিত সমাজতন্ত্রবাদী বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছে। সমষ্টিবাদের প্রতি

তার অনুমাত্রও অনুরাগ ছিল না কিন্তু চক্রান্তের মোহ পেয়ে বসল 'তাকে। অবশেষে কল্পিত বিদ্রোহ কার্য্যে পরিণত হ'বার পুর্ব্বেই মুক্তি পেয়ে সে দেশে ফিরল। যবনিকা পড়বার পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে দেখা যায় মার্সিলা আর একটি ধনী ব্যক্তির উপপত্নী হয়ে বিরাট শকটারোহণে চলেছে।

গ্রন্থখানি ছন্নছাড়া ও অসম্ভব ঘটনাবলীতে সমাচ্ছন্ন হলেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থকারের বহু উৎকট মানসিক উৎকেন্দ্রিকতা রচনার সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে এবং ব্যক্তিগত অহংকার হয়েছে প্রকট কিন্তু তাতে পাঠকের চিত্ত বিরক্ত হয় না কারণ প্রথম হতেই প্রতীয়মান হয় যে কাহিনীটি নিছক কৌতুক-উৎপাদনকল্পে হাল্কা ভাবে রচিত।

গ্রন্থকার হচ্ছেন ইহুদী; নাৎসীদের উৎপীড়নে দেশ ত্যাগ ক'রে তিনি ইংলণ্ডের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য রচনায় ইংরাজ সৈনিকের ভদ্র আচরণের প্রশস্তি ও ইতালীয়ানদের নিন্দাবাদে সন্দেহ জাগে যে গ্রন্থকার তাঁর বর্ত্তমান আশ্রয়দাতার তুষ্টিকল্পে যত্নবান, কিন্তু তাতে, রসপ্রতিপত্তির যে বিঘ্ন ঘটেনি সে কথা ঘোরতর জাতীয়তাবাদী ইতালীকেও স্বীকার করতে হবে। ব্যঙ্গোক্তিগুলি তিক্ত না হ'য়ে হয়েছে কৌতুকবহ, কোথায় জাতিগত অভিমান বা অহমিকার লেশ মাত্র নাই, আছে ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

আলোচ্য রচনা হ'তে গ্রন্থকারের প্রকৃতি অনুমান করা বিধেয় হবে কিনা জানি না তবে ইহা যে-প্রকার আভিজাত্যগর্ব্বী অর্থহীন বিদগ্ধ মনোভাবের পরিচায়ক তাতে নাৎসী পীড়নের অনেকখানি সার্থকতা উপলব্ধি হয়। বর্ত্তমান রাষ্ট্ররচনাপদ্ধতিতে স্বপ্নবিলাসের স্থান নাই সে কথা ইংরাজের কাছেও প্রতীয়মান হচ্ছে আজ—কিন্তু তাঁরা যতদিনে বর্ত্তমান সঙ্কট কাটিয়ে উঠে নূতনতর সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করবেন ততদিনে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমাণ হ'বে যে ধনতন্ত্রের আগাছা শুধু ছাঁটলে মরে না—চাই সেইগুলিকে বাধাহীন পূর্ণ সমাজবোধের বারিসিঞ্চনে প্রস্ফুটিত বৃক্ষপল্লবাদিতে রূপান্তরিত করা।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Problem of India.—By K. S. Shelvankar. A Penguin Special.

ব্রিটিশভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক স্বরূপ এত পরিষ্কার ভাবে আর কোনো পুস্তকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। লেখক যে এত অল্প পরিসরে তাহা করিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে যে সমস্যার সৃজন করিয়াছে তাহার আলোচনা ও এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ-শাসনের গুরুতর দোষত্রুটির তীব্র সমালোচনা স্বদেশভক্ত ভারতবাসী ও ভারতভক্ত ইংরেজ-লিখিত একাধিক পুস্তকে পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকটি ইহাদের মধ্যে আধুনিকতম। কিন্তু পূর্বগামীদের সঙ্গে ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে। গ্রন্থকার স্বয়ং তাহার আভাস দিয়াছেন এই বলিয়া যে ইংরেজ বা ভারতবাসী কাহারও পক্ষ সমর্থন বা বিরোধিতা ইহার উদ্দেশ্য নয়, কেননা তিনি একমাত্র তাহাদেরই পক্ষে যাহারা খাদ্য ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত এবং শুধু তাহাদেরই বিপক্ষে যে সকল স্বদেশী বা বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রীতি নীতি এবং বিধি ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষের এই দুর্গতির জন্য দায়ী।

শুধু গ্রন্থকারের এই কৈফিয়ৎ হইতে গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানী লেখকও এইরূপ উদার মত অনেক সময়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহারা মাথা ঘামান শাসক ও শাসিতের যম্পর্ক লইয়া, শেল্‌ভান্‌কার মহাশয় মাথা ঘামাইয়াছেন শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক লইয়া এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষের সমস্যার বিচারে তিনি নূতন আলোকসম্পাত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার উপকরণের জন্য তিনি বহুল অংশে দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়েডারবার্ণ, প্রভৃতি ভারতীয় ন্যাশন্যালিষ্ট লেখকদের নিকট ঋণী এবং পুস্তকটির পরিশিষ্টে বিস্তৃত তালিকায় এই ঋণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ তাঁহার স্বকীয়। অবশ্য এই স্বকীয়তার পিছনে রহিয়াছে রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক প্রগতিশীল মতবাদের বিস্তৃত পটভূমি।

গ্রন্থকারের সহিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী লেখকদের প্রকৃত পার্থক্য

এইখানে। এই পটভূমির অভাবে তাঁহারা অনেক সময়ে শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ফল ক্ষোভ প্রদর্শন করেন, কখনো মৌলিক সমস্যাগুলির বিচার করেন সাময়িক ঘটনাপুঞ্জের সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে। শেলভাঙ্কার তাহা করেন নাই বলিয়াই তাঁহার বইখানি এত মূল্যবান হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব কি করিয়া হইয়াছে অথচ তাহা সত্ত্বেও ধনিকতন্ত্রের প্রধান গর্ব, শ্রমশিল্পের বিস্তার, কেন হয় নাই; কি ভাবে বিদেশী ও স্বদেশী ধনিকসম্প্রদায়ের ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছে; সাম্রাজ্যশক্তির সহিত ধনিকতন্ত্রের সাহচর্যে কি ভাবে ভারতবর্ষ বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে এবং এই অবস্থার কি প্রতিকার—এই বিষয়গুলির আলোচনায় গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের ও প্রখর বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মামুলি দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃত পার্থক্য কোথায় এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার বলিতেছেন:

মামুলী মত অনুযায়ী ভারতবর্ষের অনুন্নত অবস্থা স্বাভাবিক, অর্থাৎ শ্রমশিল্পযুগ প্রবর্ত্তনের পূর্বে বা এই যুগের আদিতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে যেরূপ ছিল, তাহারই অনুরূপ। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে এখন দরকার শুধু শান্তিরক্ষা, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের পথে যে সব বিঘ্ন রহিয়াছে তাহাদের অপসারণ এবং মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প সরকারি সাহায্য ও উৎসাহ লাভ—বাস্, তাহা হইলেই, ধনতান্ত্রিক প্রচেষ্টা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে ও তাহার ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি প্রভৃতি দেশের মতন এই দেশেরও চেহারা একেবারে বদলাইয়া যাইবে। এই যুক্তি যাঁহারা দেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল ভারতবর্ষ তখন শুধু যে নিশ্চেষ্টভাবে দূরে থাকে নাই তাহা নয়, ঐ সবল উন্নতিশীল দেশের প্রয়োজনমত ভারতবর্ষের প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের ফলেই উহাদের সমৃদ্ধি সম্ভব হয়।...

পুস্তকটির শেষাংশে বর্তমান ভারতের বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারার যে বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে তাহাও লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কিন্তু স্থানসঙ্কোচের জন্য এই

আলোচনা [illegible] অনেক [illegible]ানে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। তবে এই জাতীয় ক্ষুদ্র পুস্তকে এই অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য।

মলাটে মুদ্রিত পরিচয় পত্র হইতে জানা যায় যে গ্রন্থকার সম্প্রতি ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত আছেন। বইটির গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্তসার আছে তাহা পড়িলে আশা হয় যে এই ইতিহাসে শুধু পরিচিত ঘটনা ও তথ্যের বিবৃতি নয় তাহাদের নূতন ব্যাখ্যাও পাইব।

বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

ইওরোপের চিঠি। শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্. এ., পি-এচ. ডি.। বাগ্‌চী এণ্ড কোং, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা

ইউরোপ হইতে গ্রন্থকারের ভারতীয় বন্ধুবান্ধবকে লিখিত পত্রাবলী এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় বহু মনীষীর সহিত গ্রন্থকারের পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত পরিচয়সূত্রে ইওরোপীয় অধ্যাত্ম জীবনের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রন্থকার লাভ করেন এই পত্রগুলি মধ্যে তাহাই তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন। চিন্তাশীল ও পণ্ডিত বলিয়া তাঁহারা খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থে চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য উভয়েরই সমাবেশ ঘটিয়াছে।

লেখা। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্. এ, পি-এচ্. ডি। মূল্য দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা।

আলোচ্য বইখানি কতকগুলি প্রবন্ধ ও গল্প লইয়া সংগ্রথিত। এইগুলির আকারও যেরূপ ক্ষুদ্র, বিষয়বস্তুও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই রচনাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে লিখন-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে। 'শনিবারের চিঠির পাঠকেরা এই কথায় সাক্ষ্য দেবেন, কেননা লেখকের ছদ্ম নাম ভাস্কর তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নহে। কিন্তু তাঁহার বিনয়ের অভাব নাই। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন: কখনও কখনও একটু একটু

লিখিতে ইচ্ছা হয়। আমার এই অক্ষম অনধিকার চর্চার অন্য কোনো কৈফিয়ৎ নাই।” অবশ্য ইহা পরিহাস হইতে পারে, যদি হয় তাহা সূচনা হিসাবে খুবই প্রাসঙ্গিক, কেননা বইখানির অধিকাংশ রচনাই পরিহাসোজ্জ্বল। কিন্তু এই পরিহাসে কোথাও বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই, অনাবিল হাস্যরসে ইহা ঠাসা। দুই একটি নমুনা দিলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হইবে। যথা :

> যদি কেহ বলে, “এলগিন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া কণ্ডাক্টরের নিকট টিকেট লইয়া সামনের সীটে বসিতেই ট্রামখানি লোয়ার সারকুলার জংশনে আসিয়া পড়িল এবং পূর্ব দিক হইতে আগত একখানি ট্যাক্সির সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইল। একটি তরুণীকে আহত অবস্থায় ট্রাম লাইনের উপর ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়াই আমি ট্রাম হইতে নামিয়া একখানা ট্যাক্সি করিয়া তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া গেলাম এবং অনেক কষ্টে ওখানকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ইন্‌ডোর পেশেণ্ট ভাবে অ্যাডমিট করাইলাম। হোষ্টেলে ফিরিয়া দেখি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট রোল কলের সময়ে আমাকে অ্যাবসেণ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পরদিন হইতে ভিজিটিং আওয়ার্সে নিয়মিত তরুণীটিকে দেখিতে যাইতাম। অসুখ সারিয়া আসিলে তিনি তাঁহার বাসার ঠিকানা দিয়া আমাকে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে ক্রমশঃ তরুণীটির সহিত ইত্যাদি,” তাহা হইলে তাহাকে জালিয়াৎ বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন। কিন্তু তাহার ভাষা যে অস্বাভাবিক তাহা বলা চলে না।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য শুধু হাস্যরসের সৃষ্টি নহে। তাঁহার বলিবার কথা কিছু আছে এবং যদিও তাহা পরিহাসের ভঙ্গীতেই তিনি বলিয়াছেন তবু তাহা শুনিবার মতন। উদ্ধৃত অংশের পরবর্তী কয়েকটি লাইনে এই কথা লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন :

> বিশুদ্ধ বাংলায় উক্ত কথাগুলি বলা যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে বড়বাজার হইতে হাওড়া ষ্টেশনে যাইবার সময়ে বিদেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্মিত হাওড়ার পুলের উপর না গিয়া স্বদেশীয়গণ কর্তৃক বাহিত ডিঙ্গীতে অথবা পবিত্র গঙ্গাজলে সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইবার মতই হইবে।

লেখক যে পরিহাসছলে তীব্র সত্যও বলিতে পারেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘হাসির বাধা’ প্রবন্ধের এই চরম উক্তিতে :

[illegible] না মনীষী শেক্সপীয়ার সম্রাট জুলিয়াস্ সীজারের মুখ দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বলইয়াছেন, Such men are dangerous! কিন্তু একথা বাঙালী সম্বন্ধে খাটে না। কারণ, ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম থাকিলেও আমরা জাতি হিসাবে কিরূপ সরল, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ, পরনিন্দাবিমুখ, পরশ্রীপুলকিত, একতাবদ্ধ, কুসংস্কারহীন এবং উদারপ্রকৃতি তাহা মেকলের সাক্ষ্য সত্ত্বেও আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। সুতরাং শেক্সপীয়ারের উক্ত মতবাদ বাঙালীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

শুধু প্রবন্ধগুলি হইতে গ্রন্থকারের রচনার নমুনা দিলাম, কেননা তাঁহার গল্প-গুলি এত জমাট যে সেগুলি হইতে কোনো বিশেষ অংশ বাছাই করা মুস্কিল। অনেক স্থানে তাঁহার গল্প পড়িতে পড়িতে 'বনফুল'-এর কথা মনে পড়ে। অমি সাদৃশ্যের কথা বলিতেছি, প্রভাবের নহে। লেখকের ষ্টাইল তাঁহার স্বকীয় এবং এই ষ্টাইলে রসবোধ ও লিপিদক্ষতার যে সমাবেশ ঘটিয়াছে আধুনিক বাংলা গদ্যে তাহা বিরল।

হিরণকুমার সান্যাল

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

গত 'জুন' মাসের 'অগ্রণী' পত্রিকায় 'ফসিল' ব'লে একটি গল্প বেরিয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্যে যার তুলনা পাওয়া কঠিন। 'প্রগতিশীল সাহিত্য' বলতে কি বোঝায় যদি কারো সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহলে এই গল্পটি পড়লে তা দূর হবে। গল্পটির মধ্যে প্রগতির ও সাহিত্যের যে রকম রসোত্তীর্ণ সংমিশ্রণ হয়েছে তাতে মনে হয় লেখক সুবোধ ঘোষ যদিও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত নন, তবু অনেক খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিকের চেয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব ও লেখনীর দক্ষতা উভয়ই অনেক বেশি। আশা করি ভবিষ্যতে এঁর হাতের গল্প আরও অনেক পড়বার সুযোগ পাব।

যতদূর সম্ভব লেখকের উজ্জ্বল ভাষায় 'ফসিল' গল্পটির একটি সংক্ষিপ্তসার দিলাম।

'নেটিভ ষ্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আট বর্গ মাইল। তবুও নেটিভ ষ্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নিজামৎ সব আছে! এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি, তিনি নরপাল, ধর্মপাল এবং অরাতিদমন।............ক্ষত্রিয় আর মোগল এই দুই জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজা-রঞ্জন করেন। হিঙ্গের মত সেই অদ্ভুত শাসনের ঝাঁঝে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে স'রে পড়েছে।' কুর্মি আর ভীল—অঞ্জনগড়ের এই দুই জাতীয় প্রজা। লাঠিতন্ত্রের দাপট সইতে না পেরে ভীলেরা প্রায় সবই গেছে মানে মানে পালিয়ে, শুধু মাটি কামড়ে প'ড়ে ছিল কুর্মি প্রজার দল। তারা 'বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে, আর মারও খায়—ঋতুচক্রের এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিন সন্ধ্যের সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়।' কিন্তু ওদিকে মহারাজার আস্তাবল-ভরা পোলো পনির খরচ জোগাতে রাজকোষ প্রায় শূন্য, তার ওপর আছে আবার নরেন্দ্র মণ্ডলের চাঁদা!

[illegible] ড়ের ভাগ্যাকাশে এক শুভগ্রহের উদয় হ'ল—নবাগত ল-এ[illegible] ইংরেজী আইন-নবিশ মিষ্টার মুখার্জীর রূপে। শুভক্ষণে সে আবিষ্কার করলে 'রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেষ্টসের স্তূপ। কলকাতার মার্চেণ্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকড়ে মাটীর ডাঙ্গাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।'

কিন্তু ফিউড্যালিজ্‌ম্ ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্-এর এই সন্ধিক্ষণে এক বিচিত্র রকমের গোল পাকিয়ে উঠল ক্ষুদ্র অঞ্জনগড় রাজ্যে। দেখা গেল মরিশাস-ফেরৎ দুলাল মাহাতোর প্ররোচনায় কুর্মি প্রজারা হঠাৎ স্বাধিকার সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে উঠেছে। দুলাল তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে নগদ মজুরী কি জিনিষ। বাস্ —তারা আর বেগার খাটতে চায় না। রাজা বৃথাই চোখ রাঙালেন। কুর্মিদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবার দিন গিয়েছে। তাদের দুষ্ট উৎসাহ যোগাচ্ছে বিদেশী কলওয়ালাদের সিণ্ডিকেট—তাদের পিছনে রয়েছে আবার ব্রিটিশ সরকারের পলিটিক্যাল এজেণ্টের খুঁটির জোর। 'ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জর' মহারাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ পর্যবসিত হ'ল নিষ্ফল আষ্ফালনে। মুখার্জী সাহেবও প্রমাদ গণল। সিণ্ডিকেটের স্বার্থবুদ্ধির কাছে তার কূট বাঙালী চালও হার মান্‌ল—তাঁর অত সাধের ইরিগেশ্যান স্কীম বুঝি পণ্ড হ'য়ে যায়।

এমন সময় এল সুসংবাদ। সিণ্ডিকেটের চোদ্দ নম্বরের পিট ধ'সে মেয়ে পুরুষ মিলে নব্বই জন কুর্মি কুলি চাপা পড়েছে। 'মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। এইবার দুষমন মুঠোর মধ্যে, নির্দ্দয়ের মত পিষে ফেলতে হবে এইবার।' তাঁর মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই 'মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি' নিয়ে অমাত্য এসে খবর দিলেন, বিদ্রোহী কুর্মি প্রজাদের ঠাণ্ডা করতে গিয়ে গুলি চালানো হয়েছিল, ফলে হতাহতের সংখ্যা হয়েছে বাহাত্তর। হতভম্ব মহারাজার 'চোখের সামনে পলিটিক্যাল এজেণ্টের নোটটা সূচীমুখ বর্শার ফলকের মত ভেসে বেড়াতে লাগল।'

অসহায় মহারাজা অধীর হ'য়ে তলব করলেন বিপদবারণ মুখার্জীকে।

ফিউড্যাল দরবার ও ক্যাপিট্যালিষ্ট সিণ্ডিকেটের এ[illegible]
বেরোলো বুর্জোয়া ব্যবহারজীবীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। [illegible] দিল, মাহাতোকে আগে আটকান। আটকানো এত ভালো ক'রেই হ'ল যে ইহজগতে তার আর সন্ধান না পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে রাতারাতি ব্যবস্থা হ'ল খনি চাপা-পড়া আর গুলি-খাওয়া যত মেয়ে মরদের লাসগুলোকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার।

সে রাত্রে 'একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে।' সপারিষদ মহারাজা শতাব্দী-সঞ্চিত ইজ্জৎ খুইয়ে ভুঁইফোড় কলওয়ালা সাহেবদের নিয়ে উৎসবে মত্ত হলেন পেগ গ্লাস আর ডিকেণ্টারে ঠাসা সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলের চারপাশে।

বেচারি মুখার্জী! অসামান্য মস্তিষ্ক ধারণের নিদারুণ দায় তাকে একা বহন করতে হ'ল এই ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্যে। শ্যাম্পেনের পাতলা নেশায় আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল চোখে চোদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল 'লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে···কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।'

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।
কার্ত্তিক ১৩৪৭
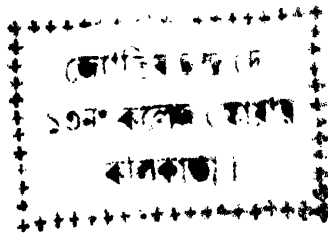
পরিচয়

জীবন্মুক্তের দশা

(১)

আমরা দেখিয়াছি যিনি জীবন্মুক্ত—তিনি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সুস্থিত। ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সুস্থিত জীবন্মুক্তকে গীতা 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নাম দিয়াছেন এবং এইভাবে তাঁহার দশা বর্ণন করিয়াছেন :—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

—গীতা, ২।৫৫-৭

'হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট হন, * তখন তাঁহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে। দুঃখে যাঁহার চিত্ত অনুদ্বিগ্ন, সুখে যিনি স্পৃহাহীন, যিনি রাগভয়ক্রোধশূন্য—এইরূপ মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।'

---

* গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—যঃ ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

চতুর্দশ অধ্যায়ে গীতা জীবন্মুক্তকে গুণাতীত + বলিয়া [illegible]াছেন।
সে বর্ণনা এইরূপ :—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব !
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি, ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি, নেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥

—গীতা, ১৪।২২-২৫

'ত্রিগুণের কার্য—প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ, গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি উদাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। গুণ সকল স্ব স্ব কার্যে রহিয়াছে এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন। তাঁহার সুখ দুঃখ সমান। তিনি আত্মাতে অবস্থিত। লোষ্ট্র প্রস্তর ও সুবর্ণে তাঁহার সমদৃষ্টি। প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার পক্ষে সমতুল্য। তিনি ধীর; মান ও অপমান তাঁহার পক্ষে সমান। শত্রু-মিত্রে তাঁহার পক্ষে ভেদ নাই। সমস্ত আরম্ভ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 'গুণাতীত'।'

+ যিনি গুণাতীত,—তিনি বুদ্ধদেবের ভাষায়, নির্বাণের তোরণে উপনীত ('নিব্বাণসম্পত্তিকে')। বুদ্ধদেব তাঁহার 'attitude'-এর এই ভাবে পরিচয় দিয়াছেন—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি।

সো সুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি, বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি। —মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩

'তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়,—'ইহা অনিত্য' ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত। যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য' ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত। যদি অদুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন, তবেও তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত।' তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, দুঃখকর হ'ক, অদুঃখ-অসুখকর হ'ক, তিনি 'বিসংযুক্ত' (উদাসীন) ভাবে তাহা ভোগ করেন।'

এই উদাসীন অবস্থান—মজ্‌ঝিমনিকায়ে ইহার চমৎকার বর্ণনা আছে। বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন—

পটিখুলং চ অপটিখুলং চ তদ্‌ উভয়ং অভিনিবজ্জেত্বা উপেখ্‌কো বিহরেয্যং সতো সংপজনো তি উপেখ্‌কো তত্থ বিহরতি সতো সংপজনো এবং খো আনন্দ! অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দ্রিয়ো—মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩

অর্থাৎ, প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জন করিয়া উপেক্ষক উদাসীন ভাবে—(with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ! যিনি 'অরিয়' (আর্য্য—Saint), তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।

এই 'Equal Mind'-ই গীতার 'সমত্ব'—সমত্বং যোগ উচ্যতে। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

ইহাই প্রকৃত 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহাই 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্‌'—নির্বাণের সমীপস্থ দশা—

পক্ষপাত-বিনির্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা

—ব্রহ্মবিন্দু, ৬

বুদ্ধদেব নিজের ঐ দশা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :—

যে মে দুক্‌খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেনুয়ো কোপি ন বিজ্জতি॥
সুখদুক্‌খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্‌খা পরং॥

—চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ, যশঃ ও অযশঃ আমার নিকট তুল্যমূল্য। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (perfection of my equanimity)।

সেই গীতার প্রাচীন কথা—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধি রসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—৫।২০

'যিনি ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মে স্থিত—যিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন—প্রিয়প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রহর্ষ নাই, অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার উদ্বেগ নাই।'

ইহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা—যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত 'ব্রাহ্মণে'র অনুষ্ঠেয়—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত'।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ
—বৃহ, ৪।৪।২১

সন্ন্যাস-উপনিষৎসমূহে এ অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা আছে। ব্রহ্ম-উপনিষৎ বলেন—'তাঁহারই ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ, যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহার জ্ঞানময় উপবীত'।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

এইরূপ 'ব্রাহ্মণে'র লক্ষ্য—পরম পদে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য।

গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদম্ অনাময়ম্।

এইরূপ 'ব্রাহ্মণ' পরমহংস-পদারূঢ়।

'তিনি শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ ও জরামৃত্যু-রূপ সংসার সমুদ্রের ছয়টি ঊর্মি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। নিন্দা গর্ব হিংসা দম্ভ দর্প ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ অসূয়া অহংকারাদি বর্জন করিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্বক) তিনি নিজ শরীরকে শবদেহ জ্ঞান করেন।'

ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানে চ ষড়ূর্মিবর্জং নিন্দাগর্বমৎসরদম্ভ দর্পেচ্ছাদ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহহর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

[illegible] জীবন যাপন করেন ?’ ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসাং চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

‘হে সন্ন্যাসী ! তোমরা ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।’

সঙ্গে সঙ্গে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প, হিংসা, মমত্ব, অহংকার, অসত্য সর্বথা বর্জন কর।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দর্পাসূয়া-মমত্ব-অহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ

—আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন ?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ, সুখে ন স্পৃহা, ত্যাগো রাগে, সর্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ, ন দ্বেষ্টি ন মোদতে—পরমহংস, ৪

‘দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন, সর্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষ, রাগ বর্জিত হইবেন।’

তিনি নিন্দা-স্তুতির অতীত হইবেন—

স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্

—সন্ন্যাস, ৪

তাঁহার সম্বন্ধে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিতেছেন—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দর্পাসূয়া-মমত্বাহংকারাদীন্ বিতীর্য মানাপমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সন্ন্যাসী—‘কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দাস্তুতি বর্জন করিয়া, তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এইখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।’

তখন তাঁহার স্থিতি কিরূপ হয় ?

সর্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্তন্তে। সর্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গ[illegible] আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্ ব্রহ্মাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি।

—পরমহংস উপনিষদ্

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন, কৃতকৃত্য হন।'

জীবন্মুক্তের ঐরূপ দশা লক্ষ্য করিয়া একজন অভিজ্ঞ লেখক সংক্ষেপে বলিয়াছেন—To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss far above earthly comprehension. (Man, Visible and Invisible)—অর্থাৎ, জীবন্মুক্তের এমন স্বস্তি ও শান্তি, যাহা মানবধারণার বহু ঊর্ধ্বে।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'মোক্ষ মননের বচনের বর্ণনের অতীত'

তথাপি মোক্ষকে চরম শান্তি ও পরম আনন্দ বলা যাইতে পারে। মোক্ষাস্বাদী ঋষিরা তাহাই বলিয়াছেন।

প্রথমতঃ উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমানন্দ' বা 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' বলা হইয়াছে।

স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীম্
আনন্দস্য গত্বা শয়ীত, এবমেবৈষ এতৎ শেতে—বৃহ, ২।১।১৯
অন্যত্র—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখম্ অস্তি।
ভূমৈব সুখং * * যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্—ছান্দোগ্য, ৭।২০।১-২

অর্থাৎ মোক্ষ বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি ভূমানন্দের অবস্থা, উহা আনন্দের অতিঘ্নী (Acme)।

গীতা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মোক্ষকে 'অত্যন্ত' সুখ বলিয়াছেন—ঐ সুখ 'ব্রহ্ম-সংস্পর্শ'-জনিত।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে

—গীতা, ৬।২৮

'অক্ষয়'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—

স ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে
—গীতা, ৬।২১

বৌদ্ধ ধম্মপদেরও ঐ কথা—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্‌গো, ৮
পস্সে চ বিপুলং সুখং—পকিণ্ণকবগ্‌গো, ১

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য মানবকে ঐ বিপুল সুখ, ঐ ভূমানন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ-সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধিমান্, সকলের অধিপতি, সর্ববিধ মনুষ্য-ভোগের অধিকারী—ঐ ব্যক্তির যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্য-লোকের পরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি, অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্বৈঃ মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যানাং পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকের যে আনন্দ সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্বলোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্বলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতিলোকের যে আনন্দ আজানদেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতিলোকের আনন্দ তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র।

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার আনন্দের ঐ পরিমাণ—

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ, নির্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষ কোটি গুণ (billion times)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ইহার উপর কয়েক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। [illegible] বিত্ত পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক হন, আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন, এবং এই সর্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের চরম।'

ব্রহ্মের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ মনুষ্য-আনন্দের ১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০ গুণ অর্থাৎ one hundred billion times. অকামহত শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তের আনন্দ এইরূপই—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য—তৈত্তি, ২।৮

এইরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, মুক্তির আনন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। সেইজন্যই ইহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরাও নির্বাণের প্রসঙ্গে বলেন—Bliss is Nibbana. Bliss is Nibbana (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ইহা শারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলেন, মুক্ত পুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্ঞং চা ততো সন্ততরং (মজ্ঝিমনিকায়)—অর্থাৎ, নির্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন ঐ আনন্দ 'নন্দনাতীতম্'।

মুক্তি শুধু পরম আনন্দ নহে—মুক্তি পরাশান্তি 'that peace that passes understanding'—'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled.' (Rhys Davis, p. 166).

তম্ আত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্—কঠ, ৫।১৩

'সেই ব্রহ্মকে যে ধীর ব্যক্তি আত্মার মধ্যে অনুভব করেন, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।'

ইহাই প্রজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান,—যাহার অচির ফল পরাশান্তি।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি
—গীতা, ৪।৩৯

আর এক শ্লোকে (৬।১৫) গীতা ইহাকে 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র গীতার উক্তি এই:—

—হাঁ, উইংগু ব্যা[illegible]কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭১

'যিনি সমস্ত কামনার বস্তু উপেক্ষা করিয়া স্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হন।'

হংস উপনিষদের বর্ণনায়, যিনি মুক্ত—তিনি 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে'—মুক্ত 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ (self-illumined), শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন (stainless) ও শান্ত।' বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্বাণের পরা শান্তি লক্ষ্য করিয়া, উহার সংজ্ঞা এইরূপ :—

'Blissful tranquility' 'stainless bliss of eternal peace' 'absolute peace' 'eternal peace' 'eternal rest, eternal stillness, the great peace.'—(The Doctrine of the Buddha. pp. 350 & 356).

মুক্ত পুরুষ যে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন, ইহা বিচিত্র নয়। কেন বিচিত্র নয়—সে অনেক কথা। আগামী বারে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাগরিকা

পঞ্চম অঙ্ক

(দৃশ্য :—ডাক্তার বাঙ্গেলের উদ্যানের সুদূর প্রান্তে কার্প্-মাছের দীর্ঘিকা। নিদাঘ-রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে। আর্ন্‌হল্‌ম্, বোলেত্, লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্ ও হিল্ডে একটি নৌকায় সমুদ্রের তীরে-তীরে বাম দিকে যাইতেছেন)।

হিল্ডে—লাফিয়ে পড়্‌লে আচ্ছা ফুর্ত্তি হবে।

আর্ন্‌হল্‌ম্—না-না, লাফিও না।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—আমি কিন্তু লাফাতে পারিনে মিস্ হিল্ডে।

হিল্ডে—আপনিও পারেন না, আর্ন্‌হল্‌ম্?

আর্ন্‌হলম্—নাঃ, আমার দরকার নেই লাফিয়ে।

বোলেত্—ঐ স্নানের ঘাট দিয়েই নাবা যাক্।

(লগির ঠেলায় নৌকা চলিল। এমন সময় বেলেষ্টাড্ হাতে সঙ্গীত-পুস্তিকা ও একটি ফরাসী তূর্য্য লইয়া ফুট্‌পাথ্ দিয়া আসিয়া উপস্থিত। খেয়া-যাত্রীদিগকে নমস্কার করিয়া আলাপ সুরু করিলেন। প্রত্যুত্তর-ধ্বনিগুলি দূর-দূরান্তে মিলাইয়া যাইতেছে)।

বেলেষ্টাড্—কি বল্লেন? তা তো বটেই;—ইংরেজ জাহাজ বৈকি। এইটেই এ-বছরকার মতো এদের শেষ আসা কিনা। তা আপনারা গানের বৈঠকে যাচ্ছেন তো?—তবে আর দেরী কর্‌বেন না।......(তারস্বরে) কী?......(শির দোলাইয়া) কী বল্‌ছেন, শুন্‌তে পাচ্ছিনে।

(এলীডার প্রবেশ—মাথায় একখানা শাল জড়ানো। পিছু-পিছু আসিলেন ডাক্তার বাঙ্গেল্)।

বাঙ্গেল্—লক্ষ্মী আমার, এখনো অনেক সময় বাকী। অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

এলীডা—না-না, বাকী নেই। দেখো না; এলো বলে।

বেলেষ্টাড্—(বেষ্টনীর বাহির হইতে) হ্যালো, শুভ সন্ধ্যা, ডাক্তার! শুভ সন্ধ্যা, মিসেস্ বাঙ্গেল্!

বাঙ্গেল্—(দেখিয়া) ওঃ! তুমি যে! আজ রাত্তিরে তোমাদের জল্‌সা আছে?

বেলেষ্টাড্—হাঁ, উইণ্ড্ ব্যাণ্ড্ সোসাইটি একটা প্রোগ্রাম করেছেন। আজকাল আমাদের তো মজলিস লেগেই আছে। আজ রাত্তিরের উপলক্ষ্য ঐ ইংরেজ জাহাজ।

এলীডা—ইংরেজ জাহাজ! এখনি এসে গেছে?

বেলেষ্টাড্—এখনো আসেনি যদিও। ছ'টো দ্বীপের মাঝ্‌খান দিয়ে আস্‌বে কিনা—কিছুই দেখ্‌তে পাবেন না। তদুপরি, আপনাদের বাড়ীর পাশা-পাশি লম্বালম্বি ঠায় আস্‌বে তো!

এলীডা—সে ঠিক।

বাঙ্গেল্—(অর্দ্ধেক এলীডাকে উদ্দেশে) আজ রাতেই শেষ যাত্রা। আর এ-মুখো হবে না।

বেলেষ্টাড্—দুঃখের বিষয় সত্যি। সেজন্যেই তো যাকে বলে "বিদায় সম্ভাষণ" —তাই দেবার বন্দোবস্ত আমরা করছি। আঃ! এই চোস্ত সামার্-টা আর ক'দিনই বা আছে। যাকে বিয়োগান্ত নাট্যে বলেঃ পথ সর্ব্বত নিরুদ্ধ হয়ে যাওয়া—তা-ই হবে শেষ্‌মেষ্।

এলীডা—পথ সর্ব্বত নিরুদ্ধ—ইস!

বেলেষ্টাড্—এ-ভাবলে কষ্ট না হয়ে পারে না। সপ্তাহ-ভর মাস-ভর কেমন আমরা গ্রীষ্মের নর্ম্ম-সখার মতো ছিলুম। এর পর, তিমির-বরণ দিন-গুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা নেহাৎ সোজা কাজ নয়;—অন্তত প্রথম ক'দিন। তবে লোকে নিজেকে স্-সইয়ে নিতে পারে, মিসেস্ বাঙ্গেল্। সে-ই তো রক্ষে। (নমস্কার করিয়া বামদিকে চলিয়া গেলেন)।

এলীডা—(ফিওর্ডের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া) উ! মরিয়া হয়ে থাকতে আর পারিনে। কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের আগে পর্য্যন্ত এই আধ ঘণ্টা জ্বলে-পুড়ে জর্জ্জরিত হওয়া, কী মর্ম্মান্তিক!

বাঙ্গেল্—আলাপটা তুমি নিজেই করবে সঙ্কল্প করেছো?

এলীডা—হাঁ নিজে। নির্ব্বাচন-কর্ত্তব্যটি স্ব-তন্ত্র হয়েই করা চাই।

বাঙ্গেল্—তুমি নির্ব্বাচন-ক্ষম নও, এলীডা। আমার অনুমতি ছাড়া নির্ব্বাচনের দাবী তোমার অর্থহীন।

এলীডা—নির্ব্বাচনে বাধা দেওয়ার শক্তি তোমার নেই—কারুর নেই। বাস্তবিক

যদি ওর সহধর্ম্মিনী বা অনুগামিনী হতে মনে করে বসি, তুমি আমাকে 'যেও না' বলে বারণ করতে পারো ; এমন-কি—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় জোর করে বেঁধে রাখতেও পারো। কিন্তু নির্ব্বাচন করতে আমায় বাধা দিতে পারো না। এই নির্ব্বাচন আমার আত্মার স্বগতোক্তি। এ-উক্তির লক্ষ্য তুমি না হয়ে সে-ও হতে পারে। যদি তাকেই মনে মনে বরণ করে নিই, কি সাধ্য তোমার আমায় আটকে রাখো ?

বাঙ্গেল্—তা ঠিক। আমি কি-ই বা করতে পারি !

এলীডা—তাহলেই দেখো, আমায় নিরস্ত করতে পারে এমন কিছুই নেই। বিশেষ যখন এ-বাড়ীতে আমার পিছটান নেই, মায়ার বন্ধন নেই। বাঙ্গেল্ ! তোমার গৃহে আমি প্রবাসী : দেখো না, মেয়েরা আমার নয়, তাদের হৃদয়ে আমার স্থান নেই। আজ রাত্তিরে যদি আমি ওর সঙ্গে চলে যাই, অথবা যদি কাল স্কিওল্‌ভাইকেনে যেতে হয়, তবে যে যাত্রার সময় চাবি-টা—আরেক জনকে সমজিয়ে যাবো কিংবা ছিটো-ফোঁটা দু'টো শেষ-কথা বলে যাবো, তার যো নেই। এ-গৃহে আমি নেহাৎ-ই প্রক্ষিপ্ত ; —গোড়া থেকেই আমি তোমাদের সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন আছি।

বাঙ্গেল্—আমি কিন্তু তোমার কল্যাণ সর্ব্বাবস্থায় কামনা করেছি।

এলীডা—সে কি আমি ভালো করেই জানিনে, বাঙ্গেল্ ? কিন্তু এদ্দিন দুশমন গা-ঢাকা দিয়ে ছিলো। এখন তার প্রতিশোধ নেবার পালা এসেছে। এ-বাড়ীতে আমার কোনো বন্ধন নেই, কোনো নির্ব্বন্ধ নেই, কোনো লোভ নেই। তোমার ও আমার সম্পর্কের মধ্যে যেটুকু অসপত্ন দৌলত হিসেবে গণ্য হতে পার্‌তো তাকে ঠাঁই দেওয়ার মতো কিচ্ছু নেই।

বাঙ্গেল্—বুঝেছি, এলীডা।······কাল তুমি তোমার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। তদবধি, তোমার স্ব-তন্ত্র জীবনে তোমারই হবে একচ্ছত্র অধিকার।

এলীডা—স্ব-তন্ত্র জীবন আমার ? উহুঁ, যেদিন থেকে তোমার গৃহে সহবাস করার প্রস্তাবে মত দিলুম, সেই দিনই আমার প্রকৃত জীবনের বৈচিত্র্যকে জলাঞ্জলি দিতে হলো (ত্রাস ও অস্বস্তিতে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) আজ রাত্রি বেলায়—আর আধ ঘণ্টা—তারপরই আস্‌বে আমার উপেক্ষিত—।

হয়তো সেই হতো আমার চির জীবনের অবলম্বন, যেমনটি আমিও অদ্যাবধি তার অবলম্বন হয়ে আছি। আবার সে এসেছে, শুধু একবার তার শেষ মিনতি জানিয়ে যাবে, যেন আমি আমার প্রকৃত জীবন—নব জীবন—যাপনের সুযোগ স্বীকার করে নিই : ঐ জীবনের এম্‌নি স্বরূপ যে, আমায় ভয়ও দেখায়, আবার ফুস্‌লাতেও ছাড়ে না। একে আমি অকুণ্ঠিত মনে বর্জ্জন করি কি করে?

বাঙ্গেল্—সে-জন্যেই তো আমি আছি—স্বামী-রূপে চিকিৎসক-রূপে তোমার কর্ত্তব্যে সাহায্য করবো ব'লে, যাতে নিঃসঙ্গ হয়ে কাজের ভার তোমায় একলাটি বইতে না হয়।

এলীডা—বাঙ্গেল্, আমি কি তা-ই চাই না? সত্যি জেনো—মাঝে-মাঝে আমি ভাবি তোমার জীবনের তালে-তালে যদি ছন্দ রেখে চল্‌তে পার্‌তুম, তাহলে বুঝি-বা সমস্ত ভয়-ডর প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা যেতো!—কিন্তু হয় না, আর হয় না।

বাঙ্গেল্—এলীডা, এসো, কিছুক্ষণ দু'জনে একটু বেড়াই।

এলীডা—চলো। কিন্তু সাহস পাচ্ছিনে যে। বলে গেছে, এইখানে তার প্রতীক্ষা করে থাক্‌তে।

বাঙ্গেল্—এসো, এখনো ঢের সময় বাকী।

এলীডা—সত্যি?

বাঙ্গেল্—হাঁ-গো। ঢের সময়।

এলীডা—চলো তবে, একটু বেড়ানো যাক্।

(তাঁহারা প্রাগ্‌ভাগে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আর্ন্‌হল্‌ম্ ও বোলেত্ দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে দর্শন দিলেন)।

বোলেত্—(তাঁহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া) ঐ দেখুন—

আর্ন্‌হল্‌ম্—(অনুচ্চ স্বরে) চুপ। ওঁরা চলে যান, তারপর।

বোলেত্—গত ক'দিন যাবৎ এঁদের মধ্যে যেন কি-একটা ঘনিয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করেছেন?

আর্ন্‌হল্‌ম্—তুমি কিছু দেখেছো?

বোলেত্—দেখিনি আবার!

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কি—রকমারি কিছু ?

বোলেত্‌—এটা-ওটা-সেটা। আপনি দেখেননি বুঝি ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—নাঃ, এমন তো কিছু দেখ্‌লুম না।

বোলেত্‌—দেখেছেন নিশ্চয়। শুধু বল্‌ছেন না। বুঝেছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—আমার মনের কথা বলি, তোমার সৎমা যদি ভ্রমণে বেরোন্‌ তাহলে তাঁর পক্ষে খুব ভালো হয়।

বোলেত্‌—বটে ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—শুধু তা-ই নয়। উনি মধ্যে-মধ্যে অন্যত্র বেড়াতে গেলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল।

বোলেত্‌—কাল স্কিওল্‌ভাইকেনে যাবার মানে কিন্তু এ-ই শেষ ;—আর এখানে আস্‌বেন না।

আর্ন্‌হল্‌ম—কিসে জান্‌লে ?

বোলেত্‌—আমি নিঃসংশয়। সবুর করুন না। নিজেই দেখ্‌তে পাবেন। আর আস্‌বেন না ;—অন্তত যদ্দিন্‌ আমি ও হিল্ডে এ-বাড়ীতে থাক্‌বো।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—হিল্ডের সঙ্গে কিসের যোগ ?

বোলেত্‌—তা বটে। হিল্ডের বিশেষ এসে যাবে না। ও ছেলেমানুষ। কিন্তু এ-ও জানি যে, হিল্ডে তলে-তলে ওঁকে খুব মমতা করে। অবিশ্যি আমার কথা আলাদা। দেখুন না, উনি তো সৎমা ; কিন্তু তাঁতে-আমাতে বয়সের তফাৎ কতোটুকু !

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বোলেত্‌ ! তোমার স্থানান্তরিত হবার দিন যা-হোক্‌ কাছিয়ে এলো।

বোলেত্‌—(উৎসুক) কী ? বাবাকে বলেছিলেন ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—হাঁ, বলেছিলুম।

বোলেত্‌—বাবা কি বল্লেন ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—হুঁ, তিনি এখন অন্যান্য বিষয় নিয়ে বড্ড উদ্ব্যস্ত হয়ে আছেন।

বোলেত্‌—জানি, জানি। ব্যাপারটা কদ্দুর গড়াতে পারে সে আমি আগেই আন্দাজ করেছি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—তবে আমি এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে, তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করা তোমার সমীচীন হবে না।

বোলেত্‌—কী ?

আন্‌হল্‌ম্‌—তিনি নিজের অবস্থা তন্ন-তন্ন করে দেখালেন, এ হতেই পারে না। তাঁর পক্ষ থেকে কিচ্ছু করা অসম্ভব।

বোলেত্‌—(ভৎর্সনার সুরে) আর আপনি এলেন তাতে ঠাট্টা-মস্করা কর্‌তে ? আপনার-ও যে খুব দরদ দেখ্‌ছি !

আন্‌হল্‌ম্‌—ভুল করোনা, বোলেত্‌। তোমায় বল্‌তে এলুম যে, যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর কর্‌ছে একমাত্র তোমারই ওপর।

বোলেত্‌—কি নির্ভর কর্‌ছে আমার ওপর ?

আন্‌হল্‌ম্‌—মানে, সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করার যা-কিছু ; সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যা-যা শেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব, যা-যা করার জন্যে তুমি ঘরে থেকে আইঢাই কর্‌ছো—এ-সমস্তই নিষ্পন্ন করা এখন তোমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ।

বোলেত্‌—(হস্তদ্বয় একত্র সংবদ্ধ করিয়া) হায় বিধি ! একি সম্ভব ? বাবা যদি অসমর্থ হন অনিচ্ছুক হন, তবে সংসারে আমার আর কে আছে, যার মুখ চেয়ে—

আন্‌হল্‌ম্‌—তোমার পুরোণো টিচারের কাছ থেকে যদি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে গররাজী না হও—

বোলেত্‌—মিঃ আন্‌হল্‌ম্‌ ! আপনি—আপনি কি অসহায়ের—

আন্‌হল্‌ম্‌—সহায় হবো বৈকি। কায়মনোবাক্যে তোমার কল্যাণ কর্‌বো। আমায় বিশ্বাস করো না, লক্ষ্মীটি নেবে তুমি সাহায্য ? বলো—নেবে ?

বোলেত্‌—না নিয়ে যাই কোথা ! আমার যে দুনিয়া দেখার সাধ, বেরিয়ে পড়ার সাধ, যাহোক্‌-একটা কাজ সম্পূর্ণ শিখে নেবো কল্পনা করেছি।—সব মিলিয়ে আমার মস্ত আকাশ-কুসুম স্বপ্ন রচনা হয়েছে !

আন্‌হল্‌ম্‌—তুমি ইচ্ছে কর্‌লেই এখন স্বপ্ন সত্য হয়।

বোলেত্‌—আপনার অনুগ্রহে এই অপূর্ব্ব সুখের অধিকারিণী হতে পারি ? বেশ বলুন তো, একজন অনাত্মীয়ের কাছ থেকে এম্‌নিতরো দান নেওয়ায় দোষ নেই ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বোলেত্‌, আমার কাছ থেকে নেওয়ায় কী দোষ ? আমার কাছে তুমি সব-কিছু চাইতে পারো।

বোলেত্‌—(তাঁহার হস্তধারণ করিয়া) আমারো তাই মনে জাগ্‌ছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যদিও, কি-সর্ত্তে—। যাক্‌ (সোচ্ছ্বাসে) ও ! খুশীর চোটে হাস্‌বো না কাঁদ্‌বো, ঠাওরাতে পাচ্ছিনে।…অতঃপর লাইফের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে। আমি তো জেনে রেখেছিলুম, আমার জীবন শুধু-শুধুই কেটে যাবে।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—মিছে ভয় তোমার, বোলেত্‌। একটা কথা তোমার কাছে খোলসা করে জান্‌তে চাই,—এখানে কোনো বন্ধন তোমার নেই ?

বোলেত্‌—বন্ধন ?—কই না।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কিচ্ছু না ?

বোলেত্‌—না, একটাও না। খালি বাবার সঙ্গে যা-একটু;—আর হিল্ডে। তবে—

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বাবাকে তো আজ না-হয় কাল ছেড়ে যেতেই হবে। আর হিল্ডে ? তাকেও আপনার জীবনের পথে ঘর-ছাড়া হতে হবে—ছু'দিন আগে না-হয় ছু'দিন বাদে। বস্তুত তোমার আট্‌কা-পড়ার কিছু নেই, বোলেত্‌। কোনো বন্ধু-টন্ধু ?

বোলেত্‌—কেউ না। এদিক্‌ দেখলে যে-কোনো মুহূর্ত্তে খালাস।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—তাই-যদি হয়, তবে আমার সঙ্গে চলো, বোলেত্‌ !

বোলেত্‌—আ ! ভাব্‌তেই এতো আনন্দ !

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো, বোলেত্‌ ?

বোলেত্‌—একশোবার করি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—নিজেকে যুদ্ধ নিজের ভবিষ্যৎ-কে আমার হাতে নিঃশঙ্ক ভাবে তুলে দিতে তোমার সাহস টল্‌বে না ? সত্যি বল্‌ছো ?—সাহস আছে ?

বোলেত্‌—নিশ্চয়। অন্যথা কেন হবে, বলুন দেখি ? আপনি আমার ওল্ড টিচার্‌—মানে একদিন আমার মাষ্টার ছিলেন তো ?

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—সেজন্যে নয়। ও-কথা ছেড়ে দাও……বোলেত্‌ ! তুমি বন্ধনহীনা, কোনো দেনা-পাওনার দায় তোমার নেই। সুতরাং আমার সঙ্গে তোমার যোগ-সূত্র স্থাপিত হলে কেমন হয় ?

বোলেত্—(সন্ত্রস্ত ভাবে পশ্চাৎ হটিয়া) এ আপনি কী বল্‌ছেন ?

আর্ন্‌হল্‌ম্—দিব্যি দিয়ে বল্‌ছি বোলেত্ !—তুমি আমার পত্নীত্ব গ্রহণ কর্‌বে ?

বোলেত্—(অর্দ্ধ-স্বগত) না-না-না, অসম্ভব ! একি হয় ?

আর্ন্‌হল্‌ম্—অসম্ভব বটে, একটি কারণে—

বোলেত্—এই যা বল্লেন, তা নিশ্চয়ই আপনার অন্তরের কথা নয়, মিঃ আর্ন্‌হল্‌ম্। (তাকাইয়া) যখন আমার ভার নেবেন বল্‌ছিলেন, তখনো আপনার মনে এই একই অভিপ্রায় ছিলো ?

আর্ন্‌হল্‌ম্—বোলেত্ ! কথাটা বল্‌তে দাও। অতো চম্‌কে ওঠার কি আছে ?

বোলেত্—উঃ ! আপনার কাছে এমন কথা শুন্‌তে হবে—কি-করে যে—চম্‌কে উঠ্‌বো না ?

আর্ন্‌হল্‌ম্ —মাপ চাইছি। অবিশ্যি তুমি জানো না, তোমায় বলিনি—এতোটা এসেছি শুধু তোমারি জন্যে।

বোলেত্—আপনি এসেছেন এখানে আমার জন্যে ?

আর্ন্‌হল্‌ম্—হাঁ, বোলেত্। গত বসন্তে একখানা চিঠি তোমার বাবার কাছ থেকে পেলুম। ওতে দু'চার্ লাইন্ লেখা আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লে ;—তুমি নাকি তোমার টিচার-কে বন্ধুর চেয়েও অন্তরঙ্গ দয়িত বলে মনে করে রেখেছো ?

বোলেত্—বাবা এম্‌নিতরো কথা লিখ্‌লেন ?

আর্ন্‌হল্‌ম্—তাঁর লেখার তাৎপর্য্য তা ছিলো না। আমিই মন-গড়া ভেবে নিলুম যে, এক পূর্ণ-যৌবনা নারী আমার প্রতীক্ষায় দিন গুন্‌ছে—। রসো বোলেত্, কথাটা শেষ করেনি। তুমিই বলো ঃ যদি কেউ—যে সদ্য-যুবক মাত্র নয়, আমারি বয়সী, এম্‌নি একটা বিশ্বাস বা কল্পনা ক'রে বসে, তখন তার মনে কী বিষম ছাপ পড়ে ! আমার হৃদয়-পুরে তোমার উদ্দেশে জাগ্রত শ্রদ্ধানুরাগ ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠ্‌লো। ভাব্‌লুম, তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌তেই হবে, তোমাকে বল্‌তেই হবে—তুমি আমার প্রতি যে মনোভাব পোষণ কর্‌ছো, তাতে আমারো একটা অংশ আছে।—কিন্তু এ-সবই অলীক কল্পনা।

বোলেত্—বুঝেছেন যে, আসলে তা নয় ? ভুল আপনারই হয়েছে ?

আর্ন্‌হলম্‌—যা হয়েছে তার তো আর চারা নেই, বোলেত্‌।—আমার হৃদয়ে তোমার ভাবচ্ছবি চিরকাল রাঙা হয়েই থাকবে। আর এই ভুল-ভাঙার স্মৃতিটি-ও তাতে যাবে জড়িয়ে। বুঝ্‌তে পাচ্ছো কি ?—এই হবে।

বোলেত্‌—এমন হবে, আমি কখনো ভাব্‌তে পারিনি।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—অসম্ভব-ও সম্ভব হয়, তার তো প্রমাণ পেলে। এখন তবে কি করতে চাও ? বোলেত্‌ ! মন স্থির করে একবারটি ভেবে দেখো, আমার পত্নী হতে পার্‌বে না ?

বোলেত্‌—এ যে অভাবনীয়, মিঃ আর্ন্‌হল্‌ম্‌ ! আপনি আমার টিচার ছিলেন যে ! আপনার সঙ্গে অন্যতর সম্পর্ক কল্পনায়-ও আনা দুষ্কর।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—বেশ, না পারো—থাক্‌। আমাদের আগের সম্বন্ধই বজায় রইলো, বোলেত্‌।

বোলেত্‌—অর্থাৎ ?

আর্ন্‌হলম্‌—অবিশ্যি, আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবোই। যাতে তুমি ঘরোয়া জীবনের বাইরে সংসারের অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শিক্ষিতব্য বিষয়-ও আয়ত্ত করতে পারো, নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারো—সেজন্যে ভার আমি নিলুম, বোলেত্‌। ভবিষ্যতে তোমার ভরণ-পোষণের ভার-ও আমি নিচ্ছি। আমাকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী চিরসঙ্গী বিশ্বস্ত সুহৃদ্‌ বলেই জেনো। এ-প্রতিশ্রুতি আমার সার্থক করবোই।

বোলেত্‌—হায় কপাল ! এখন এ-পথও বন্ধ, মিঃ আর্ন্‌হল্‌ম্‌।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—কেন ? এতে-ও দোষ।

বোলেত্‌—সে কি আপনি বোঝেন না ? আপনার আগেকার উপরোধের পর আমি যা উত্তর দিলুম, তারপরেও বোঝাতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, আপনার শেষের প্রস্তাব-ও গ্রহণ করা আমার অসাধ্য। আপনার কাছে আর কিছুই আমি চাইতে পারবো না। এই ঘটনায় দু'পক্ষের আদান-প্রদান একেবারে খতম হয়ে গেলো।

আর্ন্‌হল্‌ম্‌—শেষে ঘরেই থাকা স্থির করলে ? লাইফ্‌-কে এম্‌নি খোয়া যেতে দেবে ?

বোলেত্—ও ! ভাব্তেই মন দুঃখে বিষিয়ে ওঠে।

আর্নহল্ম্—বিশ্ব-জীবনের আস্বাদ অল্প পেয়েই বৈরাগিনী হবে ? অন্তর তোমার যার জন্যে বুভুক্ষিত, তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা না করে হেলায় হারাবে ? ভূমার বার্ত্তা তোমার কাছে এলো—তাকে অনুভূতির মধ্যে অভিনন্দন করে নিতে ইচ্ছে জাগে না ? বোলেত্, এখনো ভেবে দেখো !

বোলেত্—হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছেন, মিঃ আর্নহল্ম্।

আর্নহল্ম্—তারপর,—পিতা-ও কিছু চিরকাল থাক্বেন না। তখন হয়তো নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবনের সঙ্গে একা লড়াই কর্তে হবে। অথবা হয়তো কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষের হাতে আত্ম-সমর্পণও কর্তে হতে পারে !

বোলেত্—বেবাক্ সত্য কথা। কিন্তু কি করি ? তাই মনে হচ্ছে—

আর্নহল্ম্—(উন্মুখ) কী !

বোলেত্—(দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তাকাইয়া) সব দিক্ দিয়ে বিচার কর্লে বোধ হয় মেনে নেওয়াই উচিত।

আর্নহল্ম্—কী, বোলেত্ ?

বোলেত্—বল্ছিলুম, আপনার প্রস্তাবটিতে মত দেওয়াই সমীচীন।

আর্নহল্ম্—রাজী ? আমায় সর্ব্বাবস্থায় তোমার চির-সহচর সুহৃদ্ হবার সুকৃতি দান কর্লে ! বন্ধু বলে মেনে নিলে ?

বোলেত্—না-না, বন্ধুর কথা হচ্ছে না। তা কি আর হতে পারে ? তার চেয়ে বরং আমাকে গ্রহণ করুন।

আর্নহল্ম্—বোলেত্ ! অবশেষে—

বোলেত্—হাঁ, তা-ই।

আর্নহল্ম্—তুমি আমার স্ত্রী হবে ?

বোলেত্—যদি গ্রহণ কর্তে আপত্তি না থাকে—তবে।

আর্নহল্ম্—আপত্তি ! (হস্ত ধারণ করিয়া) অজস্র সাধুবাদ দিচ্ছি, বোলেত্। তুমি সংশয়ের কথা যা-সব তুলেছো তাতে আমার ভড়্কাবার কিছু নেই। এখনো যদিও তোমার হৃদয়ের সবখানি যায়গা জুড়ে আসন পাইনি, একদিন আমি জয় করে নেবো, বোলেত্ ! দেখ্বে, কায়মনোবাক্যে নিজেকে তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নিযুক্ত করেছি।

বোলেত্—আর জগতের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় করে নিতে আমার অন্তরায়ও থাক্‌বে না ? বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পাবো ?—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ?

আন্‌হল্‌ম্—দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি না ; প্রতিশ্রুতি পালন কর্‌বো।

বোলেত্—যা-যা শিখ্‌তে চাই, সব শিখ্‌তে পাবো ?

আন্‌হল্‌ম্—আমি নিজেই হবো তোমার মাষ্টার, বোলেত্—ঠিক আগের মতো ? ইস্কুলের শেষের বছরটা মনে পড়ে ?

বোলেত্—(শান্ত ও আন্‌মনা) নিজেকে জান্‌বো স্বাধীন বলে, ভাব্‌বো স্বাধীন বলে, অচেনা বিশ্বে পাবো ছুটি ! ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে রেহাই মিল্‌বে। ছাইপাঁশ জীবিকার চেষ্টা বল্‌তে কিছু থাক্‌বে না।

আন্‌হল্‌ম্—না, এসব ঝঞ্ঝাট তুমি এতটুকুও পাবে না। ডীয়ার ! বেশ একরকম সুব্যবস্থা—নয় ?

বোলেত্—বেশ ব্যবস্থা—সত্যি।

আন্‌হল্‌ম্—(তাঁহাকে বাহুবদ্ধ করিয়া) বোলেত্ ! দেখ্‌বে, অনায়াসে দু'টিতে আমরা নীড় বেঁধে নির্ব্বিঘ্নে নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের দিনগুলিকে অবন্ধ্যা ক'রে তুল্‌বো।

বোলেত্—বেশ লাগ্‌ছে। মনে হচ্ছে পার্‌বো, প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব হবে না। (ডান দিকে চাহিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া আপনাকে বাহুমুক্ত করিলেন) এ সম্বন্ধে কোনো কথা যেন না হয়।

আন্‌হল্‌ম্—কী হলো ডীয়ার ?

বোলেত্—ঐ বেচারী (অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ-ক্রমে) ; চেয়ে দেখো না।

আন্‌হল্‌ম্—কে ?—তোমার বাবা ?

বোলেত্—না, সেই তরুণ ভাস্কর। হিল্ডের সঙ্গে বেড়াচ্ছে।

আন্‌হল্‌ম্—ও ! লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্ ! কেন ওর কি হয়েছে ?

বোলেত্—জানো তো, ও কতো দুর্ব্বল, কতো অক্ষম !

আন্‌হল্‌ম্—স্রেফ্ কল্পনা যতো !

বোলেত্—না-না, কল্পনা নয়। সাচ্চা কথা। ওর দিন ফুরিয়ে এলো। তবে এই তার পক্ষে ঢের।

আর্নহল্‌ম্‌—ডীয়ার, এই ঢের কেন ?

বোলেত্‌—কেননা আর যাই হোক্‌ তার আর্টের দফা রফা। চলো, ওদের আসার আগে সরে পড়ি।

আর্নহল্‌ম্‌—চলো ডীয়ার।

(হিল্ডে এবং লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌ দীর্ঘিকার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

হিল্ডে—সাবাস ! বলি মশাইরা, একটু দাঁড়াবেন না ?

আর্নহল্‌ম্‌—আমাদের একটু এগিয়ে যেতে হবে। (বোলেত্‌-কে লইয়া বাম দিকে বাহির হইয়া গেলেন।)

(গম্ভীর ভাবে হাসিয়া) একেবারে দহরম মহরম লেগে গেছে। সবাই জোড়ায়-জোড়ায় টহল দিচ্ছেন—দু'টি আর দু'টি !!

হিল্ডে—(তাকাইয়া) আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, ও বোলেতের কাছে প্রপোজ্‌ কর্‌ছে।

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌—বটে ? চোর বমাল ধরা পড়েছে ?

হিল্ডে—না পড়ে যায় কোথায় ? চোখের মাথা তো খাইনি ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্‌—কিন্তু মিস্‌ বোলেত্‌ ওকে গ্রহণ কর্‌বেন না,—বলে দিচ্ছি।

হিল্ডে—দিদি বলে যে, ওঁকে কেমন যেন জবুথবু বুড়ো-মতন দেখায়। তাছাড়া অচিরেই ওঁকে টেকো বল্‌তে হবে।

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌—শুধু তাই নয়। গ্রহণ না করার অন্য কারণও আছে।

হিল্ডে—তুমি এর কি জানো ?

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌—উনিই কথা দিয়েছেন একজনকে, স্মৃতিতে তার অনুধ্যান কর্‌বেন।

হিল্ডে—কেবল অনুধ্যান ?

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড—হাঁ, অবর্ত্তমানে তাকে স্মরণ কর্‌বেন।

হিল্ডে—ও ! তোমাকেই বুঝি ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্‌—দোষ কি ?

হিল্ডে—তাই প্রতিজ্ঞা করেছে ?

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌—হাঁ। খবরদার কিন্তু। ওঁকে ঘুণাক্ষরেও বুঝ্‌তে দিও না যে, তুমি কিছু জানো।

হিল্ডে—একটা কথাও বল্‌বো না। এর বিন্দু-বিসর্গও কেউ জান্‌তে পাবে না।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—একি তাঁর কম অনুগ্রহ, মনে করো ?

হিল্ডে—তারপর বাড়ী ফিরেই বাগ্‌দান ক'রে বুঝি তাঁকে বিয়ে করবে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—না, ফস্ করে তেমন কিছু করা ভালো নয়। প্রথম ক'বছর তো বিয়ের কথা উঠ্‌তেই পারে না। পরে আমি সঞ্চয়-ক্ষম হতে-হতে আবার সে-ও অনেকটা আইবুড়ো—বিয়ের অযোগ্যা হয়ে পড়্‌বে। নয় কি ?

হিল্ডে—তবু তুমি চাও, ও তোমার স্মৃতি-পূজো করে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—চাই-ই তো। এতে যে আমার অনেক কাজ হাঁসিল হয়। দেখো, আমি হলুম আর্টিষ্ট্। আর ও ?—জনৈকা উপজীবিকা-হীনা যে-কে-সে বৈ তো নয় ? অথচ, এ-করায় ওঁর ক্ষতি কিছুই নেই। তবু বল্‌তেই হবে, এ তাঁর অনুগ্রহ।

হিল্ডে—তুমি কি মনে করো, বোলেত্ এখানে তোমার স্মৃতির ধ্যান করছে জেনে তোমার কাজের তোড় বেড়ে যাবে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—মন যে তাই বলে। পৃথিবীর এক কোণে বসে একটি ধীরা স্থিরা তরুণী নারী-নিভৃতে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন-রচনা করছে, এ ভাব্‌তেই একদম —মানে, কী যে বল্‌বো, কথাই খুঁজে পাচ্ছিনে—

হিল্ডে—প্রাণ মেতে ওঠে, এইতো ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—প্রাণ মেতে ওঠে ! ঠিক ঠিক।—আমিও তাই বল্‌তে যাচ্ছিলুম। (মুহূর্ত্তকাল স্থির-দৃষ্টিতে তাকাইয়া) তোমার বেড়ে বুদ্ধি, মিস্ হিল্ডে। সত্যি, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়।…আমি যখন বাড়ী ফিরে আস্‌বো তখন তুমি তোমার এখনকার দিদির বয়সী হবে, অনেকটা তাঁর মতোই দেখাবে। হয়তো তোমার মন-ও তাঁরি মনের মতন হবে। বুঝি তখন একাধারে তোমার ও তাঁর একটা সংমিশ্রণ দেখ্‌তে পাবো।

হিল্ডে—তোমার তা ভাল লাগ্‌বে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—কি করে বলি ? তবে মনে হয়, লাগ্‌বে। সে যাই হোক্, এখন এই সামার্‌টা তুমি যেমনটি আছো তা-ই আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে। এ-ই বেশ !

হিল্ডে—যা আছি, তাতেই তোমার পছন্দ ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—হাঁ গো, তুমি যে আমার দেখন-হাসি।

হিল্ডে—হুঁ।—আচ্ছা, তুমি তো আর্টিষ্ট্। বলো দিকিন, যদি সব ঋতুতেই আমি চিত্র-বিচিত্র গ্রীষ্ম-পরিচ্ছদ পরি তাহ'লে কেমন দেখায়?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—দিব্যি দেখায়!

হিল্ডে—চক্‌চকে রঙ্ আমাকে মানায় বল্‌ছো?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—সুন্দর মানায়। আমারো তা-ই পছন্দ।

হিল্ডে—আচ্ছা, আর্টিষ্টের চোখে চেয়ে বলো দিকিন্, কালো পোষাক আমাকে মানাবে কেমন?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—কালো?

হিল্ডে—হাঁ, আস্ত কালো পর্‌লে দেখ্‌তে কি-রকমটি হবে?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—কালো পোষাক সামারে বেমানান্ নয় কি? তবে তোমার চেহারায় ভালোই দেখাবে।

হিল্ডে—(সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া) একেবারে গলা ইস্তক্ কালো—চুনট্ করা গলা। কালো হাত-মোজা। আর পেছন দিকে বেশ নীচু অব্‌ধি ঝুল্‌বে একটা কালো ঘোমটা।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—আমি রূপদক্ষ হলে ঐ পোষাকে তোমায় আঁক্‌তুম মিস্ হিল্ডে—যেন একজন পতিহীনা শোকাতুরা সুন্দরী তরুণী।

হিল্ডে—অথবা যেন অনূঢ়া তরুণী—দত্তা শোক-বিহ্বলা।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—বাঃ, এ আরো চমৎকার! কিন্তু তোমার ঐ-বেশ পর্‌তে সাধ যাবে কেন?

হিল্ডে—তা জানিনে। তবে বড্ড চিত্তাকর্ষক!

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—বটে?

হিল্ডে—হাঁ গো, প্রাণটা আন্‌চান্ ক'রে ওঠে! (সহসা বামদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া) দেখো, দেখো—ঐ!

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—(তাকাইয়া) ও! ইংরেজ জাহাজ। একেবারে Pier-এ ভিড়্‌লো এসে। (বাঙ্গেল্ ও এলীডা পুষ্করিণীর সীমা অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন)।

বাঙ্গেল্—না, এলীডা, সত্যি সত্যি বল্‌ছি—এ তোমার ভুল। (অন্যদের দেখিয়া) কী, তোমরা দু'টিতে এখানে?......এখনো দেখা যাচ্ছে না—না, মিঃ লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্?

লিঙ্‌স্ট্রাণ্ড্‌—কী, জাহাজ ?

বাঙ্গেল্‌—হাঁ ?

লিঙ্‌স্ট্রাণ্ড্‌—(দেখাইয়া) ঐ যে কবে এসে গেছে, ডাক্তার।

এলীডা—আমি আগেই জান্‌তুম্‌।

বাঙ্গেল্‌—এসে গেছে !

লিঙ্‌স্ট্রাণ্ড্‌—রাত্তিরে এসেছে ;—যাকে বলে, চোরের মতো নীরবে নিঃশব্দে।

বাঙ্গেল্‌—হিল্ডেকে তুমি Pier-এ নিয়ে যাও দেখি। দেরী করো না। শুন্‌লে ? ওকে বাজ্‌নাটা শুনিয়ে নিয়ে এসো।

লিঙ্‌স্ট্রাণ্ড্‌—ওখানেই যাচ্ছিলুম আমরা।

বাঙ্গেল্‌—আমরাও এলুম বলে।

হিল্ডে—(ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া) এঁরাও দু'টিতে টহল দিচ্ছেন, বুঝ্‌লে ?

(হিল্ডে ও লিঙ্‌স্ট্রাণ্ড্‌ উদ্যানের ভিতর দিয়া বহির্গত হইয়া গেলেন। নিম্নোক্ত কথোপকথনের সময় সুদূর ফিওর্ড্‌ হইতে ঐক্যতানে রেশ ভাসিয়া আসিতেছে।)

এলীডা—ওগো, ঐ দেখছো ! ঠিক ধরে নিয়েছি।

বাঙ্গেল্‌—এলীডা, তুমি বরং ঘরে যাও। আমিই একলা এর সঙ্গে কথা বলি।

এলীডা—তা হয় না। অসম্ভব ! (চীৎকার) বাঙ্গেল্‌ ! দেখছো ?

(বামদিকে পরদেশীর প্রবেশ। কিছুক্ষণ বেড়ার বাহিরে রাস্তায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইব্‌সেনের The Lady from the Sea হইতে অনূদিত।

ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

প্রাচীন পুস্তকের শ্লোক উদ্ধৃতি দ্বারা আমরা আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক সঠিক সংবাদ জানিতে পারি না। উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ মূল জাতিগত না হইয়া বরং উহাতে ধর্ম্মগত ছিল বলিয়া মনে প্রতীত হয়। সীমার বলেন, (১) এই উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সম্বন্ধে যে, ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন উহা কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সব জাতির লোকেরা আর্য্য দেবতাদের কোন পূজা প্রদান করে না, কোন ফুটন্ত পানীয় দেবতাদিগকে প্রদান করে না (৩৷৫৩৷১৪)। ঋক্‌বেদে কিকট (২) জাতিকে এইজন্যই গালাগালি করা হইয়াছে। দস্যু এবং পণিদিগকেও এই প্রকার (ঋক ৭৷৬৷৩) গালাগালি করা হইয়াছে। ঋকবেদে (১৷৫১৷৩৭) স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—আর্য্য ও দস্যুকে বিভাগ (পৃথক) করিয়া দাও, নিষ্ঠাবান

১। Zimmer—p. 115.

২। নিরুক্তকার যাস্ক কীকটদের সম্পর্কে বলিয়াছেন—"কীকটা নাম দেশো অনার্য্য নিবাসঃ" (৬৷৩২)। এই প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যে 'অনার্য্য' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মগধের প্রাচীন নাম 'কীকট' ছিল বলিয়া অনুমান করেন কিন্তু এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। ওয়েবার যাস্কের এই 'অনার্য্য' শব্দ অদীক্ষিত অর্থে বুঝিয়াছেন। (Ind. Stud, 1, 18[illegible])। তিনি অনুমান করেন যে ইহা দ্বারা 'অব্রাহ্মণ্য' ধর্ম্মবাদীদের (heretic) বুঝায়। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে যাস্ক জন্ম গ্রহণ করেন। প্রায় সেই সময়েই বুদ্ধদেব মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই অব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধদিগকেই কি অনার্য্য বলা হইয়াছে? কেহ কেহ আবার কীকটদের আর্য্য বৌদ্ধ বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'অনার্য্য' ও আর্য্যের কলহ ধর্ম্ম নিয়াই হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা সংস্কৃতির বিভিন্নতাই সূচিত হয়।

(বর্হিসমস্ত) থেকে তফাৎ করে দাও, দেবতাহীনদিগকে (অব্রত) শাস্তির জন্য পরাজিত কর।

এই দেবতাহীনদের ধর্ম্ম কি ছিল, তাহার কোন বিবরণ বেদ গায়কেরা লিপিবদ্ধ করেন নাই। কেবল দুইটি যায়গায় 'শিশ্নদেবাঃ' (৭।২১।৫ ; ১০।৯৯।৩) কথা পাওয়া যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিত রথ (৩) ইহার অর্থ করিয়াছেন ;—

"লেজবিশিষ্ট দেবতা !" কিন্তু সায়নাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—"কামুক।" আবার জার্ম্মান মনীষী লুড্‌ভিগ (৪) এই শব্দকে বহুব্রীহি সমাস ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন—লিঙ্গোপাসকগণ (phallus worshippers)। যদি এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু সংবাদ অবগত হওয়া যায়। ঋকবেদ বলিতেছে—লিঙ্গ উপাসকগণ (শিশ্নদেবা) আমাদের পবিত্র স্থলে (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে) ঢুকিতে পারিবে না" (৭।২১।৫), "সে যুদ্ধে গমন করিল···জয় অনিবার্য্য, আলোক জয় করিয়া সে (ইন্দ্র) তাহার শত্রুদের বেষ্টন করিল, যখন সে শিশ্নোদেবদের মারিবে তখন যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবে···(১০।৯৯।৩)······। লাসেন বলেন (৫) এই শিশ্নোদেবগণ শিবপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট ; কারণ শিবকে লিঙ্গমূর্ত্তিতে পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতিতে দস্যু বা দানবদের সকলকেই শিবভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৬)। পক্ষান্তরে মহেন-জো-দাড়োর সভ্যতা আবিষ্কৃত হইবার পর দেখা যায় যে লিঙ্গপূজা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এমতাবস্থায় আমরা শিশ্নোপূজক দস্যু ও দাসদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিব ?

এই প্রসঙ্গে সিন্ধু উপত্যকায় উদ্ঘাটিত মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার সম্বন্ধে পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক মার্শাল বলেন—উক্ত

৩। Roth—Erlaeut. Zur Nirukta—p 47.

৪। Ludwig—Nachrichten—p. 50.

৫। Lassen—Part II. p. 924.

৬। Marshall—The Indus Valley Civilisation

দুই স্থানে একই প্রকারের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহার সিন্ধু (Indus) নামকরণ করার কারণ—এই নদ ও তাহার শাখা প্রশাখার দ্বারা বেষ্টিত মধ্যবর্ত্তী দেশের সহিত এই নবাবিষ্কৃত সভ্যতা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট (জড়িত)। এই সভ্যতা সিন্ধুপ্রদেশ ও পঞ্জাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্বে সিমলা পাহাড়ের নিম্নে শতদ্রু নদীর তীরেও ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতা একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টীয় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন মহেন-জো দাড়ো এবং হরপ্পা সভ্যতার ও সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহিত ছিল, তখন ইহাদের সহিত পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার ঘনিষ্ঠ, সুনিবিড় যোগাযোগ ও আদান প্রদান ছিল।" এই মহেন-জো-দড়ো সহরের বয়স মার্শাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ এবং ২৭৫০ বৎসরের মধ্যে হইবে বলিয়া মোটামুটি আন্দাজ করেন (৮)।

এই সহরের ভগ্নস্তূপ সমূহের মধ্যে যে সমস্ত নরকঙ্কাল ও নরকরোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নরতত্ত্ববিদ্ সেওয়েল ও ডাঃ বি. এস. গুহ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহারা (৯) চারি প্রকার শারীরিক লক্ষণ বিশিষ্ট মূলজাতির অস্তিত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। যথা :—(১) প্রটো-অষ্ট্রোলয়ড (৯ক)

৭। Sir John Marshall—Mahenjo Daro and the Indus Civilization—p. 92.

৮। Sir John Marshall—Mahenjo—Daro and the Indus Civilisation p. 102.

৯। ইঁহাদের পরীক্ষার ফলের উপর আবার কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন। Mr. Atul Sur in "Indian Culture," vol. III, 1933 এবং D. Mackay—"Mohenjo—Daro and Ancient Civilisation in the Indus Valley" in Annual Reports of the Smithsonion Inst., 1932 দ্রষ্টব্য।

৯ক। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ডাঃ গুহ তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন ককেসীয় জাতীয় করোটী (Caucasian Megalith)। ইহা Megalith কৃষ্টিগত জাতির অন্তর্গত লোক। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই Elliot Smith বলিয়াছেন যে উত্তর আফ্রিকা হইতে 'মেগালিথ' কৃষ্টির লোকেরা পশ্চিম এসিয়ার মধ্য দিয়া সিন্ধু প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মত—এই প্রভাব মধ্য এশিয়া হইতে উত্তর ভারতেও আর একটি ধারায় আসে। (Vide (1) The Ancient Egyptians and their Influence upon the Civilisation of Europe—Elliot Smith : pp 1[illegible]6. (2) Elliot Smith—Diffusion of Culture.)

(২) মেডিটেরনীয়ান (৩) আলপিন মূল জাতির মঙ্গোলীয় শাখা * (৪) আলপিন। পাঞ্জাবের হরপ্পায় প্রাপ্ত নর-করোটিগুলিও বিভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট। সেওয়েলের মতে এইগুলি আলপিন মূল জাতির আরমেনীয় ন্যায় (armenoid) জাতীয় শাখার অন্তর্গত। এখানে (হরপ্পায়) একটি নরকরোটি পাওয়া গিয়াছে যাহা অন্য মূলজাতীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।

এই সকল নর-কঙ্কাল পরীক্ষান্তে মার্শাল বলেন—"যতদূর ইতিহাস অনুসরণ করা যায় তাহা হইতে মনে হয় সিন্ধু ও পঞ্জাবের অধিবাসিগণ নানা জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময়েও তাহার অন্যথা হয় নাই (১০)। ইহা হইতে দেখা যায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষিদের পবিত্র দেবভূমি 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' (বর্ত্তমান 'আম্বালা' জেলা) বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ স্থল ছিল। সে সময়কার যে সকল নর-করোটি পরীক্ষা করা হইয়াছে নরতত্ত্ববিদগণ তাহাতে 'নর্ডিক' জাতির বা রিজলিকর্ত্তৃক বর্ণিত 'ইণ্ডো-আর্য্যে'র সন্ধান পান নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে—সিন্ধু সভ্যতার জাতির সহিত বৈদিক আর্য্যদের কি সম্বন্ধ? সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করিয়া মার্শাল বলিয়াছেন যে 'উভয় সভ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই।' তিনি খুব জোরের সহিত বলেন যে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষগুলি দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে খৃঃ পূঃ চার হাজার ও তিন হাজার বৎসর সময়ের মধ্যে তাহারা উচ্চ ও উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন ছিল। ইহাতে ইণ্ডো আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কোন চিহ্ন নাই।(১১) তবে তিনি উপসংহারে বলেন—খ্রীঃ পূঃ দুই হাজার বৎসরের মধ্য ভাগে 'ইণ্ডো আর্য্যগণ' যে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল মহেঞ্জো দাড়ো ও

* এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ প্রমাণাভাব। উপরোক্ত নরতত্ত্ববিদ্দের মতে ইহা একটি Probability মাত্র। এই বিষয়ে Dr. B N. Datta—Races of India, Cal, Univ. Journal of the Dept. of Letters, vol XXV দ্রষ্টব্য।

১০। Marshall—Mahenjo—Daro and Indus Valley Civilisation—p. 109.

১১। Marshall—Mahenjo-Daro and the Indus Valley Civilisation p. 122.

হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এই প্রচলিত মতের প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব করে না। কিন্তু বেদে আর্য্য পূর্ব্ব জাতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে আমার এইরূপ মনে হয় যে সিন্ধু-সভ্যতা সেই সময়ে পূর্ব্বরূপেরই ছায়ার ন্যায় হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে সিন্ধু সভ্যতার অনেক জিনিষই বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় (১৩)। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার মৃতদেহ সৎকার করার প্রথা বৈদিক ব্যবস্থার সহিত বেশ মিলে (১৪)। বৈদিক আর্য্যদিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ধারণা অর্দ্ধ শতাব্দীর ও অধিককাল যাবৎ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, উহার সহিত কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মার্শাল এইরূপ কথা বলিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং গোঁজা-মিল দেওয়া কথা বলিয়া মনে হয়। বেদের আর্য্যদিগের শত্রুগণ এবং সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা যে এক ও অভিন্ন—একথার প্রমাণ তিনি কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত তদানীন্তন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় একটি জাতিকে যাযাবর অর্দ্ধ-সভ্য অর্দ্ধ-চাষী ও পশুপালক একটি জাতির দ্বারা বিলোপ সাধন করা হইল। যে জাতির সভ্যতা তাঁহার মতে আন্তর্জাতিক বৃহত্তর সভ্যতার অন্তর্গত ছিল তার নামগন্ধ পর্য্যন্ত ভারত হইতে লোপ পাইল—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। ইহা হইতে আমরা কি এই ধরিয়া লইব যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতে ও ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিয়াছে? অর্থাৎ অসভ্য ইণ্ডো-ইউরোপীয়েরা সভ্যতর জাতিসমূহকে পশুবলে জয় করিয়াছে। কিন্তু পরে ইহারা তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের নূতন অধ্যায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে অসভ্য 'ইণ্ডো-ইউরোপীয় হেলেনিক' (গ্রীক) জাতি সভ্যতর পেলাসগীয়দের জয় করিয়া পরে এই পরাজিত জাতির সভ্যতা দ্বারাই প্রভাবিত ও বিজিত হইয়াছিল। অসভ্য ইণ্ডো-

---

১২। Marshall – Mahenjo-Daro and the Indus Valley Civilisation p. 12'.

১৩। Marshall—p. 122

১৪। Dr. B. N. Dutta—"Vedic Funeral Customs and Indus Valley Culture" in "Man in India", vol. 16, no. 4 and vol. 17, nos. 1 & 2.

ইউরোপীয় কাস্যুরাও (Cassites), ব্যাবিলন ও আসিরিয়া জয় করিয়া অবশেষে তাহাদের উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। সাজির মতে নব-প্রস্তর যুগে (Neolithic Age) অসভ্যেরা এসিয়া হইতে ইউরোপ আক্রমণ করিয়া তথাকার তৎকালীন সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে। ভারতে ও কি তাহার পুনরাভিনয় ঘটিয়াছিল? কোন কোন স্থলে এই অসভ্য ইণ্ডো-ইউরোপীয় আক্রমণকারীগণ লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে সভ্যতর ও উন্নততর জাতি সমূহকে জয় করিয়াছিল (১৫)। ভারতে বৈদিক আর্য্যগণ অশ্বের ব্যবহার জানিত; যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের সময়ে লৌহের সহিত পরিচয় হয়। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা অশ্ব ও লৌহের সহিত আদৌ পরিচিত ছিল না (১৬) এই জন্যই কি বৈদিক আর্য্যগণ তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল? ঐতিহাসিকেরা বলেন,—ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিরাই প্রাচীন সভ্য জগতে অশ্ব ও লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র আমদানী করেন। বোধ হয় সর্ব্বত্র এই দুই জিনিষের সাহায্যে আর্য্যভাষী জাতিগুলি অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের চাইতেও সভ্য জাতি-সমূহকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও কোথাও কিছু পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঋক্‌বেদে লৌহের প্রচলনের কথা সন্দেহ মূলক। পণ্ডিতগণ বলেন, ঋকবেদের আর্য্যগণ 'কৃষ্ণায়স' (১৬ক) অর্থাৎ লৌহের ব্যবহার জানিতেন না। কাজেই ঋকবেদের আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সিন্ধু সভ্যতার জাতিকে ধ্বংস করিবার আখ্যায়িকাটি ঠিক খাটে না।

বর্ত্তমানে ভারতে শারীরিক নরতত্ত্বের (Physical Anthropology) অনুসন্ধান সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই মহাদেশ তুল্য দেশটী নরতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি মিউজিয়াম বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিশাল ভূখণ্ডে নানা প্রকারের লোকসমূহ বাস করে। তাহাদের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধান এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। হারবার্ট রিসলী প্রথম বিশেষভাবে একটা অনুসন্ধান করেন এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া 'খাঁটি-আর্য্য', 'আর্য্য-দ্রাবিড়ীয়', 'মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয়', 'সিথিয়-দ্রাবিড়ীয়', 'খাঁটি-দ্রাবিড়ীয়' প্রভৃতি মিশ্রিত জাতির

১৫। H. R. Hall—"The Ancient History of the Near East" P. 74.

১৬। Marshall—122.

১৬ক। এই বিতর্ক সম্বন্ধে সীমার ও Vedic Index দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টি করেন। তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া আজ কালকার নরতত্ত্ববিদেরা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহা সত্য যে এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন মূল-জাতীয় (bio-type) লোক বাস করে। এই সকল মূল জাতিগুলি পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য কোন একটি দেশের জাতির মধ্যে একটি খাঁটি মানব সমষ্টি পাওয়া পাওয়া যায় না (অবশ্য জীব-জগতের কুত্রাপি আজকাল খাঁটি জীব সমষ্টি পাওয়া যায় না)। প্রাচীন কাল হইতে নানা মূলজাতীয় লোক এই ভূখণ্ডে বাস করিতেছে। যে সকল জাতি বাহির হইতে এই দেশে আসিয়াছে, তাহারাও যে আগমন কালে বিশুদ্ধ (unmixed) ছিল তাহার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নাই।

এক ভাষার বা ধর্ম্মের অথবা এক সভ্যতার লোক হইলেই যে শারীরিক লক্ষণ বিষয়ে সকলে একত্ব প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন হেতু বা যুক্তি নাই। শরীর সম্পর্কিত নরতত্ত্ব (Physical Anthropology) একটা নির্দ্দিষ্ট লোক-সমষ্টির মধ্যে শারীরিক লক্ষণের ঐক্য দেখিলে, তাহাদের একত্ব (homogeneity) এবং তদ্ধেতু সেই লোক-সমষ্টির বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিয়া থাকে। যেখানে সকলেই এক প্রকারের শারীরিক লক্ষণাক্রান্ত সেখানে সেই সমষ্টির রক্তের বিশুদ্ধতা আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আজকাল জীবতত্ত্বে ও নরতত্ত্বে Biometric গণিত শাস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার প্রয়োগ দ্বারা কোন একটি জীব সমষ্টির একত্ব বা বৈচিত্র্য নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভারতে শারীরিক নরতত্ত্বের (Physical Anthropology) মাপ-যোগ ও তাহাতে Biometry নামীয় সংখ্যাগণিত পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে ভারত-বর্ষে সকলেই এক লক্ষণ বিশিষ্ট নয়। একই বর্ণ, জাতি, ধর্ম্ম অথবা দেশ বা ভাষার লোকের মধ্যে নানা প্রকারের লক্ষণ যুক্ত লোক আছে। আবার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, জাতি অথবা ভাষা-ভাষী লোকের মধ্যে একটি জাতিরই লক্ষণ বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ একটি মূল-জাতীয় লোকই বিভিন্ন ধর্ম্ম, জাতি বা ভাষা দ্বারা পৃথকীকৃত হইয়া জগতে বাস করে।

একটি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত লোকের শরীরে যদি তাহার জাতির মধ্যে যে সব লক্ষণ বিরাজ করে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সেই জাতির নিদর্শন (type) বলা হয়। পূর্ব্বে এরূপ ক্ষেত্রে বলা হইত যে এই ব্যক্তি

তাহার মূল-জাতির (race) নমুনা (type) স্বরূপ। এক্ষণে এরূপ লোককে বলা হয় যে সে একটি মূলজাতীয় নমুনা (bio-type)। এইরূপ নমুনা একটি দেশের নানাস্থানে পাওয়া গেলেই বলিতে হইবে যে অমুক লক্ষণাক্রান্ত bio-type সেই দেশে আছে। ভারতে এবম্প্রকারের বহু bio-type আছে। পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী নানাপ্রকার নাম দিয়া ভারতে race (মূলজাতি) নিরূপণ করিবার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শারীরিক লক্ষণ বিশিষ্ট bio-type সমূহের পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল।

(১) আফগানিস্থান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী পাঠান জাতি সমূহের মধ্যে বেলুচিস্থানের ওয়ানেচি-আফগান, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের জাতিগুলির মধ্যে বেলুচিস্থানের ‘লরি, শিবির জাঠেরা এবং পাঞ্জাবের বেলুচিগণ অধিকাংশই লম্বা মস্তক, সরু নাক (dolichoid-leptorrhins) বিশিষ্ট মূলজাতীয় লোক ; (২) বেলুচিস্থানের মেঙ্গোলেরা, কালানড্রানি, মির জাঠেরা, ছুঁট্রারা, সাঙ্গুরেরা, বান্দি-জারা, আচাকজাই, তারিন, মেড, বেলুচিরা বেশীরভাগই গোল মস্তকাকৃতি ও সরু নাক বিশিষ্ট (brachycephal-teftorrhins) মূলজাতীয় লোক। (৩) আফগানীস্থানের হাজরারা, পামীরের ইরাণী ভাষী জাতিগুলি (ফয়সাবাদী বাদ), সারিকোলি, ওয়াখি, সারাওয়ান ব্রাহুই, ডোওয়ারেরা বেশীর ভাগই গোলমাথা ও মধ্যমাকৃতির নাক (brachycephal-mesorrhins) বিশিষ্ট। (৪) মরি ও বগ্‌টি পর্ব্বতের বেলুচিরা, পাণি-পাঠানেরা ‘লম্বা মাথা ও মধ্যমাকৃতির নাক (dolichoid-mesorrhins)।

ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত লোকদের রিসলী কর্ত্তৃক গৃহীত পরিমাপ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ইহা পাওয়া গিয়াছে যে পঞ্জাবের অনেক মুসলমান কৌম এবং জাঠ শিখগণ অধিকাংশই লম্বা মাথা, সরু নাকযুক্ত (dolichoid-leftorrhins) আড়োড়া ও অস্পৃশ্য চূড়ারা অধিকাংশ লম্বা মাথা ও মধ্যমাকৃতি নাক (dolichoid-mesorrhins)-বিশিষ্ট। যুক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রি, বেনিয়া, কায়স্থ, লোহার, গোয়ালা, কুর্ম্মি,কেয়ট জাতির অধিকাংশই উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত। বিহারে ব্রাহ্মণ, বাভন, গোয়ালা, কুর্ম্মি, কাহারগণও বেশীর ভাগই উক্ত লক্ষণ যুক্ত। তথাকথিত অস্পৃশ্য মুসাহার বেশীর ভাগ লম্বা মস্তক ও চওড়া নাক (dolichoid-chamoerrhins) বিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল,

সদ্‌গোপ, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি বেশীরভাগই লম্বা মাথা ও মধ্যমাকৃতি নাসিকা বিশিষ্ট। দক্ষিণ ভারতেও দ্রাবিড় ভাষা-ভাষীদের মধ্যে উচ্চজাতি সমূহ লম্বা মস্তক ও মধ্যমাকৃতির নাম বিশিষ্ট। কিন্তু পানিয়ান, কাদির, কুরুম্বা, মালাভেদাম, উরুলা, কানিহার প্রভৃতি তথা কথিত নিম্ন জাতির লোকসমূহ লম্বা মাথা, চওড়া নাক ও ক্ষুদ্রাকার (dolichoid-chamoerrhin-short-stature) বিশিষ্ট। ইহাদিগকেই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) জাতি বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কাদির জাতিকে কেহ কেহ 'নিগৃটো' জাতীয় বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই বিষয়ে খুব প্রবল মতভেদ আছে (১৬খ)।

মধ্য-ভারতের কোলারীয় ভাষার লোকেরা মুণ্ডারি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মন-ক্মের (Mon-Khmer) ভাষা বলিয়া আজ কাল অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের ভাষায় যথেষ্ট সংস্কৃত শব্দ আছে (১৭)। হ্যাডনের মতে (১৮) নরতাত্ত্বিক বিচারে ইহাদিগকে কেবল দ্রাবিড় পূর্ব্ব জাতির মধ্যে গণ্য করিতে হয়। কারওয়া, মুণ্ডা, খারওয়ার, সাঁওতাল, ভূমিজা প্রভৃতি জাতিগুলিও লম্বা মাথা এবং চওড়া নাক বিশিষ্ট। ওরাওঁরা দ্রাবিড় ভাষায় কথা কহিয়া থাকিলেও দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির মধ্যে পরিগণিত হয়। রাজ মহলের মাল ও মালপাহাড়িয়ারা ওরাঁওদের সম্পর্কীয় জাতি। আবার গুজরাট হইতে কুর্গ পর্য্যন্ত অনেক গোল মাথা বিশিষ্ট লোক পাওয়া যায়। যথা ঃ—নাগর ব্রাহ্মণ, প্রভু, মারাঠা, কোডাগা। কিন্তু ইহারা মধ্যমাকৃতির নাক বিশিষ্ট, যদিচ দক্ষিণ ভারতের অপরাপর জাতি অপেক্ষা লম্বা (১৯)। তিনি (হ্যাডন) বলেন (২০) এই জাতিগুলি মধ্যমাকৃতি ও মধ্যমাকৃতির নাসিকা বিশিষ্ট যদিচ ইহাদের মধ্যে কোন 'মঙ্গোলীয়' লক্ষণ পাওয়া যায় না।

১৬খ। এ সম্বন্ধে Aickstedtpএর Report দ্রষ্টব্য।

১৭। প্যাটারস্মিডট ও ষ্টেনকনো কোলারীয় ও মন ক্মেরদের মধ্যে এক-জাতিয়ত্ব প্রমাণের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ষ্টেনকনো মনক্মেরের যে আদর্শ শারীরিক নমুনা আঁকিয়াছেন তাহা রিসলী প্রদত্ত দ্রাবিড় জাতির নমুনা। উভয় জাতির ভাষার গোটাকতক শব্দ লইয়া এই অভিন্নতা কল্পনা করা হইয়াছে।

১৮। Haddon—Races of Man, pp. 107—111.

১৯-২০। Haddon—Races of Man, pp. 107—111.

পূর্ব্বভারতে আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে খাসি, কুকী, মণিপুরী, মিকে, কাছারি প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে প্রাচীন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব লম্বা-মাথা, চওড়া নাক বিশিষ্ট লোকের নমুনা (type) বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমান হয়। নাগাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই লম্বাকৃতি, মধ্যমাকৃতির নাসিকা বিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। হাটন বলেন যে ইহাদিগের মধ্যে নিগৃটো নমুনা (type) পাওয়া গিয়াছে। আসামে হিন্দুদের মধ্যে লম্বা-মাথা সরু নাক বিশিষ্ট লোক খুব ভাল সংখ্যায়ই আছে বলিয়া মনে হয় (২০ক)। আবার গোল মাথা সরু নাক যুক্ত লোক বেশ ভাল সংখ্যায়ই আছে। লম্বা মাথা মধ্যমাকৃতি নাক বিশিষ্ট লোক আছে এবং গোল মাথা এবং মধ্যমাকৃতির নাক সম্পন্ন লোকও আছে। কিন্তু গোল মাথা ও চওড়া নাক যুক্ত লোকও বিরল নহে।

হিমালয় পর্ব্বতোপরি লেপচা, মুর্ম্মি প্রভৃতি জাতিগুলি লম্বা মাথা—মধ্যমাকৃতি নাক বিশিষ্ট; গোল মাথার মঙ্গোলীয় নমুনাও সর্ব্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বিগত সেন্সাস রিপোর্টে ডাঃ গুহ ভারতীয় নরতত্ত্বের সম্পর্কে রিসলীর মত খণ্ডন পূর্ব্বক এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে বিভিন্ন মূল জাতীয় লক্ষণ পাওয়া যায়;—পাঠান, লাল কাফির এবং কালাস ও খোসদের মধ্যে লম্বা মাথা, সরু নাক, চক্ষু ও চুলের বর্ণ ফরসা (light) এবং দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট লোক পাওয়া যায়। গোল মাথা, সরু নাক, ফরসা (light) গাত্রবর্ণ, মাঝারি (medium) রংএর চুল এবং চক্ষু বিশিষ্ট লোকও এই সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ খোস, লাল কাফির, উত্তরের পাঠান, বুরিস এবং দর্দ জাতি সমূহের মধ্যেও পাওয়া যায়। আরও একটি লম্বা মাথা, সরু ও বাঁকান (aoquiline) নাক, গোলাপী গাত্রবর্ণ কিন্তু ব্রাউন চক্ষু ও চুল বিশিষ্ট নমুনা বাদাক্সানের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়। পাঠানদের ভিতরও এই এই লক্ষণযুক্ত লোক পাওয়া যায়। লাডাক এবং দক্ষিণে মঙ্গোলীয় লক্ষণযুক্ত লোকও পাওয়া যায়।

২০ক। Dr. B. N. Datta—"Anthropological Notes on Some Assam Castes and Tribes". Cal. Univ. Press. New Series No. 5 ; Anthropological Papers.

খাস ভারতের সম্পর্কে তিনি বলেন—পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানেরা একই প্রকার শারীরিক লক্ষণযুক্ত। শিখদের সহিত তুলনায় সিন্ধিরা গোল মাথা, অপেক্ষাকৃত চওড়া নাক এবং দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত। যুক্ত প্রদেশের (United Provinces) ব্রাহ্মণেরা পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লোকদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। মধ্য-ভারতে গোল মাথা বিশিষ্ট লোকের অভাব; কেবলমাত্র রাজপুতদিগের মধ্যেই ইহার কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুজরাটের সহিত মধ্য-ভারতের কিঞ্চিৎ মিল আছে। কোমোটিন বলেন—গোয়ার গৌড়-সারস্বতদের (ব্রাহ্মণ) বাংলার ব্রাহ্মণদের সহিত শারীরিক লক্ষণের মিল ও সাদৃশ্য আছে। নরতত্ত্বের সহিত তাহাদিগের গৌড় হইতে আগত ঔপনিবেশিক বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে তাহার সহিত সুন্দর মিল দেখা যায়। পুনরায় ডাঃ গুহ বলেন—মহারাষ্ট্রের জাতিসমূহ যে একই মূলজাতি সম্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল পূর্ব্বোক্ত সারস্বতেরা কিঞ্চিৎ পৃথক। পক্ষান্তরে পার্শীরা বড় ও চওড়া মস্তকবিশিষ্ট। বাংলার ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা কায়স্থেরা অধিক গোল মস্তকবিশিষ্ট এবং তাহাদের নাক লম্বা ও উচ্চ। পোদ, মাহিষ্য এবং নমঃশূদ্র জাতিগুলির নরতাত্ত্বিক জাতীয় ভিত্তি (racial basis) এক। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত। তাহাদের সহিত বৈদ্য ও সুবর্ণবণিক জাতি দুইটির সম্বন্ধও খুবই নিকট। আবার বাংলা তামিলনাড়ু ও মধ্য-ভারতের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। (There does not appear to be much relationship between Bengal, Tamilnadu and Central India.)। অন্যপক্ষে গোল মাথাবিশিষ্ট 'খো'দের (Kho) সহিত বাঙ্গালা, গুজরাট ও মহীশূরের গোল মাথাবিশিষ্ট জাতিগুলির সম্পর্ক আছে। মালাবারের নায়ারদের সহিত পাঠানদের সম্বন্ধ আছে। বাংলার কায়স্থদিগের সহিত গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ, ইরাণী-ভাষী তাজিক, গুজরাটের কাঠি এবং জৈন বেনিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার বাংলার পোদদের সহিত উড়িয়া মালওয়ে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঔদিচ্যচিৎপাবন, দেশস্থ ব্রাহ্মণ, মারাঠা, ইলুভা, তেলুগু ও কানাড়া ব্রাহ্মণদের সহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু বাংলার সহিত আসামের খাসী জাতির কোনও সম্বন্ধ

নাই। ডাঃ গুহ বলেন—ভারতের বাহিরেই মঙ্গোলীয় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাঃ গুহের এই রিপোর্টে (২১) আমরা দেখিতে পাই যে পরলোকগত কার্ল পিয়ারসনের "Co-efficient of Racial Likeness" নামক একটি সংখ্যাগণিত বিজ্ঞানের ফরমূলা (statistical formula) তিনি ভারতীয় নরতত্ত্বে প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদ্দারা তিনি বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য দেখিয়াছেন। কিন্তু মিঃ পিয়ারসনের এই ফরমূলা নরতাত্ত্বিকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। মিঃ পিয়ারসনের পদের উত্তরাধিকারী অধ্যাপক R. Fisher এই সম্বন্ধে বলেন—"It is a test of significance............it does not calculate a racial difference." (২২) এই ফরমুলার উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে অধ্যাপক ফিসার সবিশেষ সন্দিহান। ডাঃ গুহ এক একটি জাতির সমষ্টির সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন। একটি জাতি বা লোক সমষ্টির বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন শারীরিক লক্ষণযুক্ত লোকের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই।

ডাঃ গুহ বলেন—বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ (The Brahmans and the Kayasthas are intimately realated.)। কিন্তু বিভিন্ন জাতির Inter-relations সম্বন্ধে তিনি বলেন—মালাবারের নায়ার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, আর নাগর ব্রাহ্মণ, তাজিক, কাঠি, বেনিয়া জৈন প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙ্গালী কায়স্থের সম্পর্ক (affinities) রহিয়াছে। বাংলার ব্রাহ্মণ ও

২১। এই রিপোর্টের বিষয়ে Journal of Physical Anthropologyতে Prof. Hardliskaর সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

২২ (ক)। Prof. R. A. Fisher—"The Co-efficient of Racial Likeness and the Future of Craniometry" in "Journal of Royal Anthropological Institute." Vol. LXII. Jan.—June. 1936.

(খ)। "Co-efficient Racial Likeness" সম্বন্ধে "Biometrika"; 1923, xiv, p. 193—264তে Morantএর সমালোচনাও দ্রষ্টব্য।

কায়স্থদিগের মধ্যে যে অতি নিকট সম্বন্ধ দেখান হইয়াছিল তাহা তাঁহার এই মত দ্বারা এখানে স্বতঃ-খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, তিনি বলেন যে বাঙ্গালী কায়স্থদের সহিত গোল মাথাবিশিষ্ট গুজরাটী প্রভৃতির সম্পর্ক রহিয়াছে, অন্যপক্ষে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সহিত লম্বামাথা বিশিষ্ট পাঠান-দিগের সম্বন্ধ রহিয়াছে। একদিকে যেমন তিনি পোদ, মাহিষ্য প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিতেছেন, অপরদিকে আবার এই পোদদের মালবে ব্রাহ্মণ, রাজপুত প্রভৃতির সহিত নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। উত্তর ভারতের এই রাজপুতদিগকে তিনি লম্বা মাথাবিশিষ্ট বলিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে পোদেরা কতটা তফাৎ? তিনি পোদদের সহিত ঔদিচ্য-চিৎপাভন ব্রাহ্মণদিগের সম্পর্কও টানিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে এই চিৎপাভনদের চক্ষুর রং (বর্ণ) শতকরা চারজনের grey, শতকরা ৪ জনের 'hazel' এবং ২০ জন clear light brown. এবং তাহারা মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ফরসা (পরিষ্কার) গাত্রবর্ণবিশিষ্ট (শতকরা প্রায় পাঁচজন গোলাপী rosy-white বর্ণ) জাতি। পক্ষান্তরে পোদদিগকে তিনি কাল বা dark-brown বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট বলেন। তাঁহার এই বিবরণ স্ব-বিরোধী।

মহাদেশতুল্য আমাদের এই বিশাল ভারতে অসংখ্য জাতির বাস। তাহাদের মধ্যে একটি লোক সমষ্টির Co-efficient অপর একটি লোক সমষ্টির Co-efficientএর সহিত মিলিয়া যাওয়া সম্ভবপর। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই তাহাদের সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না; এবং উহার জোরেই (অর্থাৎ এই Co-efficientএর পারস্পরিক মিলের উপর নির্ভর করিয়া) এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র নির্ণয়ের প্রয়াসকে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলিয়া মনে হয় না। শরীরের অন্যান্য লক্ষণসমূহেরও মিল থাকা একান্ত আবশ্যক।

শারীরিক লক্ষণের এই সাধারণ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। কিন্তু এতদ্দ্বারা কেহ যেন এইরূপ না বুঝেন যে এই প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট লোকেরা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান বা জাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে। পাঞ্জাবেও লম্বা

মাথা চওড়া নাক ও গোল মাথা চওড়া নাক বিশিষ্ট নমুনার লোক পাওয়া যায় এবং দক্ষিণেও ইহার বিপরীত পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে নরতত্ত্বে এইরূপ লক্ষণযুক্ত নমুনাগুলির স্থান কোথায়? প্রথমেই লম্বা মাথা (২৩) সরু নাকযুক্ত লোক সমষ্টির কথা উঠে। এই জাতীয় নমুনা (type) আফগানীস্থান, পারস্য, ককেসস্ এবং ইউরোপেও পাওয়া যায়। এই নমুনাকেই রিসলী 'ইণ্ডো-আর্য্য' এবং জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' নর্ডিক বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতে ইহারা মলিনবর্ণ বিশিষ্ট লোক। এই নমুনাকে এখন কেহ উত্তর-ইউরোপীয় বলেন না। তবে হ্যাডন এই নমুনাকে Proto-Nordic (নর্ডিক পূর্ব্ব) নামে একটা নূতন আখ্যায় আখ্যায়িত (২৪) করিয়াছেন।

কিন্তু নরতাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক, মেণ্ডেলীয় (Mendelian : J. Mendel 1822—84) সূত্র ও ঐতিহাসিক কোন উপায়ে যখন এই জাতীয় লোক-দিগের সহিত নর্ডিকের ঐক্য বা অভিন্নতা স্থাপন অসম্ভব তখন ইহাকে 'নর্ডিক-পূর্ব্ব' (Proto-Nordic) জাতি বলা একটা গোজামিল দেওয়া ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ হয়। এই নমুনার লোক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান নাই। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষভাবে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে বিদেশাগত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই নমুনার লোককেই 'ইণ্ডো-আফগান' বলা হয়।

আফগানীস্থান, পামীর, পারস্য বিশেষভাবে তুর্কীতে আরমানী প্রভৃতি জাতি সমূহের মধ্যে গোল মাথা সরু নাকবিশিষ্ট নমুনার লোক বিশেষভাবে পাওয়া যায়। মধ্য-ইউরোপেও এই নমুনার লোক বিশেষভাবে পাওয়া যায়। পশ্চিম-ভারত, বাঙ্গলা, আসামেও উপরোক্ত এই নমুনার লোক বেশ পাওয়া যায়, যদিচ শেষোক্ত দুই স্থানে ইহা অধিক সংখ্যায় (সংখ্যা গরিষ্ঠরূপে) নাই। পশ্চিম এশিয়াতে এই নমুনা অধিকাংশ ভাগে (অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়া) আছে

২৩। মহেঞ্জো-দড়োতে এইরূপ নমুনা (type) এখনও পাওয়া যায় নাই।

২৪। এতৎ সম্পর্কে Eickstedtএর "Rassenkunde und Rassen geschichte der Menschhiet" পুস্তকের ২৬৫ পৃষ্ঠার foot-note দ্রষ্টব্য। তিনি সাইবিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে এই কল্পিত 'Proto-Nordic' জাতির উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বলিয়া ইহাকে 'আরমেনয়ড্' (আরমেনীয় ন্যায়) বলিয়া অভিহিত করা হয়। (২৫)

লম্বা মাথা মধ্যমাকৃতি নাকবিশিষ্ট নমুনা (type) সমগ্র ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; বেলুচিস্থান, পারস্য অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরের উভয় কূলের জাতি সমূহের মধ্যে এই লক্ষণ বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছে। ইউরোপে এই জাতিকেই 'ভূমধ্যসাগরীয় জাতি' বলা হয়। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-ভাষী তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে এই জাতীয় নমুনা পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হাক্সলি, ফ্লাওয়ার, হ্যাডন প্রভৃতি, দ্রাবিড় জাতির গাত্রবর্ণ যদিচ মলিন তথাপি ইহাকে (দ্রাবিড় জাতিকে) ভূমধ্যসাগরীয় জাতির সহিত সম্পর্কিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ভারতের এই সকল উপরোক্ত জাতি ভূমধ্যসাগরীয় মূল জাতির কোন শাখার অন্তর্গত তাহা পণ্ডিতগণ এখনও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই (২৬)।

অতঃপর আসে লম্বা মাথা চওড়া নাক বিশিষ্ট নমুনা। এই জাতীয় লোকদিগকে অতি নিম্নাবস্থায় পাওয়া যায়। নরতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে "অষ্ট্রেলীয়-পূর্ব্ব", "দ্রাবিড়-পূর্ব্ব" বলিয়া বলেন। ইহাদিগকে যথার্থ আদিম অধিবাসী বলিয়া সন্দেহ করা হয়। এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে এই জাতির সমজাতীয় লোক পাওয়া যায়। পূর্ব্ব সুমাত্রা, সেলিবিসের 'টোয়ালা' জাতিগুলি এই সম্পর্কীয় লোক। অবশ্য এই নমুনা (typo) উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও পাওয়া যায়।

তৎপর আসে গোলমাথা মধ্যমাকৃতি ও চওড়া নাক যুক্ত নমুনা। সাধারণতঃ এই লক্ষণ দুইটি পূর্ব্ব এসিয়াতে পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাদিগকে "মঙ্গোলীয়" আখ্যা দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব্ব-ভারত ও হিমালয়ের উপর এই নমুনার (type)

২৫। সাধারণ লোক যাহাকে ইহুদির আকৃতি (ইহুদিদিগের ন্যায়) বলে তাহা এই চেহারা। প্রাচীন ইহুদি জাতির মধ্যে এই জাতির রক্ত খুব অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া এই ভ্রম হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আকৃতি সেমিটিক জাতীয় নহে।

২৬। জার্ম্মান নরতত্ত্ববিদ আইকষ্টেডট বলেন, 'দ্রাবিড়ীয়' নামটি ভ্রমাত্মক। ইহার পরিবর্ত্তে 'ভূমধ্য সাগরীয়' নামটি প্রচলিত হউক। Census Report-এ ডাঃ গুহ এই নামটি ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অতি প্রাচীন মহেন-জো-দড়োর নিদর্শনের মধ্যেও এই নমুনার নর-করোটি পাওয়া গিয়াছে একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেওয়েল ও গুহ বলেন যে উপরোক্ত এই লক্ষণ 'নাগা' করোটির সহিত মিলে। ইহার পর আসে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি ভেড়ার লোমের ন্যায় মাথার চুল (woolly), গোল মাথা, চওড়া নাসিকা যুক্ত "নিগৃটো" জাতীয় নমুনা। আন্দামান দ্বীপে এই প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে দক্ষিণ ভারতের কাদির দিগের মধ্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এবিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে।

ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতি সংঘের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মলিন-শ্বেত (dark-white) বর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুলের বর্ণ সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের এবং 'ঢেউ খেলান' (wavy)। ভারতে এই বিভিন্ন মূলজাতীয় লোকসমূহ অতি পুরাকাল হইতে একই দেশে বসবাস করিয়া পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এখন 'জতিতত্ত্ব' হিসাবে সকলেই 'ভারতীয়' এবং 'ভাষাতত্ত্ব' হিসাবে হয় আর্য্যভাষী নতুবা 'দ্রাবিড়'-ভাষী (অবশ্য হিমালয় পর্ব্বতের লোক ব্যতীত)। সভ্যতায় সকলেই অর্য্যীভূত ; ধর্ম্মে হয় বৈদিক ধর্ম্ম-প্রসূত ব্রাহ্মণ্য-বাদী অথবা বৌদ্ধ ; নতুবা, সোমিটিক ধর্ম্ম-প্রসূত মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টান। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে রাজনৈতিক ও সভ্যতার নানা শক্তির সমবায়ে এক ভারতীয় জাতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর অপরাপর জাতি (nation) সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাকে (নানাজাতির সমবায়ে অভিব্যক্ত জাতি) কেহ কেহ Homo Indicus বলেন।

বিভিন্ন মূলজাতির লক্ষণ ভারতের লোক সমূহের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও নানা শক্তির সমবায়ে যে 'ভারতীয়তা' অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে কোন প্রদেশ বা বিশিষ্ট ভাষাভাষীকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নিখিল ভারত হইতেছে এক এবং অবিভাজ্য। এই জন্য ইতিহাসে ভারতকে একটি দেশ বা জাতিরূপে দেখিতে হইবে। ইহা সত্য বটে যে অধিকাংশ সময়ই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে ; তথাপি কৃষ্টির দিক দিয়া সকলে একীভূত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির একত্বের (oneness) জাজ্বল্যমান প্রমাণ হইতেছে যে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণগণ ও কাশ্মীরের গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণগণ উভয়েই সমগোত্রীয়, অর্থাৎ এক বংশীয় বলিয়া

পরিচয় প্রদান করে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই ভাষায় একই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস বৈদিকযুগ হইতে ধরা হয়। কারণ সেই সময় হইতে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় চলিতেছে। এইজন্য সামাজিক ইতিহাসের মূল উৎস সেই সময় হইতেই ধরিতে হইবে। কিন্তু মহাদেশতুল্য এই ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অতি বিরাট ব্যাপার। ইহার ইতিহাসের দীর্ঘতার নিকট প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিবৃত্ত অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই প্রতীত হইবে। প্রাচীন গ্রীক কবি হোমার (Homer) এর সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস একত্র করিলে যাহা হয় সমগ্র ভারতের ইতিহাস সেইস্থান ও সময় অধিকার করে। কাজেই এত বড় বিরাট ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা এস্থানেও সম্ভবপর নয়।

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস কিভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কি কি সামাজিক শক্তি তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে তদ্ধেতু রাষ্ট্র কোন পথে অগ্রসর হইয়াছে এইসব বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি কয়েকটি যুগে (epoch) বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথমতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও গৃহ্যসূত্র সমূহের সময় নিয়া একটা যুগ ধরিতে হইবে। তৎপর বেদের পরবর্ত্তী কাল হইতে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের যুগ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারতীয় জাতীয়তা সংসাধিত হয়। ইহার পর পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল হইতে অন্ধ্র রাজত্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিক্রিয়ার যুগ। ইহাকে তৃতীয় যুগ বলা যাইতে পারে। তৎপর কুষাণাধিপত্যের যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময় বৌদ্ধ প্রাধান্যের পুনরুত্থান হয়। ইহা চতুর্থ যুগ। ইহার পর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় আবার ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান হয় এবং দ্বিতীয়বার ভারতীয় জাতীয়তা সংসাধিত হয়। ইহা পঞ্চম যুগ। ইহার পর ভারতে মাৎস্য-ন্যায়ের সময়। এই অবস্থা উত্তরে বৌদ্ধ শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্য ও দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুলকেশীর রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সহিত অবসান হয়। কিন্তু শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর ভারত পুনরায় খণ্ডীকৃত আকার ধারণ করে। দক্ষিণভাগেও নানা ভাগ্য

বিপর্য্যয় দেখা দেয়। এই সময় হইতে ভারত একজাতিয়ত্ব (nationality) পুনঃ সংগঠনে অসমর্থ হয়।

শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তর ভারত জয় পর্য্যন্ত সময়কে সামাজিক অন্ধকারের যুগ ধরিতে হইবে। ইহা ষষ্ঠ যুগ। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সংমিশ্রিত হইয়া অধুনা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইতেছিল। এই সুদীর্ঘ নিখিল ভারতীয় মাৎস্য-ন্যায়ের যুগে বংলায় বৌদ্ধ পাল রাজবংশ ও গুজরাটে ভিনমল্লের গুর্জ্জর-প্রতিহারদিগের এবং দক্ষিণে রাজেন্দ্র চোলের অভ্যুত্থান একটি রাজনীতিক episode (আশ্চর্য্যজনক ঘটনা)। এই অন্ধকার যুগের কটাহ মধ্য হইতে রাষ্ট্রে ও সমাজে 'রাজপুত' নামধারী একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতির অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ইহার পর মুসলমান শাসনকালকে সপ্তম যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে তৈমুর বংশীয়দের অধীনে ভারতে আবার 'এক জাতিয়ত্ব' সংগঠনের চেষ্টা হয়। কিন্তু এই রাজত্বকে অনেকে 'অর্দ্ধ-জাতীয়' (quasi-national) বলিয়া থাকেন।

প্রাচীন রোম বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় দেশ সমূহের ন্যায় ভারতে একটা অখণ্ড এবং ধারাবাহিক ইতিহাস অভিব্যক্ত হয় নাই বলিয়া আমাদের ইতিহাসকে এবম্বিধ উপায়ে ভাগ করিতে হইল। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসকে 'কৌম'গত বর্ব্বর অবস্থার যুগ, ক্লাসিক্যাল যুগ (classical age), সামন্ততান্ত্রিক যুগ, (Feudal Age), বুর্জ্জোয়া ডেমোক্রাটিক যুগ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়। এই উপায় ভারতীয় ইতিহাসেও প্রয়োগ করিলে বৈদিক যুগকে কৌমগত বর্ব্বর অবস্থার যুগ; বৈদিক যুগের পর রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অবস্থাকে classical যুগ; এর পরের যুগ হইতে মৌর্য্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত একটা serf-empire এর যুগ (২৭)। এখন এই 'গোলাম রাষ্ট্র-যুগ' কখন অবসান হইল এবং কখন সামন্ত-তন্ত্রীয় যুগ আরম্ভ হইল, তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও বিচারের বস্তু। আমাদের ধারণা 'গুপ্ত সাম্রাজ্য' একটি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। এই সামন্ত্রতন্ত্রের পূর্ণ-বিকাশ রাজপুতদিগের অভ্যুত্থানের সময়ে প্রকাশ পায়। মুসলমান শাসনের প্রথমভাগে সেই ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

২৭। ইহার অর্থ H. G. Wells তাঁহার Outline of Historyতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরে মুঘল যুগে উহা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করা হয়। কিন্তু তাহাদের জমি-বিলি ব্যবস্থার (land tenure system) মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রে ইংরেজ শাসনের যুগেও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে। এইজন্য ভারতীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রীয় যুগ কখন আসিয়াছে এবং কোথায় উহার অবসান হইয়াছে তাহা সঠিক বলা বড়ই দুরূহ ব্যাপার !

রাষ্ট্রের এই সকল বিভিন্ন epoch ও সমাজের বিভিন্ন age সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কোন ইতিহাস আমাদের নাই। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক সাহিত্য হইতে এই সকল উদ্ধার করিতে হইবে। এই কারণেই আমরা প্রথম যুগ অনুসন্ধানের জন্য বৈদিক সাহিত্য নিয়া আলোচনা আরম্ভ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

আশ্বিন সংখ্যার ভ্রম সংশোধন

২৩৮ পৃঃ ২নং পাদটীকার প্রথম লাইনে 'হিন্দরী'-র পরিবর্ত্তে 'হিন্দবী' হইবে।

২৩৮ পৃঃ ৩নং পাদটীকার দ্বিতীয় লাইনে 'কান্দাহার'-এর পরিবর্ত্তে 'গান্ধার' হইবে।

২৪১ পৃঃ ৩নং পাদটীকায় 'Akhund Darweza Babu' স্থানে 'Akhund Darweza Baba' পড়িতে হইবে।

কালিম্পঙের চিঠি

কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্চে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্-প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারি একটুখানি নমুনা পাঠাই :—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দের মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ?

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বত শিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ?

২৫।৯।৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত।

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নেতা হওয়া যে এত সহজ আর নেতৃত্ব করা এমন কঠিন, বিভূতি তা জানিত না। এবার সে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। শ্রীধরের দোকানে বসিয়া মাত্র কয়েকজনের কাছে সে আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিল যে নন্দনপুরের যাত্রার আসরে সামনে বসিবার অধিকার সে তাদের আদায় করিয়া দিবে, জন্মাষ্টমীর দিন দেখা গেল নানা বয়সের প্রায় দেড়শ' মানুষ তার এই অধিকার আদায়ের অভিযানে যোগ দিয়াছে। শ্রীধর বা রামলোচনের মত যারা অন্তত ফতুয়া গায়ে দিয়া যাত্রা শুনিতে যায়, এদের অধিকাংশই সমাজের সে স্তরের মানুষও নয়। এরা যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে, আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মাঝে বসিতে পাইলে বোধ হয় রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করে। শ্রীধর রামলোচন প্রভৃতির মত চাঁদা দিয়াও সামনে বসিতে না পাওয়ার অপমানে এরা ক্ষুব্ধ হয় নাই। চাঁদাই বা এদের মধ্যে ক'জন দিয়াছে কে জানে! কোথা হইতে দিবে? খাজনা দিতে যাদের অনেকের ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়, চাঁদা দেওয়ার বিলাসিতা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না।

তবু তার নেতৃত্বে যাত্রার আসর আক্রমণের জন্য সকলে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনপুরের স্থায়ী আটচালার নীচে সর্ব্বসাধারণের যাত্রার আসর। চাঁদা দিক বা না দিক, গায়ে ফতুয়া থাক বা না থাক, এদের সকলেরই অবশ্য সে আসরে সামনে বসিবার অধিকার আছে। কিন্তু এরা কি তাই চায়? সেইজন্যই কি এরা সকলে জড়ো হইয়াছে? বাঁচিবার অধিকার সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে এদের সে যেসব কথা বলিয়াছে, একি তারই প্রতিক্রিয়া?

এই প্রশ্ন বিভূতিকে পীড়ন করিতে থাকে। তার বক্তৃতা আর উপদেশ এতগুলি মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে একথা বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রতি-

যোগিতা থাকে, মনোমালিন্য থাকে—এক গ্রাম অন্য গ্রামকে অনায়াসে হিংসা করে। কে জানে এরা নন্দনপুরের অধিবাসীদের একটু জব্দ করিতে চলিয়াছে কি না? শ্রীধর, রামলোচন আর অন্যান্য কয়েকজন ফতুয়াধারী হয়তো নিজেদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সব অশিক্ষিত সরল মানুষগুলিকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছে। যাত্রার আসরে হয়তো আজ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আর পিছাইবার উপায় নাই, মরিয়া গেলেও না। বিভূতি বার বার সকলকে আসল কথাটা বুঝাইয়া দেয়। গালাগালি হাতাহাতি চলিবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে সকলে সামনের দিকে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পড়িবে, কিছুতেই আর সেখান হইতে উঠিবে না।

একজন প্রশ্ন করে, 'ওরা যদি গাল দেয়, অপমান করে? যদি মারে?' বিভূতি জবাব দেয়, 'তবু চুপ করে বসে থাকবে, কথাটি কইবে না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওরাই লজ্জা পাবে। ওরা যদি ছোটলোকমি করে আমরা কেন ছোটলোক হতে যাব?'

বিভূতি ইচ্ছা করিয়াই সকলকে সঙ্গে নিয়া যাত্রা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে আসরে গিয়া হাজির হইল। মানুষ তখন জমা হইয়াছে অনেক তবে বসিবার স্থানও যথেষ্ট ছিল। সামনের বিশেষ স্থানগুলি রাখা হইয়াছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য। সকলে দল বাঁধিয়া সেই স্থানগুলি দখল করিয়া বসিবার উপক্রম করিবামাত্র কয়েকজন ভলান্টিয়ার আসিয়া প্রতিবাদ করিল। বিভূতি যেখানে খুসী বসুক, বিভূতির দু'একজন বন্ধু-বান্ধবও বসুক, কিন্তু সকলে বসিলে চলিবে কেন!

বিভূতি খুব অহিংসভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন চলবে না? এরা সকলেই আমার বন্ধু।'

একজন ভলান্টিয়ার, বয়স তার আঠার উনিশের বেশী হইবে না, একগাল হাসিয়া বলিল, 'আর আমরা বুঝি আপনার শত্রু?'

'না, তা বলছি না—'

একজন তিন চার হাত তফাৎ হইতে বিভূতির মুখগহ্বরটিকে পিকদানি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করিয়াছে। মুখ ভাসাইয়া পানের পিক বুকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভূতি মুছিবার চেষ্টাও করিল না। এক লাফে

সামনে আগাইয়া গিয়া এক হাতে অপরাধীর গলাটা টিপিয়া ধরিয়া অন্যহাতে তাকে মারিতে লাগিল কিল চড় ঘুষি। আরেকজন চট করিয়া বসিয়া পড়িয়া পিছন হইতে বিভূতির পা ধরিয়া মারিল এক হ্যাঁচকা টান, বিভূতি মুখ থুবরাইয়া পড়িয়া গেল।

একজন চীৎকার করিয়া উঠিল : 'মার শালদের।'

অনেকের মুখে প্রতিধ্বনি শোনা গেল : 'মার! মার! মার!'

অধিকাংশ লোক যেন দাঙ্গার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে এমন দাঙ্গা বাধিয়া গেল বলিবার নয়। কোথা হইতে যে এত লাঠি ইট পাটকেল আসিয়া জুটিল! কয়েকটা মাথা ফাটিয়া গেল, অন্যভাবে আহত হইল অনেকে। হৈ হৈ রৈ রৈ হল্লা, ছুটাছুটি, মারামারি—এক গ্রামের লোক যে ভাবে পারিতেছে অন্য গ্রামের লোককে আঘাত করিতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ভাল করিয়া দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত কারও নাই। একজন হয়তো পেছন হইতে অন্য একজনের মাথায় লাঠি মারিবার আয়োজন করিয়াছে এমন সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি লোহার একটা মুখ-সরু শিক তার পিঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। এ ধরণের অস্ত্রও কেউ কেউ দু'একটা সঙ্গে আনিয়াছিল। কেবল আজ নয়, আগের দু'দিনও আনিয়াছিল। মারামারিটা যে আজ হঠাৎ লাগে নাই, এ তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

শেষ পর্য্যন্ত বিভূতির স্থাপিত ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা আসিয়া সেদিনকার মত সেখানকার হাঙ্গামাটা থামাইয়া দিল। মারামারিটা হইতেছিল এক গ্রামের লোকের সঙ্গে আরেক গ্রামের লোকের এবং বিভূতি ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল এক এক গ্রামে একটা করিয়া। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার, মারামারিটা বন্ধ করিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্যায়াম সমিতি-গুলির সদস্যেরা একসঙ্গে মিলিয়া। অধিকাংশই মাথা-গরম যুবক কিন্তু তাদের মধ্যে এমন ঘোরতর মিল দেখা গেল ঠাণ্ডামাথা বুড়োদের মধ্যে যা সম্ভব হয় না।

আহত বিভূতিকে তারা গরুর গাড়ীতে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বিভূতির আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়, অন্ততঃ দেহের আঘাত নয়। অন্যান্য যারা আহত হইয়াছিল তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল

কিন্তু অধিকাংশ আহত মানুষ যে কোথায় উধাও হইয়া গেল তার আর কোন পাত্তাই মিলিল না।

মারামারি কিন্তু সেইখানে শেষ হইল না।

এক গ্রামের কয়েকজন অন্য গ্রামের একজনকে একা পাইলে ধরিয়া পিটাইয়া দিতে লাগিল। মারামারির পরদিন সকালে নন্দনপুরে গিয়া মহেশ চৌধুরী মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। মাথাটা তার ফাটিয়া গেল এবং দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল কয়েকটা।

বিভূতি আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরিলে মহেশ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ?'

বিভূতি বলিয়াছিল, 'না। যাতে দাঙ্গা না বাধে তার চেষ্টা করেছিলাম।' কথাটা মহেশ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তখনকার মত কিছু আর বলেও নাই। পরদিন সকাল হইতে না হইতে আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিজে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগটাও সে পায় নাই। তাকে দেখিয়াই নন্দনপুরের জনপাঁচেক বদমেজাজী মানুষ বলিয়াছিল: 'বিভূতির বাপ ব্যাটা এসেছে রে!'

বলিয়াই তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অনেক বেলায় খবর পাইয়া বিভূতি তাকে আনিতে গেল। বাপের অবস্থা দেখিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। যাদের সে যাচিয়া আগের দিন যাত্রার আসরে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল, মারামারির জন্য তাদের উপরেও তার বিরক্তির এতক্ষণ সীমা ছিল না। এরকম একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘটার জন্য মনে মনে তার বড়ই খারাপ লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এই রকম বর্ব্বর যদি তার দেশের মানুষ হয় আর এই রকম কারণে অকারণে পরস্পরকে হিংসা করে আর পরস্পরের সঙ্গে কলহ বাধায়, দেশের তবে হইবে কি? আজ আহত বাপকে দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে তার মনে হইল, যারা তার বাপকে এভাবে মারিয়াছে, তাদের কিছু উত্তম মধ্যম না দিলে জীবন ধারণ করাই বৃথা।

কিন্তু কে যে মহেশ চৌধুরীকে মারিয়াছে, কেউ তা জানে না। অত সকালে আটচালার দিকে বড় কেউ যায় নাই। একটু বেলায় মহেশকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে একটা গোলমাল বাধিয়া যায়। তখন

নন্দনপুর ব্যায়াম সমিতির সদস্যেরা তাকে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাক্তার দেখাইয়া পাল্কীতে করিয়া মহেশকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হইল। সারাদিন সারারাত বিভূতি মহেশের শিখরে বসিয়া রহিল, বিভূতির মা বসিয়া রহিল পায়ের কাছে। মাধবীলতাও ওই রকমভাবেই রাতটা কাটাইবার আয়োজন করিয়াছিল, বিভূতির জন্য পারিয়া উঠিল না। মাঝরাত্রে বিভূতি তাকে এমন একটা অপমানজনক ধমক দিয়া ন্যাকামি করিতে বারণ করিয়া দিল যে কাঁদিয়া ফেলিয়া মাধবীলতা উঠিয়া গেল।

মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিল পরদিন সকালে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা একটু কাটিয়া আসিলে বিভূতি মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় কে মেরেছে বাবা ?'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'একজনে কি মেরেছে—চার পাঁচজনে।'

'কেন মারল ?'

'তোমার জন্যে। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।'

উত্তেজিত হওয়ার ফলে হঠাৎ ব্যথায় মহেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

'তুমি আমার বাবা ব'লে তোমায় মারল ? কে কে মারল ?'

মহেশ চৌধুরী চোখ বুঝিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরা সবাই ভাল লোক, অকারণে কখনো মারত না। যোগেন, দীনু, কালীপদ, রমানাথ আর নগেনের সেজমামা ছিল,—কি যেন নাম লোকটার ? আমি তো ওদের কোনদিন ক্ষতি করিনি, মিছিমিছি কেন ওরা আমায় দেখামাত্র পিটাতে আরম্ভ করবে ?'

নড়িতে গিয়া মৃদু একটা আর্তনাদ করিয়া মহেশ চৌধুরী চুপ করিয়া গেল।

বিভূতি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'আমি যদি ওদের তোমার মত অবস্থা না করি, তোমার ব্যাটা নই আমি।'

কাতরাইতে কাতরাইতে চোখ মেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তুমি যদি আবার ওদের পিছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মত ত্যাগ করবো বলে রাখছি।'

'তা তুমি ত্যাগ কোরো। তাই বলে ঘাড় গুঁজে এ অন্যায় সহ্য করা—'

'কিসের অন্যায় ? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর কি ? মেরেছে আমাকে, তোমাকে তো মারেনি, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার ?

'বাঃ, বেশ !' বলিয়া বিভূতি খানিকটা হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল। মহেশ চৌধুরী বলিতে লাগিল, 'তুমি ওদের পেছনে লাগবে, বদনাম রটবে আমার। সবাই বলবে আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।

বিভূতি বলিল, 'তুমি এমন কাপুরুষ !'

'কাপুরুষ ?'

'নয় তো কি ? লোকে নিন্দে করবে ভয়ে মুখ বুজে এতবড় অন্যায় সহ্য করে যাবে ! লোকের নিন্দা প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয়, আর কিছু নেই তার পেছনে !

বিভূতির মা ব্যাকুলভাবে বলিল, 'চুপ কর না বিভূতি ? কি যে তোরা আরম্ভ করেছিস !

বিভূতি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, চুপচাপ একটু ভাবিয়া বলিল, 'নিন্দা প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে পিটিয়ে দিল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোকে আমায় অপদার্থ বলবে। ভীরু কাপুরুষ বলবে।'

মহেশ সভয়ে বলিল, 'কি করবি তুই ?'

বিভূতি বলিল, 'ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে কেবল ওরা একাই জানে না।'

'তাতে লাভ কি হবে ?

ভবিষ্যতে আর এরকম করবে না।'

'আরও বেশী ক'রে করবে। তার চেয়ে সেরে উঠে আমি যদি গিয়ে হাসিমুখে ওদের সঙ্গে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কিরকম লজ্জা পাবে বল তো ?

'ছাই পাবে। ভাববে, আবার মার খাবার ভয়ে খাতির করছ।'

মহেশ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার তর্ক করার ক্ষমতা ছিল না। তখনকার মত সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু বিভূতি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আবার তাকে ডাকিয়া বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। রাগ করিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া, মিনতি করিয়া, কতভাবেই যে সে বিভূতিকে

নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল। যতই সে কথা বলিতে লাগিল বিভূতির কাছে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তার ভয়ের পরিচয়—মার খাইয়া মহেশ চৌধুরী মার ফিরাইয়া দিয়াছে মানুষের কাছে এই রকম অসভ্য বর্ব্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয়! মহেশ চৌধুরীকে এমন দুর্ব্বল বিভূতি আর কখনো দেখে নাই। শেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে।' বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। হাতাহাতি মারামারি সে নিজেও কোন দিন পছন্দ করে না, ও সমস্ত সত্যই নীচতা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি তাই? মহেশ চৌধুরী কোন অপরাধ করে নাই, কেবল তার বাবা বলিয়া তাকে যারা মারিয়াছে, উদারভাবে তাদের ক্ষমা করাটা কি উচিত? তাকে কি উদারতা বলে? তার চেয়ে ছোটলোকের মত ওদের ধরিয়া কিছু উত্তমমধ্যম লাগাইয়া দেওয়াই কি মহত্বের পরিচয় নয়, মনুষত্বের প্রমাণ নয়? ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি বুঝিতে পারিল, মাধবীলতা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত রাত্রে মাধবীলতাকে বিশ্রী ধমক দিয়া কাঁদানোর কথাটা মনে পড়ায়, ভাব করার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সে মাধবীলতার কাছে পরামর্শ চাহিয়া বসিল।

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'ওদের মেরে ফেলা উচিত, খুন করে ফেলা উচিত।'

বিভূতি হাসিয়া বলিল, 'সত্যি? কিন্তু ওরা যদি আমায় মেরে ফেলে?'

বিভূতি হাত বাড়াইয়া দিতে মাধবীলতা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যেন অধীর আগ্রহে সে এই জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। বিকারের সঙ্গে ভালবাসার তীব্রতা বাড়িয়া গিয়াছে। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়ামমতা জোরালো হয় না। এক রাত্রির অভিমান-সংক্ষুব্ধ বিরহ মাধবীলতাকে অধীর করিয়া দিয়াছে।

হাঙ্গামার ফলে নন্দনপুরে যাত্রা আর কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, সেই যাত্রা আর কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইল আশ্রমে। বুদ্ধিটা মাথায় আসিল কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের। তারা ভাবিয়া দেখিল, আশ্রমে সব গ্রামের লোকের সমান অধিকার, সেখানে বিশেষ সুবিধাও কেউ দাবী করিতে পারিবে

না, বদমাইসী করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করার সাহসও কারও হইবে না। যেদিন সকালে মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল সেইদিন দুপুরে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্ত্তন। রাত্রি আটটা ন'টার সময় যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত রাত চলিবে।

বিভূতি যখন দল বাঁধিয়া বাপের প্রহারকারীদের খোঁজে বাহির হইল, তখন পুরা দমে কীর্ত্তন চলিতেছে। বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটি অপরাধীর খোঁজ করিতে গিয়া বিভূতি শুনিল, তারা সকলে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছে। বিভূতি তখন সোজা আশ্রমে চলিয়া গেল।

আসর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কীর্ত্তনের দলটি নামকরা, প্রধান কীর্ত্তনীয়ার গলাটি মধুর আর আবেগ রোমাঞ্চকর—শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্মিবেন, যুগে যুগে তপস্যা করিয়া যোগী-ঋষিরা যার হদিশ পায় না তিনি কেন নিজে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিবেন এই কথাটা সুর করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বলিতেই সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে, গদগদ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকজনের চোখে জলও দেখা দিয়াছে।

সদানন্দের কিছু তফাতে অপরাধী পাঁচজন বসিয়া ছিল। মনে তাদের একটু ভয় ঢুকিয়াছে, মহেশ চৌধুরী যদি মরিয়া যায়। কাছাকাছিই বসিয়া চুপি চুপি ইঙ্গিতে তারা এ বিষয়ে প্রথমে একটু আলাপ করিয়াছিল, তারপর চুপ করিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছে। দলবল সহ আসিয়া বিভূতি যখন আসরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাদের খোঁজেই চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, তার উপর পাঁচজনেরই নজর পড়িল।

পাঁচজনকে দেখিয়া বিভূতি সঙ্গীদের বলিল, 'ওই যে ওরা।'

সঙ্গীদের একজন একটু দ্বিধাভরে বলিল, 'এত লোকের মাঝখান থেকে টেনে আনা কি উচিত হবে?'

বিভূতি বলিল, 'প্রথমে ডাকব, যদি আসে ভালই। না এলে ঘাড় ধরে টেনে আনতেই হবে। শাস্তিটা সকলের সামনেই দিতে হবে।'

ইতিমধ্যে সদানন্দ বিভূতিকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে—মহেশের খবর জানিবে। বিভূতিকে আশ্রমে দেখিয়া সদানন্দ সত্যই খুসী হইয়াছিল। বিভূতি মুখ তুলিয়া তার দিকে চাইতে সে একটু হাসিল। বিভূতি হাসিল না,

হাসিবার মত মনের অবস্থা তার তখন নয়, শুধু মাথা একটু কাত করিয়া হাসির জবাব দিল।

লোকটিকে বলিল, 'বলগে, একটু কাজ সেরে আসছি।'

পূর্ণেন্দু নামে একটি যুবককে বিভূতি অপরাধী পাঁচজনের কাছে পাঠাইয়া দিল। পূর্ণেন্দু গিয়া বলিল, 'মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একটু বাইরে ডাকছেন—বিশেষ দরকার।'

যোগেন ভড়কাইয়া গিয়া বলিল, 'আমাদের ডাকছে ? কেন ডাকছে।'

'দরকার আছে, আসুন।'

'আমাদের ডাকছে ? আমাদের কাদের ?

পূর্ণেন্দু একে একে আঙ্গুল দিয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া দিল, 'আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে।'

পাঁচজনেই ভড়কাইয়া গেল। আসর ছাড়িয়া কি যাওয়া যায় ? দরকার থাকিলে বিভূতি আসুক না ?

'চৌধুরী মশায় কেমন আছেন জানো ?'

পূর্ণেন্দু বলিল, 'ভাল নয়।'

শুনিয়া পাঁচজনে আরও ভড়কাইয়া গেল। এবং আরও স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে কীর্ত্তন যখন চলিতেছে আসর ছাড়িয়া যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। আশে পাশের দু'একজন এতক্ষণে গোলমালের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ণেন্দু উঠিয়া গেল।

তারপর ঘটিল অতি খাপছাড়া নাটকীয় ব্যাপার। লোকজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া বিভূতি আর তার সঙ্গীরা অপরাধী পাঁচজনের কাছে আগাইয়া গেল। চার পাঁচজনে মিলিয়া এক একজনকে ধরিয়া হ্যাঁচকা টান মারিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। পাঁচজনের মুখ তখন পাংশু হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, সকলে অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিরা বলিল, 'এই পাঁচটি গুণ্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাপকে বিনা দোষে মেরে প্রায় খুন করে ফেলেছে। আজ সকাল পর্য্যন্ত বাবা অজ্ঞান হয়েছিলেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি এদের শাস্তির বিধান করছি, চেয়ে দেখুন।' বলিয়া

একদিন সদানন্দের মুখে যেরকম ঘুষি লাগাইয়াছিল কালীপদর মুখে সেইরকম একটা ঘুষি বসাইয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিল বটে কিন্তু মারটা তেমন জমিল না। ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া গোঁঙ্গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যাদের নাই, এক-তরফা তাদের কাঁহাতক পিটানো যায়? এমনি মারিতে হাত উঠিতেছে না দেখিয়া বিভূতি একজনের একটা ছড়ি কুড়াইয়া নিল, তারপর সেই ছড়ি দিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল।

এতক্ষণে চারিদিকে হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মারের ভয়ে আশে-পাশের সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে। সদানন্দই বোধ হয় সকলের আগে তাদের কাছে আগাইয়া আসিল। সদানন্দকে আগাইতে দেখিয়া তখন অগ্রসর হইল আশ্রমের অধিবাসীরা।

সদানন্দ বিভূতিকে ধরায় বিভূতি তাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। তখন সকলের দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিতে লাগিল, 'আমার আশ্রমে এসে একজন গুণ্ডা গুণ্ডামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমাদের সহ্য হচ্ছে? আমার যদি একজন ভক্ত এখানে থাকে—'

উত্তেজনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তার উপর সদানন্দের অনুপ্রেরণা। একটা গর্জ্জনের মত আওয়াজ উঠিয়া এলোমেলো গোলমালটা একেবারে ঢাকিয়া দিল। শ'চারেক লোক আগাইয়া গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীদের দিকে। বিভূতিরা দলে যে বিশেষ ভারি নয় সেটা টের পাইয়া সকলের মধ্যেই অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। বাকী পাঁচ শ' ছ'শ লোকের মধ্যে তিন চার শ' স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, বাকী সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা।

মাঝে মাঝে শোনা বাইতে লাগিল: 'মার শালাদের।' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া বাঙ্গালী দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি আরম্ভ করিতে পারে না।

জনতা যখন আক্রমণ করে তখন দেরী হয় শুধু আরম্ভ করিতে, একজন

যতক্ষণ আসল ব্যাপারটা হাতেনাতে সুরু করিয়া না দেয় ততক্ষণ চলিতে থাকে শুধু হৈ চৈ আস্ফালন। তবে এরকম অবস্থায় আরম্ভ হইতেও যে খুব বেশী দেরী হয় তা নয়,—দু'এক মিনিটের মধ্যেই কারোর না কারোর উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যায়। ব্যাপার যে কি রকম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিভূতি আর তার সঙ্গীরা ভাল করিয়াই টের পাইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এখন আর উপায় কি? পালানোর চেষ্টা করিলে কয়েকজন বাঁচিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা তো আর করা চলে না। তার চেয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে মরাই ভাল।

পালানোর চেষ্টা করা চলে না কেন? বিভূতির ভক্তরা সকলে কি মনে করিবে! মানুষের নিন্দা প্রশংসা সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর দুর্ব্বলতা দেখিয়া সেদিন সকালে বিভূতির লজ্জা আর দুঃখ হইয়াছিল, এখন সে চোখের পলকে বুঝিতে পারে, অনুগত যুবক সমাজের নিন্দা প্রশংসার ভাবনাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাদের এত বড় বড় কথা শুনাইয়াছে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বুক ফুলাইয়া যাদের সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়া আসিয়াছে, এখন বিপদ দেখিয়া তাদের ফেলিয়া পালানোর কথা ভাবিতেই হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে। অথচ এ ভাবে মরণকে বরণ করা নিছক বোকামি। রেল লাইনে ট্রেণের সামনে দাঁড়াইয়া সাহস দেখানোর মত।

সদানন্দও নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। দু' হাত মেলিয়া বিভূতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে ঠেকানোর কল্পনাটা মনের মধ্যে আসিয়াই অন্য একটা কল্পনার তলে মিলাইয়া গেল। চোখের সামনে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, অথচ এই অবস্থাতেও সদানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে এ জগতে মাধবীলতার একজন মাত্র মালিক আছে, তার নাম বিভূতি। বিভূতির যদি কিছু হয়, মাধবীলতার তবে কেউ আর কর্ত্তা থাকিবে না। চিন্তাটা মনে আসিতে সদানন্দ একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘটিল আরেকটা কাণ্ড। হাতে আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মহেশ চৌধুরী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পাগলের মত আসিয়া হাজির হইল।

খানিকটা তফাৎ হইতেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল, 'ওরে, রাখ্, রাখ্। ওরে বিভূতি, রাখ্।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা সহানুভূতিতে। বিভূতি প্রথমে সকলকে শুনাইয়া যা বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীকে দেখিয়া সেই কথাগুলি সকলের মনে পড়িয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা।

চাঁদ

দিগন্তে নিস্তব্ধ নভে দেখা দিল চাঁদ,—
সন্ধ্যার তিমির-তীরে তরণী সোনার
অতীত-স্মৃতির লিপি ব'য়ে পৃথিবীতে।
বাতায়নে জ'মে ওঠে প্রণয় অগাধ।
কবি আর রূপসীরা হ'ল ছারখার
উত্তেজিত হৃদয়ের বেদনার শীতে।
যুগ-যুগান্তের চাঁদ মানুষের মনে
জ্বলন্ত জোয়ার হানে স্মৃতির গহনে॥

আবার বিষণ্ণ নভে দেখা দেবে চাঁদ,—
বিশাল শর্ব্বরী ঘিরে স্তিমিত আলোক
জনহীন পৃথিবীর প্রান্তে প'ড়ে রবে।
সেইদিন কবি আর রূপসীর সাধ
স্মরণের বাতায়নে জানাবে না শোক।
যুগ-যুগান্তের চাঁদ সেদিনো নীরবে
দেখা দেবে মহাকাশে,—সোনালি পাথর!
নীচে জনশূন্য ধরা নিস্পন্দ নিথর॥

মণীন্দ্র রায়

শিবির

আমি শুনি ক্লান্ত ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে নীলরক্ত ঘিরে ঃ
জটায়ু আকাশ ছিন্ন, নিরঙ্কুশ বিষণ্ণ শিবিরে।
শুষ্ক ত্বকে চৈত্র-সূর্য্য,তপ্তস্বাদ—বসন্ত মেখলা,
জনহীন অরণ্য-মর্ম্মর,
উর্দ্ধশ্বাস মিছিলের পদধ্বনি করেছে উর্ব্বর।
তপ্তস্বাদ বালুরাজ্য নগ্নতার প্রচ্ছন্ন বিলাস
শকুনের শ্যেনদৃষ্টি :
জনহীন বসন্ত বাতাস।

সিক্ত-হাতে উজ্জ্বল মশাল, ঋজু দেহ দিনের ধনুকে
স্বর্ণবাহী গর্দ্দভের স্বেদসিক্ত ভ্রষ্ট অগ্রগতি
জাতিস্মর মনে ছায়া :
অকস্মাৎ অদ্ভুত আকাশ।

তারাতীর্থ রাত্রি ঘোরে। বারবার হানা দিল দ্বারে
শীতশেষে প্রবীণ ফাল্গুন : উজ্জ্বল সূর্য্যের সভা,
পত্রশিশু ঋজুদেহ কম্পিতপল্লব।
অনেক বসন্ত-জীর্ণ পৃথিবীর অক্লান্ত মর্ম্মর
অনেক বসন্ত-জীর্ণ আমাদের অস্পষ্ট মিনতি।

ঋজু দেহ দিনের ধনুকে
শুষ্ক ত্বকে চৈত্র-সূর্য্য।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অবসর

অবসর চাই, চাই ঘন অবসর,
মৃত্যুর মত অকপট অবসর।
বিরামবিহীন বাহিরের কোলাহল
জীবনে এনেছে কুটীল প্রদাহী জ্বর।

অবিরাম জ্বর পলে পলে ক্ষয় আনে,
আনে পলে পলে নিশ্চিত ধীর ক্ষয়,
জীবনের রস নিঃশেষে নেয় চুষি',
মেসিন যেমন ইক্ষুর রস টানে।

গঙ্গার ধারে এই ছোট ঘরে আজ
কাঁচের জানলা টেনে দাও এঁটে ক'সে।
বাহিরে জগৎ গরজি' মরুক ক্ষোভে,
আমার জগতে সে রোল না যেন পশে।

আঁধার মাখানো সুনিবিড় অবসর
আমার কামনা। কালো অবসর চাই,
কীট্‌সের কালো সুগন্ধ অবসর
মৃত্যুর সাথে প্রেমে পড়িবার মতো।

আমার এ ঘরে জ্বালিও না কোনো আলো,
শুধু জ্বেলে দাও ধূপ-কাঠি গোটা কয়।
নীনামণি, সখি, তুমিও এসো না কাছে
তোমার কাকলী আজি লাগিবে না ভালো।

মৃত্যুর প্রেমে পড়িবার এককতা,
অসহ মধুর অন্ধকারের ফাঁকে,
যে জীবন শুধু থেকে যায় দূরে দূরে
অনুভূতিহীন অনুভব করি তাকে।

রবীন্দ্রনাথ সরকার

কলিকাতা।
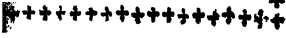
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সাধারণের চোখে পড়ে। তাতে অনেকেই শক্তির ও নতুনত্বের আমেজ পান। ক্রমে সেটি বিকশিত হ'য়ে লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সহায়তা করেছে। বাংলা দেশে তাঁর বই কি রকম বিক্রি হয় জানি না, কিন্তু এমন একাধিক অ-বাঙ্গালী দেখেছি যাঁরা তাঁর রচনা সম্বন্ধে নিতান্ত আগ্রহশীল। অনেক দিন ধ'রে তাঁর বিশেষত্ব কি বুঝতে ও বোঝাতে উৎসুক হয়েছি, কিন্তু পারি নি। কাজটা কোন ক্ষেত্রেই সোজা নয়, মাণিকের বেলা আরো শক্ত, কারণ, প্রথমত, তিনি এখনও অপরিণত, দ্বিতীয়ত, তাঁর আঙ্গিক আমাদের কাছে অপরিচিত। সেই জন্য একটু গোড়ার কথা বলার প্রয়োজন।

দুটি চরিত্রের সংঘাত—এই হ'ল নাটকত্বের প্রাণবস্তু। তাই থেকে একটি চরিত্রকে তুলে নিয়ে প্রতিবেশী সংস্থানকে বসালে দ্বন্দ্ব থাকে বটে, কিন্তু নাটকত্ব গল্পের দিকেই ঝোঁকে। যদি পারিপার্শ্বিককে চেপে রাখা যায় তখন একটি চরিত্রের অন্তরের বিভিন্ন টুকরো মানুষের বিরোধটাই নাটকত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এলিজবীথান যুগের নাট্যকার এবং ইবসেন ও পিরাণ্ডেলোর নাম উল্লেখ করা চলে। গ্রীক নাটকের গোড়ার দিকে ছিল নিয়তির বিপক্ষে বিদ্রোহ, কিন্তু নিয়তির কার্য্যাবলী ছিল মানবিক। ইবসেনের সময় সমাজ ঝানু হয়েছে, তাই সামাজিক বাধার শক্তি হ'ল ভীষণ, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বোধ ও গল্পাংশ বৃদ্ধি পেল। পিরাণ্ডেলোর বেলা মানুষের মন ধাক্কা খেয়ে সঙ্কুচিত ও বিখণ্ডিত। সমাজ-যোগ বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এই নাটকত্ব আন্তরিক, অ-স্বাভাবিক ও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। নিতান্ত সাধারণভাবে মন্তব্যলিপি লিখলাম। হাজার ব্যত্যয় থাকলেও মোটামুটি এইগুলি গ্রহণ করা যায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ইঙ্গিত আছে যে নাটকের ছায়াতেই নভেল বেড়েছে। খুবই স্বাভাবিক। সমাজবন্ধন যখন দৃঢ় হয়নি

তখন পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্য নিয়ে বিরোধটাই প্রত্যাশা করা যায় ; যখন হয়েছে, তখন ব্যক্তিগত বিরোধ সামাজিকতার মধ্যে বিস্তারিত ; যখন আবার অত্যন্ত দৃঢ় তখন নোরা ও ক্লিটেমনেষ্ট্রা স্বধর্ম্মী। অন্য দিক থেকেও তাই। ঘটনার দ্রুত স্রোতে পাঠকের মন ভেসে গেলেও আগ্রহ ঘনীভূত হয় সংঘাতের আশায়। যে কেউ কথকতা শুনেছেন, কিংবা বিখ্যাত ঐতিহাসিক নভেলের পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন ও তার পরিবর্ত্তে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে রাত কাটিয়েছেন বলতে কুণ্ঠিত নন, তিনিই স্বীকার করবেন যে সংশয়, বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনোভাব জাগ্রত না হলে গল্পের মজা পাওয়া যায় না। ছোট গল্পের বেলা ত' বটেই, নাটকত্বই তার কৃতিত্ব। এমন কি অতি-সভ্যতার চাপে মনের ওপর যখন মেউড়ি পড়েছে, সাধারণ জীবনযাত্রায় যখন উত্তেজনাই আসছে না তখনও সমস্ত খবরের কাগজের মধ্যে চোখে পড়ে চার্চ্চহিল-হিটলার সংবাদ ও খুনী মোকদ্দমার বিবরণ। নাটকীয় বিরোধের আশীর্ব্বাদেই নভেল, গল্প বেঁচে আছে। একে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না।

কিন্তু এও ঠিক যে জীবনে এত একঘেয়েমী আছে ও সেটা এতই বেড়েছে যে বড় রকমের সংঘাতের অবকাশ আর নেই। গত মহাযুদ্ধে ফোশ, হেগ্‌, হিণ্ডেনবর্গ, লুডেনডর্ফ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষের নাম মুখে মুখে ঘুরত, এখন কারুর মনেই থাকে না। শুনি এটা যান্ত্রিক যুগেরই ফল। চাষ-বাসের যুগেও একঘেয়েমী ছিল, যদিও ভিন্ন ধরণের। সে যাই হোক, বর্ত্তমানে সংঘাত কমেছে বটে কিন্তু চাপ বেড়েছে। সে-চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত, কিন্তু সক্রেটিক পদ্ধতিতে তার বিপক্ষে মাথা তুলে মুখে বিষ ঢালতে কেউ সহজে রাজি নন। প্রধানতঃ নাটকের পরিসর সঙ্কীর্ণ বলেই চাপ, প্রভাব প্রভৃতি সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক দ্বন্দ্ব ভাল খোলে না। যেটা ওতঃপ্রোত তার জন্য স্থান হওয়া চাই প্রশস্ত। একদম অসম্ভব বলছি না, কারণ চেখভ-এর চেরী অর্চার্ড প্রভৃতি নাটক সার্থক। সহজসাধ্য নয়ই বলছি। নভেলের কিন্তু ঐ ধরণের সীমা নেই, তাই নভেলে 'চাপ'টা দেখান যায় ভাল। এই হিসেবে হেনরী জেম্‌স্ বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ নভেলিষ্ট। তিনি প্রভাবের আর্টিষ্ট, যে-প্রভাব হাওয়ায় থাকে, অজানিতে, অথচ সুনিশ্চিতভাবে অপরের জীবনে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়, যার ফলে ব্যক্তিগত চরিত্রের কোণ যায় খ'সে, সোজা কাঁধ যায় বেঁকে, বাঁকা

কাঁধ হয় সোজা, দৃষ্টি হয় উজ্জ্বল। কিংবা ক্ষীণ স্বর হয় মিষ্টি কিংবা রুক্ষ। এই প্রকার সামান্য ও তুচ্ছ পরিবর্ত্তনের সমষ্টিই পরিণতির পরিচয়। হেনরী জেমসের নায়ক নায়িকার নামই মনে থাকে না, কারণ তাঁদের পরিণতি তীব্র সংঘাতের অভাবে আকস্মিক নয়। এই পদ্ধতিতে পাঠকের আগ্রহ জমে ওঠে স্রোতের অন্তে, বই বন্ধ করার পর। ক্ষুদ্র ঘটনকে বড় নক্সার অঙ্গ না ভাবলে জেমসীয় পদ্ধতিকে অবান্তরের ভিড় জমান ব'লে ধারণা হয়। লেখকও বুদ্ধির সাহায্যে ঘটনা নির্ব্বাচন করেন। রচনার দোষে যে-রূপ ফুটবে তাকে বহু-পূর্ব্বে কল্পনার অন্তর্গত করাই শক্ত, বিশেষত যখন এই পদ্ধতিতে লেখকের মনে কোনোপ্রকার বাঁধাধরা প্ল্যান্ থাকে না, তার উপর আবার তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক পরিপূর্ণতার যোগ স্থাপন করা—এতটা বুদ্ধি-সাধনার প্রয়োজন বোধ হয় অন্য কোনো রচনা-পদ্ধতিতে নেই। প্রতি মুহূর্ত্তে লেখক মনকে সতর্ক রাখবেন, নচেৎ সব এলোমেলো হবে—গল্প একটা সময়ের পর নিজের তাগিদে চলতে চায়, তাকে স্বাধীনতাও দিতে হবে, না হলে গতি মন্দা হবে, আবার নাগাল বেশী ছাড়লেও চলবে না, পাগলের খেয়াল হয়ে উঠবে। এই প্রকার নানা বিপদ কাটাবার জন্য একমাত্র মার্জ্জিত সচেতনতাই সাহায্য করতে পারে। অতটা মনঃসংযোগ জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাই এই সব নভেল বুদ্ধিসর্ব্বস্ব, উঁচকপালে দুর্ণাম অর্জ্জন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভাব-ধর্ম্মী নভেলই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী।

প্রভাব-ধর্ম্মে জাতিভেদ আছে অবশ্য। ডি. এচ. লরেন্স-এর আঙ্গিক প্রুস্ত-এর আঙ্গিক থেকে পৃথক। লরেন্স-এর মূল ছিল ব্যক্তি। দুজন মানুষ, বিশেষতঃ স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধের চাপই ছিল তাঁর প্রধান কারবার। প্রুস্তের ছিল আব্হাওয়া; বড়লোকের বাড়ীতে প্রকাণ্ড হলে নাচ গান হচ্ছে, রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি, সেই রাস্তায় দুটি পরিবার পায়চারি করে—এই প্রকার সমবেত প্রভাব কখনও কাটাকাটি হচ্ছে, কখনও বা জুড়ে যাচ্ছে—কিন্তু প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। ফক্নারের আঙ্গিক সমগোত্রের না হলেও সমজাতীয়। প্রাজনিক উত্তরাধিকার, পারিপার্শ্বিকের শত্রুতা প্রভৃতি অবাস্তব ও প্রশস্ত প্রভাব তাঁর রচনায় গ্রীক্ নিয়তির কাজ করে। এই সম্পর্কে স্ত্রী সাহিত্যিকের উল্লেখ একান্ত কর্ত্তব্য। ভার্জ্জিনিয়া উল্ফ, ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড, ডরথি

রিচার্ডসন, ডেলাফিল্ড প্রভৃতি লেখিকা প্রভাব-ধর্ম্মী। আমার বিশ্বাস মেয়েদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিক গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক।

কেবল তর্কনীতির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রভাব-ধর্ম্মের প্রসার আশা করতে পারি। এমন একঘেয়ে জীবন, নাটকীয় সংঘাতের এমন ছুর্ভিক্ষ, এমন মেয়েলী স্বভাব, এমন সঙ্কীর্ণতা, এমন অনুকরণপ্রিয়তা আর কোথায় পাব? কিন্তু বাংলা দেশে যা আশা করা যায় তা ফলে না। প্রতিবেশী ঘটনার কিংবা চরিত্রের আবহাওয়া ওতঃপ্রোতভাবে নভেলের ঘটনা কিংবা চরিত্রকে ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে, ও তারই জোরে পরিবর্ত্তিত করছে এমন কোনো সার্থক বাংলা দৃষ্টান্ত নজরে পড়েনি। চেষ্টা যেন একবার হয়েছিল মনে হয় শৈলজানন্দের হাতে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করলেন। তাঁর 'ষোল আনা' কিংবা 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' তখন গৃহীত হল না। বাংলা নভেলের পক্ষে এটা দুঃখের বিষয়। যে-কাজ শৈলজানন্দ পারেন নি সে কাজে আজ মাণিকলাল অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছেন। আজকালকার বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র প্রভাব ও চাপের লেখক। এই ভাবে দেখলে মাণিকলালের কৃতিত্ব ধরা পড়ে, তাঁর দোষেরও স্খালন হয়।

আমি মোটেই বলছি না যে মাণিকলাল পূর্ব্বে যাঁদের নাম করেছি তাঁদের মতন একজন বড় আর্টিষ্ট। তাঁর রচনায় অনেক দোষ। হাওয়াতে অনেক পকেট আর গর্ত্ত আছে বলেই প্রভাব-বর্ণনা শিথিল হলে চলে না। লেখকের দুর্ব্বলতা প্রভাবের দুর্ব্বলতা এক বস্তু নয়। প্রভাবটা স্ত্রীসুলভ, তাই মাণিকলালেরপ্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-চরিত্রই জীবন্ত, স্ত্রীজাতির মোহটাই প্রহেলিকা, মাণিকলালের স্ত্রীচরিত্রকে ধরা ছোঁয়া যায় না—কিন্তু সেজন্য সব স্ত্রীচরিত্রই এক ছাঁচের হবে, এবং প্রহেলিকার বদলে তাঁরা সকলে একটু এলোমেলো, ছিটগ্রস্ত হবেন এমন কিছু কথা নেই। যদি তাই হন তবে বুঝব তাঁদের স্রষ্টার রচনাশক্তিতে না হোক চিন্তাশক্তিতে গলদ আছে।

মাণিকলালের প্রায় সব রচনাই পড়েছি। পড়ে আমার সন্দেহ হয়েছে যে তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর অসমতা ধারণার অক্ষমতা থেকে উৎপন্ন। তিনি প্রকৃত জিনিষটা ধরেছেন, কিন্তু মুঠো তাঁর আলগা হয়ে যায় এইজন্য যে শক্ত মুঠির শিক্ষা তাঁর নেই।

এ-যুগের উপযোগী রচনার জন্য অভিজ্ঞতার মূলধন কিংবা ঐশী শক্তিটাই যথেষ্ট নয়। সজ্ঞানতার প্রয়োজন এ-যুগে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মাণিকলালের চৈতন্য মার্জ্জিত নয়—নচেৎ 'পদ্মানদীর মাঝি', 'কুষ্ঠ রোগীর বৌ'-এর মতন লেখায় তাঁর য়ুটোপীয়া-প্রীতি সংযত হত, বর্ণনার বুকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুরি বসত না, যেমন বসেছে 'অহিংসা'য়। তাঁয় রচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ চাপের ওজন কতটা হতে পারে একমাত্র তাঁর রচনাতেই ধরা পড়ে! প্রমাণ? 'কেরানীর বৌ', 'সহরতলী', 'পুতুল নাচের ইতিবৃত্তে'র একাধিক অংশ, 'টিকটিকী', 'সিঁড়ি'।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জ্বালাতন

পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা ভারি জ্বালাইতেছে। আসিয়া পর্য্যন্তই কিছু কিছু উপদ্রব লক্ষ্য করিতেছিলাম, গ্রাহ্য করি নাই—ইদানীং দেখিতেছি বড় বাড়াইয়াছে।

শাসন করা দরকার।

স্বধু দরকার নয় রীতিমত প্রয়োজন। মুখ বুজিয়া এত অত্যাচার সহ্য করা কঠিন। মুস্কিল এই, একবার ভালরকম শিক্ষা দিয়া দিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিতেছি না।

মৌখিক পরিচয় তো নাই—থাকিবেই বা কোথা হইতে? বাড়ীওয়ালা ছোকরা এই অল্প বয়সেই হিসাবী কি কম? বাড়ীখানাকে নিক্তির ওজনে মাপিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, চুল চেরা ভাগে এমন পার্টিশন তুলিয়া রাখিয়াছে যে পাশাপাশি বাস করিয়াও কাহারও সহিত কাহার মুখ দেখাদেখির পথ রাখে নাই। গলার স্বর শুনিয়া কানে তালা ধরিয়া যাইবে—স্বরের অধিকারী কিন্তু চিরঅজানা চিররহস্যময়।

স্বধু একটি জায়গায় তাহার বুদ্ধির বাহাদুরীকে কাবু করিয়া রাখিয়াছে—সিঁড়িটি ভাগের। বাড়ীর বাসিন্দাদের এইখানেই যা—মৌখিক না থাক্ চাক্ষুষ পরিচয়।

যখন তখনই 'আপ্ ট্রেণ' ও 'ডাউন ট্রেণে' কলিশন ঘটে। 'সহসা' 'হঠাৎ' 'দৈবক্রম' 'অনবধানতা বশতঃ' ইত্যাদি বিশেষণগুলা যতক্ষণ অভিধানে রহিয়াছে ততক্ষণ সংসারী জীবের অনেক কিছু সহ্য করিতে হয়, উপায় কি? একলা মানুষ আস্ত একখানা বাড়ী নেওয়া তো সোজা নয় কিন্তু তাই বলিয়া সদা সর্ব্বদা ইচ্ছাকৃত দৈবক্রমটা সহ্য করাই কি সোজা?

যে যে সময়টিতে আমাকে সিঁড়ি পার হইতে হয়, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই যে লোকেদের সিঁড়িতে যত দরকার পড়িয়া যায়, বারমাস এই কথা মানিয়া লইব না কি? এ্যটর্নীশিপ্ পড়ি, ঘাস তো খাই না! ভাবি যে—একদিন শুনাইয়া দিব কথাটা—ভদ্রতায় বাধে।

ভগবান লোকটা পুরুষ মানুষ বলিয়াই বোধ করি—স্বজাতির শরীরে ভদ্রতা জ্ঞানটা পরিমাণে কিছু বেশি দিয়াছেন ; কিন্তু অজ্ঞান স্ত্রীজাতি সে তত্ত্ব বুঝিলে তো ? ভাবে সাহসের অভাবে চুপ করিয়া আছে—এবং নিজেদের সাহসের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়াইয়া তোলে।

ঘরের দরজায় চাবি দিয়া যাওয়ার কথাটা আমি না হয় প্রায়ই ভুলিয়া যাই, তাই বলিয়া রাস্তার লোকের তো এমন কোন রাইট্ থাকিতে পারে না যে ঘরে ঢুকিয়া যাহা খুসি করিয়া লইবে ?

উহাদের ঘরে স্থানাভাব, গোলমাল, পরীক্ষার পড়া হয় না—সে অপরাধ আমার নয়। বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া উঠিয়া গেলেই পারে। আমার ঘরে আসিয়া পরীক্ষার পড়া তৈয়ারি করিবার স্বাধীনতা উহাকে কে দিয়াছে শুনি ?

সুধু তাই নয়, শুনিতেছি না কি ড্রয়ার খুলিয়া অবাধে ছুরি, পেন্সিল, এটা সেটা ব্যবহার করে, ফাউণ্টেন পেনে যথেচ্ছা কালি ভরিয়া লয়, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করিয়া চিঠির কাগজগুলা ছেঁড়ে—সবচেয়ে মারাত্মক কথা চাবির রিং হইতে চাবি চিনিয়া বইয়ের আলমারী খোলে।

এত কথা জানিতাম না—জানিবই বা কেমন করিয়া ? আমি থাকিলে তো আর এ অঞ্চলের ছায়া মাড়াইবার সাহস নাই।

খবর দিয়াছেন আমাদের গোস্বামী মহাশয়। প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত নদীয়া গোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন। তিন তলায় ঠিক আমার সামনা সামনি অংশে বাস করেন উনি।

আমাদের মত সংসারকূপমগ্ন অন্ধ জীব নয় যে, সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সহস্র কাজে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবেন। সন্ধ্যাবেলা খরম পায়ে দিয়া একটা হাত-কাটা বেনিয়ান ও সাদা চাদর গায়ে চড়াইয়া ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসেন রাজাই চালে। ভাড়ার জন্য চিন্তা করিতে হয় না—ভক্তরাই দেয়। প্রধান পেশা পাঠকগিরি, মাঝে মিশেলে না কি কীর্ত্তনও করেন। ঘণ্টা দুই তিন খাটিয়া আসিলেই তাঁহার পয়সা খায় কে ?

কাজেই সারাদিনই তাঁহার প্রচুর অবসর। বেচাল মেয়েটার গতিবিধি লক্ষ্য করেন অবশ্য কর্ত্তব্যের খাতিরেই। জীব তরাণো যাঁহার চিরজীবনের পেশা, না তরাইয়া উপায় আছে তাঁহার ? আমার ভালর জন্য—মানে সম্পূর্ণ

অনাত্মীয় একটা বাহিরের লোকের জন্য জানালার খড়্খড়ি তুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়াইয়া থাকা !!

ভাবিতে পারি আমরা ? ধৈর্য্য থাকে ? সুধু দেখেন নয়, সুবিধা পাইলেই আমাকে সাবধান করিয়া দিতেও ছাড়েন না। কেবল আমি লোকটা নেহাৎ 'গেঁতো' বলিয়াই এ যাবৎ কিছু বিহিত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

এই আজই তো সকালে—টিকলো নাকের উপর সূক্ষ্ম রেখায় তিলক আঁকিয়া অষ্টাঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ছাপ আঁকিয়া, গোস্বামী মহাশয় নামিয়া অধমের ঘরে পদধূলি দিয়া কহিলেন—এই যে 'অমুক বাবু' আপনাকে আবার দুটো কথা বলতে এলাম—

ব্যস্ত তটস্থ ভাবে তাঁহার উপযুক্ত আসন খুঁজিতে হতাশ নয়নে, ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলাম। বাস্তবিক একখানা কম্বলের আসন না থাকাটা ভারি ভুল হইয়া গিয়াছে! থাকিলে তো চেয়ারের উপর পাতিয়া দিয়া হিন্দুয়ানী বজায় রাখা চলিত।

তবে গোস্বামী মহাশয় করুণার অবতার। ধূলিশূন্য একখানি চেয়ারে ফুঁ দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—

—থাক থাক ব্যস্ত হবেন না, কাষ্ঠাসন অপবিত্র হয় না, ওই কারণেই যানবাহনাদিতে কাষ্ঠাসন ব্যবহারের প্রথা।" বলিয়া উপর্য্যুপরি দুই টিপ নস্য লইয়া, টেবিলের উপর মুঠা খানেক ছড়ান।

অতঃপর কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা হইবে জানি, ভাবিলাম দিই খানিকটা আগাইয়া। গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বেলা করিয়া দিবে, এখনো দাড়ি কামানো হয় নাই।

সরঞ্জামগুলা বাহির করিয়া গুছাইতে গুছাইতে কহিলাম—বেশ ছিলাম আপনাদের আওতায়, সাধুসঙ্গ একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখছি উঠে যেতেই হবে।

ভাগবতরত্নের উৎসাহ-পুলকিত মুখখানি করুণ করিয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিটোল গোল হইয়া উঠে।

—বাসা ছেড়ে দেবেন? বলেন কি—বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড়ই পরিতাপের বিষয়। অন্য কোথাও ঠিক করে ফেলেছেন নাকি ?

—ঠিক হ্যাঁ—মানে ঠিকই এক রকম, এবারে মনে করছি আলাদা একখানা বাড়ীই নেব। বড় উৎপাত। হাসি গোপন করিতে হাতের প্লেটখানা মাটিতে ফেলিয়া কুড়াইতে হেঁট হই।

ভাগবতরত্ন দুই কর যুক্ত করিয়া একবার কপালে ঠেকাইয়া আন্তরিক ভাবে সায় দিয়া কহিলেন—ঠিক বলেছেন 'অমুকবাবু' যথার্থ বলেছেন—বড় উৎপাত। বাসা আপনি বদলেই ফেলুন, আজকালের মধ্যেই ফেলুন। জীবনের প্রধান কাম্য হচ্ছে শান্তি, বুঝলেন কি না ? হ্যাঁ, গত কালকের কথাটা শুনলেন না আদ্যোপান্ত। আপনিও বেরোলেন, আর ছুঁড়ি সেই খ্যাঁদা ভাইকে টানতে টানতে এনে হাজির আপনার পোরশানে। ঘরে তো চাবি দেবেন না কস্মিন্‌কালে! চুরি গেলেই আপনার শিক্ষা হয়। আচ্ছা আপনার টেবিলে ন্যাবণচুষ টুস্ থাকে না কি ?—গোস্বামী মহাশয়ের স্বর ঈষৎ কৌতূহল মিশ্রিত সন্দিগ্ধ।

—থাকে—না, কাল ছিল। এনেছিলাম আমার এক 'ইয়ের' জন্যে। সেটিও চক্ষুদান করেছে? কী সর্ব্বনাশ, বোতলটাই যে নেই!! এযে দিনে ডাকাতী। আপনিই বলুল গোস্বামী মশাই, আর টেঁকা যায়?—এখানে যে টিঁকে রয়েছেন এই তো বাহাদুরী আপনার।

নিমীলিত নয়নে উত্তর দেন প্রভুপাদ।—ঠিক বলেছেন, বাসাই বদলান দরকার হয়েছে আপনার, জীবনের প্রধান কাম্য হচ্ছে শান্তি, আহা—শান্তিময় গৌরহরি হে।—হ্যাঁ, কথাটা শুনুন শেষ অবধি—ল্যাবনচুষের বোতল উজাড় করে ভাইকে বসিয়ে দিয়ে আলমারী খুলে রাজ্যের বই বার করে ইজিচেয়ারে লম্বা। আঃ কি বলবো যে 'পরকন্যা,' ওই মেয়েকে সায়েস্তা করে দিতে পারতাম—হরি হে—কিছু পারমার্থিক উপদেশ দেওয়া দরকার ছুঁড়িকে। আর সারাদিন জোর তলবে ফ্যান্ খুলে কলের গানের আদ্যশ্রাদ্ধ করে।

আমি আর একবার আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম—আবার পাখাও খোলে? বলেন কি গোস্বামী মশাই, ডাকাত কি—এ যে খুনে মেয়ে! তাই গেল মাসে আমার ইলেকট্রিক বিল ডবল হয়েছিল। বাসাটা তা হলে ছাড়তেই হ'ল।

নিশ্চয় নিশ্চয়, আজই চেষ্টা দেখবেন—শুভস্য শীঘ্রং, আমাদের কিঞ্চিৎ মনোবেদনা হবে—সে যাক্, শ্রীগৌরের কৃপায় মায়ায় আর কিছু করতে পারে না।

গোস্বামী মহাশয় উঠিলেন। আমিও হাঁফ্ ছাড়িলাম।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি মেয়েটাকে শাসন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততা অনুভব করিতেছি। জীবনের প্রধান কাম্য শান্তি—গোস্বামী মহাশয় মিথ্যা বলেন না, হাজার হোক পণ্ডিত লোক। মায়ামুক্ত জীব। এই তো—বিপত্নীক হওয়াবধি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। ছুই তিনটি অবোধ সন্তান মাতুলালয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে—দেখিতে যান? (ভাষাটা তাঁহারই ব্যবহার করিলাম) কখনই না।……

যাক্ কি বলিতেছিলাম—নূতন নূতন কয়খানা বই লইয়া আসিয়াছিলাম—কবিতার বই; দেখিতেছি টেবিল হইতে উধাও। একটা লেডিস্ পেন্ আনিয়াছিলাম—দেশে বৌদিকে পাঠাইয়া দিবার জন্য। তাহারও একই গতি। ঘরের পাশে এরূপ চোর লইয়া ঘর করা সম্ভব? কোনদিন আরো কি মূল্যবান বস্তু চুরি করিয়া বসিবে কি না কে জানে?

কিন্তু বাসা বদলাইবার পূর্ব্বে উহাকে একটা ভালমত শাস্তির বন্দোবস্ত না করিলে? কাপুরুষ ভাবিয়া হাসিবে কি না? অথচ এইসব আধুনিক তরুণীদের জব্দ করিবার উপায় খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কিছুতেই দমে না। উহার নিরীহ ভালমানুষ বাবাটিকে জানাইব? না তাহার পূর্ব্বে দেশে চিঠি লিখিয়া বৌদির কাছে পরামর্শ চাহিব? মেয়েরা মেয়েদের তথ্য বোঝে ভাল।

কিন্তু ওই গেঁতোমি, ওতেই আমার সব মাটি করিবে। শাসন প্রণালী সম্বন্ধে মনে মনে যত কিছু আইডিয়া করিতেছিলাম—সব ভস্মে ঘি ঢালা হইতে বসিতেছে। মাথায় হাত দিয়া বসিলাম।

মাঝে প্রভুপাদ নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, কাজেই দিন ছয়েকের রিপোর্ট পাই নাই, তা ছাড়া বাসা বদল করিতে বিলম্ব দেখিয়া ইদানীং যেন কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। জীবের অজ্ঞানতায় মহাপুরুষ ব্যক্তিদের বিচলিত করে বই কি।

কিন্তু নূতন কোন উপদ্রবের চিহ্নও লক্ষ্য হইল না। আসামী ভয় পাইল না কি? কারণ তো কিছু নাই—

আছে কারণ। প্রভুপাদ ফিরিবার পর শুনিলাম—মানে তিনি নিজে জানান নাই, উঁহারা গুপ্ত সাধক, সহজে আপনাদের ব্যক্ত করেন না। শুনিলাম

তাঁহার ভক্ত নিত্যানন্দের নিকট। জীবহিতার্থে গোস্বামী মহাশয় নিজেই মেয়েটার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হউক অনাত্মীয়া—তবু ভদ্রকন্যা বিপথগামী হইতেছে—চক্ষে দেখা কঠিন—অতএব যাহাতে অহোরাত্র উহার শ্রবণবিবরে পারমার্থিক উপদেশাবলী ঢালিয়া দিবার সুযোগ ঘটে তৎকারণ তাহার ঐহিক এবং দৈহিক উভয়বিধ ভারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

হতভাগা মেয়েটার অকালকুষ্মাণ্ড বাবাটির আপত্তি নাই, থাকিবার কথাও নয়, ভাগবতরত্ন শুনিলাম তাঁহার জন্য কিছু আর্থিক উপদেশ হাতে রাখিয়াছেন।

আপত্তি তাঁহার স্ত্রীর, কিছুদিন হইল তিনি প্রভুপাদের নিকট না কি দীক্ষা লইয়াছেন—কে কাহাকে প্রণাম করিবে—এই সমস্যায় পড়িয়া তাঁহার মত-বিরোধ।

মরুক্ যে যাহার সমস্যা লইয়া, আমার কি হইল? মেয়েটা এত কাণ্ড করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইবে? কিনা আমারই নাকের উপর দিয়া ড্যাং ড্যাং করিয়া গোঁসাই গিন্নি হইয়া বসিবে—আর আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিব, ট্যাঁ—ফোঁ করিবার জোটি থাকিবে না?

অসম্ভব। "অলসতা ত্যজি, রণসাজে সাজি, হও আগুয়াণ অকুতোভয়ে—" কিন্তু বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না—সময় অল্প, চিঠি লিখিবার সময় নাই। বৌদিকে টেলিগ্রাম করিলাম—পাঠমাত্র চলিয়া আসিও। অবশ্য দাদাকেও আসিতে হইবে, বহিয়া আনিবে কে? ছেলেমেয়েগুলা কিছু আর দেশের বাড়ীতে একলা পড়িয়া থাকিবে না? আর পিসিমা—বুড়ো মানুষ, না আনাটা কেমন হয়? অতলোক তো আর দুইখানি ঘরে ধরিবে না—সামনের ওই বড় বাড়ীখানাই ভাড়া করিয়া ফেলিলাম—দু'পয়সা যাইবে—? যাক্, একটা বিহিত হওয়া দরকার তো? বৌদির পরামর্শ ছাড়া সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি মেয়েদের জব্দ করিতে মেয়েরা যেমন পটু—আমরা তাহার সিকিও নয়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

পুস্তক-পরিচয়

INSIDE THE WHALE—George Orwell (Gollancz).

আলোচ্য বইখানি তিনটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম এবং বৃহত্তম প্রবন্ধটি ডিকেন্স, দ্বিতীয়টি ছেলেদের সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং তৃতীয়টি স্বল্পপরিচিত মার্কিন নভেলিষ্ট হেনরি মিলার সম্বন্ধে।

অরওয়েল ডিকেন্সের সমসাময়িক সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষায় তাঁকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। ডিকেন্স কি নয় তারই আলোচনা ক'রে তিনি ডিকেন্সকে অবধারণ করার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ বুর্জ্জোয়াদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে কষাঘাত করা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রিয়। অথচ মার্ক্সপন্থীরা তাঁকে প্রোলেটেরিয়টের পৃষ্ঠপোষক ব'লে দাবী করেন। আবার স্বয়ং লেনিনের কাছে ডিকেন্সের 'Christmas Carol'-এর বুর্জ্জোয়াভাব অসহ্য হয়েছিল। অরওয়েলের মতে চেষ্টারটান অথবা জাকসন-প্রমুখ মার্ক্সপন্থীদের চেয়ে লেনিনের মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। ডিকেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইংরাজ মধ্যেতর শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি। এই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ চতুর্সীমানার ভিতর শিল্প, কৃষি বা শাসকসম্প্রদায় কখনও প্রবেশ করত না। এক ধারে যেমন এরা আভিজাত্যকে ঘৃণা করেছে এবং যেমন প্রোলেটে-রিয়টের কল্যাণকামনায় কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেনি, অন্য ধারে তেমনি শ্রেষ্টিসম্প্রদায় সম্বন্ধে এদের কোন অভিযোগ ছিল না। এদের নির্ভর ছিল ভবিষ্যত এবং গুরুভার ঐতিহ্যের শাসন ছিল এদের কাছে অসহ্য। এই শ্রেণীতে জন্মেও কিন্তু ডিকেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এতটা নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি খালি অভিজাতদের ঘৃণা করতেন না, শ্রেষ্টিদেরও করতেন। আবার ঠিক যে অভিজাতদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল তাও নয়। কুলীন-সমাজেই উৎপন্ন যারা সেই সমাজের আশেপাশে আগাছার মত গজিয়ে উঠেছে তারাই ডিকেন্সের বিদ্রূপের লক্ষ্য ছিল। আমলাতন্ত্র ও সৈনিকসম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁর একই মনোভাব। দেশের শাসনবিধির সহিত সম্পর্কবিবর্জ্জিত যে শ্রেণী দু'টি প্রচ্ছন্ন অর্থের প্রসাদে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

স্বভাবতই স্বার্থান্ধ এবং দায়িত্বহীন হবে। ডিকেন্সের কিন্তু স্বীয় শ্রেণীসুলভ এই সঙ্কীর্ণতা ছিল না, যদিও তিনি এই সত্যটি কখনও উপলব্ধি করেননি যে অষ্টাদশ শতকের উদ্বৃত্ত এই অভিজাসম্প্রদায় ও আমলাতন্ত্র তাঁর সময় যে প্রয়োজনটা পূর্ণ করছিল সাম্প্রদায়িক চেতনাহীন স্বার্থমত্ত মধ্যেতর শ্রেণীর সে দিকে মনোযোগ দেবার কথা মনেই হ'ত না। ডিকেন্সের পক্ষে এই পরিমিত দৃষ্টিশক্তি অবশ্য সুবিধারই হয়েছিল, কারণ caricaturist-এর পক্ষে গভীর দৃষ্টিশক্তি মারাত্মক। অন্যদিকেও ডিকেন্স নিজের শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছিলেন। তৎযুগসুলভ সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণাভিমানপুষ্ট সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার অভিমান তাঁর ছিল না। এর জন্য দায়ী হল তাঁর negative রাষ্ট্রনৈতিক মনোভাব। তিনি গোঁড়া ইংরাজ ছিলেন কিন্তু নিজের ইংরাজত্বের সচেতনায় রোমাঞ্চিত হতেন না। শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি প্রোলেটেরিয়টের লেখকও ছিলেন না। উপদ্রুতের প্রতি করুণা বা সমবেদনা ব্যতীত তাঁর মনে শ্রমিকদের সম্পর্কে অন্য কোনও মনোভাব ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষালম্বনে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের কোন প্রভাব ছিল না। ইতিহাসের বিবর্ত্তনে বিপ্লবের যে কোন আবশ্যতা আছে যে সম্বন্ধেও কোন ধারণা তাঁর ছিল না। তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কোন বক্তব্য ছিল না! সমাজে যে অত্যাচার-অনাচার ছিল তার দ্বারা ব্যথিত হয়ে তিনি সমাজকে কষাঘাত করেছিলেন। তাঁর অভিযোগের মূলে ছিল মানবী সহানুভূতি। তাঁর প্রতিবাদ ছিল নৈতিক, রাষ্ট্রিক নয়। তাঁর আবেদন ছিল হৃদয়ের কাছে। রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন তিনি চাননি, কারণ সমাজের গাঁথুনির যে কোন দোষ ছিল তা তিনি ভাবেননি। এই সূত্রে অরওয়েল বলতে চান যে বিপ্লবী মতবাদ দুই রকমের—নৈতিক ও রাষ্ট্রিক। কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের আকার পরিবর্ত্তনেও মানুষের দুঃখকষ্ট কিছু কমে না যদি না তার সঙ্গে হৃদয়েরও আচরণের পরিবর্ত্তন হয়। শক্তির অপব্যবহার কি ভাবে নিবারণ করা যার এইটাই হল প্রধান সমস্যা যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। ডিকেন্স এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সমস্যাটির সমাধান নির্দ্দেশ করেছিলেন 'behave decently' এই উপদেশে। লেখকেয় মতে এটা তুচ্ছ আটপৌরে হিতোপদেশ নয়। এই

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খৃষ্টান-লিবার‍্যাল্ সংস্কৃতির অবদান। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই এবং তাঁর উনিশ শতকী উদারতা ও মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই ডিকেন্স ইংলণ্ডের ধনী-নির্ধন, শ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবী সকলের কাছেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। লেখকের মতে ইংলণ্ডবাসীরা যতদিন না এখনকার "smally little orthodoxy"গুলির কবলে পড়ে, এবং যতদিন না তথাকথিত "বাস্তবতা" ও power-politicsএর জগতে প্রবেশ করেন ততদিন ডিকেন্স তাঁদের মধ্যে জীবিত থাকবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির মৌলিকতার বৈশিষ্ট্য আছে। ইংলণ্ডের জনপ্রিয় শিশু-পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে অরওয়েল দেখাচ্ছেন যে এগুলি ছেলেদের মনে একটি অপরিবর্ত্তনীয় উনিশশতকী জগতকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়াস পায়। গত বিশ বছরের আলোড়নে কতকটা বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও এই ধরণের আত্মসমাহিত সঙ্কীর্ণ মনোভাব ইংলণ্ডে এখনও সজীব রয়েছে। গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে জগতে যেন কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি এবং জগতের যেন কোন সমস্যাই নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে চিরকালের মত দয়াদাক্ষিণ্য বিতরণ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে সে বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিদেশীদের কার্য্যকলাপও চিরদিনের মত আজকেও তেমনি অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক ও অকিঞ্চিৎকর। বাস্তব জগতের কোন ঘাতপ্রতিঘাতই এই সুরক্ষিত জীবনের দোরগোড়ায় পৌঁছায় না। এই পত্রিকাগুলি নিতান্ত নির্লজ্জভাবে আভিজাত্য এবং অর্থের মহিমা কীর্ত্তন করে। পাঠকসম্প্রদায় অধিকাংশ মধ্যেতর শ্রেণীর এবং কতকাংশ শ্রমিক শ্রেণীর। ঊর্দ্ধতর শ্রেণীর আকাঙ্খিত এবং দুরধিগম্য জীবনধারার উপাদানে এদের জন্য একটি কল্পনার জগত সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটির মত এটিতেও অরওয়েল "সাধারণ" ইংরাজদের কথা বলেছেন—তাদের দ্বীপনিবদ্ধ সঙ্কীর্ণ মনোজগতের সঙ্গে সমস্যা ও সঙ্ঘর্ষ-সংক্ষুব্ধ বৃহত্তর বহির্জগতের কোন সংস্পর্শ নেই। অরওয়েলের মতে এই সাধারণী মনোভাবের কোন খোঁজ না রাখার দরুণ বামমার্গের পার্টিগুলি কখনও গ্রহণযোগ্য পররাষ্ট্র-নীতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। এই কাগজগুলি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারকার্য্য সম্পাদন করে। শাসকসম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুযায়ী মনোভাব সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর বিশাল জনতাকে যাতে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার দুরাগম্য কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় সেই ভাবে চরিত্রগঠনের চেষ্টা করে।

উত্তরসামরিক যুগের কাগজগুলি কতকটা অন্য রকমের। লেখার ভঙ্গি কতকটা ভাল, বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ একটু বেশি এবং নেতৃপূজার ও রক্তপাতের একটু মাত্রাধিক্য। কিন্তু আসলে উন্নতির বা অগ্রগতির বিশেষ লক্ষণ নেই। এগুলিও প্রাকসামরিক যুগের রাষ্ট্রনীতিতে নিমজ্জিত। বিদেশীরা আগের মতই বিদ্রূপ ও কৌতুকের পাত্র, কেবলমাত্র মার্কিনদের সম্বন্ধে কতকটা সশ্রদ্ধভাব। হিটলার, মুসোলিনী বা রুষবিপ্লব কিছুই এদের জগতে ঘটেনি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এখনও এরা snob। আগের মত ততটা নগ্ন না হলেও এখনও আভিজাত্য ও ধনের পূজা প্রায় পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। সত্য বা বাস্তবের সম্মুখীন হবার কোন লক্ষণই নেই। নিম্নশ্রেণীর চোখে উর্দ্ধশ্রেণীর জীবনকে রমণীয় এবং কামনীয় ক'রে তোলার প্রয়াস একা বালকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নয়, মেয়েদের পত্রিকাগুলিতেও সে চেষ্টা যথেষ্ট আছে। অরওয়েলের প্রতিপাদ্য হল এই যে শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রভাবে রচিত এই জনপ্রিয় গল্পসাহিত্য, "সাধারণ" ইংরাজের মনকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করে। বামমার্গীয় চিন্তাধারা এই শ্রেণীর গল্পসাহিত্যে প্রবেশ করেনি বলে সাধারণ ইংরাজের মনের উপর এভাব বিস্তার করতে পারেনি। অরওয়েলের মতে বিশেষ মনের উপর, তথা পরবর্ত্তী জীবনের উপর, গল্পসাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাঁর মতের গুরুত্ব নির্ভর করছে এই প্রভাবের গভীরতার উপর।

শেষ প্রবন্ধটির নামেই বইটির নাম দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি স্বল্পপরিচিত মার্কিন ঔপন্যাসিক Henry Miller-এর Tropic of Cancer-এর সমালোচনা। মিলারের বইখানি উপন্যাসের মত লেখা হলেও আসলে মিলারের জীবনচরিত। মিলার নির্জ্জলা চলতি ভাষায় লিখেছেন—নির্ভীক ভাবে, ভব্যতা বা শ্লীলতার দাবী সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য ক'রে। অশ্লীলতা সমর্থনের ভয়ে অনেকেই বইখানিকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারেননি। মিলার লিখেছেন প্যারিস-প্রবাসী একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর মার্কিনদের জীবন সম্বন্ধে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, ডলারের প্রাচুর্য্যের যুগে, মার্কিন আর্টিষ্টদের এক প্রবল বন্যা প্যারিসে এসে উপস্থিত হয়। পরে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে যখন ডলারেরও উৎস শুকিয়ে গেল তার সঙ্গে এই বিশাল আর্টিষ্ট বাহিনীও উবে গেল, কেবল পড়ে রইল একদল নিঃস্ব লোক। তারা এই সঙ্কটের হাত থেকে

পরিত্রাণ পেলখাঁটি আর্টিষ্ট নতুবা খাঁটি দুর্বৃত্ত ব'লে। এদের এবং এদের প্যারিস সম্বন্ধেই মিলার লিখেছেন। অরওয়েল বলছেন যে যদিও এদের জীবন অতিবাহিত হয় চিন্তা, আলাপ, মদ্যপান ও ব্যভিচারে তবুও এদের অভিজ্ঞতা হ'ল সেই সাধারণ লোকদেরই অভিজ্ঞতা যাদের জীবনধারা প্রবাহিত হয় উপার্জ্জন, বিবাহ ও সন্তান প্রতিপালনের ত্রিসীমানার মধ্যে। অরওয়েল বলছেন যে সাধারণ পাঠকমাত্রেরই এই জীবনের অভিজ্ঞতা আছে। মিলারের নিজের অভিজ্ঞতা হ'ল সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা। বাস্তব ও Power Politics-এর দ্বারা অস্পৃষ্ট এদের দৃষ্টিভঙ্গি হল দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি! বাইবেল কথিত জোনার মত এরা তিমি মৎসের জঠরে আশ্রয় নিয়ে অদম্য অনিবার্য্য শক্তিসমূহের সঙ্ঘাতে বর্ত্তমান জগৎকে ভেঙেচুরে যেতে দেখছে। এই ভাঙন প্রতিরোধ করার কোন প্রয়াস নেই, কারণ তা করার কোন অর্থ নেই। যা ঘটছে তাকে এরা স্বীকার করে নিচ্ছে। যা মানুষের শাসনের অতীত তাকে সমর্থন করার বা তাকে রোধ করার কোনটারই অর্থ হয় না। মিলার এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন বলেই তাঁর কণ্ঠস্বর হল পরিতৃপ্ত সুখী লোকের কণ্ঠস্বর। তিনি জীবনের ভীতিপ্রদ ও জঘন্য দিকটাই মেনে নিচ্ছেন, কারণ সাধারণ মানুষের কাছে সেইটাই জীবনের সত্যতর রূপ। মিলার মেনে নিচ্ছেন ভয়, স্বৈরীতন্ত্র এবং regimentation-এর যুগকে। আমরা যে ক্রমশ সঙ্কুচিত জগতে বাস করছি তার আত্মবিকাশের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার মুক্তির অভিযান সমাপ্ত হয়েছে শৃঙ্খলে। অর্থাৎ মিলার মেনে নিয়েছেন আজকের ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতাকে। তাঁর এই নিষ্ক্রিয় 'মেনে-নেওয়া' দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই মিলার 'সাধারণ' মনোভাবের এতটা কাছে আসতে পেরেছেন যতটা আসা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি বিরহিত এই নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে অরওয়েল গত চল্লিশ বছরের ইংরাজি সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বিগত সমর এবং তার পরবর্ত্তী যুগে হাউসম্যান প্রচ্ছন্ন যৌন বিদ্রোহ এবং ভগবানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগের বাণী প্রচার করেছিলেন। তারপর এল জয়েস, এলিয়ট, হাম্‌লি প্রভৃতির প্রাধান্যের যুগ। তাঁরা বল্লেন প্রগতি বলে কিছু নেই এবং থাকাও উচিত নয়। তৃতীয় দশকের এই লেখকদের

ছিল অতীতের দিকে। তখনকার সমস্যাগুলির দিকে তাঁরা নজরই দিতেন না। রুষ বিপ্লব তাঁদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। তাঁদের রাশিয়া ছিল টলষ্টয়-ডষ্টয়েভস্কির রাশিয়া! রাষ্ট্রনীতি তাঁদের আকর্ষণ করত না। সাহিত্য ছিল কেবল শব্দবিন্যাস। বিষয়বস্তুর প্রয়োজন ছিল না, রচনা করাই ছিল উদ্দেশ্য। উনিশ শ' ত্রিশ সালে সাহিত্যের আবহাওয়া হঠাৎ বদলে গেল। অডেন ও স্পেণ্ডারের যুগে তৃতীয় দশকের tragic sense of life-এর বদলে এল serious purpose। লেখকরা রাষ্ট্রনীতির দিকে ঝুঁকলেন। মার্কস্‌বাদ-বর্জ্জিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু সাহিত্যে অপাঙক্তেয় হয়ে উঠিল। সাম্যবাদের দিকে এই ঝোঁকের মূলে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক বেকার-অবস্থা। ধর্ম্ম ও দেশপ্রেম লুপ্ত হয়েছিল, কিন্তু একটা কিছুতে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা যায়নি। ধর্ম্মের লক্ষণবিশিষ্ট কম্যুনিজম সেই শূন্যতা ভরে দিল। কিন্তু কম্যুনিজমের স্বরূপ তারা জানত না বলেই তাকে বরণ করে নিয়েছিল। যখন স্বরূপ প্রকাশ পেল তখন দেখা গেল যে কম্যুনিজমের রাজত্বে উপন্যাসের মৃত্যু অনিবার্য্য, কারণ স্বাধীন মন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হ'ল উপন্যাসের জীবন এবং কম্যুনিজমের তাঁবে মানসিক সাধুতা অসম্ভব। অডেন-স্পেণ্ডার যুগের আন্দোলন সাহিত্যকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করছিল। অতএব ১৯৩৫ সালে হেনরি মিলার এই যুগের উদ্দেশ্যপ্রসূত রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যের পিঞ্জর ত্যাগ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নিষ্ক্রিয়তার মুক্ত বাতাসে ফিরে গেলেন। "বাস্তবে"র কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে তিমি মাছের জঠরে আশ্রয় নিলেন। মিলারের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে অরওয়েল বলছেন যে যে-লেখক সৃষ্টি করেন তাঁর সত্য দর্শনের ততটা মূল্য নেই যতটা আছে তাঁর ভাবিক আন্তরিকতার। অর্থাৎ ঘটনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সত্যই হ'ল সাহিত্যে গ্রাহ্য। এই ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে বহিরাশ্রয় সত্যের কোন সাদৃশ্য না থাকলেও কিছু আসে যায় না।

অরওয়েলের বক্তব্য হ'ল যে বর্ত্তমান সময় অব্যাহত ধনতন্ত্রের এবং তৎসহ লিবারেল খৃষ্টান সংস্কৃতির দ্রুত নিঃশেষিত যুগ। সমাজতন্ত্রবাদ যে উনিশ শতকী উদারনীতির ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত ও সম্প্রসারিত করবে সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে আগত যুগে সার্ব্বভৌম একনায়কত্বের বিজয় সম্ভাবনায়। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবসানে সাহিত্যের—বিশেষ করে নভেল ও গদ্য সাহিত্যের

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। আগামী যুগ সাহিত্যিকের যুগ নয় যেহেতু সাহিত্যিক হলেন লিবারেল। লিবারেল জগতের ধ্বংসের প্রণালীতে প্রকৃত লেখক হিসাবে যোগ দেওয়া অসম্ভব। অব্যাহত স্বাধীন চিন্তার অবশিষ্ট যুগে কেবলমাত্র মিলারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব।

প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। যে 'সাধারণ' মনে ডিকেন্সের সিংহাসন অটুট রয়েছে, এবং যে 'সাধারণ' মন গঠিত হয়েছে Gem ও Magnet প্রমুখ পত্রিকাগুলির আওতায় সেই মনেরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়েছে Tropic of Cancer-এ। অরওয়েলের এই 'সাধারণ' লোকের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। লিবারেল সংস্কৃতিসৌধকে তিনি সাধারণ মনোভাবের ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী-বিরহিত সাধারণ লোকের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অরওয়েল স্বীকার করেছেন যে শ্রেণীগত প্রতিবেশের দ্বারাই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়। তিনি বস্তুতঃ একথাও স্বীকার করেছেন যে বর্ত্তমান সাহিত্য বুর্জ্জোয়া সমাজের তথা ধনতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। (সেই জন্যই আজ মিলারের দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র কার্য্যকরী)। এ-কথা স্বীকার না করলে তাঁর সমালোচনার কোন অর্থ হয় না। অতএব তাঁর মেনে নেওয়া উচিত যে ব্যক্তিবিশেষের ভাবিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিবিশেষের শ্রেণীর উপর নির্ভর করে এবং সে-অবস্থায় কোন শ্রেণীসম্পর্কবিরহিত standardised ব্যক্তি বা সাধারণ মনোভাব থাকতে পারে না। এই স্বীকারোক্তি এড়াবার জন্য তিনি বলছেন যে স্বাধীনতা ও সাম্যের idea সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাই হ'ক, তিনি এই যুক্তির সাহায্যে বুর্জ্জোয়া সভ্যতার সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি। শ্রমিকশ্রেণী কখনও liberalism-এর কবলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতারণা আর টিকছে না ব'লেই ধনতন্ত্রবাদ লিবারেলি মুখোস ফেলে দিয়ে ফ্যাশিজমের নগ্নতায় আত্মপ্রকাশ করছে। যে সাধারণ লোকের সংস্কৃতি আজ সঙ্কটাপন্ন হয়েছে সে হল বুর্জ্জোয়া। কিন্তু অরওয়েল তাঁর বুর্জ্জোয়াসুলভ বুর্জ্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে সমগ্র মানবজাতির অধঃপতন দেখছেন। তিনি ক্ষয় এবং ধ্বংসের লীলাই দেখছেন। অন্যদিকে মানুষ যে সংগ্রাম করছে ভবিষ্যতের

দিকে মুখ করে তা তাঁর দৃষ্টিতে পড়ছে না। নিজেদের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা যতই জাহির করুন না কেন আসলে অরওয়েল ও মিলারের দৃষ্টিভঙ্গি নৈরাশ্যবাদ-আশ্রয়ী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি যে চিরকালের জন্য লুপ্ত হচ্ছে তাঁদের এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে মানুষের উপর অবিশ্বাস এবং ফ্যাশিজম ও কম্যুনিজমের প্রকৃত অর্থবোধের অভাব। ক্ষয়িষ্ণু ধনিকতন্ত্রের চরম বিকাশ যে সংস্কৃতিপরিপন্থী ফ্যাশিজম—তার আওতায় যে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কম্যুনিজম সংস্কৃতি বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-পরিপন্থী নয়। বস্তুতঃ জীবিকা-অর্জ্জনের সংগ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সময় ও সামর্থ্য নিযুক্ত করতে পারবে তখনই সত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্ভব হবে। অরওয়েল কথিত ব্যক্তি হ'ল খণ্ডব্যক্তি এবং তার প্রকৃত সংজ্ঞা হ'ল অর্থনৈতিক। বুর্জ্জোয়া সমাজের কাঠামোর মধ্যে, বুর্জ্জোয়া নীতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও সংস্কারশাসিত প্রতিবেশে স্বাবলম্বী ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তি জন্মাতে পারেনি।

অরওয়েল অনেক কিছুই অর্দ্ধ-উক্ত বা অনুক্ত রেখেছেন। অনেকগুলি অমীমাংসিত প্রশ্নের সৃষ্টি করেছেন। তিনি কতকটা মার্ক্সিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হল অন্তরাশ্রয়ী আদর্শবাদ (subjective idealism)। এই ধরণের মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই অরওয়েলের বইখানি পড়ে মনে একটা অসম্পূর্ণতার ভাব থেকে যায়—অনেকগুলি প্রশ্ন থেকে যায়।

অরওয়েলের মতামত সম্বন্ধে মোট বক্তব্য হল এই যে তিনি যে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন সেটি আসলে হ'ল পরাজয়ের অবসাদজনিত নৈরাশ্যবাদ। এবং এই নৈরাশ্যবাদ বুর্জ্জোয়াদের সমর্থনযোগ্য হ'লেও সারা সম্প্রদায়ের সমর্থনযোগ্য নয়। সংস্কৃতিকে বুর্জ্জোয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোঠায় না ফেললে এমন মতামত সম্ভব নয়। বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থাচ্ছন্ন (অর্থাৎ মূলতঃ অর্থ-নৈতিক) দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করতে পারলে নিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয়তার জঠরে আশ্রয় নিয়ে মিলারের মত সুখী হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক

সম্রাট—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

মনকে আর চোখ ঠেরে লাভ কি? মাইকেল মধুসূদন ছিলেন এককালে আধুনিক কবি, আর একালে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত কাব্যের মোড় ফিরিয়েছেন এমন কবি বর্ত্তমানে কেউ নেই। বাংলা কাব্যে যাকে 'অতি আধুনিকতা' বলা হচ্ছে, তাকে আকাশ-কুসুমের সঙ্গে তুলনা করাই বোধ করি সঙ্গত। রবীন্দ্রোত্তর কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথের ছাঁদে কবিতা লিখছেন না বটে, পরধর্ম্ম না নিয়ে স্বধর্ম্মই বরণ করেছেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কোনো কবির সন্ধান পাইনি যিনি বাংলা কাব্যধারাকে নূতন খাতে বওয়াবার শক্তি ধরেন ; এবং অধিকাংশই একটা নূতন-কিছু করবার প্রাণান্ত চেষ্টায় ধরা দিচ্ছেন শেষটায় ফ্যাশনের ফাঁদে। এর ফলে ভালো কবিতারও আজ কদর নেই, কাব্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে জেগেছে অনীহা। এই অস্বাভাবিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হতে পারে, যদি আমাদের দেশে প্রকৃত কাব্য সমালোচনা হয়। কবিরা কবিতা লিখে খালাস, রসিকরা তা নিয়ে করেন বিলাস। মধ্যে মধ্যে সমালোচকের ভূমিকায় যে তু'একজন এই মহৎ কার্য্যে নামেন, তাঁদের সমালোচনার প্রকৃতি ভুলেও অভিসারী হয় না। সুতরাং পাঠকরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যান। নূতন কবিতার চারা যাও বা কিছু গজিয়েছে, এই রকম প্রতিকূল পরিমণ্ডলের মধ্যে তা যে কতো দিন সজীব থাকবে ভাববার কথা।

কেউ কেউ আজকাল সাম্যবাদী কবিদের 'আধুনিক' আখ্যা দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের দেশে যে কয়জন কবি এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কবিতা লিখতে পারেন তাঁরা সাম্যবাদী নন আর যাঁরা প্রকৃতই সাম্যবাদী তাঁদের লেখনীতে যা আসে তা কবিতা নয়। অথচ সাম্যবাদী হ'য়েও কবিতা লেখা যায়, যদিও কবি হওয়ার জন্য সাম্যবাদ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক নয়। অবস্থাবিশেষে সাময়িকভাবে দেশের চিৎ-প্রকর্ষের সকল প্রেরণাকে সমাজের পুনর্গঠনের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কবি ও শিল্পীদের উপর জুলুম না চললেই হ'লো। কারণ, এ-কথা ভুললে' চলবে না যে, মাঠে ফসল ফলানো যতোটা সহজ মনের ক্ষেত্রে

সেটা তার বিপরীত। আর্টের সঙ্গে লৌকিক হিতাহিত বা সুখদুঃখের ঠিক কি সম্পর্ক বুঝতে পারি না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র পূর্ণ মাত্রায় আধুনিক না হ'য়েও বিশিষ্ট ও সুশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতার সঙ্গে বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়াও তেমন কঠিন নয়। অথচ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ-পদ্ধতি স্বকীয়। কোনো দিনই তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-বিদ্রোহের সুর চড়া হয়ে ওঠে নি। হয়তো বা সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ক্রমেই যাচ্ছে বেড়ে। সন্ধিৎসা ও আত্ম-জিজ্ঞাসা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার মূল কথা; দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে তাঁর কৌতূহল অগাধ, এবং এই দিক থেকে দেখলে তাঁকে আধুনিক না ব'লে উপায় নেই। তাঁর মনের ধর্ম্মও তন্ময়তা। আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়; এমন কি তথাকথিত অত্যাধুনিক বাংলা কবিতার একাধিক অনাচারের মূল হয়তো তাঁর পুরাতন কবিতা খুঁজলে বেরিয়ে পড়বে।

'প্রথমা' লিখে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'বিংশ শতাব্দীর কবি' এই আখ্যা পান। শীত যেমন রিক্ততাকেও বরণ করে বসন্ত-বোধনের জন্য, তেমনি বর্ত্তমান কাল যুগান্তরকে আবাহন করতে গিয়ে আজ নিঃশেষিত। এই যুগ সন্ধিক্ষণে কবিদের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশি। প্রাক্তন প্রাসাদ ধূলিসাৎ হ'চ্ছে, অথচ নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের উপাদান সংগ্রহসাপেক্ষ। তাই কবির অসহায়তার সীমা নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন এবং এই বিষাক্ত সভ্যতার মূল কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এখনকার সমাজের অবরোহী দুর্গতি মানুষের মনোসমুদ্রে যে আলোড়ন তুলেছে তারই প্রকাশ প্রেমেন্দ্রের 'প্রথমা'য়। সংশয়াকুল কবির মনে হতাশা নেই। তিনি বলেছেন:

(১) অভ্রংলিহ মিনার দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি।

(২) অসীম আকাশ তীরে
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।

'প্রথমা'র কবির সংশয় এখন অনেকটা কেটেছে; 'সম্রাটে'র কবি পথের সন্ধান পেয়েছেন;

স্বপ্ন দেখি সে পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হ'য়ে আগামী কালের প্রানে,

স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি !

তাঁর দৃষ্টি আজ আরো স্বচ্ছ, ভাষা শাণিত।

নাই ফুল, শস্যের মঞ্জরী।
বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
উদ্গারিছে বিষ বাষ্প ;
— আজ শুধু বাতাসে বারুদ।

আসন্ন বিপ্লবের আভাসও তাঁর কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে :

তবু হতাশ আমি হই না।
জানি,—'পামের' চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য ;
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না !
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে ; একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ কিছুটা উগ্র। এ-কথা মানি, 'অজেয় আত্মার অরণ্য পর্ব্বতকে 'বেড়া দিয়ে জরিপ করা যায় না, সমিতির শাসন মানে না সে সীমাহীন ষ্টেপি'। তবু 'সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা, তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র'—এ-কথা অনুক্ত থাকলেই ভালো হ'ত। তাঁর এ-আশঙ্কা হয়তো সম্পূর্ণ অমূলক নয়। কিন্তু ভয় হয়, এই পূর্ব্বনিরুক্তি কারো বা বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। তাঁর কাছে আরো একটি অভিযোগ আছে। 'কোজাগরী' কবিতাটি এ বইয়ে বেমানান ব'লে আমার বিশ্বাস। এর পরিবর্ত্তে 'বিজলী'তে প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'সম্রাটে' সন্নিবিষ্ট দেখলে খুসি হ'তাম।

তাঁর 'নীলকণ্ঠ' আলোচ্য গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। গদ্য ও কবিতার সংমিশ্রণে, রূপ ও প্রকর্ষের সমন্বয়ে এমন অপূর্ব্ব কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হ'য়েছে। মানুষের অতলস্পর্শ সত্তাকে এই সজাগ কবি রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। এ দিকেও তাঁর সাফল্য অসাধারণ। 'বিনিদ্র' থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি :

চেতনা সীমান্তে ভীরু স্বপ্নের কুয়াশা
না জাগিতে অমনি মিলায়,

চিতা-ব্যগ্র ভাবনার অস্থির সঞ্চারে
সচকিত শশকের মত।
স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি ;
অবিরাম অশ্বক্ষুর ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।
—কতদূর হ'তে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,
চির মৌন হিম রাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে ;
সে দুঃসহ ধ্বনি হ'তে কোথা পরিত্রাণ ?
ঘুম কই ?

চিড়িয়াখানায় 'বাঘের কপিশ চোখে' কবি দেখেন টেরাই-এর জঙ্গলের ছায়া। অকস্মাৎ বাঘ হাই তুলে গরাদের ওপারেতে গড়াগড়ি দেয়। তখন কবির মনে হয় :—

স্রোতোহীন চেতনায়, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে,
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক -
সে অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।

বস্তুত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্য এইখানে।

তিনি যে পুরোপুরি আধুনিক নন, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে পাওয়া যাবে। সুধীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ক্ষণবাদী। ইলেকট্রনের মরীচিকার তামাসাটা মনে রাখতে ব'লে তিনি আবার উল্টো গাইছেন :

আকাশে থাকুক জটিল দেশ কাল জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি ;

আমার থাক

সমস্ত অঙ্কের এপিঠে

মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,

নেশার রঙে টলমল

এই মুহূর্ত্ত বুদ্বুদ,

জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,

আনন্দ, বেদনা আর নিস্ফল এই

আত্মার আকুতি।

আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি প্রেমের কবিতাও আছে। শুনতে পাই, এ বিষয়ে তাঁর নাকি তেমন হাত খেলে না। কিন্তু 'তুমি এস', 'নীল দিন' ও 'কাল রাত'—লঘু ছন্দে লেখা তাঁর এই তিনটি কবিতা সাধারণ জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত, অথচ কবিতাগুলি থেকে যেন লাবণ্য উপচে পড়ছে। একথাও এখানে বলা দরকার যে, রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমের রূপ প্রেমেন্দ্র কাব্যে প্রতিফলিত হয়নি। প্রেমেন্দ্রের বাণী হ'লো : 'আমাদের প্রেম,—তারো কোন মুক্তি নেই।'

গ্রন্থের শেষে লরেন্স ও চেষ্টারটনের তিনটি ক'রে কবিতার অনুবাদ আছে। বলা বাহুল্য, তাঁর অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নি।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সপ্তদশী—শ্রীপারুল দেবী, শ্রীতুষার দেবী ও শ্রীঅজয় গুপ্ত। দি পাব্লিসিটি ষ্টুডিও, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। মূল্য আড়াই টাকা।

দেহলি—শ্রীহেমলতা দেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য এক টাকা চার আনা।

শ্রীমতী পারুল দেবীর আটটি কবিতা ও শ্রীমতী তুষার দেবীর এক ছোট উপন্যাস একত্রিত ক'রে 'সপ্তদশী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি শ্রীযুক্ত অজয় গুপ্তের লেখা ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের রচিত মুখবন্ধ সম্বলিত। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে লেখক লেখিকারা ভ্রাতা ভগিনী; এই যোগসূত্র ভিন্ন গল্প ও কবিতাগুলির সঙ্গে একখানি উপন্যাস একত্রিত ক'রে প্রকাশিত করবার কোন সঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না। উৎকর্ষের দিক থেকেও লেখক ও লেখিকাদের এক করা যায় না। এবিষয়ে শ্রীমতী পারুলদেবীর গল্পগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য। গল্প রচনার কৌশলটি ইনি বেশ আয়ত্ত করেছেন; আলোচ্য গল্পগুলি পাঠক পাঠিকাদের কাছে আদরণীয় হবেই; লেখিকার নিকট আমরা আরও নূতন গল্পের প্রত্যাশা করব। এঁর গল্পের পাত্র পাত্রগুলি উদ্ভট বা অপরিচিত ব্যক্তি নন,—পুস্তকে তাঁদের সাক্ষাৎ লাভ করে হাঁফ ছেড়ে বলা চলে, "ও তুমি!" আধুনিক গল্পলেখকদের অধিকাংশই কিন্তু অন্য পথের পথিক; পাছে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয় বা প্রতিষ্ঠিত লেখক-দের অনুকরণ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁরা নিত্য অভিনয়ের বা চমৎকারিত্বের জন্য নানারূপ প্রয়াসে লিপ্ত। তাঁরা ভুলে যান যে এই সকল প্রয়াসের দুঃসহ চালে ক্লিষ্ট হয়ে ছোট গল্পে তার প্রধান আকর্ষণ-বস্তু হারিয়ে ফেলে। শ্রীমতী পারুলদেবী এ-বিষয়ে সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর গল্পের যে মেয়েটি এলাহাবাদ থেকে বিয়ের পর ঢাকায় স্বামীর ঘর করতে গিয়ে পূজার সময় প্রত্যাশান্বিত বাপমাকে বঞ্চিত করে স্বামীর সঙ্গে পুরী ভ্রমণের সঙ্কল্প করে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তার সঙ্গে আমাদের নিত্য দেখা শোনা। আবার যে বৌটি সামান্যমাত্র সম্বলেও অবলীলাক্রমে ঘরদোর আসবাবপত্র সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করে, সংসারকে মনোরম দাঁড় করায় এবং তারই ফলে অগোছাল স্বামীর বিরাগভাজন হবার সম্মুখীন হয় তারও সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত নই। সামান্য রেল-কর্ম্মচারীর স্ত্রী আন্নাকালী

কোম্পানীর কোয়ার্টারে সুখে বিভোর হয়ে বিবাহিত দিন কাটায় কিন্তু রেলের বড়সাহেবের পত্নী যেদিন নিতান্ত খেয়ালের বশে আন্নাকালীর ঘরে বেড়াতে গিয়ে তাকে আপনার সেলুন কামরায় ডেকে নিয়ে যান সেদিনই আন্নার নিক্ষোভ মনে দারিদ্র্যের কালিমা উদিত হয়—এ দারিদ্র্য কালিমা যে-অবস্থা বিশেষেই উদিত হোক খুব অল্প লোকই এর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। পশ্চিমের শহরে প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলারা একটু মুক্তির আস্বাদ পেয়ে থাকেন,—তাঁদেরই এক দল ছুটির সময় অভিনয় করার সিদ্ধান্ত ক'রে রিহার্সাল দিতে গিয়ে যে তুষ্টি অভিমান কান্না সাধাসাধির স্তূপ সৃষ্টি করেন তাতে বাঙ্গালী-মহিলার এক দিকের "যবনিকার অন্তরাল" পরিষ্কার উন্মোচিত হয়েছে। সবগুলির পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়; অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের নারীর চিত্র,—আনন্দ সমুজ্জ্বল এবং তাতে ঈষৎ বিষাদের ছায়াপাত হ'য়ে চিত্রগুলি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পের সমাপ্তি নিপুণভাবে সম্পাদিত,—এটি বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী তুষার দেবীর উপন্যাস 'প্রতীক্ষা'র গল্পভাগ হ'ল মন্দিরের পুরোহিতের এক পালিত শিষ্য শঙ্করের সঙ্গে কৌলিন্যপ্রথায় বিবাহিত কিন্তু পলাতকা হৈমর ব্যর্থ প্রণয়ী। শঙ্কর ও শঙ্করের পালক পুরোহিত ঠাকুরের কাছে হৈমর এ পরিচয় বিদিত ছিল না; ভিন্নকুলের হলেও হৈমর সঙ্গে শঙ্করের বিবাহ যুক্তিযুক্ত ব'লে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরের হঠাৎ পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। শঙ্কর বিবাহের জন্য প্রস্তুত হন, হৈম কিন্তু রাজি হয় না; এমন সময় দৈবক্রমে হৈমর স্বামী তারই অনুসন্ধানে এসে পড়ায় হৈমর পরিচয় ব্যক্ত হয়। অনুতাপে সে দেহত্যাগী হয়, হৈম মন্দিরের সেবাতেই রত থাকে। লেখিকার উপন্যাসরচনায় প্রথম উদ্যম মোটামুটি প্রসংসনীয় হলেও তাঁর ভগ্নীর মত সফল হয়নি। পল্লীগ্রাম ও কুলীনঘরের বর্ণনা বেশ সুন্দর হয়েছে কিন্তু একদিকে কৌলিন্যপ্রথা অন্যদিকে শাস্ত্রানুশীলনকারী পুরোহিতের মনে অজ্ঞাতকুল নারীর সঙ্গে আপন শিষ্যের বিবাহের যৌক্তিকতা একত্রিত হয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের মন একদিকে যদি গতানুগতিক সংস্কারে ও আর একদিকে যদি অতি আধুনিক ঔদার্য্যে মুখামুখি ক'রে দেখান যেতে পারে তাহ'লে লেখক লেখিকার অনেক প্রশ্নেরই সুমিমাংসা আয়ত্ত করা যেতে পারে কিন্তু উপন্যাস তাতে হয় বিনষ্ট।

গুপ্ত মহাশয়ের কবিতাগুলির মধ্যে ক'টি ভাল। বাকিগুলি এমন রবীন্দ্রছাঁদী যে তাতে তাঁর আপন কবি প্রতিভার কোন ঠাঁই হয় নি।

মাঠের পরে নামল জলধারা
থামল বায়ু, লুপ্ত শশীতারা
আকাশ ছাওয়া মেঘের রাশি মাঝে।
বৃষ্টি ছাড়া স্তব্ধ হ'ল সব,
স্তব্ধ হ'ল ঘাটের কলরব—
বিজন তটে বৃষ্টি-বিধুর সাঁঝে
আমার মনে পূরবী সুর বাজে॥

এঁর কবিতা থেকে অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 'দেহলী'তে একটি বৃহৎ গল্প ও পাঁচটি ছোট গল্প স্থান পেয়েছে ; ছোট ছোট বাক্যে রচিত ভাষা অতি ঝরঝরে পরিষ্কার। গল্পগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"বাংলাদেশের ছোট বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্র-প্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য।"

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বর্ণে বর্ণে সত্য। এঁর লেখায় পল্লীগ্রামের আওতা ও প্রাচীনা দিদিমা-সুলভ গল্প বলার ছাঁদ চমৎকার সফলতা পেয়েছে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

ঘুম-পাড়ানি গান }
যে নদী মরু পথে } শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা প্রকাশনী নিকেতন।

ঘুম-পাড়ানি গান গ্রন্থখানি হচ্ছে কাননবাবুর প্রথম উপন্যাস। এর ভাষা ঝরঝরে পরিষ্কার, প্রকাশভঙ্গীও প্রীতিপদ কিন্তু প্রতিপাদ্য, বিষয়টি যে কি তা' বোধগম্য হয় না।

সুরেন অতসীকে ভালবাসে কিন্তু বিবাহ করতে চায় না। মীরা অবনীর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত ঘর করতে গেল না। এই সব স্বেচ্ছাকৃত বিরহের প্রকৃত কারণ যে কী তা শেষ পর্য্যন্ত বোঝবার উপায় নাই।

শেষ পৃষ্ঠায় সুরেন তার ভগ্নী মীরাকে বলেছে বটে—"সংসারে একদল মানুষ জন্মায়, তাদের মনের গড়ন এত সূক্ষ্ম, এত স্বতন্ত্র যে জীবনে কারো সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে না। এত স্পর্শকাতর তারা যে যাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে সামান্য গরমিলও অসহ্য মনে হয়। সংসারী হবার জন্যে তারা নয়। মীরু, ভুল করবি তুই যদি ভাবিস দ্বিজেন না হয়ে আর কারো সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে জীবনে সুখী হতিস্। জীবনের সুখ তোর মতন মেয়ের জন্যে নয়। সংসারে এমন কজন সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষ আছে যে তোর মনের সত্যিকার সন্ধান পাবে। কে তোর মর্য্যাদা বুঝবে?"—

কিন্তু এই উক্তির সঙ্গে সুরেন বা মীরা কারও চরিত্রগত সাদৃশ্য নাই। মুখের কথায় যতই দড় হোক না কেন তারা অন্তরে বড় ভাল মানুষ ও সাধারণের মতই প্রতিক্রিয়াপ্রবণ। নতুবা দ্বিজেন আবার বিবাহ করছে শুনে সুরেন সে বিবাহ ভাঙবার জন্যে ছুটবেই বা কেন আর সে সংবাদ পেয়ে মীরাই বা কেন দিশেহারা হয়ে অবনীর বাসাবাড়ীতে ঠেলে উঠবে।

এই জাতীয় আরও বহুবিধ যৌক্তিক অসঙ্গতির সমালোচনা বোধ করি গ্রন্থকারের কর্ণগোচর হয়েছে তাই দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় একটি জবাবদিহি মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থকার বলেছেন যে তাঁর উপন্যাস ঘটনাপ্রধান রচনা নয়। তাদের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানুষের মন। ছোট ছোট অবস্থার ঘাত

প্রতিঘাতে মানুষের মন কি বিচিত্র লীলায় অপরূপ হয়ে ওঠে সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি।

বেশ কথা। এবার ছোট ছোট অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

সুরেন ও মীরার মাতা হেমলতা কম বয়সে ছিলেন যৌবনপন্থী। তিনি বিয়ে করেছিলেন বাপ মার অমতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে। কিন্তু এখন অসবর্ণ বিবাহেও তাঁর মত নাই তাই সুরেন ও অতসীর বিয়েতে তাঁর আপত্তি।

সুরেন-এর চিরুণীর কারখানা আছে। ছোট মধ্যবিত্ত সংসার চালাবার মত মত সামান্য আয়। বুদ্ধিমান শান্ত প্রকৃতির ছেলে সে। রুগ্না মাকে যত্ন করে ও ছোট বোনকে ভালবাসে। ব্যবসার কাজের অছিলায় সে পাটনা গিয়ে দ্বিজেন-এর দ্বিতীয় বিবাহ রোধ করবার চেষ্টা করলো কিন্তু ধূর্ত্ত লোকের প্ররোচনায় বেচারার পুঁজি টাকা উৎকোচ দিতে ব্যয় হয়ে গেল আর বিয়েও বন্ধ হ'ল না। সুরেন অতসীকে ভালবাসে আর সেই ভালবাসার জোরে আর একটি অচেনা লোককে বিয়ে করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়।

মীরা হচ্ছে প্রখর ধী-সম্পন্ন বিদুষী তরুণী। জীবনের প্রতি স্বচ্ছ, সবল আর তীক্ষ্ণ ওর দৃষ্টিভঙ্গী। নির্ভীক ওর প্রকৃতি। কথাবার্ত্তা, চালচলন, কাজকর্ম্মে ওর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে আসে সে। তার পর মায়ের সেবায় আর সংসারের কাজে যখন নিজের সত্তাকে ভুলতে বসেছে তখন হল অবনীর আবির্ভাব। সুরেন পাটনা গেলে তাদের প্রেম-আলাপনের সুযোগ ঘটে তার পর যখন তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ ও ভ্রাতার আর্থিক ক্ষতির সংবাদ আসে তখন মরিয়া হয়ে অবনীর বাসায় গিয়ে সহবাসের প্রস্তাব ক'রে আসে। অবনী মুসলমান হ'য়ে পরে শুদ্ধির পরামর্শ দেয় কিন্তু মীরার মত ন্যায়নিষ্ঠ মেয়ে মিথ্যে ঠকাতে অস্বীকার করে—সে বলে যে সন্তানদের তারা শেখাবে সত্যকে আঁকড়ে থাকার মর্য্যাদাবোধ, কঠিন মানুষ করে তুলবে তাদের ইত্যাদি। তারপর আলিঙ্গন চুম্বন ইত্যাদি যথারীতি প্রেম প্রকাশের পর তারা ঠিক করলে একদিন রাত দশটার গাড়ীতে পালাবে। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে যথা সময়ে মোড়ের মাথায় অবনী ট্যাক্সী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মীরা যাবে

ব'লে প্রস্তুত এমন সময় কথায় কথায় সুরেনের উপরোক্ত লেকচার শুনে আর তার যাওয়া হ'ল না। সে নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে পড়ে মনে মনে বল্লে দাদা জীবনকে তুমি আমার চেয়ে ঢের গভীর করে বুঝেছ'।—অবনীর কি দশা হ'ল সে কথা বর্ণিত হয়নি।

দ্বিজেন হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত অধ্যাপক। ধনী সন্তান ও নির্লজ্জ লম্পট। বিয়ের অনতিকাল পরেই সে তার উপপত্নীকে এনে অন্তঃপুরে তোলে। তার পর স্ত্রী চলে যাবার পর কলেজের এক ছাত্রীর পুত্র সম্ভাবনা হওয়ায় তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়!

অবনী হচ্ছে সুরেন-এর বন্ধু। মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। সুপুরুষ ও কবি। মীরাকে সে নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছে। তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে মায়ের বিয়ের কথা হয়, তার পর জ্যেঠামশাই বেঁকে বসলেন বিয়ে করবেন না, সন্ন্যাসী হবেন। পরে যখন মার কলঙ্কের ছাপ দেহের রেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন তার বাবা বড় ভায়ের অস্বীকার করা দায়িত্বের বোঝা মাথায় তুলে নিলেন। সে জানতে পারে বড় হ'য়ে বাবার মৃত্যুর পর। পাড়ার ভদ্রলোকেরা মৃত দেহ স্পর্শ করল না যখন তখন চাকরের বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে শেষকৃত্য সমাধা করে বাড়ী ফিরে আত্মঘাতী মায়ের হাতে লেখা চিঠিতে সব সংবাদ জ্ঞাত হয়।

অতসী হচ্ছে বড়লোকের মেয়ে। নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন চঞ্চল, হাল্কা কাশে, উঁচু হাসে, ফটফট ক'রে চলে—সে যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকে তখন থেকেই নাকি ওর সফল ও ব্যর্থ ভালবাসার অনেক গল্প শোনা যায়। কিন্তু তার একটা গুণ আছে, সে নির্ব্বিকার। অত্যন্ত চাপা মেয়ে তাই তাকে কেউ বুঝতে পারে না। সুরেনকে সে এত ভালবাসে যে আদেশ পেয়ে আর একজনকে বিয়েই করে বসলো।

এই যে অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনা ও চরিত্রের ফিরিস্তি দিলাম তাকে 'ছোট ছোট অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত' বলা যায় না। গ্রন্থকার হয়ত মনে করেন কোন ঘটনা প্রবাহমান কথোপকথনের মধ্যে ব্যক্ত হ'লে ভারবহ হয় না, কিন্তু শিল্পী যেখানে কাঁচা, কোন যুক্তিই খাটে না সেখানে। সাধারণতঃ দেখা যায় কুৎসা ও পরচর্চ্চার বিবরণ বাস্তবিকই হোক বা কল্পিতই হোক আর তা' ঝড়েই উড়ে

আসুক বা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বকথায় আবৃত হয়ে ভাসুক, পাঠকের মনের মধ্যে তা' প্রবেশ করে কঠিন ইটের মত ও শেষ পর্য্যন্ত এমন এক কদর্য্য ইমারত খাড়া ক'রে বসে যা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে লিখন-ভঙ্গীর মৌলিকতা সুস্পষ্ট হ'লেও অসম্পূর্ণ, তাই অসঙ্গত ও অসন্তোষজনক ঘটনাগুলি পাঠকের মনকে পীড়া দেয়।

গ্রন্থকার ভূমিকার শেষে বলেছেন যে তাঁর ভাগ্যে আজো সাধনার সিদ্ধি মেলেনি তাই হয়ত' পাঠকদের তৃপ্তি দিতে পারেন নি। আশা করি এই স্বীকারোক্তিটি আন্তরিক এবং তিনি প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত প্রকাশকবর্গের নির্লজ্জ প্রশস্তিলিপি অস্বীকার করবেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প'ড়ে মনে হয় লেখক কিছুদিনের মত উপন্যাস রচনা স্থগিত রেখে ছোট ছেলেদের উপযোগী গল্প ও আজগবী পরী কাহিনী রচনায় মনোনিবেশ করলে নিজের ও সাহিত্য জগতের অশেষ উপকার করবেন। লেখবার স্বাভাবিক ক্ষমতার এতখানি অপব্যয় কদাচিৎ দেখা যায়।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে স্ত্রীলোকে সাহিত্য জগতে উচ্চাসন গ্রহণ করলে ব্যক্তিগত জীবনকে কখনই মধুময় ক'রে তুলতে পারে না। কিন্তু সাহিত্য ও চাকুরী জগতের এমন কোন চলতি কথা নাই যা এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয় নি। রাশি রাশি অবান্তর ও অসংলগ্ন ঘটনা ও মতামতের ছড়াছড়ি হয়েছে ও তার মধ্যে আসল পরিকল্পনাটি পরিস্ফুট হতে পারে নি।

এম্. এ. পাশ অশেষ ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া ক'রে বস্তির মধ্যে থেকে সাহিত্য ও চাকুরীর আরাধনা করে। বুড়ী বাড়ীওয়ালীর অত্যাচারে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বেলে রাখা যায় না। শেষে বুড়ীর এক কিশোরী নাতনী লুকিয়ে লুকিয়ে লণ্ঠন দিয়ে যায়। কৃতজ্ঞ যুবক তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি উপহার দিতে চায়। তারপর অনেক বছর পরে অশেষ যখন নাম-জাদা সাহিত্যিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রূপে জেঁকে বসেছে তখন সেই বস্তির মেয়েটির আবির্ভাব হ'ল। বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী কণিকা অদ্ভুত ভাল সাহিত্য রচনা করতে পারে। বাস্—প্রেম ও বিবাহ। তারপর কণিকা দেবীর প্রতিভা ও যশ যখন অভ্রভেদী হয়েছে তখন তার স্বামীর ঈর্ষা দেখা দিল। সতী সাধ্বী তখন বিশ্বের সাহিত্য জগতকে পথে বসিয়ে স্বামীকে নিয়ে

ডুব দিলেন। উপসংহারে দেখা যায় দুঃসহ অভাব অনটনের মধ্যে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত স্বামীকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিচ্ছেন।

অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনার সৃজনে দোষ নাই যদি রসপ্রতিপত্তি থাকে অক্ষুণ্ণ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গ্রন্থকার কথায় কথায় খেই হারিয়ে জঞ্জালের সৃষ্টি করেছেন। পুনর্ব্বার বলি উপন্যাস রচনা তাঁর স্বভাবজ গুণ নয় এবং তিনি 'যে নদী মরু পথে' নামকরণটি নিজের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ব'লে গ্রহণ করলে সকলের মঙ্গল হবে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
মূল্য দেড় টাকা ও দুই টাকা।

'ছেলেবেলা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলছেন: "এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে 'জীবনস্মৃতি'তে কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হোলো কাহিনী এ হোলো কাকলী······" অর্থাৎ 'জীবনস্মৃতি'র ও 'ছেলেবেলা'র রস একেবারে ভিন্ন পর্য্যায়ের। 'জীবনস্মৃতি'তে আমরা কবির বাল্যজীবনের পারিপার্শ্বিক ও ঘটনা-পুঞ্জের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাই তা' তাঁর উত্তর-জীবনেরই ভূমিকা, তাঁর সমগ্র জীবন-বৃত্তান্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'ছেলেবেলা'য় এই অংশটুকু কবির সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেছে নিজের অনিবার্য দাবিতে। তাই 'ছেলেবেলা' পড়ে একথা মনে হয় না এর পরে আরো কিছু আছে, মনে হয় এই সব, এর পরে আর কিছু হ'তে পারে না, যদি হয় তা' নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হবে। কেন না যে-ছেলেবেলার কথা রবীন্দ্রনাথ এতে বলেছেন

তা কোন ব্যক্তিবিশেষের ছেলেবেলা নয়, তা' সকলের ছেলেবেলার এমন অভাবনীয় চিত্র যে তার প্রভাব সর্বব্যাপী, পরিণত মানুষের জীবনকেও প্রাণবান ক'রে তুলতে পারে তার প্রেরণা।

কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক ছেলেবেলা আমাদের চোখে এমন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে একটির পর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অত্যন্ত যথাযথ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এত যথাযথ বর্ণনা স্বল্পোকরণ বাঙলা ভাষায় যে সম্ভব তা' এই রচনাটি না পড়লে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। তাই বিস্মিত হয়ে পড়েছি কবির প্রথম ইংরেজী পড়ার কথা :

> "মাষ্টার মশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ষ্টবুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চ'লত চোখ রগড়ানি। বারবার শুনতে হোতো মাষ্টার মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি ? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রু দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কি জানি কিসে পিছু ধ'রেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূতপ্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকি সুর, দড়াম ক'রে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে ভূতটা সব চেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোনে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারি ডালে এক পা, অন্য পা-টা তেতালার কার্ণিসের পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন মূর্তি, তাকে দেখেছি বলার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্ম্মজ্ঞান মোটেই নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে টেবিলের নিচে পা রাখলে পা সুড়সুড় ক'রে উঠত।"

লোক জড় ক'রে শোনাবার মতন নয় বাল্যজীবনের এই মামুলি স্মৃতি, কিন্তু কল্পনার সম্মোহনে ও ভাষার ইন্দ্রজালে লেখক একে দিয়েছেন রূপকথার

চিরন্তন মর্যাদা, যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন সেকালের কলকাতার নগণ্য রূপ এই অপরূপ ছবিতে :

"আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি সুরু হয়েছে বিজলী আলোর দিন। সে সময়টাতে সহরে কাজ কম কিন্তু বিশ্রাম নেই। উনুনে যেন জ্বলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, ষ্টীমারের বাঁশি থেমে যাবে, কারখানা ঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের গাঁটটানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নিচে শহুরে গোষ্ঠে। সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন, এখনে তার নাড়ীগুলো যেন দব্‌দব্‌ করছে। রাস্তার তুধারে দোকানগুলোতে কেনা বেচা তেমনি আছে। কেবল সামান্য কিছু ছাই চাপা। রকম-বেরমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়া-গাড়ি ছুটেছে দশদিকে; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম। আমাদের সেকালে দিন ফুরোলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নিচের তলায়।..."

এই ভাবে পংক্তির পর পংক্তিতে, পাতার পর পাতায় লেখকের স্মৃতি-বিস্মৃতির আবছায়াজাত সামান্য সামান্য ঘটনা বা ছবি অসামান্য হ'য়ে উঠেছে কল্পনার রঙিন প্রলেপে, লেখনীর অলৌকিক জাদুতে। অথচ এর কোথায়ও এতটুকু অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জনের চিহ্ন মেলে না। এত অল্প পরিসরে এতখানি সার্থকতার সৃষ্টি কবির অন্য কোনো গদ্যরচনায় পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। তার কারণ এই বইখানিতে বাঙলা গদ্যের যে-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা' একেবারে নূতন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম 'সবুজপত্র' পত্রিকায় চলতি ভাষায় রচনা আরম্ভ করেন তখন বাঙলা গদ্যের যে চেহারা আমরা দেখেছিলাম তা' আগে আমাদের অগোচর ছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই চলতি ভাষা ক্রমশ বিচিত্র আভরণে ভূষিত হ'য়ে সম্পদশালী হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ চলতি বাঙলার এমন স্বকীয় সৌষ্ঠব ও শক্তি আবিষ্কার করেছেন যে একেবারে নিরাভরণ মূর্ত্তিতে একে প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। এখনো বাঙলা গদ্য সমসাময়িক ইংরেজী গদ্যের তুল্য বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ হয়নি, কিন্তু স্বল্পতর উপকরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই বাঙলাকে যে-

ভাবে অসাধারণ সাহিত্য স্বজনের অনুগত আঙ্গিকে পরিণত করেছেন তার তুলনা ইংরেজী গদ্যে পেলে তেমনি আশ্চর্য হব, যেমন আশ্চর্য হয়েছি 'ছেলেবেলা'য় অসাধ্যসাধনে অপ্রয়াস সাফল্য দেখে।

'ছেলেবেলা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয় শুধু চলতি বাঙলার এই চরম অভিব্যক্তিতে নয়। বালক রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবন তার সঙ্কীর্ণ পরিধি ও সাময়িক পরিবেশ কাটিয়ে উঠে যে শাশ্বত শিল্পসৃষ্টির আশ্চর্য উপাদানে পরিণত হয়েছে তার প্রধান কারণ প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অভিধানে আজ আত্ম ও বিশ্বের পার্থক্য একেবারে লুপ্ত। তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'ছেলেবেলা'য় তথ্যের সন্ধান যতটা পাবেন, রসগ্রাহী পাঠক তা'র চাইতে অনেক বেশি পাবেন আনন্দ।

হিরণকুমার সান্যাল।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

পরিচয়

জীবন্মুক্তের দশা

(২)

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি, জীবন্মুক্তের দশায় ভূমানন্দ ও পরা শান্তি—এমন আনন্দ, যাহা নন্দনাতীত, যাহা অকথ্য অবর্ণ্য—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—যে আনন্দের পরিমাণ চরম মনুষ্য-আনন্দের ১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০০ গুণ, অর্থাৎ one hundred billion times এবং যে শান্তি পরা শান্তি শাশ্বত শান্তি—Absolute Peace, Eternal Peace —'that peace that passeth understanding'—যে স্বস্তি মানব-ধারণার বহু বহু ঊর্ধ্বে।

জীবন্মুক্ত পুরুষ কিরূপে ঐ বিপুল শান্তি ও স্বস্তির অধিকারী হন? বিষয়টা একটু বুঝিবার চেষ্টা করি। অ-শান্তির নিদান কি? কামনা বাসনা তৃষ্ণা। নির্বাণ-দশায় যখন 'যত্র কামাঃ পরাগতাঃ'—সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়, সমস্ত বাসনা উন্মূলিত হয় (ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।২), সমস্ত তৃষ্ণা নির্বাপিত হয় (মোক্ষ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ—মুক্তিক, ২।৬৮)—তখন নির্বাণীর অশান্তি আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুক্ত পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অ-কামহত' নাম দিলেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'অকাম নিষ্কাম

আপ্তকাম আত্মকাম' (বৃহ, ৪।৪।৬)—এই বিশেষণ-চতুষ্টয়ে বিশেষিত করিয়া বলিলেন—তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। ইহাকেই বলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। এই ব্রহ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—১৮।৫৪

ব্রহ্মভূত পুরুষ কামের ও শোকের অতীত—অতএব তিনি প্রশান্ত। যাজ্ঞবল্ক্যেরও ঐ কথা—

তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২

অর্থাৎ মুক্তপুরুষ, হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

অন্যান্য উপনিষদেরও ঐরূপ উক্তি—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩
তরতি শোকম্ তরতি পাপ্মানম্—মুণ্ডক, ৩।২।৯
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি—কঠ, ২।২২

'সেই মহতো মহীয়ান্ (বিভু) পরমাত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকের অতীত হন।'

এই জন্যই মোক্ষশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়ের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাস-ভাষ্যে একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত দেখা যায়, যাহার মর্ম্ম এই যে, ইহলোকে যে কামসুখ এবং দিব্যলোকে যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

বুদ্ধদেবও মনোজ্ঞ ভাষায় তন্‌হা-বিজয়ের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সব্বসঙ্খারসমথো সব্বূপধিপটিনিস্‌সগ্‌গো তন্‌হক্খয়ো বিরাগো নিরোধো নির্ব্বাণংতি

—মজ্ঝিমনিকায়

অর্থাৎ, 'This is the peaceful, this is the exalted : the coming to rest of all organic processes, the becoming free from all *upadhis*, the drying up of thirst, the unattractiveness, Nirodha, Nibbana.

অশান্তির আর একটি কারণ—বিচিকিৎসা, সংশয়, Doubt ; কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, কারণ—তিনি তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন, সত্যের তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'temperamental reaction to the vision of Reality' বলিতেছেন। অতএব ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ—মুণ্ডক, ২।২।৬—তিনি 'অ-বিচিকিৎস' হন। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন :—

ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি (৩।১৪।৪)—'যাঁহার এই অবস্থা, তাঁহার কখনও সংশয় হয় না' অর্থাৎ 'The illusion, when once it has been penetrated, can no longer delude.'

অশান্তির তৃতীয় কারণ—স্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত—এককথায় কৃত-কর্ম-বিপাক, —যাহার ফলে সুখ দুঃখ, 'হ্লাদ পরিতাপ'।

তে হ্লাদ-পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।১৪

মুক্তপুরুষ কিন্তু বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত হন—

বিসুকৃতঃ বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্—কৌষী, ১।৪

তিনি পুণ্য-পাপ-প্রহীন (ধম্মপদ, চিত্তবগ্গো, ৭), তাঁহার সমস্ত কর্ম অবসিত—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

অতএব পাপ ও পুণ্য, কৃত ও অকৃত তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এতং হ বা ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপম্ অকরবম্ ইতি স য এবং বিদ্বান্—তৈত্তি, ২।৮

'যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী—তাঁহাকে 'কেন আমি পুণ্য করিলাম না—কেন আমি পাপ করিলাম' —এ চিন্তা কখনও তাপিত করে না।'

কারণ, তিনি—

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার বলিয়াছেন—

ত্যজ ধর্মম্ অধর্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥

অর্থাৎ—

'ধর্ম ও অধর্ম—সত্য ও মিথ্যা সমভাবে ত্যাগ কর। উভয়কেই ত্যাগ করিয়া যাহার দ্বারা ত্যাগ কর—তাহারে ত্যাগ কর।'

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তে অপহত-পাপ্মা এষ ব্রহ্মলোকঃ।—৮।৪।১

'সেই পরমাত্মা সেতুস্বরূপ। তিনি সমস্ত লোকের অসংভেদের বিধৃতি (জাঙ্গাল—embankment)। সেই সেতুকে দিবারাত্রি উত্তীর্ণ হয় না—জরা মৃত্যু শোক সুকৃত ও দুষ্কৃত তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না। সমস্ত পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়—সেই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মৈব লোকঃ—শঙ্কর) অপহত-পাপ্মা।'

কিন্তু জীবন্মুক্ত ঐ সেতু উত্তীর্ণ হন—

তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি।

তিনি যখন ঐ সেতু উত্তীর্ণ হন, তখন পূর্বে যেন অন্ধ ছিলেন এখন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন—অক্ষত হন, রোগী ছিলেন—অরোগী হন।'

ঐ জীবন্মুক্ত-সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের উক্তি এই:—

এবম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ। ইত্যতঃ পাপম্ অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ * * আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি. নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২২-৩

'ইঁহাকে 'কি আমি পাপ করিয়াছি, কি আমি পুণ্য করিয়াছি' এ চিন্তা পীড়িত করে না—এ উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না। * * যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়' (মুণ্ডক, ৩।১।৪)—পাপ তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন; পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।'

ব্রাহ্মণ কে? ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার চর্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩৷৫৷১)—'By living as chance may determine' অর্থাৎ তিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (গীতা)।*

এই ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্তন করিয়া বৃহদারণ্যক এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্ধতে কর্মণা ন কণীয়ান্
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ, তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেন।

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম দ্বারা অপচিত বা উপচিত হন না। ব্রহ্মের পদ (তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি পাপ কর্মে লিপ্ত হইবেন কেন?'

বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যদ্ ইহ বা অপি বহ্বিব অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্বম্ এব তৎ সংদহতি, এবং হৈব এবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমৃতঃ সংভবতি—৫৷১৪৷৮

'যদি বহু কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সে সমুদায়ই দগ্ধ করে। সেইরূপ এই প্রকার বিজ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন তথাপি তিনি সে সমস্ত বিনাশ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর অমর হয়েন।'

ছান্দোগ্যের এ সম্বন্ধে উক্তি এই—

তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।

—৫৷২৪৷৩

---

* বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের ঐরূপই লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি পথায়ন্তীং ন শোচতি।
সংজ্ঞাসংগামজিং মুক্তং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥—উদান, ১।৮

The coming does not make him glad,
The going does not make him sad.
The monk, from longing all released,
Him do I call a Brahmana.

'যেমন ঈষিকা-বৃক্ষের তুলা (fibre) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীর সমস্ত পাপ প্রদগ্ধ হয়।'

ইহার সহিত ধর্মপদের নিম্নোক্তি তুলনীয়—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনিঘো যাতি ব্রাহ্মণো ॥

—ধম্মপদ, পকিণ্ণক বগ্গো, ৫

আমরা জানি, কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ। উপরিধৃত উপনিষদ্ বাক্যে আমরা জীবন্মুক্তের সঞ্চিত কর্মের 'বিনাশে'র কথা পাইলাম—গীতা যাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—গীতা, ৪।৩৭

'জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত (সঞ্চিত) কর্ম বিনষ্ট হয়'।

আর জীবন্মুক্তের ক্রিয়মান কর্ম? তাঁহার 'অশ্লেষ' হয়। এ-সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে—৪।১৪।৩ *

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম স্পর্শ করে না।'

ইহাকেই গীতা 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' বলিয়াছেন।

ঈশ-উপনিষদ্ সেইজন্য বলিলেন—

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে—২

* বুদ্ধদেবও এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন :—

সেয়্যথাপি ব্রাহ্মণ! উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবট্ঠং উদকং অচ্চুগ্গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন, এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ! লোকে জাতো লোকে সংবট্ঠো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন।

ইহার অনুবাদ এই—

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water—just so, Brahmin, I am born within the world, but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain.

—অঙ্গুত্তর নিকায় II.

অর্থাৎ এইরূপ হইলে, (ক্রিয়মান) কর্মের আর সংশ্রব হয় না। বাদরায়ণ মুক্তপুরুষের কর্ম সম্পর্কে এই 'অশ্লেষ-বিনাশ' লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন—

তদধিগমে উত্তর-পূর্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৩

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞের পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহজন্মকৃত কর্ম (যাহা সাধারণতঃ বন্ধের কারণ) বন্ধের হেতু হয় না—অর্থাৎ তাহার অশ্লেষ হয়।

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

সম্যক্-জ্ঞানাধিগমাৎ উৎপন্ন-সম্যগ্-জ্ঞানস্য ধর্মাদীনাম্ অকারণপ্রাপ্তৌ এতানি সপ্তরূপাণি বন্ধনভূতানি সম্যক্ জ্ঞানেন দগ্ধানি। যথা নাগ্নিনা দগ্ধানি বীজানি প্ররোহণ-সমর্থানি, এবম্ এতানি ধর্মাদীনি বন্ধনানি ন সমর্থানি।—সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য।

'যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ধর্মাধর্ম আর ফলপ্রসূ হয় না। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর আচরিত ধর্মাধর্ম বন্ধনের কারণ হয় না।'

বাচস্পতি মিশ্র অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

ক্লেশ-সলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম-বীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞান-নিদাঘ-নিপীত-সকল-সলিলায়াম্ ঊষরায়াং কুতঃ কর্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ ?

অর্থাৎ, জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে ঊষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদগম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই কর্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনোত করিয়া চিত্তকে ঊষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?

এই ভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন, তাঁহার ক্রিয়মান কর্ম আর কর্ম থাকে না—অকর্ম হয়।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ সর্ব-কর্মকৃৎ ॥
—গীতা, ৪।১৮

'যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই কর্মযোগী, তিনিই সমস্ত কর্ম সুনিষ্পন্ন করেন।'

বাকি রহিল 'প্রারব্ধ' কর্ম। জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্মের কি হয়? ঐ প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ বা অশ্লেষ হয় না—জীবন্মুক্তকে ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় করিতে হয়—

প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে—

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে—৪।১।১৯

অনারব্ধ-কার্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় উক্তঃ। ইতরে তু আরব্ধ-কার্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—শঙ্কর।

অর্থাৎ, 'অপ্রবৃত্ত-ফল যে পুণ্য-পাপ—জ্ঞানের বলে তাহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ বা প্রবৃত্ত-ফল যে কর্ম, তাহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়।'

ঐ পাদের ১৫ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য ঐ বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন্মান্তর-সঞ্চিত কিম্বা জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ইহজন্মকৃত যে সুকৃত-দুষ্কৃত, জ্ঞানাধিগমে তাহাই বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যে প্রারব্ধ কর্ম দ্বারা এ জন্মের শরীর নির্মিত হইয়াছে, ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় হয় না।

অনারব্ধ-কার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ—৪।১।১৫

অপ্রবৃত্ত-ফলে এব পূর্বে জন্মান্তর-সঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃত-দুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়তো ন ত্বারব্ধকার্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যামেতদ্‌ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্মিতম্—শঙ্করাচার্য্য

৬।১৪।২ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এ বিষয়ে পুনরায় বিচার উত্থাপন করিয়াছেন—

তথাপি প্রবৃত্তফলানাম্ অপ্রবৃত্তফলানাম্ চ কর্মণাং বিশেষঃ অস্তি—'প্রবৃত্ত-ফল ও অপ্রবৃত্ত-ফল কর্মের বিশেষ আছে।

কিরূপে—কথং?

যানি প্রবৃত্তফলানি কর্মাণি—যৈঃ বিদ্বৎশরীরম্ আরব্ধং, তেষাম্ উপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ।

'জীবন্মুক্তের যে প্রারব্ধ কর্ম—যদ্দ্বারা তাঁহার বর্তমান শরীর গঠিত হইয়াছে—সে কর্মের ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হয়।' ইহার দৃষ্টান্ত—যথা আরব্ধবেগস্য লক্ষ্যমুক্তেষ্বাদেঃ বেগক্ষয়াদেব স্থিতির্ন তু লক্ষ্যবেধসমকালমেব প্রয়োজনং নাস্তীতি তদ্বৎ। অন্যানি তু অপ্রবৃত্তফলানীহ প্রাক্‌জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধ্বং চ কৃতানি বা ক্রিয়মাণানি বা অতীতজন্মান্তরকৃতানি বা অপ্রবৃত্তফলানি

জ্ঞানেন দহ্যন্তে প্রায়শ্চিত্তেনেব। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেতথা' ইতিস্মৃতেশ্চ। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণী'তি চ আথর্বণে। অতো ব্রহ্মবিদো জীবনাদিপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রবৃত্ত-ফলানাং কর্মণাম্ অবশ্যমেব ফলোপভোগঃ স্যাদিতি যুক্তেমুবং 'তস্য তাবদেব চিরমিতি' যুক্তমেবোক্তমিতি যথোক্তদোষচোদনানুপপত্তিঃ। জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ ব্রহ্মবিদঃ কর্মাভাবম্ অবোচাম 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' ইতি অত্র তচ্চ স্মর্তুমর্হসি।

অর্থাৎ, যেমন লক্ষ্যভেদ জন্য নির্মুক্ত শর, লক্ষ্যভেদ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই নিবৃত্ত হয় না—বেগক্ষয় হইলে তবে নিবৃত্ত হয়—সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানী জীবন্মুক্তের প্রবৃত্তফল যে প্রারব্ধ কর্ম তাঁহার জীবন-প্রয়োজন অবসিত হইলেও সে কর্মফল-ভোগ শেষ না হইলে নিবৃত্ত হয় না। অবশ্য জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কৃত যে অপ্রবৃত্ত-ফল অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম তাহার এবং জ্ঞানোৎপত্তির পরে অনুষ্ঠিত যে ক্রিয়মান কর্ম তাহার 'অশ্লেষ-বিনাশ' হয়। ঐ বিনাশ বিষয়ে প্রমাণ—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি-ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' এই স্মৃতিবাক্য এবং 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি' এই শ্রুতিবচন। অতএব উপনিষদ্ যে বলিলেন—'তস্য তাবদেব চিরং' ইহা উপপন্ন বটে। 'ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি' ইহার ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞের কৃত কর্মের অশ্লেষ আমরা ইতিপূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি।'

প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিগত হইলে যখন অহংকার ও অভিমান তিরোহিত হয়, ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়,—তখন জীবন্মুক্তের শরীর কিরূপে বিধৃত থাকে? ইহার উত্তরে শ্রীশঙ্করাচার্য ৬।১৪।২ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলিয়াছেন—

সদ্-বিজ্ঞানানন্তরমেব দেহপাতো ন ভবতি কর্মশেষবশাৎ * * তস্য উপভোগেন ক্ষয়াৎ দেহপাতঃ।

অর্থাৎ অভুক্ত প্রারব্ধ কর্মের সংস্কার (momentum)-বশে কতকদিন (অর্থাৎ ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয় পর্যন্ত) জীবন্মুক্তের দেহ-ব্যাপার সচল থাকে। ইহাকেই সাংখ্যেরা বলেন 'চক্রভ্রমণবৎ ধৃত শরীরঃ'।* কুমারের চাক ঘুরাইয়া কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিল। ঘট প্রস্তুত হইয়া গেলেও চক্রের যে Momentum বা বেগাখ্য সংস্কার, সেই সংস্কারবশে চক্র ঘুরিতে থাকে। এইরূপ জীবন্মুক্তের যে শরীরযাত্রা—তাহা সংস্কার বশেই সম্পন্ন হয়—সে কেবল শারীর কর্ম—

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্—গীতা, ৪।২১

* চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ। সংস্কার লেশতঃ তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮২-৩

ঐ কর্ম ভোগ মাত্র—ফলপ্রসূ নয়। এ সম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে বলিয়াছেন—

যথা উপরতেঽপি কুলালব্যাপারে, চক্রং বেগাখ্যসংস্কারবশাৎ ভ্রমৎ তিষ্ঠতি, কালপরিপাক-বশাৎ উপরতে সংস্কারে নিষ্ক্রিয়ং ভবতি। শরীরস্থিতৌ চ প্রারব্ধ-পরিপাকৌ ধর্মাধর্মৌ সংস্কারঃ।

আচার্য শঙ্কর ইহার অনুমোদন করেন। তাঁহার উক্তি এই—বাধিতম্ অপি মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানবৎ কিঞ্চিৎকালম্ অনুবর্তত এব (৪।১।১৫ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য)।

এইরূপে ধৃত শরীরই জীবন্মুক্তের অন্তিম দেহ। বুদ্ধদেবের ভাষায়,

সবে অন্তিম-সারীরো মহাপঞ্‌ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি—ধম্মপদ

ঐ শরীরধারী জীবন্মুক্ত বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

গহকারক! দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি!—'হে ঘরামি! এইবার তোমার 'হদিস্' পাইয়াছি, তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ! আর নূতন ঘর গড়িতে পারিবে না!'

জীবন্মুক্তের ঐ অন্তিম শরীরের পাত হইলে কি হয়? সে অনেক কথা—আগামী বারে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাগরিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম অঙ্ক

পরদেশী—(নতি করিয়া) শুভ সন্ধ্যা, এলীডা ! আমি এসেছি।

এলীডা—হাঁ-হাঁ, সময় তো হয়ে এলো।

পরদেশী—যাবার জন্যে প্রস্তুত ? না, যাবে না ?

বাঙ্গেল্—দেখছো না ?—প্রস্তুত নয়।

পরদেশী—আমি ভ্রমণ-পরিচ্ছদের কথা বল্‌ছিনে; তৎ-সম্পর্কীয় পেট্‌রা-পেট্‌রির কথাও বল্‌ছিনে। সমুদ্র-যাত্রার জন্যে যা-যা দরকার সবই জাহাজে রেখে এসেছি। একটি ক্যাবিন-ও এঁর জন্যে বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছি। (এলীডাকে উদ্দেশে) তাই জিজ্ঞেস করছি, প্রস্তুত তো ? আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যেতে সম্মত ?

এলীডা—এ কী প্রশ্ন ! আমায় অমন ফুস্‌লাচ্ছো কেন ?

(দূরে জাহাজের ঘণ্টা শ্রবণ-গোচর হইল।)

পরদেশী—ঐ জাহাজে ওঠার প্রথম ঘণ্টা। বলো, হাঁ, না—না।

এলীডা—(হস্তদ্বয়ে মোচড় দিয়া) উ ! জন্মের শোধ নির্ব্বাচন ! পরে আর অদলবদল নেই !

পরদেশী—হাঁ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌তে হবে।

এলীডা—(কুণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি) তুমি আমায় এতো আঁকড়ে আছো কেন ?

পরদেশী—বোঝো না তুমি ?—আমরা যে দু'য়ে এক।

এলীডা—সেই বাগ্‌দানের জন্যে তো ?

পরদেশী—বাগ্‌দানে কি হয় ? ওতে না পুরুষ, না স্ত্রী—কাউকে বাঁধতে পারে না। তোমায় যে এতো আঁকড়ে আছি, তার কারণ—না আঁকড়ে থাকতে পারিনে।

এলীডা—(মৃদুতর কম্পিত স্বরে) আগে কেন এলে না তবে ?

বাঙ্গেল্—এলীডা!

এলীডা—(উদ্বেলিত) ইস্—কী মোহ কী লোভ! অজ্ঞাতের প্রতি কী আকর্ষণ! —যেন সাগরের অনন্ত উদ্দামতা এই একের মধ্যে উদগ্র হয়ে দেখা দিচ্ছে!

(পরদেশী বেড়া ডিঙাইয়া প্রবেশ করিলেন।)

এলীডা—(বাঙ্গেলের পশ্চাদ্‌ভাগে পদক্ষেপ করিয়া) কী—কী চাও!

পরদেশী—তোমায় দেখছি। তোমার মনের কথাও শুন্‌তে পাচ্ছি, এলীডা। আমাকেই শেষে তুমি বরণ করে নেবে।

বাঙ্গেল্—(অগ্রসর হইয়া) এ-ব্যাপারে আমার স্ত্রীর কোনো মতামত নেই। যা মত তা আমার। যেহেতু, ওঁর পরিরক্ষণ আমার কর্ত্তব্য। হাঁ পরিরক্ষণ বৈকি! এখান থেকে—এই দেশ থেকে, তোমায় পালাতে হবে বলে দিচ্ছি। যদি না যাও, ফের আসা-যাওয়া করো—তাহ'লে তোমারই একদিন আর আমারই একদিন!

এলীডা—না-না, বাঙ্গেল, চুপ করো।

পরদেশী—কি করবেন শুনি?

বাঙ্গেল্—জাহাজে যাবার আগেই এক্ষুণি তোমায় আসামী ব'লে ধরিয়ে দেবো। আমি স্কিওল্‌ভাইকেনের হত্যাকাণ্ডের সব খবর রাখি।

এলীডা—আঃ! বাঙ্গেল্, কী যে বল্‌ছো?

পরদেশী—আমিও আগাম তৈরী হয়ে এসেছি। এই—(বুক-পকেট হইতে রিভল্‌ভার বাহির করিয়া) এইটি সঙ্গে করে এনেছি।

এলীডা—(মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া) না-না, এঁকে মেরো না! আমায় মারো!

পরদেশী—ভয় নেই। কাউকে মারবো না। এটি আমার নিজের জন্যে;—কারণ, জীবনে-মরণে আমি স্বতন্ত্র থেকে যেতে চাই।

এলীডা—(বর্দ্ধিষ্ণু উত্তেজনার মধ্যে) বাঙ্গেল্! তোমায় বলছি;—এঁর সামনেই বলছি যেন ও-ও শুনতে পায়। তুমি আমায় এখানে আটক রাখতে সমর্থ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তোমার শক্তি-সামর্থ্য দু'ই আছে, অভিপ্রায়ও তাই। কিন্তু আমার মন, আমার ভাবনা-চিন্তা, আমার অন্তর্গূঢ় আশা আকাঙ্ক্ষা—এদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে

পারবে না। এরা ওই অজ্ঞাতের মধ্যে বেরিয়ে উধাও হয়ে যাবে। ও-ই অজ্ঞাতের জন্যেই প্রাণ আমার আকুলি-বিকুলি করে। আর এর-থেকেই তুমি আমায় আল্‌গোছে রেখেছো!

বাঙ্গেল্—(শান্ত ও বেদনার্ত্ত) বুঝছি এলীডা, এক-এক ধাপে তুমি আমার কাছ থেকে ফস্‌কে যাচ্ছো। ঐ অনন্ত অপার অগোচরের জন্যে তোমার অনুকাঙ্ক্ষা তোমায় শেষে অথই তিমিরে ঠেলে না ফেলে!

এলীডা—তাইতো—যেন নিঃসাড় কৃষ্ণ পক্ষপুটের মতো আমার চারদিক্ আচ্ছন্ন করে আছে!!

বাঙ্গেল্—না, এ হতে দিচ্ছিনে। তোমার উদ্ধারের একটা মাত্র পথ। অন্তত আমি আর দ্বিতীয় পথ দেখছিনে। তা-ই করা যাক: এক্ষুণি আমাদের প্রতিপণ প্রত্যাহার করলুম। স্বাধীন—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তুমি তোমার অভীষ্ট স্থির করো।

এলীডা—(চিত্রার্পিতবৎ দৃষ্টি স্তম্ভিত করিয়া রহিলেন) সত্যি! এ-ও সত্যি!! তোমার মনের কথা বল্লে?

বাঙ্গেল্—হাঁ এই কথা। নিদারুণ দুঃখ পাচ্ছি, তবু এ-ই আমার বক্তব্য বল্লুম।

এলীডা—বটে? তা-ই করতে চাও?

বাঙ্গেল্—হাঁ। আমি তোমায় প্রাণাধিক ভালোবাসি, এলীডা।

এলীডা—(অনুচ্চ কম্পিত কণ্ঠে) তুমি আমায় শেষে এতো—এতো আপনার ক'রে নিলে?

বাঙ্গেল্—এ আমাদের দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফল।

এলীডা—(উভয় হস্ত সংবদ্ধ করিয়া) আর আমি এদ্দিন কিছুই বুঝিনি?

বাঙ্গেল্—তুমি যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলে।...এখন তোমার পরিপূর্ণ মুক্তি হলো;—আমার কাছ থেকে মুক্তি, আমার সব দায় থেকে মুক্তি। তোমার জীবনের প্রকৃত পন্থা নির্ণয়ের সুযোগ আবার উপস্থিত। এবারে স্বাধীন ভাবে, আত্ম-দায়িত্ব অঙ্গীকার করে, তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির করো—এলীডা!

এলীডা—(উভয় হস্তে মস্তক আঁকড়াইয়া এবং বাঙ্গেলের দিকে লক্ষ্য স্থির

রাখিয়া) স্বাধীন ভাবে আত্মদায়িত্ব স্বীকার ! দায়িত্ব ? বটে ! —এতেই সব উলটেপালটে যাচ্ছে।

পরদেশী—শুনলে এলীডা ? শেষ ঘণ্টা পড়লো। চলো।

এলীডা —(ফিরিয়া; স্থিরদৃষ্টিতে—দৃঢ়কণ্ঠে) এর পরে তোমার সঙ্গে যাওয়া আমার হবে না !

পরদেশী—যাবে না ?

এলীডা —(বাঙ্গেলের দেহলগ্না হইয়া) তোমায়ও আমার ছাড়া চলবে না !

বাঙ্গেল্—এলীডা ! এলীডা !

পরদেশী—এ-ই শেষ ?

এলীডা—হাঁ, শেষ—চিরতরে শেষ।

পরদেশী—বটে ? আমার ইচ্ছাশক্তিকে ঠেকিয়ে রাখার দুশ্চেষ্টা ?

এলীডা—তোমার ইচ্ছার ছায়াও আমায় মাড়াতে হবে না। আমার কাছে তুমি মরার সামিল। সমুদ্র দিয়ে তুমি এসেছিলে। পুনরায় তোমায় সমুদ্রেই ফিরে যেতে হবে। মেঘ গেলো কেটে। আর তুমি আমায় প্রলুব্ধ করতে পারবে না।

পরদেশী—বিদায়, মিসেস্ বাঙ্গেল্ ! (লফ দিয়া বেষ্টনী পার হইলেন) আজ থেকে তুমি-ও আমার জীবনে একটা কাটিয়ে-ওঠা জাহাজ ডুবির বেশী কিছু নও। (প্রস্থান)

বাঙ্গেল্—(কিছুক্ষণ পত্নীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) এলীডা ! ঐ সাগরের মতো তোমার মন—কতো যে জোয়ার-ভাটা ! এই হঠাৎ-পরিবর্ত্তনটি তোমার কিসে হলো ?

এলীডা—ওগো ! বুঝছো না ? আর কিছুই যে হবার যো ছিলো না। আমি যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হয়ে আমার শ্রেয় নির্ব্বাচন করলুম !

বাঙ্গেল্—সেই অজ্ঞাতের প্রতি আকর্ষণের কী হলো ?

এলীডা—গেছে। এখন আকর্ষণও নেই, বিভীষিকাও নেই। ইচ্ছে করলে তো আত্ম-প্রেরণায় ঐ অগোচর-গর্ভে ঝাঁপ দিতে পারতুম। তাই ইচ্ছেকে নিজে অকুণ্ঠিত মনে দমন করতেও সক্ষম হলুম।

বাঙ্গেল্—অল্পে-অল্পে বুঝছি, এলীডা। তোমার চিন্তার পটে সব যেন ছবি হ'য়ে

প্রত্যক্ষ মূর্ত্তির মতো ভেসে ওঠে। সাগরের জন্যে তোমার উৎকণ্ঠা, তোমার ছটফটানি, ঐ ভিন্‌দেশীর প্রতি তোমার টান—সবই তোমার ক্রম-জাগ্রত প্রবুদ্ধ মুমুক্ষার অভিব্যক্তি। আর কিছু নয়।

এলীডা—তা বলতে পারবো না, বাঙ্গেল্। কিন্তু তুমি যদি সহায় না থাকতে আমার কি হতো, বলো দেখি? ধন্বন্তরীর মতো আমার রোগ চিনে নিয়ে ঠিক ওষুধটা প্রয়োগ করতে তুমি দ্বিধা বোধ করোনি।

বাঙ্গেল্—হাঁ গো ডাক্তার কিনা। বিপদের মুখে সাহস ক'রেই আমাদের অনেক কিছু করতে হয়। এখন আবার তোমায় আমার ক'রে পাবো, এলীডা!

এলীডা—প্রিয়তম! আমি আবার তোমার হলুম। এখন দেখবে, তোমার জন্যে আমি অসাধ্য-ও সাধন করতে পারি। কারণ, এবারে তোমার কাছে এলুম স্বেচ্ছায়, আত্ম-দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে।

বাঙ্গেল্—(রাগাত্মক দৃষ্টি) এলীডা! এলীডা!! এখন থেকে আমরা দু'জনে দু'জনার জীবন ভরপুর করে রাখতে পারবো?

এলীডা—হাঁগো আমাদের দু'জনকার সন্ধি হবে অভিন্ন হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।

বাঙ্গেল্—প্রাণবঁধু এলীডা আমার!

এলীডা—আর আমাদের সন্তানেরাও—

বাঙ্গেল্—'আমাদের' বলছো তো?

এলীডা—এখনো আমার নয়। কিন্তু তাদের হৃদয় আমি জিতে নেবো।

বাঙ্গেল্—অ্যা—'আমাদের'! (পুলকিত হইয়া শশব্যস্ত ভাবে তাঁহার হস্ত-চুম্বন করিয়া) এই কথাগুলোর জন্যে তোমায় কী বলে সাধুবাদ দেবো? (হিল্ডে, বেলেষ্টাড্, লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড, আর্ন্‌হল্ম্, এবং বোলেত্ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহরের একদল তরুণ-তরুণী ও অন্যান্য পর্য্যটকেরা ফুটপাথ দিয়া যাতায়াত করিতেছেন)।

হিল্ডে—(জনান্তিকে লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি) দেখছো?—বাবা-মাকে দেখাচ্ছে যেন সবে-মাত্র তাঁদের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হলো।

বেলেষ্টাড্—(কথাগুলি অলক্ষ্যে শুনিয়া) এ যে সামার্, ছোট্ট বিবি!

আর্নহলম্—(বাঙ্গেল্ ও এলীডাকে উদ্দেশ্যে) ইংরেজ জাহাজটি নোঙর তুলছে।

বোলেত্—(বেড়ার কাছে যাইয়া) এখান থেকে চমৎকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড্—এ-বছরের মতো এই শেষ যাত্রা।

বেলেষ্টাড্—কবিরা যেমন বলে থাকেন: অচিরেই সবগুলি সমুদ্র-পথ নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। মনটা কেমন কেমন করে সত্যি, মিসেস্ বাঙ্গেল্। আবার কিছুদিনের জন্যে আপনাকেও আমরা হারাতে চল্লুম। শুনছি নাকি, কাল স্কিওল্ভাইকেনে যাচ্ছেন?

বাঙ্গেল্—না। সেটা আপাতত মুলতুবি থাকলো। রাত্তিরেই প্ল্যান বদ্‌লে ফেললুম।

আর্নহলম্—(দুইজনকে পর-পর লক্ষ্য করিয়া) বটে!

বোলেত্—(অগ্রসর হইয়া) তাই নাকি বাবা?

হিল্ডে—(এলীডার অভিমুখে যাইয়া) তাহলে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছো না?

এলীডা—না, বাছা! তোমরা আমায় রাখো ত'—যাচ্ছিনে।

হিল্ডে—(অশ্রু ও হাস্যের দ্বন্দ্বে দোলায়মান) শুনলে কথা!—'রাখো ত'!

আর্নহলম্—(এলীডার প্রতি) এ তো জানতুম না—

এলীডা—(অনর্গল হাসিয়া) বুঝলে কিনা, মিঃ আর্নহলম্—; মনে আছে কালকের কথা? একবার যদি স্থলচর জীব হয়ে পড়তে পারো, তাহলে সমুদ্দুরে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া ভার। সাগর-জীবনও নাপছন্দ হয়ে যায়।

বেলেষ্টাড্—যেমন আমার মৎস্য-নারীর দশা।

এলীডা—হাঁ, কিছুটা।

বেলেষ্টাড্—তফাৎ এই যে, মৎস্য-নারী বেকায়দায় পড়ে মারাই গেলো। মানুষ কিন্তু নিজেকে স-সইয়ে নিতে পারে। হক্ কথা, মিসেস্ বাঙ্গেল্!—মানুষে স-সইয়ে নেয়।

এলীডা—নেয়,—কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের ভেতর দিয়ে মিঃ বেলেষ্টাড্।

বাঙ্গেল্—এবং যখন দায়িত্ব স্বীকার ক'রে কাজ করে—তখন, ভীয়ার—

এলীডা—(ফস্ করিয়া হাত বাড়াইয়া) যা বলেছো তুমি !

(বড়ো জাহাজটি নিঃশব্দে ফিওর্ডের বাহির হইয়া যাইতেছে। সমুদ্র-তীরে অনতিদূরে ঐক্যতান শোনা যাইতেছে।

যবনিকা

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইব্‌সেনের The Lady from the Sea হইতে অনূদিত

কলিকাতা।

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস

বৈদিক যুগ

(৩)

বেদের 'আর্য্য' নামধেয় জনগণ যখন কাবুল ও পঞ্চনদ উপত্যকায় আবির্ভূত হয়, তখন তাঁহারা খাঁটি যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে ; তখন তাহারা পশু-পালন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিলেও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই সময় পরিবারের প্রধান সম্পদ পশু হইলেও, কৃষিকর্ম্মেও তাহারা প্রবৃত্ত হইতেছিল। "কৃষি" শব্দই উহার পরিচায়ক। ইহার অর্থ হইতেছে—"লোক সমূহ" (people)। 'কর্ষ'—অর্থ চাষ করা' ; যে চাষ করে সে 'কৃষি' এবং 'কৃষি' অর্থে 'সমস্ত কৃষকের দল' বলিয়া অনুমিত হয় (১)। পশুপালকেরা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া 'কৃষ্টির' মানে 'লোক সমূহ'—এই অর্থে বিবর্ত্তিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। এই লোকসমূহ বিভিন্ন কূলে (clan) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কূলই একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতার উপাসক (২) ছিল এবং সকলে নিজদিগকে 'আর্য্য'—এই সাধারণ নামে অভিহিত করিত। 'আর্য্য' শব্দটী 'কর্ষণ' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ; ইহার অর্থ 'নিজেদের লোক' (popularis) (৩), নিজেদের কূলের বা কৌমের লোক (৪)। প্রাচীন কালে স্বীয় গোষ্ঠি বা কৌমের বাহিরের লোকগণ 'পর' বা 'শত্রু'—যাহাদের সহিত কোন প্রকার 'বন্ধুত্ব' সূত্র থাকিতে পারে না—এইরূপ ভাবে বিবেচিত হইত। এইভাবে প্রাচীন ইহুদিগের মধ্যেও দুইটি নীতির সৃষ্টি হয়:—First to the Jew, then to the Gentile (প্রথমে ইহুদি, পরে অন্যজাতির লোক) :

১। Zimmer—Altindisches.Laben ; p. 14. ২। Zimmer—p. 14. ৩। Roth —Dictionary. ৪। জার্ম্মান জাতির নিজ ভাষায় 'Deutsch' নামটিও পথিক, 'নিজের জাতি বা লোক সম্পর্কীয়'—এই অর্থ হইতে হইয়াছে।

গ্রীকদিগের মধ্যেও এই প্রকারে 'হেলেনে ও বর্ব্বর' ভাবটী উদ্ভূত হয়। পারস্য-বাসীদের মধ্যেও 'আইরা' বা 'আইরান' ও 'দহ'—এই দুই প্রকারের নীতির উদ্ভব হয়। বৈদিক লোকদের মধ্যেও মনে হয় ওই ইরাণী ভাবটী ভারতে আনয়ন করা হয়। "যাঁহারা নিজেদের কূলের বা নিজেদের লোক নয়" তাহারা আর্য্য নয়, তাহারা 'আর্য্যে'-র শত্রু 'দস্যু' বা 'দাস' ইত্যাদি মনোভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই দ্বৈত-নীতির (Dual Moral Code) ফলে ইহার অনুসরণ-কারী জাতিগুলি নিজেদের 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে করে; নিজেদের গণ্ডীর বাহিরের লোকদের ঘৃণাসূচক নানা বিশেষণে অভিহিত করে এবং তাহাদের সহিত ক্রমাগত শত্রুতা চালায় (৫)। এই সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুষ্ঠানটী লক্ষ্য করিয়া আমাদের 'আর্য্য' ও 'অনার্য্য' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

ভূমি-কর্ষণকারী এই আর্য্যগণ যে-স্থানে বাসস্থান স্থাপন করিত তাহাকে 'বসতি' বলিত। প্রথমে ইহার অর্থ ছিল—রাত্রি যাপন করিবার স্থান; পরে ইহার অর্থ হয়—"বাসস্থল"। বেদের বচনে ইহা দেখা যায় যে এই 'বসতি' একা একা সম্ভবপর হইত না। যে-স্থলে লোকে একত্রে বাস করিত, তাহাকে 'গ্রাম' নামে অভিহিত করা হইত (ঋক ১০।১২৭।৫)। এই গ্রামে গাভী সকল মাঠ হইতে চড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত (১০।১৪৯।৪)। এইরূপ গ্রাম অপেক্ষা বড় এবং অধিকতর সুরক্ষিত স্থানকে 'পুর' বলা হইত। ভিন্নকূল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সেখানে (পুর) ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা হইত। এইসঙ্গে তথা-কথিত আদিম অধিবাসীদের অনেক 'পুরে'-র উল্লেখ এমন কি তথা-কথিত 'আয়সী' পুরের কথাও উল্লিখিত আছে। পুরের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে ইহা মাটির ঢিপি (দেহি) দ্বারা বেষ্টিত একখণ্ড জমি। বিপদ কালে (শত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণ সময়ে) তাহারা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই স্থানকে অধিকতর সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রস্তর দ্বারা বেষ্টিত করা হইত। শান্তির সময়ে এই পুরগুলি পরিত্যক্ত হইত। অনেক সময়ে গ্রামের মধ্যেই এই "পুর" নির্ম্মিত হইত। এতদ্বারা এই বুঝা যায় যে চতুর্দ্দিকের লোকদিগকে শত্রু-হস্ত

৫। আজকালকার বড় বড় জাতি সমূহের মধ্যে কলহ ও ঘৃণা—এই কৌমগত মনোবৃত্তি জাতীয় হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালের কূল বা কৌমগত ক্ষুদ্রতা ও কুসংস্কার আজকাল জাতীয়তা (nationalism নামে) চলিতেছে।

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্ব্বতোপরি বা উচ্চ স্থানে যে কেল্লা নির্ম্মিত হইত তাহাকেই "পুর" বলা হইত। পর্য্যটকেরা বলেন, পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতে এই প্রকারের এক 'পুর' বা 'কেল্লা' পাওয়া যায় (৬)।

বেদে প্রাচীর বেষ্টিত বড় বড় সহরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সিমার বলেন, প্রাচীন জার্ম্মাণ, শ্লাভ ও ইতালীর আদিম অধিবাসী পেলাসগীয়দের মধ্যেও বৈদিক 'পুরে'র ন্যায় আত্মরক্ষার্থ স্থান ছিল। কিন্তু "সহর" ছিল না (৭)। তৎকালে গ্রামে বাস করিবার জন্য বাড়ীগুলি কি মালমশলায় তৈয়ারী হইত, সে সম্বন্ধে ঋক বেদে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। মুইর অনুমান করেন, (৮) যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবে যে প্রকার পাথর দ্বারা কাদার ঘর তৈয়ারী করা হয়, বেদের সময়ে তদ্রূপ করা হইত। অথর্ব্ববেদে (৩।১২।৯,৩) এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় এই মন্ত্রে উল্লিখিত ঘরটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। তারও বহুপরে মেগাস্থিনিসও এই বর্ণনা করিয়াছেন (Indica 10.2)। ইহার মশলা ছিল—কাষ্ঠ, বংশ ও তৃণ। ইহা দ্বারাই গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। বাড়ীটি চারিভাগে বিভক্ত হইত :— হবির্ধান, অগ্নিশালা, 'পত্নীনাম সদন,' সদস্য (অথর্ব্ব বেদ ৯।৩।৭)। অর্থাৎ সোমলতা রাখিবার ভাণ্ডার, পবিত্র অগ্নি রাখিবার স্থান, স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থান এবং একটি পার্শ্ববর্ত্তী ঘর। 'গৃহ' সম্পর্কে এইটুকু বিবরণই আমরা পাই। এই 'গৃহে'র আসবাবের বিবরণ ঋক্‌বেদে আরও কম। স্ত্রীলোকেরা প্রোষ্ঠ (বেঞ্চ), ভাইয়া (Vahya) এবং তল্পতে (বিছানা) শয়ন করিত। দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য 'ভাইয়া' ব্যবহৃত হইত। বিছানা পাতিবার দ্রব্যটি (অর্থাৎ যাহার উপর শয্যা রচনা করা হইত) চারিপদ বিশিষ্ট হইত ; বিবাহের সময় নারী যে যানে আরোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিত তাহা দ্বারা শয়ন করিবার খাটটি নির্ম্মাণ করা হইত ;—তদুপরি বিছানা থাকিত। একটি কৌমের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে নীচের বিছানাকে 'আস্তরণ' বলিত এবং ঢাকিবার কাপড়টিকে 'উপবর্হন' বলা হইত : বসিবার

৬। Huegel--Kashmir, pp. 20—25.

৭। Zimmer—pp. 145—147.

৮। Muir—S T 5, 461.

বলিশটিকে 'আসাদ' এবং মাথারটিকে 'অপশ্রয়' বলিত (৯)। কৌশিতকি উপনিষদেও বিছানার (পর্য্যঙ্ক) এবম্প্রকারের বর্ণনা আছে (১০)।

এহেন গৃহের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিত; তাহাকে "বাস্তোস্পতি" বলা হইত (ঋক ৭।৫৪)। এই প্রকারে সজ্জিত একটি গোষ্ঠি বহু অশ্ব, গরু লইয়া সম্পদশালী হইত। এই সকল পশুপালনের জন্য যেখানে জলাভাব হইত, সেইখানে মাটি খুঁড়িয়া 'উৎস' (ঋক ১০।১০১।১২) নির্ম্মাণ করা হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'আর্য্য' নামধারী লোকগণ বিভিন্ন কূলে বা কৌমে বিভক্ত ছিল। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কতকগুলি কূল বা কৌম আত্মরক্ষার জন্য বা অপর কৌমের গণ্ডীর মধ্যে লুণ্ঠনের জন্য বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইত (পরুষনি এবং যমুনার ধারের লড়াই কালে এরকম সংঘবদ্ধতার সংবাদ (বিবরণ) পাওয়া যায়। যুদ্ধে জয় বা কার্য্য-সিদ্ধি হইলে, প্রত্যেক কৌম পৃথক হইয়া যাইত (১১)। এই কৌম (tribe) প্রতিষ্ঠানটি বৈদিক আর্য্য-দিগের সর্ব্ব প্রথম একতার স্থান ছিল। একটি কৌম আবার বিভিন্ন 'বিশ' দ্বারা বিভক্ত ছিল। কতকগুলি 'বিশ' একত্র সংঘবদ্ধ হইলে তাহাদের 'জন' বলিত। যথা, 'ভারতম্ জনম্' (৩।৫৩।১২)। জন অর্থে 'কৌম' বা tribe বুঝাইত। কতগুলি 'বিশ' দ্বারা একটি 'জন' সংগঠিত হইত, তাহা জানা যায় না। 'বিশে'র চেয়েও ক্ষুদ্র 'গ্রাম' এবং কতকগুলি পরিবার (family) লইয়া একটি গ্রাম গঠিত হইত—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তুলনামূলক পাঠ দ্বারা এরূপ অনুমিত হইবে যে প্রাচীন ইরাণী, প্রাচীন জার্ম্মান, প্রাচীন শ্লাভ ও প্রাচীন ইতালীয় রাষ্ট্র-গঠনপদ্ধতি ও বৈদিক রাষ্ট্রগঠনের পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। এই রাষ্ট্র-পদ্ধতির শীর্ষে থাকিত একজন 'রাজন'। অনেক কৌমের মধ্যে এই পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইত। আবার 'বিশ' হইতে 'রাজা' নির্ব্বাচন করিবার দৃষ্টান্তও আছে (১০।১২৪।৮)। প্রজাদিগকে

৯। Zimmer—p. 155.

১০। Aufrecht—Ind. Stud. 1, 140.

১১। রোমান ঐতিহাসিক টাসিটুস প্রাচীন জার্ম্মানদিগের সম্পর্কে এইরূপ বর্ণন দিয়াছেন।

সকল সময়ই রাজার অনুগত হইয়া থাকিতে হইত। রাজাকে স্বেচ্ছায় উপঢৌকন ('বলি') প্রদান করা হইত। এই স্বেচ্ছা-বলিই পরে 'কর' রূপে রূপান্তরিত হয়। রাজা জমকাল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রজাগণ হইতে স্বীয় পার্থক্য বজায় রাখিত। রাজার নিকট কতকগুলি স্তাবক থাকিত। তাহাদের গোষ্ঠী সমূহ এক একটি কৌমের সহিত সনাক্ত (identified) থাকিয়া রাজার তদীয় কৌমের বা জনের বীরত্ব প্রশংসা বা স্তুতি-গান করিত। এইপ্রকারে 'বশিষ্ঠ গোষ্ঠী' ত্রিৎসু কূলে ও বিশ্বামিত্র গোষ্ঠী ভরত কূলের স্তুতি গায়ক ছিল। রাজাদের দান হইতেই এই সকল স্তাবকদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এই জন্য ইহারা যতদূর সাধ্য নিজদিগকে রাজকার্য্যে লাগাইত। যজ্ঞ বা সোমরস প্রস্তুত-কালে ইহাদের স্তুতি ব্যতীত ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাগণের মনঃপূত হইত না (১০।১০৫।৮)। অনেক রাজা বা রাষ্ট্রের একটা বড় যজ্ঞের সুন্দর ও মনোনীত (সুধিত) স্তুতি গাহিবার উপযুক্ত লোক থাকিত না। সেইজন্য স্তুতি-গায়ক বংশ হইতে একজন উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইত ; ইহাকে 'পুরোহিত' বলা হইত। কোন ভয়ানক শত্রুকে জয় করিলে, রাজা এই পুরোহিত গায়ককে যথেষ্ট বক্‌শিস্ প্রদান করিত (৭।১৮।২১)। ঋক বেদের 'ধনস্তুতি'তে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বক্‌শিস বা' দানই পরে পুরোহিতের 'দক্ষিণা'-রূপে বিবর্ত্তিত হয় (১২)।

একটি 'বিশে'র শীর্ষদেশে একজন 'বিশ'পতি থাকা সম্ভব। কিন্তু ঋক্‌বেদে এই তথ্য পাওয়া বড় শক্ত (১২ ক)। ইহার (বিশ) প্রাথমিক অর্থ হইতেছে—'একটি বসতির শাসক'। ইহার দ্বারা একটি বাড়ীর শাসক, একটি 'বিশে'র শাসক এবং রাজা অর্থও বুঝায়। কিন্তু একটি গ্রামের শাসক 'গ্রামানি' বলিয়া উল্লিখিত আছে। অনেকস্থলে তাহাকে 'ব্রজপতি' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে (১০।১৭৯।২)। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় রাজার যথেচ্ছারিতার কোন ক্ষমতা থাকিত না। জনগণের ইচ্ছার দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হইত। জনগণ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তাহাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করিত। এই সম্মেলন তিন প্রকারের ছিল :—গ্রামের লোকদের সম্মেলনকে 'সভা 'বলিত ; ইহা দ্বারা গ্রামের যে গৃহে সভা বসিত সেই সাধারণ গৃহ বুঝাইত। এইস্থান

১২। Zimmer—p. 171. ১২ ক। Zimmer—p. 171.

আবার খেলার ঘররূপেও ব্যবহৃত হইত (১৩)। এই সভায় *গ্রামানি* (ব্রজপতি) সভাপতিত্ব করিতেন। কিন্তু এই সভায় কি বিষয়ের আলোচনা হইত সে সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ (বিবরণ) পাওয়া যায় না। তবে গ্রাম-বাসীগণের ঝগড়া বিবাদ সম্পর্কিত সকল বিষয় বিবেচিত ও আলোচিত হইয়া মীমাংসা হইত। এই কারণে পরে 'সভা' অর্থে 'আদালতও (১৪) বুঝাইত। সভার কার্য্য শেষ হইলে সেখানে 'পাশা-খেলা হইত। এই প্রতিষ্ঠানের উপরে ছিল—'বিশ'। কিন্তু এই সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণীরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বশেষ আসে সমস্ত কৌম বা জনগণের সম্মেলন—ইহাকে 'সমিতি' বলা হইত; রাজাও ইহাতে যোগদান করিতেন।

এই দুই প্রকার রাষ্ট্র-পদ্ধতি ব্যতীত আরও এক প্রকারের রাষ্ট্র-পদ্ধতি ছিল বলিয়া সিমার অনুমান করেন। এই পদ্ধতির রাষ্ট্রে শান্তির সময়ে কৌমের শীর্ষোপরি একজন রাজা থাকিত না; বরং রাজবংশের অনেক সভ্যই রাজশক্তি পরিচালনা করিত। 'রাজন' শব্দের অর্থ হইতেছে—'শাসক'। সমিতি একত্রিত হইলে কৌমের রাজার (রাজা জনস্য) পরিবর্ত্তে অভি-জাতীয়েরা (রাজন্য) সভাপতিত্ব করিত (অথর্ব্ব বেদ ১৯,৫৭,২ ; ১,৯ ; ৩,৪ ; ৪,২২) (১৫)।

উপরোক্ত রীতি-পদ্ধতির বিবরণ পাঠে আমরা ইহা অবগত হই যে রাষ্ট্রে জনসাধারণ স্বাধীন ছিল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকার বুঝিতে এবং সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিল,—কারণ আইন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ও জ্ঞান অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ছিল। 'স্তি' বা 'উপস্তি' নামীয় শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ বা বিবরণ পাওয়া যায় না। সমাজে তাহাদের আইন সঙ্গত অধিকারাদি সম্বন্ধেও অতি অল্প সংবাদই পাওয়া যায়। ইহারা অর্থ-নীতিক. কারণ বশতঃ সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল কিনা—এই বিষয়ে

১৩। গ্রীক ও জার্ম্মানদের গ্রাম্য সভাগৃহও এই প্রকারে ব্যবহৃত হইত। ১৪। মহিধর—V. S. 20, 17

১৫। পরবর্ত্তী যুগে লিচ্ছবীদের মধ্যে এই প্রথা কতক কতক ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ কৌমের প্রত্যেক সর্দ্দার রাজা ছিল। টাসিটুস জার্ম্মানদের মধ্যে উক্ত প্রকারের পদ্ধতি দেখিয়াছেন।...

পরিষ্কার রূপে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। তাহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি ঋকে এইরূপ বর্ণিত আছে :—আমাদের 'স্তি' এবং সম্পত্তি ভাগ করিয়া দাও (৭,১৯, ১১), স্তুতি গায়ক ও 'স্তি'কে রক্ষা কর (১০।১৪৮।৪)। 'স্তি'র (স্তিপ) রক্ষা কর্ত্তা হও (১০,৬৯,৪) 'স্তি' ও 'উপস্তি' শব্দদ্বয় এই বিষয়ের ঋক গুলিতে যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সিমার (১৬) অনুমান করেন যে ইহা দ্বারা কেবল 'তাঁবেদার' বা Client অর্থই বুঝায়। তিনি ইহাও মনে করেন যে ইহারাও আর্য্য জাতীয় ছিল। হয়ত প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও জার্ম্মানদের অর্দ্ধ-গোলামদিগের (Serf) ন্যায় ইহারাও দাসত্বে পরিণত আর্য্য কৌম সকলের লোক ছিল। ইহারা অর্দ্ধ-স্বাধীনরূপে আপন জমিতে বাস করিত। ইহাও হইতে পারে যে একজন পাশাক্রীড়ায় শুধু নিজ বাড়ীই হারায় নাই, অধিকন্তু নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের মহাভারতে পাণ্ডবগণের দ্যৌতা-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দাসত্ব বন্ধনের দৃষ্টান্ত ইহার সহিত মিলিয়া যায়। বেদে একটি ঋকে এই প্রকারের অবস্থাও বর্ণিত আছে : অন্য লোকে তাহার 'স্ত্রী'কে আলিঙ্গন করিয়াছে, সে সময়ে পাশা তার ধন দৌলত হারাইয়াছে। তার পিতা-মাতা ও ভ্রাতা বলে—'আমরা তাকে চিনি না।' বন্ধনের পথেই সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে (১০,৩৪,৪)। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে এই প্রকারের হতভাগ্যেরা কি উপাস্তরূপে পরিচিত হইত।

রাষ্ট্রে আরও এক প্রকারের লোক ছিল। ইহারা কৌমের বিপক্ষে কোন দুষ্কর্ম্মের ফলে কৌমের লোকদের দ্বারা জাতিচ্যুত হইত, অর্থাৎ সমাজ হইতে বিতাড়িত হইত। তাহারা দক্ষিণাপথে (Deccan) পলায়ন করিত (১০,৬১, ৮)। ইহাদিগকে 'পরিবৃক্ত' বলিত।

আর্য্য কৌম সমূহের রাষ্ট্র-প্রণালীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা তাহাদের পারিবারিক জীবনের বিষয় অনুসন্ধান করিব। ইণ্ডো-ইউরোপীয় অপরাপর জাতিগুলির ন্যায় বৈদিক কৌমগুলির নিজ বংশ, আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে লইয়া পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ হইত। এই পরিবার রাষ্ট্র ও পল্লীর ভিত্তি ছিল। পরিবারের শীর্ষদেশে পরিবারের পিতা গৃহস্বামী (গৃহপতি, 'বিশ' পতি) রূপে বিরাজ করিত। পুরুষই নূতন পরিবার প্রতিষ্ঠা

১৬। *Zimmer--p. 184—185.*

করিত। কন্যাগণ অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিত। অনেক কন্যা উপযুক্ত বর না পাওয়া গেলে 'চির কুমারী' থাকিয়া পিতৃগৃহে বাস করিত (১,১১৭,৭ ; ২।১৭।৭)।

যে পরিবারে যে 'গৃহপতি' হইত, সেখানে তাহার 'স্ত্রী গৃহপত্নী' হইত (অথর্ব্ব ১৪,১,৪৩)। এই স্ত্রীকে 'জায়া' বলা হইত ; কারণ তাহার দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হইবে। সেইজন্য পুত্র সন্তানই সবিশেষ কাম্য ছিল (১,৯২,১৩)। পুত্র-দ্বারাই পিতার বংশ বৃদ্ধি হইত (১,৯১,২০)। পরিবারের বংশ বৃদ্ধি হইলে গো-পাল বৃদ্ধির প্রার্থনার সহিত ভূমি (জমি) বৃদ্ধির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং পুত্রগণের বীরত্বের কথাও জড়িত থাকিত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহা মোটেই সন্তোষ ও আনন্দের কারণ হইত না (অথর্ব্ব ২,১৪,২)।

নব বিবাহিত বধূকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া বলা হইত—শ্বশুরের উপর কর্ত্রী হও, শ্বাশুরীর উপর কর্ত্রী হও, আমার ভগিনীর (ননদ) উপর কর্ত্রী হও (১০। ৮৫,৪৬)। আবার ইহাও দেখা যায় যে পরিবাররূপ এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পুরুষ কর্ত্তার অসীম প্রতাপ ও প্রভাব ছিল। দাস ও সন্তান-সন্ততিগণ কেবল তাহাকে মানিয়া চলিলে পর্য্যাপ্ত হইতনা—তাহাদের উপর তাহার আরও ক্ষমতা ও অধিকার ছিল। পিতা পুত্রের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিতে পারিত (১, ১১৬,১৬) ; পিতার বাধ্য হওয়া পুত্রের পক্ষে আনন্দজনক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত (১,৬৮,৫)। স্ত্রীকেও কর্ত্তার ইচ্ছাধীন ও বাধ্য থাকিতে হইত। তথাপি পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মণ্য-প্রধান রাষ্ট্র অপেক্ষা বৈদিক যুগেই স্ত্রীলোক উচ্চ অধিকার পাইয়াছিল (শতপথ ব্রাহ্মণের রচয়িতা কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে ১,১,৪,১৩)। এই যুগে স্ত্রীলোকের অধিক সম্মানের কারণ এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক কার্য্য যজ্ঞে, সে প্রত্যহ স্বামীর সহিত যোগদান করিতে পারিত। এই কারণে স্ত্রীও গৃহপত্নী ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে—বিবাহ কাহাদের মধ্যে সম্পন্ন হইত ? হিন্দুরা সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে বিবাহ করে না। এই প্রকার সামাজিক আইন ও নিয়মটি একদিনে অথবা অল্প সময়ের মধ্যে বিবর্ত্তিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন—এক সময়ে সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে যম ও যমীর কথোপকথনের ঋকটী

(১০,১০) উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য উক্ত শ্লকটি দ্বারা সহোদর ও সহোদরার মধ্যে এইরূপ বিবাহের প্রথা প্রচলন ও অপ্রচলন প্রথাটীর দুইটী দিকই প্রমাণ করা যায়। যম যমীকে (যে ভ্রাতার আলিঙ্গনপ্রার্থী) বলিতেছে—আমি তোমাকে কখনও বিবাহ করিব না। সহোদরাকে বিবাহ করিলে পাপ-বিদ্ধ হইতে হইবে। এবং বরুণ দেবের নিকট ইহা কখনও অজ্ঞাত থাকিবেনা। ইহা দ্বারা এইরূপও বুঝা যায় যে, এই প্রকারের বিবাহ এক সময়ে সমাজে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই প্রথা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্যই যম সহোদরাকে এই প্রকার বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিতেছে। আবার ইহাও হইতে পারে যে এই প্রকারের বিবাহের নজীর না থাকিলে কি ভাবে যমী ঐ প্রকারের বিবাহের প্রস্তাব সহোদরের নিকট উপস্থিত করিবে (১৭)? এই প্রকার বিবাহ পদ্ধতির সমাজে প্রচলন ছিল না বলিয়াই যম তাহার সহোদরাকে এই বিবাহে প্রতি-নিবৃত্ত করিতেছে।

১৭। সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহের প্রথা পৃথিবীর প্রাচীন যুগে অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। বোধ হয় জনসাধারণ হইতে পৃথক থাকিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। প্রাচীন ইরাণ ও মিশরের রাজবংশ এমন কি দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু প্রদেশে ইন্কাদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আলেকজাণ্ডারের পারস্য মিসর বিজয়ের পর যখন তাঁহার সেনাপতি টলেমি এবং সেলিউকুস পারস্য ও মিশরের রাজা হওয়ার পর সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ প্রথা নিজেদের বংশে প্রচলিত করিলেন, তখন তাঁহারা নিজেদের অধীন প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে উক্ত প্রথার প্রচলনের নজীর দেখান। প্রাচীন ভারতের যম ও যমীর গল্প যে-ভাবেই গৃহীত হউক না কেন (জার্ম্মানদের গল্পাদিতেও এই প্রকার বিবাহের প্রচলনের কথা উল্লেখ আছে : Zimmer—P. 323) বৌদ্ধ জনশ্রুতিতে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে (Weber, Ind. Stud. 5, 427 ; 1, 204)। আবার ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুরাণাদিতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। নহুষ ও বিরমহৎ, পুরুকুৎস এবং সম্ভবতঃ শুক্র ও শুকের এই প্রকারে বিবাহ হইয়াছিল। পুরাণাদিতে এই প্রকার বিবাহের কথা অনেকস্থলে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন কোন একস্থলে বিবাহিতা সহোদরাকে পিতার পোষ্যকন্যা বলা হইয়াছে। ভারদ্বাজ ঋষির ঔরষে এবং তদীয় সহোদরার গর্ভজাত পিপ্পলাদ ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ড ও নাগর খণ্ডে অতি অলৌকিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিবাহ গোষ্ঠীর বাহিরে হইত (exogamy), কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল (দীর্ঘতমা ঋষি কর্তৃক এক রাজার দশ কন্যা বিবাহ করিবার নজীর) (১৮)। অবশ্য একপত্নীত্ব (দম্পতি সমনসা) সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর প্রশ্ন উঠে বহুস্বামিত্ব (Polyandry) বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল কিনা? এই বিষয়ে আধুনিক অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে ইহা যথার্থভাবে ছিল কিনা? সিমার বলেন—যে সময়ে স্ত্রীলোক বিবাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে উহা অতীব গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত এবং কুমারীর কুমারীত্ব নষ্ট করাকেও তদ্রূপ অপবাধ বলিয়া গণ্য হইত, সেই সময় আইন দ্বারা বহু-স্বামীত্ব প্রচলন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারিত? ঋক ১০, ৮৫, ৩৬ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে অনেকে বহু-স্বামীত্বের প্রমাণ পাইয়া থাকেন। কিন্তু সিমার বলেন উক্ত ঋকে 'মনুষ্যা ; না ; প্রহরাম' প্রভৃতি বহুব্রীহি প্রয়োগকে plural majestatis বলা যাইতে পারে (Weber's—Ind. Studien. 51, 191)। 'স্ত্রী', 'বধূ' প্রভৃতি শব্দকে collective sense-এ গ্রহণ করিলে বহু স্বামীত্বের কোন অর্থ পাওয়া যাইবে না। অথর্ব্ববেদে (৫, ১৭, ৮) উক্ত আছে—যখন কোন স্ত্রীলোকের দশজন অব্রাহ্মণ স্বামী থাকে, পরে যদি একজন ব্রাহ্মণ সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তবে শেষোক্ত ব্রাহ্মণই একমাত্র স্বামী বলিয়া গণ্য হইবে"। এই উক্তি দ্বারা বহু স্বামীত্ব প্রমাণিত হয় না। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিবাহের জন্য স্ত্রী নির্ব্বাচন করিবার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বরঞ্চ ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণের অপরাপর জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীরই বড়াই করা হইতেছে। মনে হয় যখন ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে ঘোরতর শ্রেণী সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন এই দাবী উদ্ভূত হইয়াছিল (১৯)।

পরিবারে বৃদ্ধদের কি পদ থাকিত তাহা সঠিক জানা সহজ নয়। বোধ হয় বৃদ্ধেরা যুবকদিগকে 'গৃহপতি'র পদ ছাড়িয়া দিত। যুবক স্বামী তাহার নব

১৮। Wilson—Rigveda. 3 ; Pargiter—Ancient Indian Historical Traditions : p. 70

১৯। Zimmer—P. 325-326.

পরিণীত-স্ত্রীকে বাড়ী আনয়ন করিবার পর বলিতেছে—শ্বশুরের উপর কর্ত্রী (সম্রাজ্ঞী) হও, শ্বাশুড়ীর উপর কর্ত্রী হও" ইত্যাদি (১০,৮৫,৪৬)। এই উক্তি হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে সে নিজে যেমন 'গৃহপতি' আছে, তদ্রূপ তাহার স্ত্রীকেও 'গৃহপত্নী' করিতেছে। অনুমান হয় যে বৈদিক কৌমগুলির গৃহপতিরা প্রাচীন রোমান Pater Familias ন্যায় ছিল না; অতটা ক্ষমতা বৈদিক গৃহপতির ছিল না। গৃহপতির মৃত্যুর পর তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সেই পরিবারের সমুদয় অধিকার ও কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিবার ভার পড়িত। পরিবারে বিধবাদিগের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু নিশ্চিতরূপে জানা যায়, বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করা অথবা 'সতী-দাহ' প্রথা তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। কেবল ঋকবেদের ১০,১৮,৭ শ্লোকটির নির্লজ্জ জাল করিয়াই এই প্রথা বর্ত্তমানকালে প্রচলন করা সম্ভবপর হইয়াছিল (২০)। ইহাতে বিধবার পুনর্বিবাহের কথাই প্রমাণিত হয়। ঋক ১০, ৪০, ২-তে দেবরের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে:—"কোথায় অশ্বিনী সন্ধ্যাকালে থাকে, কোথায় সকালে...কে তোমাকে বিছানায় আনয়ন করে যেমন বিধবাকে তাহার দেবরের বিছানায়" ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদে ৯, ৫, ২৭ বিধবার পুনর্বিবাহের উল্লেখ আছে:—কোন স্ত্রীলোক তাহার পূর্ব্ব স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিলে, অজ পঞ্চৌদন দান করিলেও তাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু 'সতীদাহ' যে ভারতীয় আর্য্যদের নিকট অজ্ঞাত ছিল তাহা বলা যায় না। রাজা শূদ্রকের সময় কাদম্বরী নামক পুস্তকে সতীদাহের বিপক্ষে এক বিস্তৃত বক্তৃতার উল্লেখ আছে। মুসলমান যুগে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। আকবর স্বয়ং ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই যুগেই বাংলায় রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ইহা ধর্ম্মানুশাসনরূপে পরিণত হয়। শেষে একদল শিক্ষিত হিন্দুর সহায়তায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টই এক নিষেধাত্মক আইন দ্বারা ইহা বন্ধ করিয়া দেন। অনেক ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত

২০। H. H. Wilson—I. R. A. S. 16, 20, 2. Roth—Z. D. M. G. 468. M. Muller—Z. D. M. G. 9. P. VI, XXV, Essays 2, 30.

ছিল (২১)। তাহাদের মধ্যে পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী ভৃত্য, ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্রাদিও মৃত ব্যক্তির সহিত পোড়ান হইত—কারণ মৃতের এই সকল ব্যক্তিগত জিনিষপত্র পরলোকে তাহার কাজে লাগিবে। এই সতীদাহ পরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে আইনরূপে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের দোহাই দিয়া এই প্রথার অর্থ করা অথবা শ্লোক জাল করায় এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলার বিশেষ অর্থ নাই। তুলনামূলক ইতিহাস পাঠ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন জার্ম্মাণ, নর্স, থ্রেকীয়, শক, হেলেনিক ও শ্লাভদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সিমার বলেন, এই প্রাচীন প্রথাটী কয়েকটী বৈদিক কৌমের মধ্যে কিয়দংশে প্রচলিত ছিল। অতঃপর সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহার প্রচারের দ্বারা এই প্রথাকেও পবিত্র প্রথা বলিয়া প্রচলিত করা হয়। কিন্তু সীমারের এই শেষোক্ত অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলি৷ মনে হয় না। কোনও একটি প্রথার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে থাকে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা। সীমার উহা দেখাইতে পারেন নাই। বহুপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত উহা (ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা) প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমত বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তাহার দেবরের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত (কৌমের জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই নিশ্চয় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল)। পরে দেবর অথবা আত্মীয় দ্বারাই বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। ঐ সময়ে কৌম-প্রথা ভাঙ্গিয়া বড় বড় জাতি সংগঠিত হইয়াছে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে পশুপালন ও কৃষিজীবীর অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয়েরা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে; কাজেই বিধবার বিষয়ের অংশটা কাড়িয়া নিবার লোকও তখন যথেষ্ট ছিল। সেইজন্যই এই জঘন্য প্রথার উপর জোর দেওয়া হয় এবং ধর্ম্মানুশাসন দ্বারা ইহাকে সর্ব্বত্র প্রচলিত করা হয়।

এক্ষণে বৈদিক কৌমগুলির অর্থনীতিক অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাউক। বৈদিক আর্য্যদিগের রোজগারের প্রধান উপায় ছিল গরুর পাল। গরু ও অশ্ব পাওয়া ছিল যজ্ঞকারীর মনোগত ভাব ও ইচ্ছা (১, ৮৩, ৬)। দেবতাদের নিকট প্রার্থনাতে প্রথমে গরু ও ঘোড়ার উল্লেখ আছে, পরে মানুষের

২১। Herodotus—5, 5; 4. 71. Zimmer—329-330: Grimm—Geschichte derd. Spr. p. 98. Weinhold—Altn. Laben, p. 276.

উল্লেখ রহিছে। "তাহারা এই গ্রামে ষাঁড়, ঘোড়া, মানুষ এবং গরু বাঁচাইবে (অথর্ব্ববেদ, ৮।৭।১১)।" এই যুগে গাভী, মেষ, ছাগল, ঘোড়া, গাধা এবং কুক্কুর গৃহপালিত পশু ছিল। ইহাদের মধ্যে গরুই পশুপালনের প্রধান জন্তু ছিল। যে-সব ষাঁড় প্রজননের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইত না, সেই সব ষাঁড় দ্বারা লাঙ্গল ও ভারবাহী গাড়ী টানান হইত। পক্ষান্তরে দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট প্রকারের ষাঁড় (বৃষভ) বলি দেওয়া হইত (৫, ২৯, ৭ : ৫, ২৭, ৫) : বিবাহ ও পার্ব্বন উপলক্ষ্যে গো-হত্যা করা হইত (১০, ৮৫, ১৩)। গো-পালনের পর ছিল মেষপালন কার্য্য। মেষাদি দেবতাদিগের নিকট বলি দেওয়া হইত। এই পশুর লোম দ্বারা আবার বস্ত্র বয়ন করা হইত (১০, ২৬, ৬)। ভেড়ার লোম-দ্বারা মানুষের কাপড় এবং পশ্বাদির জন্য কম্বল প্রস্তুত করা হইত।

বৈদিক জাতিগুলির নিকট ঘোড়াও একটি অতি আদরের জন্তু ছিল। এই পশু দ্বারা যুদ্ধের সময় রথ টানান হইত, এবং ঘোড়-দৌড়ের বাজী জেতা হইত (২২)। গাধাও ভার বহনের কার্য্যে লাগান হইত। "ঘোড়ার চাইতে গাধা (অশ্বতর, পাপিয়ান) ছোট (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫,১,২,১-২)।" এতদ্দারা ইহার ঘোড়া অপেক্ষা কম কার্য্যকারিতারই প্রমাণ হয়। সর্ব্বশেষে আসে কুক্কুর (শ্বন)। এই জন্তুটী পশুপালকদের যথার্থ বন্ধু। কুক্কুর পশুপালকদের গরু খুঁজিয়া আনিত, মৃগয়াতেও ইহাকে ব্যবহার করা হইত; তস্করাদি খেদাইবার জন্যও নিযুক্ত থাকিত; উৎসবাদি উপলক্ষে মাংসের হাড়-গোড় খাইতে পাইত (৬ ৩৭,৩)।

এই সব পশু বৈদিক আর্য্যদিগের আর্থিক উন্নতির উপকরণ ছিল। ইহার মধ্যে গো-উৎপাদন ছিল সর্ব্বপ্রধান আর্থিক উপায়। তারপর কৃষি-কর্ম্ম (২৩)। যে জমিতে মানুষ পাকা বাসস্থল নির্ম্মাণ ও স্থাপন করিয়াছে সেইরূপ জমিকে 'ক্ষেত্র' বলা হইত এবং ব্যবহারোপযোগী জমিকে 'উর্ব্বরা' বলিত। কৃষির জমি সম্বন্ধে বিশেষ আইন এবং ব্যক্তিগত অধিকারের ব্যবস্থাও ছিল। "কৃষকের ন্যায় মাপকাঠি লইয়া তাহারা (ঋভূগণ) জমি

২২। Zimmer—p. 430
২৩। Zimmer—p. 235.

মাপিতেছে (১,১০,৫)।" এই ঋক বচন দ্বারা প্রত্যেক চাষীর টুকরা (খণ্ড) জমি ব্যবহার ব্যবস্থার ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে। দুইটি চাষের জমির মধ্যে যে জমিখণ্ডে চাষ দেওয়া হইত না (খিল), উহা খালি রাখা হইত ; এবং এই স্থানকে রাস্তারূপে ব্যবহার করা হইত। চাষের জন্য 'লাঙ্গল' ব্যবহৃত হইত ; উহা ধাতুদ্বারা মণ্ডিত হইত (পভিরভস্তু)। শস্যের মধ্যে যবের চাষ হইত। 'চাউলে'র উল্লেখ বেদের প্রথম যুগে কুত্রাপি পাওয়া যায় না (২৪)। বাজসানেয় সংহিতাতে 'গম' (গোধূম) উল্লিখিত হইতে দেখা যায় (১৮,১২,১৯, ৮৯)। এই কৃষিকর্ম্ম বৎসরে দুইবার হইত।

কৃষিকর্ম্ম ব্যতীত বিভিন্ন পেশা ও অবলম্বিত হইত। যথা—কাঠের কার্য্য (সূত্রধর), রথকার, ধাতুর কার্য্য (কর্ম্মকার ও ধাতু দ্রব করিয়া বিভিন্ন কর্ম্ম) চামড়া পরিষ্কার করিবার কার্য্য প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি অবলম্বিত হইত। এই সব ব্যতীত তাঁত বয়নের কার্য্যও ছিল।

ইহার পর ছিল ব্যবসায়। বৈদিক লোকেরা সমুদ্রতীরস্থ বিদেশে গিয়া ব্যবসা করিত কিনা সেই বিষয়ে বিতর্ক আছে। উইলসন বলেন, তাহারা সমুদ্র পারে যাইত। কিন্তু সিমার বলেন, বেদে ইহার কোন প্রমাণ নাই। বেদে সমুদ্র গমনের অর্থ সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা প্রশাখাগুলির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত (২৫)। সেই সময়ে ব্যবসায় 'বিনিময়' (barter) পদ্ধতি দ্বারাই সম্পাদিত হইত ; টাকার বদলে 'গরু' সেই অভাব পূরণ করিত। গরুর দামেই ভেড়া, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ব্বরাবস্থায় 'বিনিময়' প্রথা ছিল। বেদে উল্লিখিত অবস্থার পর 'টাকা' বিবর্ত্তনের চেষ্টা চলে। 'নিষ্ক' যাহা গলায় বা বুকে পরিবার গহনা ছিল (৭,৫৬,১৩) তাহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। নিষ্ক ও ঘোড়া দানের সামগ্রী স্বরূপ হয়। "একশত নিষ্ক আমি (স্তুতিগায়ক কক্ষিবন্ত বলিতেছে) অভাবগ্রস্ত রাজার নিকট হইতে পাই, একবার আমায় একশত ঘোড়া দান করা হইয়াছিল (১,১২৬,২)।" এই সময়ে "মণ" (২৬) ওজনটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল ("শকামনা হিরণ্যন্তয়া" ৮,৭৮,২)।

২৪। Zimmer—p. 239 ; Robough বলেন 'চাউল' ছিল দক্ষিণ ভারতের শস্য।

২৫। Zimmer—p. 256. (২৬) 'মণ' শব্দটি বোধ হয় ভারতের বাহির হইতে

এই অর্থনীতিক ভিত্তির উপরই সমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং এই আর্থিক অবস্থানুযায়ী আহারাদিও সম্পাদিত হইত। গরুর পাল ও কৃষিদ্বারা একটি পরিবার তাহাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল দুগ্ধ (পয়স, ক্ষীর)। এইজন্যই দুগ্ধবতী গাভীর (ধেনু) এত যত্ন করা হইত। এইসঙ্গে ভাজা (ভর্জ্জ), ধান্য (যব কণা), ফল, গোধূম, চাউল, শস্যচূর্ণের দ্বারা প্রস্তুত 'পুরোডাস (ইহা প্রধানতঃ দেবতাদের ভোগে দেওয়া হইত) খাদ্য ছিল (২৭)। তবে, খাদ্যের মধ্যে আজকালকার রুটীর পরিবর্ত্তে (পুরোডাস ব্যতীত) জলের সহিত সিদ্ধ বা দুগ্ধের সহিত প্রস্তুত ধান্যচূর্ণ বা কখন ঘৃত-প্রস্তুত পায়স বা "চরু" জাতীয় খাদ্যই প্রস্তুত করা হইত। বিবাহ (১০,৮৫, ১৩) এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে মাংস দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করিয়া খাওয়া হইত। মাংসের মধ্যে গরু জাতীয় উক্ষ, মহিষ, বৃষ দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করা হইত। লোকে সাধারণতঃ তাহাই খাইত। যজ্ঞে অশ্ব অতি অল্প ব্যবহার হইত বলিয়া উহার মাংসও খুব কমই খাওয়া হইত। তবে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হইয়া লোকে কিছুই খাইতে আপত্তি করিত না। এক ঋষি বলিতেছেন—"প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আমি একটা কক্কুরের নাড়িভুঁড়ি খাই" (৪,১৮,১৩)। মৎস্য খাওয়া প্রথমে প্রচলিত ছিল না (২৮)। কিন্তু পরে

আসিয়াছে। অতি প্রাচীন হেটিটেরা এই 'মণ' শব্দটি ব্যবহার করিত। ফার্সী ভাষায় 'মণ' লাটিন—'mina'; গ্রীক 'মণ' ও সংস্কৃত ভাষার 'মণ'এর উৎপত্তি এক বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ইহার উৎপত্তি হইতেছে বাবিলনীয়—ফিনিসীয় ভাষা হইতে।

২৭। বোধ হয় 'পুরোডাস' হইতে 'পরোটা' বা 'পরেঠা'—পরে "রুটি" "রোটি" শব্দ বিবর্ত্তিত হয়। প্রাচীন গ্রীসেও প্রথমতঃ লোকে রুটী প্রস্তুত করিতে জানিত না। তাহারা ময়দা জলে গুলিয়া কাই তৈরী করিয়া খাইত। প্রাচীন রোমের ঐতিহাসিক যুগে কৃষকেরা হাতে প্রস্তুত 'চাপাটি' খাইত। বোধ হয় yeast দ্বারা ফাঁপান (খামিরে করা) ময়দায় তুন্দুরে করা রুটী পশ্চিম এসিয়া হইতে ইউরোপে আমদানী করা হয়। প্রাচীন ইহুদিরা এই প্রকারেই রুটী প্রস্তুত করিত।

২৮। Orientalist-দের মতে ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে প্রথমাবস্থায় মৎস্য খাওয়া প্রচলিত ছিল না। এই নজীর ধরিয়া তাহারা বলেন যে ইহারা নিশ্চয়ই পশুপালক; এবং সমুদ্র উপকূল হইতে দূরদেশে বাস করিত। এইজন্যই বোধ হয় তাহারা সেমিটিক

যজুর্ব্বেদে তাহা উল্লিখিত হয় ("সতরুদ্রিয় বাজসনেয় সংহিতা ১৬ : তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪,৫, ১-১১) এবং অশ্বমেধকাণ্ড বাজসনেয় (৩০)"।

এইসব খাদ্যের পাত্রও সাদাসিদা ছিল, পাত্র ও "আসেসনা" ব্যবহৃত হইত। প্রথমোক্তটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইত বলিয়া অনুমিত হয় (১,১৭৫,৩)। পান করিবার জন্য গ্লাসও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইত। অথর্ব্ববেদে পুড়ান এবং অ-পুড়ান দ্রব্যে প্রস্তুত "পাত্র"ও উল্লিখিত আছে (৪,১৭,৮)। যজ্ঞের জন্য এবং ঘরে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত আয়স-নির্ম্মিত (আয়সময়) পাত্র "ঘর্ম্ম" তৈয়ারী হইত। আগুনে চাপাইয়া রাঁধিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত (প্র-বর্জ ৫,৩০, ১৫)। মৃত্তিকা দ্বারা (মৃন্ময়ী) "উখা" (বাজসনেয় ১১,৫৯) এবং 'স্থালী" (বর্ত্তমানের 'থালী বা থালা) (বাজসনেয় ১৯,২৭,৮৬) প্রস্তুত হইত।

বৈদিক আর্য্যদের ক্ষুধার চাইতে তৃষ্ণা অধিক কষ্ট দিত। বেদে পানীয় সম্বন্ধে অনেক লম্বা চওড়া তালিকা ও উহার প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে। বৈদিক কৌমগুলি "রাজাসোমের" গুণগানে মুখরিত হইত। এই রাজাসোমই আবেস্তায় হোম ক্ষত্রিয় (২৯) বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সুরা' (৩০) (পুরাতন বক্ট্রীয় Bactrian 'হুরা'), 'কিলাল' পারস্রুত (ইহা সোমও নয় সুরাও নয়—শতপথ ব্রাহ্মণ ৫, ১,২১,১৪) প্রভৃতি মদ উত্তপ্ত (গ্রীষ্মপ্রধান) দেশের অহরহঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিত।

খেলার মধ্যে পাশাখেলা একটা বড় ব্যসন ছিল। এই খেলায় অনেক জুয়াচুরিও হইত (৫,৮৫,৮ ; ৭,১০৪,১৪। আর একটি খেলা ছিল রথের-দৌড়

(semitic) জাতিগুলির ন্যায় সমুদ্র গমনকারী (maritive) জাতি ছিল না। প্রাচীন রোমান, পারসিক জাতিগুলির দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ। মনুতে মৎস্য ভক্ষণে ও হিন্দুর সমুদ্র গমনে নিষেধ বিধি বোধ হয় এই সকল ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির সুদূর অতীতের প্রথাগুলির প্রতিধ্বনি মাত্র। বৈদিক যুগের পর ভারতীয়দের সমুদ্র যাত্রা প্রথার সহিত প্রাচীন ভারতীয় আরীয় (Indo-Aryan) জাতির সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। মনুর মৎস্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ-বিধি সত্বেও বাঙ্গালী হিন্দুর মৎস্য-প্রিয়তার সম্পর্কটিও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

২৯। I. I. S. Taraporewala—Selection from Avesta and Old Persia. Part, I. p. 14.

৩০। ফার্সী 'হ' এস্থলেও সংস্কৃত 'স' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

Chariot Race (৩১)। ইহা যুদ্ধ ক্রীড়া শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাজী রাখিয়া রথ সমূহ দৌড়াইত (৯,৩৬,১ ; ৯,৭৪,৮ ; ১,১১৬, ১৭)। অথর্ব্ববেদের মতে, একটি সোজা রাস্তা (কাষ্ঠা) দিয়া দৌড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে (কার্ষমান) পৌছাইত ; পরে যেস্থান হইতে দৌড় আরম্ভ করিয়াছিল সেখানে পুনরায় ফিরিয়া আসিত (অথর্ব্ব ২,১৪,৬)। এইরূপ অনুমিত হয় যে, পরে পুরোহিতবর্গের প্রচেষ্টায় এবং লোকের সামরিক প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসার ফলে এই খেলা বন্ধ হইয়া যায়। হয়ত ভারতে এই ঘোড়ার অভাবের দরুণ (ঘোড়া সিন্ধুদেশ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১,৫,৫,১২) এবং কাবুলীস্থান হইতে তৎকালে আমদানী বন্ধ হওয়ায়) এই খেলা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।

বৈদিক কৌমগুলি প্রতিনিয়ত পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত। কতকগুলি কৌমের পুরুষদের কার্য্যই ছিল যুদ্ধ। যথা, "যুদ্ধেই ইন্দ্র তাহার প্রধান বন্ধু খুঁজিত" (৮,২১,১৩) ; "হে ইন্দ্র আমরা ঘরে বসিয়া বৃদ্ধ হইতে চাইনা…" (৮,২১,১৫)। তখন উত্তর ভারতে আর্য্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে ; কৌম এক জায়গায় বসতি স্থাপন করিয়া চাষ ও কৃষি কর্ম্মাদি করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছে। অপর একটি কৌম তাহাদের বলপূর্ব্বক সেখান হইতে অপসারিত করিতে চায়। কাজেই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বাধিত। গরুর পাল লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে এবং "ব্রজ" (গোচারণ মাঠ বা গোপাট) বলপূর্ব্বক কাড়িয়া নিবার উদ্দেশ্যেও লড়াই বাধিত। আবার 'দস্যুদের' সহিত বহু যুদ্ধের বর্ণনাও আছে (১,৩৪,৯)। ইন্দ্র তাহার ভক্তদের দাস ও আর্য্য

৩১। এশিয়া মাইনরের (Asia Minor) প্রাচীন হেটিট (Hettite) এবং বোধ হয় মিটানী (Mitanni) জাতিদ্বয়ের মধ্যে রথের দৌড় (Chariot Race) খেলা হইত। ভাষা-তত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে এই মিটানীদের ভাষা সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ ছিল ; এবং তাহাদের দেবতাদের নামও বৈদিক দেবতাদের ন্যায় ছিল। (Vide Dr. B. N. Dutta—"Ancient Near East and India: Cultural Relations", pp. 266—272, Calcutta Review, September ; 1937). এতদ্বারা অনুমিত হয় যে প্রাচীন কতকগুলি আর্য্য-ভাষীদের মধ্যে রথ-দৌড় খেলা একটি দশের ব্যাপার ছিল। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতগণ এই মিটানী জাতির সহিত বৈদিক আর্য্যদের জাতিগত সম্বন্ধ টানেন।

শত্রুদের (দাসা বৃত্রাণি আর্য্যা স) হস্ত হইতে রক্ষা করিত (৬,৩৩,৩)। এই যুদ্ধ বেশীর ভাগ রথে আরোহণ পূর্ব্বক হইত। আবার পদাতিকের যুদ্ধও (মুষ্টি হত্যা) হইত। যোদ্ধারা শরীরের বিভিন্ন স্থান বর্ম্মাবৃত করিয়া সংগ্রাম করিত। যুদ্ধে অস্ত্রের মধ্যে 'যুরণি' বা 'ইউরণি' (Yurni) নামক অস্ত্রটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের বস্তু। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রথের মতে ইহা আগ্নেয়াস্ত্র (৩২)। মরুৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সৌখীন ছিলেন তাঁহার যুদ্ধকালীন সাজ-সজ্জার বিবরণ পাঠেই আমরা তাহা অবগত হইতে পারি। এবং তৎকালীন সৌখীন ও বিলাসী যোদ্ধারও কতকটা সংবাদ জানিতে পারি (৫,৫৪,১১)। "তোমার স্কন্ধদেশে বর্ষা (ঋষ্টি) বহন করিতেছ, পায়ে মল, (খাদি), বুকে সোনার অলঙ্কার, রথেও গহনা, হাতে আগুণ—চমকান অস্ত্র (বিদ্যুৎ), মস্তকে সোনার শিরস্ত্রাণ (helmet)।" নামজাদা গৃহস্থদের (গৃহস্পতি) সমর সজ্জা ছিল মাথায় পাগড়ী, বর্শা ধনুক, রথ, গায়ে কাল কোর্ত্তা, দুইটা কাল ও সাদা চামড়ার ঢাল (চর্ম্ম), গলায় রূপার গহনা, (রজতো নিস্কা)।

এইস্থলে বৈদিক জাতিগুলির পোষাক পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়া পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিতে চাই। বেদের স্তুতিগায়কেরা, অর্থাৎ ঋষিগণ সাধারণ বসনাদির বিবরণ খুবই কম দিয়াছেন। পরিচ্ছদের সাধারণ নাম ছিল 'বাসস; বস্ত্র'। ইহা ভেড়ার লোমে বয়ন করা হইত (বাজসনেয় ১৯,৮০)। পরিচ্ছদটি নানা রঙ্গে রঞ্জিত করা হইত। ইহাকে 'পেষাস' বলা হইত। "অগ্নি রঙ্গীন পোষাক পরিধান করিয়া আছে (১০,১,৬)," "উষাকালের আকাশ নর্ত্তকীর ন্যায় রঙ্গীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে" (১,৯২,৪)। এই সকল ঋক হইতে আমরা একটি রঙ্গীন গাত্রাচ্ছাদনের তথ্য অবগত হই। স্ত্রীলোকেরা নানাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিত। এইজন্য তাহাদিগকে 'সুবাসাস' বলা হইত (১,৮৫,১)। পোষাকগুলি নানাবিধ চকচকে রঙ্গে (৩৩) রঞ্জিত হইত। গাত্র বস্ত্রের সাধারণ নাম ছিল—

৩২। Zimmer—p. 30

৩৩। পৃথিবীর, সর্ব্বত্রই বর্ব্বর অবস্থায় বা সভ্যতার প্রথম অবস্থায় উজ্জল বর্ণের পরিচ্ছদ পরিহিত হইত।—ইহার মধ্যে শুষ্ক গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অধিবাসিগণ রঙ্গীন বস্ত্রাদি পরিধান করিত বলিয়া অনুমিত হয়, এবং আর্দ্র দেশের লোকেরা উহা ব্যবহার করিত না বলিয়াই

"আতকা"—পুরাতন বক্রীয় 'আধকা' (কেহ কেহ আবার 'আতকা' শব্দের অর্থ 'অস্ত্র'ও বলেনা); ইহা বয়ন করা হইত (১,১২২,২)। মরুতের এই 'আতকা' সোনার দ্বারা অলঙ্কৃত হইত (৫,৫৪৬)। বোধ হয় গায়ে ব্যবহার করিবার প্রথম বস্ত্রকে 'বাসাস' বলা হইত (অথর্ব্ব, ৮,২,১৬)। ইহার উপর একটা বড় আলখাল্লা বা কোটের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিহিত হইত। ইহার নাম ছিল—'অধিবাস' (১,১৪০,৯)। ইহার নীচে তস্যাগ্রে পুরুষ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা পেটে 'নিভি' জড়াইয়া বাঁধিত (অথর্ব্ব ১৪,২,৫০)। 'আতকা'র অপর একটি নাম ছিল—"দ্রাপি"। চামড়া অথবা উহার লোম (fur) যুক্ত পোষাক কতটা ব্যবহৃত হইত তাহা নির্ণয় করা যায় না। মরুৎ হরিণের চামড়া স্কন্ধে বহন করিত (১,১৬৬,১০)। এতদ্বারা ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে চামড়ার লোমের গাত্রাবরণ বড় মূল্যবান পরিচ্ছদ ছিল; কারণ মরুৎ খুব দামী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। রাত্রিতে লোকে সার্টের ন্যায় এক প্রকার পশমী জামা (সামূল্য) পরিধান করিত (১০,৮৫,২৯)।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিতে পারিলাম না। যাহাকে কাটা কাপড়" বলে তাহা আদৌ ব্যবহৃত হইত কিনা এতদ্বারা উহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তৎকালীন 'ইণ্ডো-ইরাণী' আর্য্যভাষী জাতি সমূহ 'কাটা কাপড়' প্রস্তুত করিবার প্রথা আদৌ উদ্ভুত করিয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। আর 'ইজারের' সন্ধানও আমরা বৈদিক সাহিত্যে কোথাও পাইনা (৩৪)। যাঁহারা বলেন, বৈদিক আর্য্যগণ হিম-

মনে হয়। তবে ইউরোপের সর্ব্বত্রই যাহাকে পুরাতন জাতীয় পোষাক (Vollk's Clothing) বলা হয় তাহা গ্রামের কৃষকেরা আজও ব্যবহার করিয়া থাকে; এই পোষাক নানা রঙ্গীন বস্ত্রেই নির্ম্মিত হয়।

৩৪। সংস্কৃত 'চালানস' (Chalans) ভারতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন ইহার অর্থ 'ইজার'। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে যোদ্ধৃগণ ও সর্দ্দার গণ কর্ত্তৃক ইহা এখনও ব্যবহৃত হয় (Hasting's Encyclopaedia of Religion and Ethics" Vol. 5 ; p. 47. দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই বস্ত্র কোন যুগে ব্যবহৃত হইত তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। সমুদ্রগুপ্তের টাকায় 'ইজারে'র চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। হয়ত শকদের অনুকরণ করিয়া প্রাচীন ভারতীয়েরা 'ইজার' এবং 'চাপকান' পরিধান করিতে

প্রধান উত্তর হইতে আগত, তাহারা বেদে 'ইজার' এবং উচ্চ বুট জুতার প্রচলনের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই ; অথচ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে এবং মধ্য এশিয়ার কৌমগুলির মধ্যে তাহার প্রচলন আজও পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

এইরূপ সাজসজ্জায় পরিপাটি সৌখীন পুরুষগণের অপর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institution) ছিল—উহা শুনিলে হয়ত আজকালকার হিন্দুগণ চমকিয়া উঠিবেন। ইহা হইতেছে—নৃত্য। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের আমোদ প্রমোদের একটা প্রধান অঙ্গই ছিল এই "নৃত্য"। এই নৃত্য যে আধুনিক যুগের ন্যায় সুসজ্জিত নৃত্যশালায় অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে। যখন চাষের জমি ও মাঠ সকল সবুজ রং ধারণ করিত, তখন হয় পূজা পার্ব্বন উপলক্ষে অথ বা অন্য প্রকার ছুটির সময় কুমারী (১, ৯২, ৪, ১, ১২৩, ১১) ও তরুণগণ সুসজ্জিত হইয়া 'সুপলাশ' বৃক্ষের ছায়াতলে নৃত্য করিত। তখন বাদ্যসহকারে কুমারী ও যুবকগণ পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া 'সমরাভ' চারিদিকে নৃত্য করিত। নৃত্যকারীদের গোলমালে বাজনার সুরে, লোকের হা-হা রবে (অথর্ব্ববেদ ১২, ১, ৪১) মাটি কাঁপিত, এবং যতক্ষণ না ঘন ধূলায় লোকেদের আচ্ছাদিত করিত, ততক্ষণ লোকে ক্ষান্ত হইত না। বিবাহের সময় আবাহ নৃত্যের সুযোগ উপস্থিত হইত। এইসব নৃত্যে যে একটু বীভৎসতা, বা অশ্লীলতা বা তথাকথিত কেলেঙ্কারী হইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? কতকগুলি শ্লোকে ইহাকে পাপ বলিয়া

শিখিয়াছিলেন। আরবেরা এবং আলবেরুনী ভারতীয়দের অতিঢিলা ইজার পরিধান করিতে দেখিয়াছেন। অধ্যাপক জয়চন্দ্র নারঙ্গের মতে কনিষ্কের 'জামা' আজ পর্য্যন্ত হিন্দুরা পরিধান করিতেছেন (ইতিহাস প্রবেশ (হিন্দি)...দ্রষ্টব্য। খৃ পূঃ পঞ্চম শতকে যখন পারসীকেরা সাম্রাজ্য স্থাপন করে, সেই সময়ের বেহিস্থানের প্রস্তর চিত্রে প্রথম দারায়ুস্ যে সব আখামেনীয় ইরাণী ও শকদের প্রস্তর চিত্র রাখিয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত 'কাটা কাপড়ের' চিহ্ন নাই। আবার দারায়ুস্ 'অক্ত জাতি'র ইতিহাসে বলিয়াছেন—"তাহারা চামড়ার জামা যাহার লোম সকল ভিতরের দিকে থাকে তাহা ব্যবহার করে। এই প্রকার কোট পাঠানেরা এখনও ব্যবহার করে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণও কাটা কাপড়ের ব্যবহার করিত না। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সাসানীদ রাজত্ব কালে যে পারস্যে ইজার ব্যবহৃত হইত তাহার নিদর্শন বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রস্তর চিত্রে দেখা যায়। কাটা কাপড়ের প্রথা মধ্যযুগে ক্রুসেডারদের দ্বারা ইউরোপে প্রথম প্রচলিত হয়। তাহারা পশ্চিম এশিয়ার লোকেদের পোষাক নকল করিতে আরম্ভ করে (Von Sybel—"History of the Crusades" দ্রষ্টব্য)।

উক্ত হইয়াছে। "যখন এই সকল লোক সুন্দর কেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক এই গৃহে নৃত্য করে এবং তাহাদিগকে বাহবা দানে পাপ করে……যখন ভগ্নীরা ও স্ত্রী-বন্ধুরা এই গৃহে নৃত্য করে এবং তাহাদিগকে বাহবা দানে পাপ করে তখন অগ্নি ও সবিতার তোমাকে এই ঋণ হইতে মুক্ত করে (অথর্ব্ব ১৪,১২,৫৯-৬১)। এই নৃত্যই বৈদিক আর্য্যগণের "folk dance।"

বৈদিক আর্য্যদিগের জাতি-তত্ব (Ethnology) সম্পর্কে আলোচনা ইন্দ্রের রূপ বর্ণনা দ্বারা সমাপ্ত করিব। "যবা না বার্হি ভ্রুবি কেশরাণি, আম্রা পন্থে না বৃকাস্য লোমা মুখে শ্মশ্রুণি না ব্যাঘ্রলোমা, কেশা না শির্সা ন্যাসাসেশ্রিয়াই শিখা সিংহস্য লোমা ত্বিসিরিন্দ্রিয়াণি" (তার ভ্রুতে যব ও ঘাসের গোছার ন্যায় লোম, মুখে বাঘের লোমের ন্যায় দাড়ী, মাথার চুল আঁচড়ান, চুল অলঙ্কৃত, সিংহ কেশরের ন্যায় দৃশ্য এবং শক্তিমান চেহারা)।

ইন্দ্রের, এইরূপ বর্ণনা পাঠ করিয়াই প্যান-জার্ম্মানিষ্ট পণ্ডিতেরা বৈদিক দেবতারা blond অতএব টিউটন জাতির দেবতা Odin-এর জ্ঞাতি ভ্রাতা; তজ্জন্য বৈদিক জাতি Nordic জাতির অন্তর্গত ছিল বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। কিন্তু ইহা যে একটা রূপক কল্পনা মাত্র, (allegorical epithetaroruantia) তাহা বুঝিবার বাকি থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন-তুর্কীস্থান হইতে ইউচি জাতির দ্বারা অঙ্কিত যে সকল চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের grey চক্ষুর তারকা এবং লাল দাড়ি অঙ্কিত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট লোক ভারতের উত্তর পশ্চিমের সীমান্তে আজও দেখা যায়। ইন্দ্রের নেকড়ে বাঘের ন্যায় শরীরের চুল ও মুখে বাঘের লোমের ন্যায় দাড়ী ও মাথার চুল সিংহ কেশরের ন্যায় বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা একটা কবি কল্পনার রূপক পাই মাত্র। ইহাতে Nordic, অর্থাৎ উত্তর-ইউরোপীয় লোকের সহিত কোন সাদৃশ্য পাই না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের অনেক স্বজাতীয় পণ্ডিত এই সুরেই সুর মিলান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

অহিংসা

কয়েক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। এবার আরও জোরে। আসরে মহেশ চৌধুরীরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল, তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী আর্ত্তনাদের সুরে বিভূতিকে হাঙ্গামা থামাইতে অনুরোধ করে নাই, বিভূতিকে রক্ষা করার জন্য তার অনুগতদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। বাপের আর্ত্তনাদ বিভূতির কাণে পৌঁছায় নাই। গোলমালের জন্য নয়, সে তখন প্রায় সদানন্দের পায়ের কাছেই উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া আছে, বাঁ হাতটা কব্জি ছাড়াও আরেক যায়গায় ভাঁজ হইয়া শরীরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে আর ডান হাতটা টান হইয়া নিবেদনের ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়াছে সদানন্দের পায়ের দিকে। শরীরটা রক্তমাখা, তবে কোন কোন অঙ্গের নড়নচড়ন দেখিয়া বুঝা যায় তখনও মরে নাই। আরও অনেকে জখম হইয়াছে, সকলে তারা বিভূতির সঙ্গীও নয়, সদানন্দের মান রক্ষার জন্য তার যে সব উৎসাহী ভক্তেরা আগাইয়া আসিয়াছিল তাদের মধ্যেও কয়েকজন অন্য উৎসাহী ভক্তের হাতে মার খাইয়াছে। মারামারির সময় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই দু'ঘা দিতে এমন হাত নিস্‌পিস্‌ করে!

শুধু হাতের মার নয়, গ্রামের লোকের পথ চলিতে লাঠির বড় দরকার হয়।

মারামারির দ্বিতীয় খণ্ডটা পরিণত হইয়া গেল রীতিমত দাঙ্গায়, কেউ ঠেকাইতে পারিল না। অনেকে আগেই পালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যাপার এতদূর গড়াইবে না আশায় বুক বাঁধিয়া যারা অপেক্ষা করিতেছিল, এবার তারাও ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। কেউ সটান পা বাড়াইয়া দিল বাড়ীর দিকে, কেউ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। কেউ মাটির ঢেলা ইট পাটকেল, হাতের কাছে যা পাইল দূর হইতে তাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে,—একটু আগেও যেটা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাকীর্ত্তনের আসর। খানিক

তফাতে একটা চ্যালা কাঠের স্তূপ ছিল, আট দশজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দু'হাতে চ্যালা কাঠ ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল—ঠিক যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে নয়, একপাশে সেখানে তখনও সমবেত স্ত্রীলোকদের অর্দ্ধেকের বেশী নিরুপায় আতঙ্কে কিচির মিচির স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোন অল্প-বয়সী স্ত্রীলোক পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বিফল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে বাবাগো মাগো বলিয়া আর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়াই মধুসূদনকে ডাকিতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। আসরের চারিদিকে রাত্রি আর নির্জ্জনতা, পালানোর উপায় নাই। কয়েকজন অবশ্য দাঙ্গার সূচনাতেই উন্মাদিনীর মত যেদিকে পারে ছুটিয়া পালাইয়াছে, সকলে সেরকম উদ্‌ভ্রান্ত সাহস কোথায় পাইবে? পুরুষ অভিভাবকরা আসিয়া অনেককে উদ্ধার করিয়া নিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উদ্ধারের কাজটাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কঠিন। নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমানাটুর মধ্যে অনেকে ভয়ের তাড়নায় কয়েকটি পলাতকা উন্মাদিনীর মতই দিশেহারা হইয়া এদিক ওদিক আরম্ভ করায় নিজেদের মধ্যে নিজেরাই হারাইয়া গিয়াছে। তারপর আছে ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর আছে ধাক্কা দেওয়ার, গা মাড়াইয়া দেওয়ার বচসা আর গালাগালি। যে দু'একজন অভিভাবক লজ্জা ভয় ভদ্রতা ছাড়িয়া একেবারে মেয়েদের মধ্যে আসিয়া খোঁজ করিতেছে, খোঁজ পাইয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কাছে আনাইয়া সঙ্গে করিয়া পালাইতে তারও সময় লাগিতেছে অনেকটা।

এই অবস্থায় চ্যালা কাঠগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল তাদের গায়ে মাথায়।

কেউ থামানোর চেষ্টা না করিলেও দাঙ্গা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোনটা তাড়াতাড়ি থামে, কোনটার জের চলে এখানে সেখানে ছাড়া ছাড়া হাতাহাতিতে, পিছন হইতে মাথা ফাটানোয়। এ দাঙ্গাটা থামাইয়া দিল বিপিন। আশ্রমে একটা লুকানো বন্দুক ছিল। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তবু বন্দুকটা লুকানোই থাকিত। ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা আনিতে বিপিনের

সময় লাগিল মিনিট পাঁচেক আর খানিকটা তফাতে দাঁড়াইয়া কয়েকবার আওয়াজ করিতে সময় লাগিল দু'মিনিট। শেষ মিনিটের আওয়াজ দরকার ছিল না, এ ধরণের সখের দাঙ্গা থামাইতে একটা বন্দুকে এক মিনিটে যে কটা আওয়াজ করা যায় তাই যথেষ্ট।

দাঙ্গা থামার পরে হাঙ্গামার প্রথম বীভৎস আর বিশৃঙ্খল অবস্থাটাও শেষ হইয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। এরকম হাঙ্গামার ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে সদানন্দের আশ্রমবাসী শিষ্য-শিষ্যাদের পটুতা দেখা গেল অসাধারণ। পরিচালনার ভারটা নিতে হইল বিপিনকে, সদানন্দের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, সেও মার খাইয়াছে। মেয়েদের শান্ত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল আসরে আছে শুধু আশ্রমের লোক, আহত আর নিহতদের আত্মীয়স্বজন, আর আছে গহনার শোকে কাতর কয়েকজন নরনারী। মধ্যে যারা চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিতেছিল দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কাণের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পালাইতে পারে নাই, একটা চ্যালা কাঠ কুড়াইয়া নিয়া রত্নাবলী দু'জনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

আনকোরা নূতন আঘাতের রক্তমাখা চিহ্ন গায়ে নিয়া সদানন্দ আর পুরাণো আঘাতের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চিহ্ন গায়ে নিয়া মহেশ চৌধুরী জড় ভরতের মর্ত একরকম কাছাকাছিই বসিয়া আছে,—বিভূতির গা ঘেঁষিয়া। দাঙ্গা শেষ হওয়ার একটু আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে অথবা একটু পরে বিভূতি মরিয়া গিয়াছে। এক মিনিট স্তব্ধতার আগের তিন মিনিট আর পরের সাত মিনিট, মোট দশ মিনিটের দাঙ্গায় মারা গিয়াছে চার জন। গুরুতর আঘাত পাইয়াছে সাত জন আর সাধারণভাবে আহত হইয়াছে সতর জন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে তারা এখানে নাই, আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দ আর মহেশ আহতদের প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষার পর

প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন চাহিয়া দেখিতে থাকে আর শুনিতে থাকে মরা ও আধমরা মানুষগুলিকে ঘিরিয়া বসিয়া মেয়েদের ডুকরানো কান্না আর পুরুষদের হায় হায় আফশোষ। সদানন্দের মাথার মৃদু ঝিমঝিমানির মধ্যেও মনে হয়, এতগুলি গলার কান্না আর আফশোষের শব্দ থামা সত্ত্বেও আসরটা যেন বড় বেশী নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভিড়ে যখন গমগম করিতেছিল আর খোল করতালের সঙ্গে কীর্ত্তন চলিতেছিল তখনও আসরে যেন ঠিক এইরকম স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। মেয়েদের কান্না শুনিতে শুনিতে মহেশ চৌধুরীর মনে হয় অন্য কথা—এই শোকের ছড়াছড়ির মধ্যে বিভূতি যেন অন্যায় রকম ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে, তার জন্য শোক করিবার কেউ নাই।

অন্যায়টা শেষ পর্য্যন্ত তার বোধ হয় সহ্য হইল না, তাই মাঝরাত্রি পার হইয়া যাওয়ার অনেক পরে বিপিনকে ডাকিয়া বলিল, 'বাড়ীতে একটা খবর পাঠাতে পার বিপিন?'

'পাঠাচ্ছি—সকালে পাঠালে ভাল হত না? এত রাত্রে মেয়েদের—'

'না, এখুনি খবরটা পাঠিয়ে দাও। মেয়েরা এসে একটু কাঁদুক।'

সদানন্দ এতক্ষণ বার বার শুশ্রূষা আর চিকিৎসা প্রত্যাখান করিয়াছে, এবার বিপিন অনুরোধ করিতেই রাজী হইয়া গেল এবং একজন শিষ্যের গায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের তিন মহল আশ্রয়ের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল একজন শিষ্য। মনে হইল, এতক্ষণ অন্য সব আহতদের মত কেবল সাধারণ শুশ্রূষা আর চিকিৎসা পাওয়া যাইত বলিয়া সে গ্রহণ করে নাই, এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়ায় সকলের চোখের আড়ালে সেটা উপভোগ করিতে যাইতেছে।

এদিকে কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে মহেশের মনে হইতে লাগিল, বাড়ীর মেয়েদের আসিতে বড় বেশী দেরী হইতেছে। তাই, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, সদানন্দের সামনে ছেলের জন্য কাঁদিতে এতক্ষণ তার যেন লজ্জা করিতেছিল, এবার সুযোগ পাওয়ায় প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভূতির মা, মাধবীলতা আর বাড়ীর সকলে আসিল প্রায় শেষ রাত্রে। কিন্তু তেমনভাবে কেউ কাঁদিল না। মাধবীলতা একরকম হাঁ করিয়া বিভূতির

দিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই বাকী রাতটুকু কাবার করিয়া দিল। বিভূতির মা এত আস্তে কাঁদিতে লাগিল যে একটা কাণ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা না থাকিলেও পাশে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সব সময় তার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল না।

পুলিশ আসিল সকালে।

পুলিশের লোকের কাছে কাছে একটা খবর পাওয়া গেল, ইতিমধ্যেই তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দাঙ্গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় আশ্রমের যে ছোট ফুলের বাগানটি আছে সেখানে পাঁচজন লোক কাল রাত্রে একটি এগার বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে, দু'জন পলাতক।

'না মরেনি, বেঁচে উঠবে বলেই তো মনে হয় মেয়েটা। তবে কি জানেন বিপিন বাবু—'

মহেশ চৌধুরী শুনিতেছিল, হঠাৎ তার মনে হইল দাঙ্গার চেয়ে এই মেয়েটির আলোচনাই সকলে যেন বেশী উপভোগ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, জগতের কোথাও না কোথাও সর্ব্বদাই যে কুরুক্ষেত্রীয় কাণ্ড চলিতেছে তার তুলনায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা শোচনীয়ভাবে লজ্জাকর। কিন্তু এগার বছরের একটি রক্ত মাংসের বিন্দুতে তীব্র আর বীভৎস অস্বাভাবিকতার সিন্ধু খুঁজিয়া মেলে, রোমাঞ্চকর লজ্জা ভয় রাগ দ্বেষ ঘৃণা আর অবাধ্য আবেগে স্নায়ুগুলি টান হইয়া যায়, কাণে ভাসিয়া আসে লক্ষ কোটি পশুর গর্জ্জন।

মহেশ চৌধুরী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া এক চোখে চারিদিক চাহিতে থাকে। আহতদের অনেক আগেই ভাল আশ্রয়ে সরানো হইয়াছে, পড়িয়া আছে কেবল তিনটি সাদা চাদর ঢাকা দেহ। এত বয়সে এত কাণ্ডের পর এরকম আবেষ্টনীতে এমন অসময়ে একটা জানা কথা নূতন করিয়া জানিয়া নিজেকে তার বড় অসহায় মনে হইতে থাকে। চাপা দিলেই সত্যই রোগ সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মত বিরাট এক স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নীচে চাপা দিলেও নয়।

[লেখকের মন্তব্য: মহেশ চৌধুরীর এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরীর চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া

তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশী কাজে লাগিবে মনে হয়।

মোট কথা, মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু'একজন মহাপুরুষ এবং সব সময় অনেক ছোটখাট মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা শুধু ভালর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ ঘি খাওয়াইয়া রুগীকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাও রুগী। না হইয়া উপায় কী? মানুষ হইতে যে মানুষের জন্ম, মানুষের কাছ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া যার আত্মসংগ্রহ, মানুষের যা আছে তা ছাড়া মানুষের যা নাই তা সে কোথায় পাইবে? উপাদানগুলি সেই এক, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ শুধু নিজের মধ্যে ভিন্নভাবে আত্ম-চিন্তার খিচুড়ি রাঁধে।

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরীবকে স্বপ্নে বড়লোক করার চেষ্টার মত দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।

জগতের কোটি কোটি অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানোর চেষ্টার করুণ দিকটা মহেশ চৌধুরীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হতাশায়, অবসাদে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হয়। কেউ খুঁজিয়া পাইবে না, মানুষের মুক্তির পথ কেউ খুঁজিয়া পাইবে না।

মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।]

দাঙ্গাহাঙ্গামার জের চলিতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীও বিষাদ ও অবসাদের ভারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের ভাল

নাই, একথা ভাবিলেই তার মনে হয় পৃথিবীশুদ্ধ আত্মভোলা লোক ভাল মন্দে জড়ানো জীবন নিয়া মনের আনন্দে বাঁচিয়া আছে, সেই কেবল পশুর খাঁচায় আটক পড়িয়াছে। সকলে ভাবে পুত্রশোকে মহেশ কাতর, মহেশ ভাবে, পুত্রশোকে সে যদি সকলের মত রীতিমত কাতর হইতে পারিত। একটি মাত্র ছেলে, তার শোকেও আত্মহারা হইতে পারিতেছে না, একি ভয়ানক অবস্থা তার? শোক বাড়ানোর জন্যই মহেশ সর্ব্বদা বিভূতির কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, গৃহ কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছে অনুভব করার চেষ্টা করে, বিভূতির স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে, বারবার মাধবীলতার নূতন বেশের দিকে তাকায়।

কেবল শোক বাড়ানোর জন্য। অন্য কোন কারণে নয়।

মহেশ চৌধুরীর শোক দেখিয়া বাড়ীর লোকের বুক ফাটিয়া যায়। বিভূতির মা মাথা নাড়িয়া বলে, 'ও আর বাঁচবে না। না বাঁচুক, আর বেঁচে কি হবে? ওর আগেই যেন আমি যেতে পারি, হে মা কালী, ওর আগেই যেন—তোর মত বেশ যেন আমায় ধরতে না হয় রাক্ষুসী।'

মাধবীলতার শোকটা তেমন জোরালো মনে হয় না। তাকে কেবল একটু বেশী রকম রুক্ষ দেখায়,—তেল মাখিয়া স্নান না করার রুক্ষতা নয়, ভিতর হইতে রস শুকাইয়া যাইতে থাকিলে যেমন হয়।

অনেক ভাবিয়া একদিন সে মহেশ চৌধুরীর সামনে জোড়াসন করিয়া বসে, আগে মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বলে, 'ওই লোকটাই খুন করেছে বাবা।'

'স্বামীজী?

'ওই লোকটা' বলিতে মাধবীলতা যে কাকে বুঝাইতেছে অনুমান করিতে মহেশের দ্বিধা পর্য্যন্ত করিতে হয় না।

'হ্যাঁ।'

'তুমি জানলে কি করে, তুমি তো যাও নি।'

'লোকের কাছে শুনেছি। আপনিও তো জানেন? ওই তো সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—'

'খুন করতে বলেননি, বলেছিলেন—'

মাধবীলতা অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'তার মানেই তো তাই। এ লোকটা আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে—ও কথা ব'লে সকলকে

ক্ষেপিয়ে দেওয়ার আর কি মানে হয়? কি অপমান করছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল? কেউ তখন মারতে উঠেনি কেন? যেই সকলকে ডাকল তখনি সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল কেন?'

মহেশ চৌধুরী ধীরভাবে বলে, 'উনি হয়ত ওকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।'

মাধবীলতা আরও ব্যাকুল হইয়া বলে, 'না না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকেরা তাড়াতে পারত না?'

'দল নিয়ে গিয়েছিল যে?'

অগত্যা মাধবীলতাকে ধৈর্য্য ধরিতে হয়, শান্ত হইতে হয়। সব কথা বুঝাইয়া না বলিলে মহেশ চৌধুরী বুঝিতে পারিবে না। এমন ভাল মানুষ কেন যে সংসারে জন্মায়।

'তা নয়, দলে আর ক'জন ছিল? ওঁকে খুন করাই ও লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই? ওঁকে জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।'

এবার মহেশ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার লোভে তার স্বামীকে হত্যা করা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, তবু যেন মহেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ওরকম হত্যাকাণ্ডগুলি অন্যভাবে হয়। বিভূতিকে সদানন্দ ডাকিয়া পাঠায় নাই, বিভূতি যে আসরে যাইবে তাও সদানন্দ জানিত না। বিভূতি নিজে হইতে গিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল। এরকম অবস্থায় সদানন্দের সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ানক কথা অনুমান করা চলে কেমন করিয়া?

মহেশের মুখ দেখিয়া মাধবীলতার শরীর রাগে রি রি করিতে থাকে। এমন অপদার্থ হাবাগোবা ভাল মানুষও পৃথিবীতে জন্মায়!

'বুঝতে পারছেন না? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওঁকে কি করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়া মাত্র—যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিলেই সকলে মিলে ওঁকে মেরে ফেলবে অমনি সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল।'

তা বটে, সুযোগ পাওয়া মাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু—। মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাধবীলতা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না। বিভূতিকে বাঁচাইতে দু'হাত বাড়াইয়া আগাইবার উপক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ যে চিন্তা মনে আসায় সদানন্দ পিছাইয়া গিয়াছিল, মাধবীলতা সেই চিন্তাকে কয়েক মূহূর্ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সদানন্দের জীবনের দিনে, মাসে, বৎসরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সদানন্দ এই কথাই সর্ব্বদা চিন্তা করিত, কি করিয়া বিভূতিকে মারিয়া মাধবীলতাকে লাভ করা যায়। মাধবীলতাকে হারানোর পর মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে ?

ক্রমশঃ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা।

বাঙালীর রাজনীতি

রাজতন্ত্র পরিচালনা করা এবং শাসনযন্ত্র অধিকার করা—এই বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনীতির রূপ আলাদা। আমাদের শাসন চলছে দেশবাসীর অর্থে কিন্তু বিদেশীর স্বার্থে। তাই আমাদের রাজনীতি হ'ল শাসনযন্ত্রকে অধিকার করা—রাজতন্ত্র পরিচালনা করা নয়। নিজের দখলে এলে চালনার প্রশ্ন উঠে, কিন্তু আমরা যখন দখল না করে চালাতে চাই—তখনই নানা সমস্যা এসে রাজনৈতিক কর্ত্তব্যকে এলোমেলো করে দেয়। সুনির্দিষ্ট পথ ও নির্ভরশীল নেতৃত্ব যখন রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাজ না করে, তখন এলোমেলো অবস্থাকে আমরা রাজনীতি ব'লে ভাবি। কিন্তু তা' রাজনীতি নয়।

আধুনিক জগতে শাসন যন্ত্র অধিকার করে রাজতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে কেবল সমস্যাই সমাধানের পথে এগুতে পারে না। রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী দায়িত্ব রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। দেশের সম্পদ যাঁদের কাম্য, সমাজের মঙ্গল যাঁদের লক্ষ্য, জাতির বিকাশ যাঁদের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের সাহায্য তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। আজ যাঁরা রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে চান, তাঁরা সমস্যার রূপ সম্বন্ধে মুখর হ'লেও সমাধান সম্বন্ধে মূক থাকতে বাধ্য হন। এই মূকতা অবাঞ্ছনীয়।

আমাদের বাঙলা দেশে রাজতন্ত্র পরিচালনা করবার ভার যাঁরা নিয়েছেন, শাসনযন্ত্র অধিকার করবার তাঁরা কোনদিন চেষ্টা করেন নি। বিদেশী শাসনের এই ব্যবস্থা বাঙলার রাজনীতিকে নতুন ও করুণ রূপ দিয়েছে। আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে যে-অব্যবস্থা ও বিচ্ছিন্নতা, যে-পঙ্গুতা ও অসারতা তা' এই কঠিন সত্যের সঙ্গে জড়িত। তাই আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে দল গড়ি দেশ-সেবার উদ্দেশ্যে, দলাদলি করি দেশ সেবার অজুহাতে এবং মুষড়ে পড়ি দেশ-সেবার ব্যর্থতায়। বাঙলার রাজনীতি এই ব্যর্থতায় পঙ্গু। এই সহজ সত্যকে না বুঝতে পারলে বাঙলার রাজনীতির রূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকা সম্ভব নয়।

আমাদের শাসন-সংস্কারের নতুন ব্যবস্থায় আমরা এমন অবস্থায় এসে

পৌঁছেচি যে, আমরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে পারিনে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষে ধর্মপ্রধান, একথা আমরা শুনেছি। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্ম যখন প্রধানতম স্থান অধিকার করে, তখন রাজনীতি ধর্ম-সংঘর্ষের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেই সংঘর্ষ রাজনীতিক্ষেত্রে মূলসূত্ররূপে উপস্থাপিত হয়। বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতিগত যত ঐক্যই থাকুক না কেন, রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা বিভক্ত। অর্থাৎ আমরা কেউ বাঙালী নয়--হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। এই বৈষম্যের ফলে আমরা ব্যক্তির মঙ্গল ও সমষ্টির মঙ্গলের ভিতর যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। আমরা দেশকে ভালবাসতে পারি কিন্তু দেশবাসীর আজ্ঞা বহন ক'রে রাজতন্ত্রকে পরিচালনা করতে পারিনে। আমরা দেশের কথা বলি, আইন সভায় দেশের সমস্যার আলোচনা করি, কিন্তু সেখানে সদস্যগণ বাঙ্গালী নন, কারণ তাঁদের দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্মমতের নিকট, জাতির নিকট নয়। এই সাম্প্রদায়িক বিভাগের দরুণ রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এত বড় স্থান অধিকার ক'রে আছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা যেখানে উগ্র, জাতির সমস্যা আলোচনা সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বাঙলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে রাজনীতি নেই তার প্রথম কারণ—যাঁরা শাসনযন্ত্র অধিকার করবার চেষ্টা করবেন, শাসনতন্ত্রে তাঁদের স্থান স্বীকৃত হ'বার সম্ভাবনা স্বল্প; দ্বিতীয় কারণ, জাতির মঙ্গল সাধন করবার জন্য কেউ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, এবং আইন-সভা শুধু ধর্মমতের ও স্বার্থের মেলা।

ফলে, বাঙলার রাজনৈতিক আকাশে বিদ্যুতের চমক আছে কিন্তু কোন সুস্পষ্ট আলোর রেখা নেই। আমাদের রাজনীতির মূলে আছে—শাসনযন্ত্র অধিকার করবার পথে বাধা এবং শাসনযন্ত্র পরিচালনায় জাতির সমষ্টিবোধের অভাব। প্রথম সমস্যা বাঙালীর এবং দ্বিতীয় সমস্যা সমস্ত ভারতবাসীর। তাই বাংলার রাজনীতি অন্য প্রদেশের রাজনীতি থেকে বিভিন্ন এবং বাঙালীর সমস্যা এত জটিল। আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সব প্রচেষ্টা চলছে, তাকে আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা বা স্বার্থরক্ষা বলা চলতে পারে, কিন্তু তা' রাজনীতি নয়। যখন ব্যক্তি ছিল প্রধান এবং জাতি ছিল গৌণ; যখন ব্যক্তির মঙ্গল জাতির বিত্ত ব'লে পরিগণিত হ'ত; যখন ব্যক্তিগত সমস্যা জাতীয় সমস্যা ব'লে ব্যাখ্যাত

হ'ত; যখন রাজ্যশাসনের মানে ছিল দেশশাসন, দেশবাসী-শাসন নয়; তখন যে-কোন রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট চেষ্টাকে রাজনীতি ব'লে আখ্যা দেওয়া যেত এবং সে-আখ্যা নানাভাবে প্রখ্যাত হ'ত। আজ রাষ্ট্রের নতুন রূপ ও দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির চেয়ে জাতি প্রধান হয়েছে: তাই যে চেষ্টা জাতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, তাকে রাজনীতি সংজ্ঞা দিয়ে বাহাদুরী নেওয়া অশোভন। জাতির স্বার্থ সম্বন্ধে মত-বিরোধ থাকতে পারে, জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের পথ সম্বন্ধে নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু দেশবাসীকে অস্বীকার ক'রে দেশ-শাসনের ব্যবস্থা ও পরিচালন রাজনীতির অঙ্গ নয়। এবং প্রকৃত রাজনীতি হ'ল রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সঙ্গে জাতির স্বার্থের মিলন-সাধন। আমাদের চেষ্টায় সেই মিলন-সাধনের গমক না থাকলে, দেশবাসীর প্রাণকে সঞ্জীবিত করা যাবে না। বাঙলার রাজনীতিতে সেই সঞ্জীবনী শক্তির অভাব।

জনতন্ত্র, গণতন্ত্র বা একতন্ত্র ইত্যাদি—এসব হ'ল রাজতন্ত্রের বিবিধ রূপ, অর্থাৎ নানা রঙের বিকাশ। কিন্তু জাতির প্রকাশ হ'ল প্রধানতম কথা। কোন্ দেশে কোন্ রঙ বিকশিত হ'বে, তা' ঐতিহাসিক চক্রান্তে বা ঘটনাবলী পরিচালনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু কোথাও জাতির সমষ্টিগত সত্তার অস্বীকৃতি নেই। ডেমোক্রাসি বা ডিক্টেটারশিপ্ দুই-ই দেশবাসীর শক্তিদ্বারা পুষ্ট—শুধু ক্ষমতার কেশা উদ্বেলিত হয়ে যদি একজনকে মাতাল করে এবং তার মত্ততা সমস্ত জাতির ভিতর ছড়িয়ে পড়ে, তখনই আমরা "ডিক্টেটর" দেখতে পাই। বার্টরাণ্ড রাসেল বলেছেন—"The most successful democratic politicians are those who succeed in abolishing and becoming dictators"। "ডিক্টেটারশিপে"র এই নতুন রূপ পূর্বে ছিল না—কারণ পূর্বেকার ডিক্টেটার জনমত ও জনশক্তি দ্বারা সৃষ্ট বা পুষ্ট হ'ত না, এবং পূর্বে জনমতের আধুনিক মূল্যও ছিল না। শাসনপদ্ধতির রূপ ও নীতি, ব্যবস্থা ও সংস্থান যে-ভাবেই গঠিত হোক না কেন, জাতির সঙ্গে একটা যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন এবং তা' যেখানে নেই, রাষ্ট্রকে সে-ভাবে চালিত করবার জন্য আন্দোলন রাজনীতিক্ষেত্রের মুখ্য কাজ। আমাদের চেষ্টা যদি অন্য আদর্শে ব্যয়িত হয়, তাতে রাজনীতির মুখোস্ থাকতে পারে কিন্তু রাজনীতির প্রাণ-ধর্ম্ম নেই।

রাজতন্ত্রের প্রাধান্য যখন স্বীকৃত, তখন রাজনীতি নিয়ে হেলা-ফেলা খেলা

অসঙ্গত। এবং রাজনীতি যেখানে প্রাণহীন, জাতির অসাড়তা সেখানে অবশ্যম্ভাবী। আজ বাঙলাদেশে সেই অসাড়তা এসে পড়েছে। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে হোলি খেলা চলে, কাদা ছোঁড়া চলে কিন্তু খেলা সাঙ্গ হলে ক্লান্তি ছাড়া অন্য কোন সম্পদই আমাদের থাকে না। এই সম্পদহীনতা আমাদের ধ্বংসের নিশানা।

সুস্থ ও সবল রাজনীতির প্রাণ হ'ল পার্টি—দল নয়। পার্টির মূলে থাকা চাই মত এবং মতের সংকেতে পথ নির্দিষ্ট হওয়ার মানে হ'ল প্রোগ্রাম। সেই মতে ও পথে দেশবাসীর শুভাশীষ থাকলে তা' রাজতন্ত্রে প্রধান হবে এই হ'ল পার্টি-গবর্ণমেণ্টের গোড়ার কথা। যে দেশে একই মতাবলম্বী কর্মিবৃন্দ সংযুক্ত হ'য়ে দেশবাসীর কাছে নিজের মত ও পথ সম্বন্ধে দাবি না জানাতে পারে, সে-দেশের শাসনের রূপে না আছে ডেমোক্রাসি, না আছে ফ্যাসিজম এবং না আছে সোস্যালিজম। আমরা বাঙালী—কিন্তু আমরা বাঙালী হ'য়ে ভোট দিতে পারিনে। আমি যদি কোন মুসলমান রাজনীতিকের মত ও পথকে সমর্থন করি, আমার তাঁকে বা তাঁর মতাবলম্বী কোন মুসলমান বাঙালীকে ভোট দেওয়া সম্ভব হবে না। আমি যাঁকে চাই, তাঁকে আমি পাব না, অথচ আমার ভোট আছে—একে ভোটের প্রহসন বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের কোন সম্মত বিধি নয়। দেশসেবা যখন ধর্মের আচ্ছাদনে চালিত হয়, তখন তাকে দেশসেবা না বলে ধর্মসেবা বলা শোভন হবে। এই সাম্প্রদায়িক বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যাই আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা, এবং তারই ফলে দেশমাতৃকার পূর্ণ রূপ আমাদের সমস্ত কর্মে অস্পষ্টভাবে অধিষ্ঠিত। আইন-সভায় আমরা কেউ দেশবাসীর প্রতিনিধি নই—আমরা নানা ধর্মমত ও শ্রেণীগত স্বার্থের প্রতীক। আমরা যখন আইন-সভায় গণতন্ত্রের কথা বলি, জনগণের দাবি জানাই এবং দেশবাসীর কামনা প্রকাশ করি, তখন তা' রাজনৈতিক পরিহাস বলে মনে হয়। তাই আইন-সভায় এত কলরব, কিন্তু পথনির্দেশ নেই। আমরা কলহ করি, পার্টি গড়ি না। আমাদের দল আছে, কিন্তু তা' দলাদলিতে কীর্ণ; আমাদের মত আছে, কিন্তু তা' দলগত বিরুদ্ধতায় ক্লিষ্ট; আমাদের পথ আছে, কিন্তু তা' দলগত স্বার্থের সংঘাতে অবরুদ্ধ। আমরা পথ চলি, কিন্তু আমাদের এগনো

হয় না ; আমরা কাজ করি কিন্তু সমৃদ্ধি সৃষ্টি করি না ; আমরা পলিটিক্‌স্‌ করি কিন্তু সমস্যার সমাধান করি না । পার্টির বন্ধন নেই, অথচ রেশারেশি আছে এ হেন ভিত্তির উপর রাজনৈতিক প্রচেষ্টা শোষণ ও প্রতারণের অপভ্রংশ মাত্র। আমরা স্বার্থের গলি খুঁজতে হানাহানি করি এবং তাকেই দেশসেবার মহান ব্রত ব'লে প্রচার করি। আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি আবদ্ধ, কারণ শাসনযন্ত্র আমাদের নাগালের বাইরে এবং যাঁরা নাগাল পেয়েছেন, তাঁরা শাসন ও শোষণ করতে চান, শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার অথবা দেশ-সেবা প্রণোদিত শাসননীতি প্রচলন করতে চান না। বাঙলা দেশে শাসনযন্ত্র যাঁদের হাতে, দেশসেবার মন্দিরে তাঁদের দীক্ষা হয় নি ; তাঁরা অধিকার লাভ করেছেন অপরের অনুগ্রহে, তাই অনুগ্রাহকবর্গের প্রতি কাতর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করে। এই রূপসৃষ্টিতে দেশবাসীকে ভোলাবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু দেশের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র তাঁদের জানা নেই।

বাঙলা দেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল—শাসনতন্ত্রে আমাদের অধিকার সীমাবদ্ধ ; শাসনযন্ত্রকে অধিকার করতে হ'লে যে-সব বাধা আছে, তা' সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতায় সাম্প্রদায়িক কলহে রূপান্তরিত হয়েছে ; শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, রাজনীতিক্ষেত্রে এবং জাতীয় আন্দোলনে তাঁদের দান অত্যন্ত অবহেলনের যোগ্য। রাষ্ট্রে যে অধিকার আমরা পেয়েছি, তাতে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা চলে, কিন্তু সম্পদ্‌সৃষ্টি করা যায় না। সম্পত্তি নিয়ে কলহ তখনই হয়, যখন সম্পদ সৃষ্টি ব্যাহত হয়। আমরা কৃষকের বা শ্রমিকের সেবা করতে পারি তাকে নানাবিধ অধিকারে ভূষিত ক'রে, কিন্তু কৃষিজাত বা অন্য পণ্যের চাহিদা ও মূল্য বাড়াবার যে-সব বিজ্ঞানসম্মত বিধি আছে, তা' গ্রহণ করবার ক্ষমতা ও শক্তি আমাদের নেই। বাণিজ্য-বিস্তারে আমাদের পদে পদে বাধা, আর্থিক শোষণ বন্ধ ক'রে দেশের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করবার অধিকার সীমাবদ্ধ, দেশের অর্থ ও সম্পত্তিকে অর্থ-পূর্ণ ও সম্পদ-পূর্ণ করবার কৌশল আমাদের অজ্ঞাত এবং আইন-সঙ্গত অধিকার অপূর্ণ। দেশে ধন-সৃষ্টি করতে পারিনে ব'লে ধনীর অর্থ ভাগ বাটোয়ারা করার বন্দোবস্ত করি ; যুব-বাংলার অপচয়ের পথ বন্ধ করবার ক্ষমতা নেই ব'লেই যে-ক'টা চাকুরী

আছে, তা' নিয়ে কলহ করি। ধনীর অর্থ দেশের সম্পদ-সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হ'বে এবং ধনীর শোষণ বন্ধ হবে—সে-চেষ্টা মঙ্গলপ্রসূ, কিন্তু ধনীর অর্থ হস্তান্তরিত হ'লেই পুঁজিতন্ত্রের শোষণ বন্ধ হয় না। তাতে শ্রেণী-বিভাগ স্পষ্টতর হ'তে পারে কিন্তু দেশের বৈভব বাড়বে না। লুণ্ঠন দেশ-সেবার গৌরব লাভ করে যখন লুণ্ঠিত দ্রব্য দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত হয়, কিন্তু লুণ্ঠন ক'রে যদি শুধু নিজেদের ভিতর ভাগ-বাটোয়ারা করি, তাতে লুণ্ঠনের মত্ততা থাকতে পারে, এমন কি আনন্দও থাকতে পারে, কিন্তু তা' দস্যুবৃত্তির অঙ্গ। দেশের সর্বদিকের অপচয় বন্ধ না হ'লে সম্পদসৃষ্টি হয় না এবং সম্পদসৃষ্টি না করতে পারলে আমাদের কলহ ও রাজনীতির গতি সংকীর্ণ পরিধির ভিতর প্রবেশ ক'রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে কলঙ্কিত করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং হয়েছেও তাই।

রাজনীতির ধর্ম পার্টি গড়া। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা অধিনায়ক, নায়ক বা কর্মী, তাঁদের কাছে পার্টিই দেশ। আধুনিক রাজনীতিক্ষেত্রে পার্টি-সেবার মানে হ'ল দেশ-সেবা। ডেমোক্রাসির ফলে দেশ-সেবার এই নতুন রূপ এসেছে এবং সেই রূপ আজ সর্বপ্রকার রাজতন্ত্রে ও রাজনীতিতে বিস্তৃত। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবল হ'তে হ'লে এই পার্টিকে বলশালী করতে হবে এবং পার্টিকে প্রবল রাখতে হ'লে তাকে নানাভাবে সেবা ও পোষণ করতে হ'বে। দেশের চেয়ে পার্টি বড়—কারণ পার্টি থাকলে দেশ-সেবার পথ সুগম হবে। যাঁরা এখনও উনিশ শতকের চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন, তাঁরা এই পার্টি-বোধকে নিন্দা করেন, এই পার্টি-সেবাকে ব্যঙ্গ করেন, এই পার্টির প্রাধান্যকে অবজ্ঞা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে যেদিন দেশ-সেবার গুরুভার গিয়েছে, সেদিন থেকে ব্যক্তি অপ্রধান হ'তে বাধ্য এবং সঙ্ঘ প্রধান হবে। রাষ্ট্রের আদর্শ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির এই বিস্তৃত ও বিশেষ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। পার্টি-সেবা আজ দেশ-সেবার গর্ব অধিকার করেছে। পার্টি তার নিজের স্বার্থের জন্য দেশকে শ্রেষ্ঠভাবে সেবা করবে, নইলে তার শক্তি বাধা পাবে এবং ভিতরে ঘুণ ধ'রে সমস্ত সারকে শুষে নিয়ে যাবে। তখন পার্টি হবে দুর্বল—দেশ-সেবার প্রাঙ্গণে সেই পার্টির কর্মীদের স্থান থাকবে সংকীর্ণ। এই নীতির উপর পার্টি গড়ে উঠছে এবং পার্টির প্রতি :নিষ্ঠা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রশংসা দাবী করে।

আধুনিক যুগে কোন অধিকারকে দখল করতে হ'লে এবং তা' সংরক্ষণ করতে হ'লে পার্টি-সৃষ্টি ও পোষণ প্রয়োজন। পার্টির শোষণ চলতে পারে কিন্তু অধিকার ততদিন অক্ষুন্ন থাকবে, যতদিন পার্টি প্রবল থাকবে। আজ যাঁদের পার্টি নেই, তাঁরা যে শুধু বিচ্ছিন্ন, তা' নয়—তাঁদের মূল্যও নেই। এ ব্যবস্থা আমাদের দেশের অনেককে পীড়া দেয়, কিন্তু এই আধুনিক বিধানকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। রাষ্ট্র আজ সবার উপরে, তাই পার্টির প্রয়োজন, এবং পার্টি দেশ-সেবার ভার গ্রহণ করেছে ব'লে কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। দেশ সেবকদের এই পার্টির যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে দেশকেও তাঁরা বলি দেবেন কি না, তা নির্ভর করবে নেতৃত্বের উপর। নেতৃত্বের ভাল-মন্দের উপর পার্টির গৌরব নির্ভর করতে পারে কিন্তু পার্টি-প্রথার প্রয়োজনীয়তা তাতে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হবে না। দেশসেবার মন্দিরে পার্টির আরতি হ'ল রাজনীতির প্রাণ।

এক পার্টি অন্য পার্টিকে নিন্দে করে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সজাগ রাখবার জন্য নয়—বিচারবুদ্ধিকে জয় ক'রে জনমতকে নিজের পার্টির অধীন করবার জন্য। তার জন্য প্রোপাগাণ্ডার প্রয়োজন এবং রাজনীতিক্ষেত্রে প্রোপাগাণ্ডা হ'ল প্রধান অস্ত্র। একই দেশে বিরুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডার স্থান বিস্তৃত থাকলে আমরা ডেমোক্রাসির নামে বাহবা পেতে চাই, কিন্তু সে-দেশে যদি একই মতের প্রোপাগাণ্ডা চলে এবং বিরুদ্ধ মতের পীড়ন চলে, ডিক্টেটার বলে আঁতকে উঠি। দু'দেশেরই মূল কথা—পার্টি শাসন এবং পার্টির কাছে কর্মীদের আত্ম-বিসর্জ্জন।

বাঙলাদেশে যে-পার্টি আছে, তা' সাম্প্রদায়িক বিষে দুষ্ট হতে বাধ্য। তাই তাঁদের রাজনীতির রং ফিকে এবং বিভিন্ন। রাজনৈতিক কর্মীরা জানেন যে, বর্তমান ভারত-শাসন-সংস্কার আইনের সাহায্যে বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করবার সুযোগ সুবিস্তৃত নয়। এবং তা' জানেন বলেই, তাঁদের পার্টিতে দলাদলি যতটা হয়, অন্যত্র ততটা হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রশক্তি থেকে যাঁরা বঞ্চিত, দেশে সম্পদসৃষ্টির সুযোগ থেকে যাঁরা প্রতারিত, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে কলহ না করলে পার্টিকে সজাগ রাখতে পারেন না। এবং পার্টিকে বাদ দিলে রাজনীতিক্ষেত্রে আসন পেতে নেওয়া অসম্ভব।

বাঙলাদেশে যত পার্টি ই আছে—তাদের দেশসেবার সুযোগ সীমাবদ্ধ ব'লে নিজেদের ভিতর কলহ চলে। মুস্‌লিম লীগ, কংগ্রেস ও অকংগ্রেস—তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা চান। এই প্রতিষ্ঠার দাবি তখনই সঙ্গত হ'ত যদি মুসলমান ও হিন্দুর শাসনযন্ত্র অধিকার করবার সমান অধিকার থাকত। অর্থাৎ আইন সভায় যদি সদস্যবর্গ বাঙালী বলে গৃহীত হ'তেন এবং ধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন স্বাধীন মতের আশ্রয়ে পার্টির গড়ে উঠবার সুযোগ থাকত। আজ আমাদের সে-সুযোগ নেই; আজ আমাদের দেশের অপচয়কে বন্ধ করবার শক্তি নেই। ফলে, আমরা যেটুকু অধিকার পেয়েছি—তা' নিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করি এবং যাঁরা অধিকারের আসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাঁদের স্বার্থ-সংরক্ষণের আন্দোলন দেশসেবা ও রাজনীতি বলে চলে আসছে। এভাবে জাতির শক্তি বিকশিত না হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ধরা যাক্ কলকাতা কর্পোরেশন সংস্কার আইন। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ দল গড়ে উঠেছে শাসনভার গ্রহণ করবার জন্য—দেশসেবার মন্দিরের প্রাঙ্গণে তাঁরা কোন দিন ভুলেও উপস্থিত হননি। সেবার আকুতি নেই, অথচ শাসনের মাদকতা আছে। তাই তাঁরা তাঁদের পার্টির জন্য কর্পোরেশনের সম্পত্তি ব্যবহার করতে চান। নতুন সম্পদসৃষ্টি ক'রে পার্টির শক্তি বাড়াবার দৃষ্টি তাঁদের নেই—অন্যদলকে আঘাত করে নিজেকে বলশালী করবার সহজ উপায় তাঁরা গ্রহণ করেছেন। দুর্বল যখন অধিকার পায়, অত্যাচারের পথটাই তার কাছে সহজ মনে হয়। কিন্তু তাঁদের এই চেষ্টা যেমন দেশ-সেবা নয়, তাঁদের বিরুদ্ধ আন্দোলনকেও দেশসেবা বলে গ্রহণ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সবাই নিজের পার্টির জন্য ক্ষমতা চান—কর্পোরেশনের শাসন-পদ্ধতি সংস্কার হ'ল অজুহাত মাত্র।

আমাদের দেশে পার্টি আছে—প্রোগ্রাম নেই। তাই পার্টি মানে দলাদলি এবং এই দলাদলি বন্ধ করবার একমাত্র উপায় হ'ল নিজের দলভুক্ত লোকের ভিতর উপঢৌকন বিতরণ। মুসলিম লীগ পার্টি—যাঁরা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দেশসেবার পদ্ধতি হ'ল—(১) নিজের পার্টি-অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ সাহায্য করা। (২) নিজের দলের লোককে চাকুরী

দেওয়া। (৩) বিরুদ্ধ দলের অর্থ ও শক্তি অধিকার ক'রে নিজের দলের ভিতর বিলিয়ে দেওয়া।

কর্পোরেশনের যে-দল প্রবল, তাদের শাসনপদ্ধতির রূপ হ'ল—(১) প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন ভাবে সাহায্য করা, যাতে নিজের দলপ্রভাব অক্ষুন্ন থাকে এবং ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। (২) নিজের দলের লোককে চাকুরী দেওয়া এবং ডিপার্টমেণ্টের কার্যাবলী এমনিভাবে সম্প্রসারিত হ'বে যে চাকুরী দেবার সুযোগ বিস্তৃত হয়। (৩) বিরুদ্ধবাদীদের নানাভাবে বঞ্চিত করা।

অর্থাৎ আমাদের দেশে এই দু'পার্টির রীতি ও নীতি বিভিন্ন নয়—শুধু যাঁদের অধিকার যাবে, তাঁরা চীৎকার করবেন এবং যাঁরা অধিকার লাভ করবেন, তাঁদের উল্লাস আমাদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে।

একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে নিজের পার্টিকে পোষণ আনন্দনীয় এবং প্রয়োজনীয় কিন্তু তাদের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে দেশের মঙ্গলের একটা যোগসূত্র থাকা চাই। মুসলিম লীগ যদি রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করতেন, তাঁদের পার্টি পোষণ আমাদের কাছে শোষণের রূপে দেখা দিত না। কর্পোরেশনের প্রধান পার্টি যদি নগরের সেবা করতেন, আমরা ব্যক্তিগতভাবে বঞ্চিত হ'লেও নিন্দে করতে পারতাম না। অর্থাৎ সব পার্টিই নিজের দলকে পোষণ করবে—একথা আমরা জানি, কিন্তু তাঁদের পোষণ দেশের কল্যাণ-সৃষ্টিকে অস্বীকার ক'রে যেন না চলে। বাঙলাদেশে কল্যাণ-সৃষ্টির পথে বিশেষ বাধা আছে কারণ আমাদের পার্টি-প্রথা সম্প্রদায়ের স্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারছে না। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যাঁদের অবলম্বন, রাজনীতিক্ষেত্রে দেশসেবার অজুহাতে তাঁরা সমস্ত জাতিকে দুর্বল করবেন। মুসলীম লীগের দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃষ্টিভঙ্গী দেশের অপচয়কে উগ্র ক'রে দেয় এবং রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতার কালিমায় আবৃত করে। দেশসেবার খণ্ডদৃষ্টি আমাদের দেশকে যে বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে, সে-দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। পার্টি-সৃজন ও পোষণ প্রয়োজনীয় কিন্তু সেই পার্টি যদি দেশকে খণ্ডভাবে দেখতে চায় এবং অংশ বিশেষকে সেবা করতে উদ্যত হয়, দেশবাসীর পক্ষে তা' হবে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনাই পরম পীড়াদায়ক। কংগ্রেসের এই খণ্ডদৃষ্টি নেই ব'লেই আমরা কংগ্রেস পার্টির দিকে

তাকিয়ে থাকি। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস পার্টি জানে যে, রাজতন্ত্রে তাঁদের স্থান ক'রে নিতে হ'লে যে-সব বিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে, তা' সাম্প্রদায়িক সমস্যায় অনতিক্রমণীয় হয়েছে। ফলে বাংলার কংগ্রেস দলের রীতি ও নীতি স্বার্থগত সংঘাতে ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। তাঁদের গর্ব করবার বিত্ত বা দাবি নেই, যদিচ অহমিকা আছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নেই। এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের রাজনৈতিক পার্টিসমূহের খণ্ডদৃষ্টি অপসারিত না হ'লে দেশের কল্যাণ নেই। তাই বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা খিন্ন এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অবসন্ন।

শচীন সেন

[এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকীয় সংশ্রববর্জিত। পাঠকবর্গের পক্ষ হইতে লেখকের মতামত সম্বন্ধে কোনো আপত্তি থাকিলে আমরা প্রবন্ধাকারে কিম্বা পত্রাকারে তাহা ছাপিতে প্রস্তুত আছি—অবশ্য সুলিখিত হইলে।—সম্পাদক, পরিচয়।]

অ্যাক্‌সিডেণ্ট

(ক)

দরজায় টিক্‌টিকি——————ডেকেছিল

নতুন ব্লেডে ছড়েছিল
গাল
ভোর সকাল।
রাস্তার সাম্‌নে সাপ পড়েছিল।
কার চল্‌ছিল চক্রান্ত?
আবার কে সেই বিপদ জান্‌ত
আমায় জানাতেও উদ্‌ভ্রান্ত
বোধনের দূর তলে তলে?

হ্যাঁ, তার পর তো এলেম চ'লে।
ওপারে ফুটপাথে এক ঘোর কাণ্ড
চোখের শিরায় টান্‌চে বিজ্ঞাপন প্রকাণ্ড
(বর্ম্মা টকির গ্রহ শণি—
রোজ চীৎকার প্রহসনই)
রাস্তায় ইলেক্‌সনের মোটার
ভর্ত্তি উদ্ধত ভোটার।
এদিকে কলেজ সাড়ে এগারোটায়—
মেজাজটা উর্দ্ধে ওঠায়
ফেরাফেরিতে
অসহ্য দেরিতে।

হঠাৎ ঝাঁপ দিলেম—বাস্ ধ'রতে—গাড়িতে আট্কালো
ব্যাপার।

* * * * *

ঠিক সাড়ে তিন সেকেণ্ড্ ব্যাপার।

(খ)

প্রায় মরেছিলেম—কিন্তু পুরো নয়,
গোলদিঘি থেকে দূরও নয়
তাড়াতাড়ি আন্‌ল মেডিকাল হাসপাতালে
ক্লোরোফর্মের পাতালে।

খাটের খুঁটিটা দুল্‌তে দুল্‌তে সোজা হল

এখনো কানে ফিরচে কোন্ শব্দ—"ওর মোজা খোলো।"
"পা-টা কি বাঁচানো যাবে?"
সিঁড়ি দিয়ে শাদা পোষাকে কে নাবে?
সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি মূর্চ্ছার্ত্ত গন্ধ—
(বাইসিকিলের টায়ার কি ফেটেছিল?)
(কানের পিছনে দপ্ দপ্ হাতুড়ির ছন্দ
ঠিক সেই সময় কি কেটেছিল?)

দূরের বন্ধু এল ফুল নিয়ে
বন্যা আমার মন, তার পারের কূল নিয়ে—

হঠাৎ প্রকাণ্ড ক্ষীণ দুর্লভ চেনা।
ঐ ঘড়িটা কি চল্‌চে না ?

কে জব্দ ?
(আবার টায়ার ফাটার ফাটার শব্দ ?)
শোনো : জন্মানোর মুহূর্তেই মরা সুরু
দূতটার বাসা যেখানে বুক দুরু দুরু,
সুযোগ খুঁজচে, চালাচ্চে অক্লান্ত কাজ
তারই কি লগ্ন ফস্‌কালো আজ ?
(জানি, ধরবে।
মানুষ তো মরবে।)
আর, যে চায়, বাঁচায়, দেয় অন্ন
সেই অন্য, সেই অনন্ত
রক্তের বীর
যার শিবির,
সে কি পারল ?
যদিও আজ খানিক হারল ?
(সকালে ইসারায় সার্‌ল)
(রোজকার জিনিষ দিয়ে কী বোঝায় মানে
সে-ই জানে।)

—"এখনো ঠিক বলা যায় না"—
(ওরা ভাবে: রুগী শুনতে পায় না)

মোটামুটি :
ছোটাছুটি

দুই দলের গাড়িতে গাড়িতে
ধাক্কা—ধাক্কা আমার নাড়িতে নাড়িতে।
দুই দূত আলো, কালো ;
ইচ্ছায় ঘোরালো,
মিশে প্রাণের অণুতে
মনে, তনুতে
সন্ধিসীমায় দ্বন্দ্ব ॥
জীবনের ধন্দ—
কোন্‌খানটায় সাম্য
পুরোপুরি বাঁচায় কাম্য ?

ঝ্যাণ্ডেজে ঝিম্‌ঝিম্ ; স্বাদটা হঠাৎ মিষ্টি।
নার্স, জল। থাক্ ॥ ও কি জানলায় বৃষ্টি ?

বেশি-কমের মাঝপথে
ইতস্ততের সাঁঝপথে
মাত্রার অ্যাক্সিডেন্ট্।
(সেই ঠিক সাড়ে তিন সেকেণ্ড্)

কোথায় ? পর্দ্দা কে তুলচে ? কে ওরা দুজনে ?
কেবল ফিস্ ফিস্
দিনরাত নিস্‌পিস্ করচে রক্তের কূজনে।

শক্ত নরম ঠাণ্ডা গরম

রোদ্দুরে, বিকেলে, জলে, ক্ষিধেয় ইসারা—

সর্ব্বদা ওরা কারা ?

(নীল পর্দ্দা—খোলা, খুলে দাও সম্পূর্ণ নীল আকাশ

আহা নীল হাওয়া, অনিল, বাতাস)

আমার আমি, ওদের গাড়ি

নদীর পারে না হোক্ এপারে বাড়ি।

(শেষ পর্য্যন্ত ছাড়াছাড়ি)

(ওরা কি একই ? দুই নয় ?

দূত ছাড়া কিছুই নয় ?

ঠিক হুকুম পেলে চল্‌বে ?)

(আমার জোর কথাটা কে বল্‌বে ?)

ফির্‌ব, ফির্‌ব, মেলাব আমার স্বার্থকে

প্রাণের প্রাণ, দুই দলের পরমার্থকে।

(সূর্য্যটা কতদিন জ্বল্‌বে ?)

"চাদরে ঢাকা দাও। চুপ। ঘুমিয়েচে।" ট্রিং—

"কে ?" "টেলিফোনে ডাক্‌চে ?"—"হ্যাঁ, হেলো নার্সিং—"

অমিয় চক্রবর্ত্তী

বিবর্ত্তন

চন্দন-তরুকল্পে
বিষকন্যার বাহু বাঁধা ছিল
বেষ্টিত কালসর্পে।
সে কি সম্মোহ মনে এনেছিল
মধুর কাব' গল্পে।

হৃতস্বাদ হ'ল রুচির জীবনধারা।
ঘুচে গেল সমাদর
অনূঢ় প্রাণের অনুভূতি-সঞ্চয়
রসবৈভব অকৃপণ বিস্ময়।
ধার-করা ধূমে আকাশ রূপান্তর
সুনীল নয়ন হারা।

সেই ভুজঙ্গ স্তম্ভিত আজি
চাপা বিদ্যুৎ-মণি
সেই মহীরুহ নির্ম্মোক ত্যজি'
চূর্ণ সুরভি-খনি।

আছে রূপকথা আছে মায়াসুর
আছে হিমপুরী নিরালা দুপুর
শুধু নেই সেই কুমারী হৃদয় অজানা মোহবিধুর।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি

বেরুবার পথ জানা নেই।
চারিদিক কাঁটা দিয়ে ঘেরা।
রাত্রি কাটে ভগ্ন শিবিরেই।
প্রাণভয়ে ভীত ঘোরাফেরা।

প্রভাতে নয়ন মেলে বহু তথ্য পড়ি পত্রিকায়।
চায়ের পেয়ালা হাতে প্রতীক্ষায় ভৃত্য রামদীন।
কা'কে যেন মনে পড়ে,—ফোন করি তার ঠিকানায়।
যদি সে বাড়ীতে থাকে কোনোক্রমে কেটে যাবে দিন।

পদতলে নেই পাদপীঠ।
ঊর্দ্ধনীলে কৃষ্ণচূড়া শাখা।
ঝাঁকে-ঝাঁকে ক্ষেপে হিংস্র কীট।
মৃতদেহ কাফনেতে ঢাকা।

ব্রহ্মদেশে রেলপথ খুলে দেয় ইংরেজ বণিক।
বারেক কটাক্ষ হেনে তবু মৌন শীত জাপানীরা।
মহাত্মার নেতৃত্বেই অবশেষে সত্যাগ্রহ ঠিক?
ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে চলে নেতাদের ত্রস্ত ঘোরাফিরা।

আপাতত নগরেই আছি।
শত্রুপক্ষ বেশী দূরে নয়।
দিনে-দিনে আরো কাছাকাছি
দু'-জনার মরণ-প্রণয়

ভালো কবে বেসেছিলে মনে পড়ে না ত'।
এখানে মৃত্যুর ছায়া আকাশে উদ্যত॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মাটি

ইতিমধ্যেই এদিকে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ সদয় হয়েছে। আর ভয় নেই। এ বছরে ভালো চাষ হবে, মহামারির আশঙ্কাও কম। তবু এখনো সব ভয় কাটে নি। আরো কিছুদিন না গেলে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন।

ইতিমধ্যেই লোহার ধারালো মুখ পৃথিবীকে বিঁধেছে। অনেকের ক্ষেতের স্বাদ লাঙ্গল পেয়েছে। আর দুয়েক দিনের মধ্যেই ধান বোনা সুরু হবে।

ইতিমধ্যেই চাষীরা সচ্ছল দিনের স্বপ্ন বুন্ছে: আগুনের শিখার মত ফসলের শিষ্; তীব্র। হয়তো মাটিতে ফসলের সবুজ আকাশ নেমে আস্বে। এই সব স্বপ্ন।

এরা এতো গরীব, অথচ এতো সরল! আকাশের একটুখানি ইঙ্গিতেই এদের মন থেকে দৈন্যের মেঘ মিলিয়ে যায়। এরা ফসল নিয়ে বেঁচে থাকে না, মাটি নিয়ে না, বেঁচে থাকে নিজেদের মন নিয়ে।

এই সমস্ত কাটা-কাটা কথা ভাব্তে ভাব্তে ডিস্পেন্সারি বন্ধ কর্‌ব ভাব্ছিলুম। গ্রামের মধ্যে এইটাই একমাত্র ডিস্পেন্সারি। সবাইকেই আসতে হয়। সবাইকেই চিনি।

রাত্রি বেড়ে উঠ্ছে। গ্রামে তাড়াতাড়ি রাত ঘন হয়। নটা বাজতেই চার্‌দিক নিঃঝুম। মুখের জলন্ত সিগারেটটা শেষ করেই দরজা বন্ধ কর্‌বো ঠিক করেছি। এমন সময় অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। লণ্ঠনের খানিকটা স্পন্দিত লাল্চে আলো, ছায়ামূর্ত্তি, চঞ্চল ছায়া। থাম্লো আমার দরজার কাছেই থাম্লো।

"কে হে?"

"আজ্ঞে আমি নন্দ।"

"ও, তাই বল। আমি বলি কে না কে! তা এতো রাত্তিরে যে! কি মনে করে?"

এতোক্ষণে বাইরের ছায়ামূর্ত্তি আমার ঘরের উজ্জ্বল আলোয় কঠিন ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। একটু ঝুঁকেপড়া, জীর্ণ, গ্রাম্য চাষা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। প্রৌঢ়। বয়েসের লাঙ্গল তার কপালে গভীর চিহ্ন এঁকেছে। অনেক অভাব আর দারিদ্র্য আর আশাভঙ্গের ইতিহাস সেখানে খোদাই করা। একটি জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস। তার মুখের দিকে চেয়ে অনেক কথা ভাবা যায়: অনেক অজন্মা আর অনাবৃষ্টি, অনেক ঝড় আর বন্যা, অনেক দুর্ভিক্ষ আর মহামারী।

নন্দকে আমি খুব ভালো করে চিনি। এতো সহজ সে। আমার কাছে প্রায়ই আসে। কাগজের খবর শোনে, ছেলের গল্প বলে, অনেক খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কথা। কোনো লাভ নেই। কিন্তু চমৎকার সময় কাটে। ভালো লাগে।

নন্দর ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতাতে। সেখানে আমার ডিস-পেনসারির ঠিক পাশের মেসে সে থাকতো। আমার কাছে প্রায়ই আসতো। একটি গ্রাম্য ছেলে, চাষার ছেলে। কলকাতায় কলেজে সে বিজ্ঞান পড়ে। একটু অদ্ভুত বৈকি! আর এতো তার উৎসাহ। তার চঞ্চল কালো চোখ আকাশের মত। এতো গম্ভীর আর গভীর। অথচ চঞ্চল আর সক্রিয়। দীপ্ত আর উজ্জ্বল। ধারালো। বুদ্ধির ধারে তীক্ষ্ণ।

অদ্ভুত ছেলে। কৈশোর তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সেখানে উদ্দাম যৌবন। একটি কালো গ্রাম্য ছেলে, যৌবনে উদ্দীপ্ত। চোখে জয়ের আলো। আমার সঙ্গে প্রায়ই তার অনেক আলোচনা হত। কথা বলার সময় নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত: সে সমুদ্র পেরিয়ে যাবে। সমুদ্রপারের দেশ থেকে বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞান সে নিয়ে আসবে। বিজ্ঞানকে সে কাজে লাগাবে। ভারতবর্ষের মাটিতে সোনা ফলাবে। বিজ্ঞান দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে সে জয় করবে। বেশ মনে পড়ে আমার ডিসপেনসারির অন্ধকার কোনে বসে, সায়াহ্নের পাণ্ডুর আলোয় একটি গ্রাম্য ছেলে কতদিন নিজের ভবিষ্যতের কথা বলতে বলতে যেন জ্বলে উঠেছে। কল্পনা তার সমস্ত দেহ আর মনে আশার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার নির্বাক চোখ কতদিন স্তব্ধ আর গভীর হয়ে উঠেছে।

এই নন্দ'র ছেলে। আমাদের গ্রামের ছেলে।

আমাকে সে প্রায়ই বলতো, 'সুধীরদা, আপনার আর টাকার দরকার কি? আমাদের গ্রামে ডিসপেনসারিটা উঠিয়ে নিয়ে যাননা। গ্রামের লোকদের ওষুধ আর ডাক্তারি সম্বন্ধে কুসংস্কার ভাঙ্গুন। এ কাজ আপনি ছাড়া আর কে করবে?"

আমিও মাঝে মাঝে সে কথা ভাবতুম। একদিন সত্যিসত্যিই চলে এলুম। সেই থেকে এখানেই আছি।

নন্দ প্রায়ই আসে। ঐ ছেলে ছাড়া কেউ তার নেই। আমার কাছে অতি সঙ্কোচে ছেলের গল্প সে আরম্ভ করে। তারপর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার কথার খেই হারিয়ে যায়। সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়। কে জানতো তার ছেলে একদিন মোটা মোটা বই পড়ে জলপানি পাবে! সমস্তই অবাস্তব বলে তার মনে হয়।

সমস্ত বছর ধরে সে অপেক্ষা করে থাকে কবে তার ছেলে দেশে আসবে। প্রত্যহ সে ঘর গুছিয়ে রাখে। আমার কাছে গল্প করে। আমার মুখ দিয়ে সে তার ছেলের প্রশংসা শুনতে চায়। তাকে আমি নিরাশ করি না। বলি, "তোমার ছেলে সাধারণ নয়। হীরের টুকরো ছেলে। হাজারে একটাও বেরোয় কি না সন্দেহ। আমি বাড়িয়ে বলছি না। দেখো, আমার কথা সত্যি হবে।"

নন্দ বুঝি মাঝে-মাঝে ভয় পায়। সে বুঝতে পারে না, নিজেকে সে বুঝতে পারে না। নিজের ছেলের সঙ্গে তার যেন ব্যবধান বেড়ে ওঠে। সে যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মনে মনে হয়তো সে অসুস্থ হয়ে ওঠে। হয়তো ভাবে তার ছেলে সাধারণ হলেই ভালো হত, সহজ হলেই ভালো হত। অন্তত তার সবটা নন্দ বুঝতে পারতো। নিজের ছেলের সবটা সে বুঝতে পারে না। ভালো লাগায় আর ভয়ে মাঝে মাঝে নন্দ যেন কি রকম হয়ে যায়। খেই হারিয়ে ফেলে। সময়ের লাঙ্গলে বৃদ্ধের কপাল আরো কুঁকড়ে ওঠে। তার ঝুঁকে-পড়া জীর্ণ দেহ মাটির দিকে আরো নেমে আসে। কাঁচাপাকা চুল হাওয়ায় নড়ে। ক্রমশ সে যেন ছায়ামূর্ত্তি হয়ে যায়, অবাস্তব হয়ে পড়ে। যেন কেমন হয়ে যায়।

নন্দ তার ছেলেকে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে, পুজো করে। তবু তাকে সে ভালোবাসে। তবু তার ছেলের গল্প শুনতে যেন তার নেশা ধরে যায়, তার অচেনা ছেলের। তবু প্রত্যহ সে অপেক্ষা করে ;—একটা দিন শেষ হল, একটা দিনের ব্যবধান কম্‌ল।

প্রতি ছুটিতেই নন্দর ছেলে গ্রামে আসে। একটি সহজ, সরল, গ্রাম্য ছেলে! নন্দ তাকে দেখে সুস্থ হয়। কৈ, সে তো বদ্‌লায় নি! কিন্তু সে দূরে চলে গেলেই হারিয়ে ফেলে। সে ভয় পায়।

এবারের গ্রীষ্মের বন্ধে সে গ্রামে আসে নি। এইবার তার শেষ পরীক্ষা। কল্‌কাতায় না থাক্‌লে পড়ার সুবিধে হবে না।

"তাকে একটিবার আস্‌তে লেখো না দাদাবাবু।" মাঝে-মাঝে, যখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে কেউ থাকে না, নন্দ চাপা ফিস্‌ফিসে গলায় আমাকে অনুরোধ করে।

হেসে বলি, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পরীক্ষা শেষ হলো বলে। তোমার ছেলে অনেক দিন এখানে থাকবে। তা'ছাড়া, এটা শেষ পরীক্ষা। এটা ভালো হওয়া চাই তো! এখানে এলে পড়াশুনোর অসুবিধে হবে। সব তো বোঝো।..."

নন্দও একটু দুর্ব্বল হাসে। বোধ হয় বোঝে।

বলে, "কাজ নেই আসতে লিখে।"

কিন্তু তবুও, মাঝে-মাঝে ডিস্‌পেন্‌সারি যখন খালি হয়ে যায়, এই প্রৌঢ় ঝুঁকেপড়া শীর্ণ মানুষটি চুপিচুপি যেন কি কথা বলতে চায়! লক্ষ্য করি অতিকষ্টে সে তার দুর্ব্বলতাকে জয় করার চেষ্টা করছে।

কাঠের বেঞ্চিটা দেখিয়ে আবার বললুম, "বোস। এত রাত্তিরে যে? কী মনে করে?"

"আজ্ঞে, দাদাবাবু, একটা তার এসেছে।"

"তার? কোথা থেকে? দাও, দেখি।"

এই গ্রাম্য লোকেদের কাছে বৈদ্যুতিক বার্ত্তা কখনো সুখবর বয়ে আনে না।

নন্দ তার উড়ুনির কোন থেকে ভাঁজকরা টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিলো। আঙুলগুলো তার কাঁপছে, লাঠিটা শক্ত করে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা সে

করছে। পড়লুম। নন্দর ছেলে কলকাতার পথে বাস চাপা পড়ে আজ মারা গেছে।

"কী খবর দাদাবাবু?"

খবর? কী করে বলি?

নন্দর কাছে এগিয়ে গেলুম। বললুম, "বোস নন্দ। তোমার ছেলে, মানে......"

"সে নেই, না? আমি জানতুম, সে থাকবে না।"

এই শীর্ণ লোকটির চোখ এই রাত্রে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন অনেক কথার ভীড়! সেখানে যেন বিরাট শূন্যতা! ঠিক যে কি, বোঝা গেল না। যেন সত্যি নয়। নন্দ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন ছায়ামূর্ত্তি হয়ে যাচ্ছে!

নন্দ আর কোনো কথা বলল না। তাকে বসালুম। সে আপত্তি করল না। টেলিগ্রামের কাগজটা মসৃণ করতে করতে সে যেন ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগলো।

আশ্চর্য্য হলুম। যেন ঠিক হচ্ছে না! তার একমাত্র ছেলের মৃত্যু এতোটা নিঃশব্দে কী করে শেষ হতে পারে? সেই কালো গ্রাম্য ছেলেটি, যৌবনে উদ্দীপ্ত, এতো সহজে শেষ হয়ে গেল! ফুরিয়ে গেল! তার চোখে জয়ের আলো জ্বলেছিলো। সে বলেছিলো বিজ্ঞান দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে জয় করবে। সায়াহ্নের পাণ্ডুর আলোয় একটি গ্রাম্য ছেলের চোখ ভবিষ্যতের নেশায় জ্বলে উঠেছিল। আজ সে ফুরিয়ে গেল!

আধঘণ্টা চুপচাপ। অনেকগুলো সিগারেট পুড়ল। ভেবে দেখলুম আজ রাত্রে নন্দর আমার কাছে থাকাই ভালো। একা ফিরে গিয়ে সে কি করবে?

তাকে সে কথা বললুম। কোনো উত্তর নেই। একবার শুধু আমার দিকে চাইল, আর কোনো কথা না বলে আবার মাথা নীচু করল।

তার থাকার ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেলুম। আমরা ডাক্তার। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের অসংখ্যবার ঘনিষ্ঠ পরিচয়: আমরা চট করে সামলে উঠতে পারি।

মিনিট পনেরোর বেশী আমার দেরী হয় নি। ফিরে এসে দেখি নন্দ চলে

গেছে। টেলিগ্রামটা মেঝের পড়ে। মনে মনে, সত্যি বলতে কি, বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হলুম। ভালোই হয়েছে। এখানে তাকে রেখেই বা কী করতুম ?

এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিছানায় আশ্রয় নিলুম। কিন্তু ঘুম এলো না।

যে সব রাতে ঘুম আসে না এই গ্রামের মাঠে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে। বেরিয়ে পড়লুম।

দু-তিন দিন আগে পূর্ণিমা শেষ হয়েছে। আজকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। খানিকটা ক্ষয়ে গেছে। তবুও প্রচুর আলো। পথ দেখতে অসুবিধে হয় না।

দিনের সঙ্গে রাত্রির গ্রামের অদ্ভুত তফাৎ। কেউ নেই। ফাঁকা। এতো অদ্ভুত ফাঁকা ! কুঁড়ে ঘরে যেন কেউ থাকে না, তারা যেন মানুষের তৈরী নয়। লাঙ্গল-চষা ক্ষেতগুলিতে কোনো দিন যেন মানুষের স্পর্শ পড়ে নি।

প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হল। ছোট একটা ঝাঁপের পোল পেরুতে হয়। কাদা আর জল চকচক করছে। সেখানে চাঁদ গুঁড়িয়ে গেছে। এর পর কয়েকটা বাঁশ ঝাড়। সমস্ত জায়গাটা সিরসির করে উঠলো। ও কিছু নয় : বাতাস। বাঁশঝাড়ের হালকা পাতায় বাতাস রোমাঞ্চ জাগিয়েছে। এগিয়ে চললুম। কিছুদূরে নন্দ'র কুঁড়ে। চাঁদের আলো যেন কুয়াসা বিছিয়েছে। দূরে কোথায় একটা ক্লান্ত কুকুরের ডাক। কয়েক মুহূর্ত। আবার স্তব্ধতা। ঘুমের ঘোরে কাছের বাড়ীতে ছোট ছেলে কেঁদে উঠল। রাত্রির স্তব্ধ হ্রদে মাঝে মাঝে এই সব শব্দের পাথর পড়ছে। স্তব্ধতা আরো ঘন হয়ে ওঠে।

নন্দ'র কুঁড়ে ঘরটা এখান থেকে এক রকম বোঝা যায়। ছেলে আসবে বলে কিছুদিন আগে নতুন খড় দিয়ে সে চাল ছেয়েছিল। ঝকঝকে সোনালী খড়। সে তখন আসেনি। সে কখনো আসবে না।

এতো দূর এসে মনে হল : কী করবো আমি গিয়ে ? থাক্। নির্জ্জনতাই এখন ভালো। ও কাঁদুক, ও কান্নায় ভেঙে পড়ুক। কান্নাই এখন ওর একমাত্র সান্ত্বনা। ওর মনের দগ্ধ ক্ষেতে এখন কান্নার বৃষ্টি ঝরুক। ও কাঁদুক।

কিন্তু বাড়ী ফিরেই বা করব কী ? একটা গাছের মরা গুঁড়ির ওপর বসে পড়লুম। ভাবছি আর একটা সিগারেট ধরাবো কি না। মাথার ওপর

কয়েকটা বাহুড় রাত্রির আকাশে ডুব দিল। তারা দূরে চলে গেল : ঝপঝপ ঝ-প-ঝ-প…। ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন নিভে গেল। পাশের বাঁশঝাড়ে অস্পষ্ট সিরসির।

এমন সময়, না আমার ভুল হয় নি, দেখলুম নন্দ'র কুঁড়ে থেকে কে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে এল। সামনে অনেকটা সে ঝুঁকে পড়েছে। পরনে সাদা থান, গায়ে সাদা চাদর। এই অস্পষ্ট আলোয় আরো সাদা বলে মনে হল। কোনো দিকে না চেয়ে সোজা সে মাঠের দিকে এগিয়ে চলল।

চমকে উঠলুম। দাঁড়ালুম। ওর চলার ভঙ্গী পরিচিত। ও নন্দ। কিন্তু এতো রাত্রে কোথায় চললো? নিঃশব্দে কিছুদূর দিয়ে আমিও অনুসরণ করলুম। কিন্তু অত সাবধান হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কোনো দিকে সে চাইছে না। আল দিয়ে কয়েকটা জমি পেরিয়ে সোজা সে নিজের ক্ষেতে এসে দাঁড়ালো। আমিও কিছু দূরে দাঁড়ালুম। আলের পাশে পাশে ছোট ঘাসে মেঠো মাকড়সা রূপোর জাল বুনেছে। শিশিরের দানা তাতে মুক্তোর মত টলটল করছে। আলোর রসে তারা ভরে উঠেছে। মেঠো ইঁদুর ইতিমধ্যেই মাটি কুড়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে। সোনার ফসল এই পথে তারা নিয়ে যাবে।

রাত্রির পাখী পাখার ঝপঝপ শব্দ করে মিলিয়ে গেল। কোথায় তারা ছিল, কোথায় গেল, কেউ জানে না। জানবে না। দূরের ছায়ামূর্ত্তি মাথা তুলে তাদের একবার দেখলো তারপর মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে অল্প অল্প হাত নাড়াতে নাড়াতে ক্ষেতময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। প্রথমে বুঝতে পারি নি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঝলুম। এই ভঙ্গী আমার বিশেষ পরিচিত। নন্দ এই ভাবে প্রতি বছর জমিতে ধান বোনে। আজ রাতে সে ধান বুনছে।

আলোর নিবিড় অরণ্যে আমরা দুজনে ছাড়া আর কেউ নেই। গ্রাম্য চাষার শ্বেত মূর্ত্তি এখন স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমি দেখতে লাগলুম।

চারদিকে অস্পষ্ট কুয়াসার মত আলোর জাল। আমি আটকা পড়ে গেছি। সামনে শ্বেত ছায়ামূর্ত্তি। পৃথিবী থেকে সে যেন স্বপ্নে চলে যাচ্ছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে।

নির্জ্জন আলোর অরণ্যে, ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলুম। আর আমার কাছে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেল।

একটি গ্রাম্য চাষা আজ রাত্রে মৃত্যুকে জয় করল। মাটিতে মৃত্যু ছড়িয়ে সে হাজার হাজার নতুন জীবনকে আহ্বান করছে। যারা আজ মাটিতে পড়ল তারাই একদিন মাঠময় সবুজ আগুন জ্বালিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই মরা মাঠ তখন জীবনে স্পন্দিত : সবুজ, উদ্ধত, উদ্দাম। ও আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুকে মাটিতে ছড়িয়ে, মৃত্যুকে জয় করল।

নিষ্কম্প আলোর অরণ্যে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলুম।

ওর মুখের কোনো রেখা আমার চোখে পড়ছে না। শুধু শ্বেত একটি ছায়ামূর্ত্তি মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধান ছড়াচ্ছে। জীবনের কাজ।

সমস্ত কঠিনতাকে পেরিয়ে ও যেন ক্রমশ স্বপ্নের মত দূরে চলে যাচ্ছে।

আমি শুধু দেখতে লাগলুম।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

আধুনিক বাংলা কবিতা : আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (এম্. সি. সরকার এণ্ড্ সনস্ লিঃ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দাম দুই টাকা)

গত কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলায় যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাছাই করা ১০৮টি কবিতা লইয়া এই কবিতা সংগ্রহ। বাছাই কার্য্যের বিপদ এই যে, তাহা কখনও সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে না। এ-ক্ষেত্রেও যে রুচি ও খেয়ালভেদে নানামতের উদ্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগৃহীত কবিতার মধ্যে সবগুলিই নিঃসন্দেহে "রবীন্দ্রপ্রভাববর্জ্জিত" বা "সার্থক" (significant) কিনা এ বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু সময়, প্রভাব ও সার্থকতার ত্রিধারা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থে আধুনিক কবিচিত্তের ও কাব্যরূপের যে একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য কাব্যামোদীমাত্রই সঙ্কলকদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন।

আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ কি এক কথায় তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে এই বিশ বছরের কবিতার মধ্যে যে সমস্ত নূতন রচনারীতি, চিত্রকল্প ও ধ্বনিছন্দ কাব্যপ্রকাশের ধারা বদলাইয়া দিতেছে, আলোচ্য গ্রন্থে সেই কাব্য-জিজ্ঞাসার যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত।

যে রূপান্তরের কথা বলা হইল, তাহা যে কোনো জীবন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে বারম্বার ঘটিয়া আসিয়াছে। অবশ্য একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মানুষের গভীরতম অনুভূতির বিষয়গুলি মূলত এক এবং মানুষের অভিজ্ঞতার প্রণালীও এক। সেই চিরপরিচিত আকাশ সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্য জনপদ লইয়াই চিরকাল মানুষের মন কারবার করিয়া আসিতেছে। সেই আশা-আশঙ্কা প্রীতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি চিরন্তন হৃদয়-বৃত্তির বশে মানবচিত্ত আলোড়িত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মানবের কাব্য-চেষ্টার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা নিত্যকালের। কিন্তু ইহাও সত্য

যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের পরিবর্ত্তনে মানুষের অভিজ্ঞতারও রূপ বদলাইয়া যায়। এবং মানুষের কাব্যেতিহাসেও বিশেষ বিশেষ যুগের ও দেশের ছাপ পড়িয়া যায়। ইহা আক্ষেপের বিষয় নয়, বরং ইহাই জীবনের লক্ষণ সুতরাং আশ্বাসের বিষয়। বাংলায় কাব্যজগতে এইরূপ একটি রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছে।

এই রূপান্তরের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে যে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে দু একটি কথায় ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে যে কবি সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু বিধাতাপুরুষ ন'ন। যে বাহ্য পরিবেষ ও পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি রূপগ্রহণ করে তাহা তাঁহার নিজের সৃষ্টি নয়। উনিশ শতকের মধ্যে ইওরোপের ব্যক্তিতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার সংঘাতে আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহা দ্বারা আমাদের জীবনের ধারা ঘুরিতে লাগিল এবং সেই পরিবর্ত্তমান আবহাওয়ার মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্ম। সাময়িক উত্তেজনায় বশে আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে বিশ-শতকের সাহিত্য উনিশ-শতকের সাহিত্যেরই সন্তান, একটি আর একটির পরিণতিমাত্র। আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম মাইকেলের উদ্দীপ্ত উনিশ শতকেই।

আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করি ইহা বিদেশী প্রভাবান্বিত, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে এই বিদেশী প্রভাব আমরা বাস্তবজীবনের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছি এবং মানবমনের স্বাস্থ্য তাহার সততায় ও অখণ্ডতায়। আধুনিক পাশ্চাত্যজীবনের মূলতত্ত্ব যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাহা ব্যবহারক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব অথচ চিন্তারাজ্যে বিশুদ্ধ স্বদেশী ঐতিহ্যের অনুসরণ করিব, এই মনোভাব লইয়া আমরা ইংরেজোত্তর বঙ্গসাহিত্যে অনেক ভাবুকতা ও গোঁজামিলের সৃষ্টি করিয়াছি। বিদেশী শাসক ও বিদেশী বণিকের শাসন ও শোষণ কার্য্যে যন্ত্রস্বরূপ সহায়তা করিয়া আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালী যে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠালাভ করিলাম, তাহার ফলে আমাদের মধ্যে যে পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটিল সেই পরিমাণে সমাজবন্ধন ও ঐতিহ্যবোধ শিথিল হইয়া পড়িল। সাহিত্যক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিচিত্ত এক নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ করিল

উনিশশতকের রোমান্টিক কাব্যে এই নবস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ। কিন্তু এ স্ফূর্ত্তি স্থায়ী হইল না। যে ভাবরস লইয়া কবির কারবার, সমাজজীবনে তাহার উৎস শুকাইয়া গেল; কবিকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল অন্তরাত্মার নিভৃত-কোণে, কল্পরাজ্যে। ললিতাবিন্যস্ত ছন্দঝঙ্কারে অলঙ্কারসমৃদ্ধ রূপাবলীর স্বপ্নপ্রয়াণ কবিচিত্তকে চিরকাল ভুলাইতে পারিল না। বিফলতা কবি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। নিঃসঙ্গতার বোঝা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। যে সব দুর্ম্মর সমস্যা ও দুরপনেয় সংশয় কল্পরাজ্যের হালকা হাওয়ায় সহজ সমাধান লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আবার স্বপ্নাভিযানের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিল। এ অবস্থায় যে মনোভাবের উদ্ভব হইল তাহার উপাদান ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য বা নির্বেদ। অনেকসময়ে ইহাকেই সংক্ষেপে সমরোত্তর মনোভাব বলা হয়। কিন্তু মহাসমর একটা উপলক্ষ্যমাত্র। যে সমস্ত জটিল কার্য্যকারণের সমবায়ে এই মনোভাবের উদ্ভব তাহা পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত হইতেছিল।

সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে এই বিড়ম্বিত অভিজ্ঞতাই বিচিত্র আকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এ কবিতা কেবল অভ্যস্ত সুরে সুন্দর কথা সুমিষ্ট করিয়া বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। ইহা চায় স্বপ্নসম্মোহমুক্ত জাগ্রত অভিজ্ঞতার যথার্থ ও যথাযোগ্য প্রকাশ। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যে এই জাগ্রতচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নয়; ইহার মধ্যে এমন কবিতাও আছে যাহা কৈশোরসুলভ অসংযত উচ্ছ্বাসের শিথিল প্রকাশ; এমনও কবিতা আছে যাহার পিছনে টেকনীক-সম্পর্কিত পরীক্ষার কৌতূহল ভিন্ন অন্য কোনও তাগিদ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেক কবিতার মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের কবিতায় আকর্ষণ আছে, জ্বালা আছে কিন্তু মোহ নাই, আত্মবিস্মৃতির আরাম নাই। ভাগ্যের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া লোকোত্তর সিদ্ধির পথে জয়যাত্রার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উন্মুখ হইয়া উঠে, যৌবনের স্মৃতি—

> পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
> আমাদের স্মৃতির বাসরে
> জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,

কিন্তু

পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল, ভদ্রা,
গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার।

যে আত্মদানের উৎস উজ্জীবনের একমাত্র আশা, সে আত্মদান চিরকালই বাকি থাকিয়া যায়। চারিদিকে মরুভূমির বালুকাশ্মশান, সমুদ্রের লবণাক্ত জল। অমাবস্যার আকাশ পাথরের মতো তমিস্রাজমাট। উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি গুমোটভাঙ্গা ঝড়ের জন্য, নূতন আশার মেঘসঞ্চারের জন্য, নবজাতকের জন্মাষ্টমীর জন্য। কিন্তু বিস্ময়বিমূঢ় প্রশ্ন উঠে—

যে পশুবলের হারে হয়েছিলে মৃত্যুঞ্জয়,
এবারে কি তার উজ্জীবন?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিলো সঙ্গোপন
যে-মিশরী শব—
তুমি নও,—আসে কি সে অর্দ্ধপশু, অর্দ্ধেকমানব
সঙ্গে করে' দিগ্বিজয়ী মরু?

এই যে দ্বন্দ্ব-সংশয়-নৈরাশ্যের অক্ষম নৈষ্কর্ম্যের আবহাওয়া ইহা অবশ্য কি জীবনে কি কাব্যে মানবচিত্তের চিরন্তন আবাসভূমি হইতে পারে না। আমরা যে এই বয়ঃসন্ধির বিষম ক্ষণে, যুগান্তের সঙ্কটে নিদ্রার প্রলোভন, স্বপ্নের আশ্রয়, অন্ধতার আত্মবঞ্চনা বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, জাগ্রত চক্ষে রূঢ় বাস্তবের দিকে তাকাইতে শিখিতেছি, আপাতত এইটুকুই পরম লাভ। সিদ্ধি কোন্ পথে, স্বাস্থ্যের সন্ধান কোথায় সে প্রশ্নের কোনও সর্ব্ববাদীসম্মত উত্তর আমরা এখনও পাই নাই। কেহ কেহ মনে করেন সাম্যবাদের বাণী এ যুগে এক নূতন আশার বার্ত্তা আনিয়াছে। কেহ বা মনে করেন মানবসভ্যতার চিরাগত ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত। আমাদের কাব্য-জিজ্ঞাসায় এ প্রশ্নের সমাধান এখন পর্য্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। কি সাম্যবাদী কি ঐতিহ্যবাদী কোন প্রকার আস্তিক্যবুদ্ধিপ্রসূত মনোভাবই আমাদের কাব্যে বা সমাজজীবনে এখনও শক্তিমান হইয়া উঠে নাই। আপাতত যাহা আমাদের

আধুনিক চিন্তায় পরিস্ফুট তাহা একটা নেতিমূলক চাঞ্চল্য বা একটা অস্থির আগ্রহ। এই চাঞ্চল্যের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান কাব্যগ্রন্থে একটা সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এবং ইহাতেই এ গ্রন্থের সার্থকতা বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এতক্ষণ কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ও বাস্তবপটভূমির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। কারণ আমার বিশ্বাস কাব্য সমাজ ও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন আকাশকুসুম নয়। জীবনের প্রবাহই ইহাকে রসধারা জোগায়, বাস্তবের পঙ্কেই ইহার মূল প্রাণবান। কিন্তু কাব্যসম্পর্কে ইহাই শেষ কথা নয়। যে অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে কাব্যের জন্ম, তাহা কাব্যে ধ্বনি, ছন্দ ও চিত্রকল্পের তরঙ্গে যথাযোগ্য রূপ ধারণ করিলেই কাব্য সার্থক। ইহাই হইল কাব্যের অঙ্গবিন্যাস বা টেকনীক্। টেক্নীকের কোনও বিষয়নিরপেক্ষ স্বরূপ নাই। ইহা কাব্যশরীর অভিজ্ঞতার বাহন মাত্র। যে টেক্নীক্ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির প্রেরণা ও গতিবেগ যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ টেক্নীক্। যে টেক্নীক্ রোমান্টিক স্বপ্নাভিযানের সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাহন, অভিজ্ঞতার ধারা বদলাইলে তাহা আর ভাবপ্রকাশের সহায়তা করে না, বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা আত্ম-প্রকাশের জন্য যে নূতন পথ কাটিতে বাধ্য হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। "গদ্য-রীতির প্রচলন, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষার বর্জ্জন, কবিকুলপরিত্যক্ত 'অসুন্দর' প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেষের গ্রহণ," এগুলি নূতন (নূতন অর্থে শ্রেষ্ঠ নয়) অভিজ্ঞতার যথাযোগ্য রূপদানের জন্যই আবশ্যক, ফ্যাশনের প্রলোভনে নয়।

এই সমস্ত নব্যরীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে কিনা তাহা এই নীতি অনুসারেই বিচার করিতে হইবে। যেমন ধরা যাক্ গদ্যরীতির প্রবর্ত্তন। গদ্যরীতির বিপদ এই যে ইহাতে উচ্ছৃঙ্খল বাগ্‌বাহুল্য ও শিথিল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রলোভন প্রশ্রয় পায়। আমার মনোহয় আলোচ্যগ্রন্থে গদ্যরীতির যে সব দৃষ্টান্ত স্থান পাইয়াছে তাহার মধ্যে কোনও কোনটিতে এই শৈথিল্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যঞ্জনা অপেক্ষা উক্তির বাহুল্যে ভাব অনেকস্থলে জোলো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন অনেক কবিতাও আছে যাহাতে গদ্যছন্দ জমাট হইয়া

সুগঠিত কাব্যরূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কোনও কোনও কবিতায় গদ্যছন্দের সার্থকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কাব্যকে অর্থঘন বা জমাট করিবার জন্য আধুনিক কবিরা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কাব্যের দুর্বোধ্যতা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু লাভের দিক দিয়া দেখিলে এ বিঘ্ন অনুল্লঙ্ঘ্যনীয় মনে হইবে না। উক্তিপরম্পরার শব্দার্থ গদ্যের ধর্ম্ম, আধুনিক কাব্যে ধ্বনি ও চিত্রকল্পের বেগে অর্থের স্তব্ধ ভাবই কবির লক্ষ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কবিতায় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের বাহুল্য বা অভাবিত প্রয়োগ আপাতত বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু অনেকস্থলেই দেখা যায় ঐ শব্দগুলি বাগ্‌-বাহুল্যের বা অস্পষ্টতার প্রতিষেধক। বাংলায় দুর্ব্বল ক্রিয়াপদের অত্যন্ত বাহুল্য, দুই একটি সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহারে বাক্যটি বাহুল্যবর্জ্জিত পরিপাটী রূপ গ্রহণ করে। এইরূপ, উল্লেখ-উদ্ধৃতির ব্যবহার, সিনেমাপ্রবর্ত্তিত cutting পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতি অন্যান্য কলাকৌশল সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যায়। মনে রাখিতে হইবে এ সমস্ত রীতি এখনও পরীক্ষাধীন। তবে এখনই নিপুণ ও দরদী কবির হাতে এই নব্যরীতি যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাতে বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধিলাভ হইবে বলিয়াই আশা হয়। ফ্যাশনের কথা স্বতন্ত্র, অক্ষম অনুকারকের হাতে অনেক অমূল্য রীতিই যে বিকারের সৃষ্টি করে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

এতক্ষণ নব্যরীতির কথাই বলিলাম। কিন্তু প্রচলিত কাব্যছন্দের স্বচ্ছন্দ বিকাশ, পরিচিত রোমান্টিক ঐতিহ্যের নূতন রূপ এ সব দিক দিয়াও এ গ্রন্থের সমৃদ্ধি প্রণিধানযোগ্য। যাঁহারা মাসিক পত্রিকার মারফৎ পুরাতন সুরের প্রাণহীন অক্ষম প্রতিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া কাব্যমাত্রেরই প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা এ গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা বা প্রত্যেক কবির রচনার আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্দেশ বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, যে নূতন সম্পদের সন্ধান পাইয়াছি, তাহারই সামান্য পরিচয় বাংলার কাব্যরসিকসমাজে নিবেদন করিয়াই এবং সম্পাদকের ভিন্নমত

কিন্তু উভয়ত চিন্তাশীল ভূমিকা দুইটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমি

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

The Power and the Glory—Graham Greene (Heinemann)

To a God Unknown—John Steinbeck (Heinemann)

দশ পনের বৎসর পূর্ব্বে ডি, এইচ্, লরেন্স য়ুরোপীয়ান সভ্যতার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে মেক্‌সিকোর এক অখ্যাত স্থানে কিছুকালের জন্য বসবাস করেন। খৃষ্টান-ধর্ম্মের বে-দৌলতে য়ুরোপীয়ান মানুষ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে যে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আজ ছিন্নভিন্ন, সচেতনতার মোহে সে অন্ধ, এবং স্বকৃত আবর্ত্তে নিমজ্জিত; এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে লরেন্স অ-খৃষ্টান ধর্ম্মের সন্ধানী হন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন-ধর্ম্মের ছাত্র না হয়েও নিজের তাগিদে তিনি তাদের সাধনার সম্ভতঃ এক আধটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন। অবচেতনা সংক্রান্ত তাঁর দু'খানি বই আছে যাতে অনেকে তান্ত্রিক সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছেন। অথচ তিনি মাত্র সীলন পর্য্যন্ত আসেন এবং সেখানকার অধিবাসীরা, যাঁদের তিনি ভারতবাসী ভেবেছিলেন, তাঁর কাছে অশ্রদ্ধারই পাত্র হন। শেষে তিনি ঘুরতে ঘুরতে মেক্‌সিকোয় পৌঁছান। মেক্‌সিকোর জীবনযাত্রার বর্ণনা থেকে টের পাই যে তিনি তথাকার ইণ্ডিয়ান-দের. ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অত্যন্ত কুতূহলী হন। Plumed Serpent নামক নভেলখানিতে তাদের গুহ্য ধর্ম্মের আখ্যান আছে। লরেন্স-এর এই বিশ্বাস জন্মায় যে ঐ দেশে খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রলেপের নীচে একটি আদিম ঐতিহ্যের স্রোত বইছে যার অস্তিত্ব প্রকাশ না পেয়ে থাকতেই পারে না ব্যক্তিগত জীবনের সকল সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, যার শক্তি আভিজাত্যের হেতু ও যার চিরন্তন কার্য্য-কারিতা বীজের সনাতনত্বেরই তুলনীয়। যদিও লরেন্সের বিশ্বাস এবং

নাৎসীদের race theory এক বস্তু নয়, তবু এ-কথা ঠিক যে তাঁর 'রক্ত-প্রবাহের ধারা' মানুষের সমবেত প্রয়াসকে অমান্য ক'রে একটি অ-মানুষিক, বুদ্ধির অগম্য, বিকৃত বিশ্বাসের সহায়ক হতে পারে। সৌভাগ্যের কথা যে জন-সাধারণ তাঁর নব্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নি, কারণ সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ঐ বিশ্বাসের এক আন্তরিক বিরোধ অনেকেই সন্দেহ করেছেন। কিন্তু সমাজের দিক থেকে লরেন্সীয় বিশ্বাসের অসার্থকতা থাকলেও, একাধিক লেখক তাঁর প্রতিবাদের, তাঁর সম্বিৎস্নুতার, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগস্থাপনের আহ্বানের তীব্রতায়, প্রভাবান্বিত হন। ফলে অনেকে খৃষ্ঠান ধর্ম্মের মূল ঘটনায় অর্থাৎ যীশুর আত্মদানের মাহাত্ম্যে ও তাৎপর্য্যে আকৃষ্ট হন; কেউবা তারও পিছনকার সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে পেগান-সাহিত্য রচনা করতে থাকেন। সুবিধাও সৃষ্টি করেছিলেন ফ্রয়েড্ ও ফ্রেজার এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। জাতীয় অবচেতনার অস্তিত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রের বিরুদ্ধ সম্পর্ক, বলিদান প্রভৃতি প্রাথমিক ধারণা গদ্যে-পদ্যে ফুটে উঠল। মাইথলজির পুনরুত্থানে বর্ত্তমান সাহিত্য সমৃদ্ধই হয়েছে। আজকালকার অনেক বিদেশী রচনার অর্থ বোঝাই যায় না ফ্রেজারের Golden Bough এবং ফ্রয়েড্, ইয়ুং এর পুস্তক না পড়লে, তাঁদের মতামতের সঙ্গে না পরিচিত হলে। (বর্ত্তমান বাংলা কবিতাতেও এই প্রভাব ধরা পড়ে।) গ্রেহাম গ্রীণ ও ষ্টাইনবেকের নভেল দু'খানি কেবল মেক্সিকোর বর্ণনায় নয়, ঐ দেশের বর্ত্তমান সভ্যতার নিম্নস্তরের ঘটনা-বিবরণে এবং জগতজোড়া প্রাথমিক মীথ্-এর ব্যবহারেও লরেন্স-এর প্রভাবে পুষ্ট। গ্রীণ ক্যাথলিক চার্চ্চের স্তরেই সন্তুষ্ট, কিন্তু ষ্টাইন্-বেক তারও নীচে গেছেন, যেখানে আত্ম বলিদানে মাটি উর্ব্বর হয়।

Power and Gloryর গল্পটি এই : মেক্সিকোর একটি প্রদেশ কম্যুনিষ্টদের হাতে এসেছে, তাই মদ কেনা-বেচা বন্ধ ও পাদ্রীরা পলাতক। যে-পাদ্রী বিবাহাদি ক'রে ধর্ম্ম যাজনায় ইস্তফা দিয়েছেন তিনি আছেন ভাল, আর যিনি পালিত-দের আত্মার কল্যাণের জন্য নিজেকে দায়ী ভাবেন তিনি বনে-জঙ্গলে পালিয়ে কর্ত্তব্য সাধন করছেন। গল্পের নায়কের পিছনে রাষ্ট্রশক্তি উঠে পড়ে লেগেছে। তিনি ইচ্ছা করলে পালাতে পারেন, কিন্তু শুভ মুহূর্ত্তে কোন না কোন গরীব গ্রামবাসী তাঁর কাছে কন্‌ফেশন ক'রে পাপের বোঝা খালি করতে চায়,

কান্না যা তাঁর কাছে ইনটারসেশন প্রত্যাশা করে। তিনি না বলতে পারেন না, তাই বিপদ তাঁর পদে পদে। অবশ্য পাদ্রী সাহেব নিজে ব্রাণ্ডি খান এবং তাঁর একটি জারজকন্যাও আছে। অর্থাৎ গল্পটি একটি ক্যাথলিক পাদ্রীর প্রায়শ্চিত্তের, এবং তার নক্‌সাটি অনেকটা ভিক্টর হ্যুগোর লে মিজারেবল-এর মতন—এমন কি জ্যাভেয়ারেরও জুড়ি পর্য্যন্ত। শেষকালে পাদ্রী ধরা পড়লেন—এবং কম্যুনিষ্টরা তাঁকে গুলি করে মারলে। শেষ দৃশ্যটির বর্ণনা সোজাসুজি নয়, প্রতিবেশী ঘটনার পটভূমিতে তার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত। ঘটনার মধ্যে একটিতে একজন দর্শকের দাঁত কন্‌কনানি, আমার পরিচিত মনে হল। ষ্ট্রিণ্ডবার্গেরই বোধহয় একটি ছোট গল্প আছে—নাম Toothache—যেখানে যীশুখৃষ্টের বলিদানের মাহাত্ম্য একজন দর্শকের দাঁতের ব্যথায় নিরর্থক প্রতীয়মান হচ্ছে। যীশুখৃষ্টের বদলে এখানে ক্যাথলিক পাদ্রী। সে যাই হোক—গ্রীণের হাতে পাদ্রীর মনুষ্যত্ব যেমন খুলেছে তেমনই সেই মনুষ্যত্বের অপূর্ণতা ও পূর্ণ হবার প্রক্রিয়া, অর্থাৎ আত্মবলিদানের সাহায্যে প্রায়শ্চিত্ত, যেন একটু বেশী স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে। গল্পের গতিতে ধর্ম্মকথা খুব বেশী চাকা পড়েনি। তবু মোটামুটি বইটা খুবই সুখপাঠ্য—যদিও মোড়কের উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে একমত হতে পারা যায় না। ষ্টানবেকের এ বইখানি তাঁর Grapes of Wrath-এর পূর্ব্বেকার রচনা। পরিচয়ের পাঠক নিশ্চয়ই Grapes of Wrath পড়েছেন—সত্যই এমন নভেল এ-যুগে লেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। যে-লেখকের শক্তি এমন এপিক-ধরণের তাঁর অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখাও মূল্যবান। আমি অন্ততঃ এইজন্যই বইখানি মন দিয়ে পড়লাম। গল্পটির ছক মোটামুটি Grapes of Wrath-এরই মতন খানিকটা। ওয়েন-গোষ্ঠি নতুন জমিতে বসবাস করছেন লাভের আশায়, সেখানে আপাতত প্রচুর জল থাকলেও কখনও কখনও অজন্মা আসে। কিন্তু যোসেফ্ (নামটি সার্থক) কপাল ঠুকে ও নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাসের জোরে এই "ভ্যালি অব্ আওয়ার লেডী" নামক উপত্যকায় চাষবাস সুরু করলেন। তাঁর বিবাহ হল, ছোট ভাই মারা গেল, একটি ছেলে হল, গরু বাছুর বেড়ে চলল—এই ভাবে সংসার গড়ে উঠল। ওয়েন পরিবারের ডেরার মাঝখানে ছিল একটা মস্ত বড় ওক্ গাছ, তাকে যোসেফ পিতৃস্থানীয় বিবেচনা করত, তার ধারণা যে মৃত পিতার আত্মা ঐ গাছে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু এই প্রকার অ-খৃষ্টানী বিশ্বাস যোসেফের মেজ ভাইয়ের সহ্য হল না। সে—বার্টন্—একদিন গাছটির মূল কেটে দিয়ে চলে গেল—সে ছিল গোঁড়া খৃষ্টান। দূরের জঙ্গলে, পাইন বনের বুকের মধ্যে একটি ধারা বইত, তার উৎস ঢাকা থাকত একটি শেওলাঘেরা পাথরে, যার রূপ অনেকটা ছাগলের মতন। প্যানের উল্লেখ লেখক না করলেও, ইঙ্গিতটি বোঝা যায়। অবশ্য এই পাথর দেখলেই যোসেফ ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথেরও আতঙ্ক আসত। মেক্সিক্যানরা পাথরটাকে বলিদানের স্থান ভাবত। একদিন এলিজাবেথ একলা এখানে এসে মূর্চ্ছা যায়, তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। জননী হবার পর সে জোসেফের সঙ্গে আবার সেখানে যেদিন এল, তখন তাচ্ছিল্যভরে তার ওপর চড়তে গিয়েই সে গেল পড়ে, এবং সেই পতনেই তখনই হল তার মৃত্যু। তারপর জোসেফ একদিন লক্ষ্য করলে যে ওক্ গাছটি শুখিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে অনাবৃষ্টি এল, গরু-বাছুর মরতে লাগল, ঘাস পর্য্যন্ত জন্মাল না। যোসেফ ও তার ভাই টমাস্, যার সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের একটি সহজ সম্বন্ধ ছিল, ভয় পেয়ে উপত্যকার ও-পিঠে, যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়, সেখানে নতুন জমি খুঁজতে গেল। সেখানে একজন অদ্ভুত বুড়োর ঘরে তাদের রাত্রিবাস করতে হয়—সে বিশ বছর ধরে শেষ পাহাড়ের কিনারা থেকে সূর্য্যাস্ত দেখে আসছে, এবং ঠিক সূর্য্য যখন ডুবছে তখন একটা পাথরের ওপর প্রত্যহ পশুবলি দিয়ে আসছে। এই প্রকার আচার ড্রুইড্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দু'ভাই ফিরে এল বটে, কিন্তু যোসেফ ঠিক করলে যে সে নিজে পুরাতন উপত্যকাতেই থাকবে, কারণ তখনও পাইন বনের উৎস-ধারা সমান জোরেই বইছে। সে ভাবলে যতদিন উপত্যকার ঐ প্রাণরূপী স্রোতটি বজায় আছে ততদিন আশা। টমাস্‌কে সবশুদ্ধ অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়ে সে উৎসের ধারে বসবাস করতে লাগল। এসে জুটল সেখানে এক পুরাতন মেক্সিক্যান সঙ্গী। একদিন যোসেফের সন্দেহ হল ধারা কমছে, শেওলা শুখিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে জল সেঁচতে লাগল দুজনে। ফল হল না। একদিন উৎস গেল বন্ধ হয়ে। যোসেফ সেই পাথরের ওপর শুয়ে ছুরি দিয়ে কব্জীর শিরা কেটে দিলে। রক্ত এসে পড়ল উৎসের মুখে। বৃষ্টি এল আকাশ ছেপে।

আমার দুঃখ যে রচনার মর্য্যাদা রক্ষা হল না এই সংক্ষিপ্তসারে। ষ্টাইন-

বেকের ভাষা সত্যই অপূর্ব্ব। যে-সব চিন্তা শব্দের ও ভাষার অতীত তারাই রূপ পেতে ব্যাকুল প্রত্যেক চরিত্রের মুখ দিয়ে। এবং রূপ পেয়েছে, বোধহয় যতটা সম্ভব ততটাই। তাই বইখানিতে ইমেজ ও সীম্বলের এত প্রাচুর্য্য। বলা বাহুল্য ইমেজগুলি চাক্ষুষ নয়, তারা সীম্বলধর্ম্মী। সেইটাই স্বাভাবিক, কারণ Golden Bough-এ বর্ণিত মীথ্‌গুলি প্রত্যয়মূলক। তাদের রূপায়িত করতে সেকালে একমাত্র গ্রীক, হিন্দু ও মায়া জাতিরাই আংশিক ভাবে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু বাকি অংশ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মাচার ও দর্শনের মধ্যে থেকেই আত্মরক্ষা করেছে। সর্ব্বসাধারণের চেতনার স্তরে যখন মীথ্‌গুলির স্থান আজ আর নেই, তখন মূর্ত্তি গড়া অসম্ভব, নব্য পুরাণ লেখাই চলতে পারে। নব্য-পুরাণের সন্ধ্যাভাষা ষ্টাইনবেকের করায়ত্ত। তিনি রীতিমত কবি হলে ইয়েট্‌সের সঙ্গে তাঁর তুলনা সম্ভব হত, কিন্তু যেকালে গদ্যেই তিনি লেখেন তখন তাঁকে লরেন্স-এরই সমগোত্রের বলব। যেখানে ষ্টাইনবেকের ভাষাগত কৃতিত্ব সেটা তার ছন্দে। ছন্দ স্বভাবজ, যেন সেটি সমগ্র প্রকৃতির উত্থান-পতন, জীবন-মৃত্যু, ঋতু-বিবর্ত্তনের লয়ে বাঁধা। লরেন্স-এর ভাষা এ-রকমের ছিল না। তাঁর শব্দ-চয়ন সব সময় evocative হত না, যদিও সব প্যারাগ্রাফটি পড়লে বর্ণিত বস্তুর প্রাণ পাওয়া যেত। সে যাই হোক—এই বইখানিতে অন্ততঃ লরেন্সের কাছে, ষ্টাইনবেকের ঋণ সর্ব্বজনগ্রাহ্য। এ-প্রকার ঋণই productive। Grapes of Wrath-এ তিনি ধার শুধে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। আমি সাগ্রহে পরিচয়ের পাঠকবৃন্দকে বই দুখানি পড়তে অনুরোধ করছি। বাংলা সাহিত্যে এ-প্রকার বই নেই, যদিও তাদের সম্ভাবনা কল্পনার অতিরিক্ত নয়। বরঞ্চ, হওয়া এক হিসেবে সহজ।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পলায়ন—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী কলিকাতা।
মূল্য—দুই টাকা।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর লঘু সংখ্যক যে ক'জন আভিজাতিক ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের আসরে আম্রিয়মাণ অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অন্যতম ত' বটেই পরন্তু অনুত্তম কিনা তা'ও অনুধাবনযোগ্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গতানুগতিকতা থেকে ভাব ও ভাষাগত বহু সংস্কারিক বন্ধনকে মুক্তি দিয়ে এবং বাহ্যিক আস্তিক্যের বিকৃত রূপকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে কল্লোলের যুগে সাহিত্যের পরিবেশে যে ভীষণ বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে থেকেই ঘটে অচিন্ত্যকুমারের অভ্যুত্থান। যতদূর মনে পড়ে কল্লোলের 'বেদে' এবং প্রবাসীতে মুদ্রিত 'দুইবার রাজা' নামক গল্প দুইটিই তৎকালীন রসিক সমাজে তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্র প্রশস্ত ও ক্ষমতাশালী লেখকের পরিচায়ক হিসাবে প্রশস্তি লাভ করে।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাঁর কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহার প্রথম গল্প 'পলায়ন' এবং এই গল্পটির নামানুসারেই হয়েছে গ্রন্থখানির নামকরণ। বাকী অন্যান্য আরও আটটি গল্প বিভিন্ন নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

সাধারণত কোন ক্ষমতাশীল গল্পলেখকের সকলগুলি গল্পই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঠিক সমপর্য্যায়ভুক্ত হবে এরূপ আশা করা একান্তই অসমীচীন। কারণ, ঘটনার গুরুত্ব ও মানসিক অবলোকনের উপর সেগুলি নির্ভরশীল; এবং ঘটনার গুরুত্ব ও মানসিক অবলোকন যখন ইতরেতরাশ্রয়ী ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন একই শিল্পীর বিভিন্ন গল্পোপন্যাসে রসবস্তুর বৈষম্য থাকা একরূপ অনতিক্রমণীয় বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। অচিন্ত্যকুমারের গল্পগুলির মধ্যেও তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা উক্তরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু তত্রাপি এই ইতরবিশেষের মধ্যেও বিশিষ্ট লেখকের রচনা-সৌরভ কোথাও-না-কোথাও পাঠকের চিত্ত-চত্তরে তার অস্তিত্বের স্মারক-লিপি পাঠাবেই পাঠাবে।

অচিন্ত্যকুমারের রচনার মধ্যে প্রধানত যা সুস্পষ্ট স্বল্পকথায় তা হচ্ছে তাঁর

Landour-এর austerity, Turgunev-এর translucence এবং Zola-র ন্যায় একটা comprehensive attempt to portray the social reality. কিন্তু আর্ট যতটা reality দাবী করে অচিন্ত্যকুমার প্রায় ক্ষেত্রেই তার এদিকে-ওদিকে পদক্ষেপ করেন নি এবং তাঁর গল্পগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা পরিস্ফুট তা হচ্ছে একটা মানসিক-সংগ্রাম। ভাবাবেগের কথা কোন কোন ক্ষেত্রে স্মরণে এলেও, অচিন্ত্যকুমার তা'কে প্রায়ই নিঃসঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন এবং এটা বোধহয় তাঁর সূক্ষ্ম মনন-ক্রিয়ার সাহায্যেই সম্ভূত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে তাঁর রচনায় তিনি subjective intensity gain করলেও objective truth-এর প্রতি যেন সমভাবে সংবেদনশীল হ'তে পারেন নি বলেই মনে হয় এবং এটাকে বহুক্ষেত্রে শ-র egoistic জীবনের ব্যক্তিগত প্রকাশের মত লক্ষণ বলেই সমালোচকেরা বর্ণনা ক'রে থাকেন। মোটের উপর অচিন্ত্যবাবুর পূর্ব্বাপর কতকগুলি রচনা ও বর্ত্তমান গ্রন্থখানির গল্পগুলি পাঠান্তে আমি স্বাভাবিক ভাবে যে অনুমানে উপনীত হয়েছি এটা তারই প্রতিফলন মাত্র। অতএব এখন সম্ভবমত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর কয়েকটি গল্পের রচনা-কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

গ্রন্থের প্রথম গল্প 'পলায়ন' আপাতদৃষ্টিতে একটু grotesque ঠেকলেও,—জীবনযুদ্ধে নির্জ্জিত একটি সুস্থ সবল পুরুষ তার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সমভিব্যাহারে অন্যন্যোপায়ে অপমৃত্যুকে বরণ ক'রে নেওয়ার করুণ কাহিনীটিতে লেখক যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। লরেন্স যে চিন্তার দুঃসাহসিকতার (thought adventure) কথা লিখেছিলেন, অচিন্ত্যকুমারের 'পলায়ন' গল্পটিকেও সেই দুঃসাহস পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। তাছাড়া পলায়ন গল্পের অন্তর্বস্তু স্পেণ্ডারের 'The Burning Cantus' নামক গল্প-গ্রন্থের 'Two Deaths', 'The Dead Island' নামক গল্পের সদৃশ চিন্তা মনে জাগরিত করে। ব্যর্থতার চরম পরিণতি ও আত্মসম্মান রক্ষার শেষ সম্বল গরলকেই লোকনাথের (গল্পের নায়ক) বেছে নেওয়া ছাড়া যে গত্যন্তর ছিল না আমি তা বলছি না; কিন্তু সরাসরি এই ঘটনাটি নিয়েই বিচার করলে বলতে হয় যে, গল্পটির মধ্যে ব্যর্থ জীবনচিত্রের যে একটি অকৃত্রিম ও অপূর্ব্ব আলেখ্য ফুটে উঠেছে তা কোনরূপেই অস্বীকার করা যায় না। তবে ত্রুটির দিক থেকে নিরপেক্ষ ও

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে স্থানবিশেষে গল্পটি অতিকথনদোষদুষ্ট হয়েছে ব'লেই প্রতীতি জন্মে।

দ্বিতীয় গল্প 'স্বেচ্ছাসেবিকা'র মধ্যে আধুনিকা দেশ-সেবিকাদের প্রতি আংশিক শ্লেষের চিত্রটি উপভোগ্য। তাছাড়া আনুপূর্ব্বিক একটা লঘু সোপহাসিক সংলাপ বিষয়বস্তুর ম্লানিমাকে মোটেই মাথাচাড়া দিতে দেয় নি। Frank O' Connor,-এর রচনার মধ্যে এই ধরনের হাল্‌কা অথচ রসসম্পদযুক্ত লেখা মধ্যে মধ্যে নজরে পড়ে। এর পর আসে 'পৌরাণিক' গল্পের নাম। এবং এইখানে অচিন্ত্যকুমারের intellect-এর সঙ্গে emotion ও style যেন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সম্বদ্ধ হয়েছে। 'পৌরাণিক' গল্পের বিশ্লেষণী শক্তিতে লেখক পাকা analytic psychologist-এর দাবী করলেও, creative psychologist-এর অবদান এই গল্পের অন্তর্বর্ত্তী বিষয়কে তেমন ভাবে ঔজ্জ্বল্য দান করতে পারে নি। 'ক্লোজ-আপ' স্থূল ঘটনাবিশিষ্ট গল্প এবং অন্যান্যগুলি অপেক্ষা একটু বেশিমাত্রায় subjective. এখানে অচিন্ত্যকুমার realism-এর সঙ্গে idealism-এর সমন্বয় করেছেন। অথচ মজা হচ্ছে এই যে, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ নাও হ'তে পারে উক্ত গল্পটির মধ্যে এটিও একটি বড় প্রতিপাদিত বিষয়। 'ক্লোজ-আপে'র সংলাপের মধ্যে দু'এক স্থানে ক্লাস এইট্ পর্য্যন্ত পড়া, গ্রাম্য মেয়ে, মল্লিকার মুখে দু'একটি উক্তি অপ্রতর্ক্য ব'লে মনে হয়। সিনামায় জয়েন করা সম্বন্ধে তার পিতার আপত্তির কথা বলতে গিয়ে একস্থানে সে বলছে: 'তাই এ-ক্ষেত্রে শুধ্ নেগেটিভ আপত্তি নয়, দস্তুরমতো পজিটিভ অত্যাচার'—তাছাড়া অপর একস্থানে, বয়সের তুলনায় তাকে অল্পবয়সী দেখানোর আলাপ-আলোচনায় সে বলছে: 'সেটা আমার থাইরয়েড বা অন্য কোন গ্ল্যাণ্ডের দোষ হ'তে পারে, বয়সের দোষ নয়।' আভিজাত্য সমাজের হাই-ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল মেয়ের পক্ষেই বয়স সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি সহজাত নয় কি?

পরবর্ত্তী গল্প 'অকারণে'র মধ্যে পরচর্চ্চা-পরায়ণ বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিত্রটি ও কয়েকটি type চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গল্পের উপজীব্য হিসাবে এত ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু নিয়ে কি ভাষায় কি বাচনভঙ্গীতে যে এতদূর নির্ব্বিবাদে অতিক্রম করা যায় তা এই ধরণের রচনাপারঙ্গম

অচিন্ত্যকুমারের দ্বারাই সম্ভব। এর পর আসে 'হরেন্দ্র' নামক গল্প। প্রধানত এই গল্পটি বিশ্লেষণবিরল এবং ঘটনাবহুল। হরেন্দ্র-চরিত্রাঙ্কনে লেখক বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং বর্ত্তমানের একটি বিশেষ সমস্যাকে গল্পের সাহায্যে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। মোটের উপর এই গল্পটি উচ্চাঙ্গের technic প্রধান না হলেও, অত্যন্ত realistic হয়েছে। এবং এই প্রসঙ্গে Mr. Percy Lubbock-এর 'The Craft of Fiction' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থের স্মরণ ক'রে বলা যেতে পারে যে, 'reality by the novelist is the first and the technic is the second.'

উপর্য্যুক্ত গল্পগুলি ছাড়াও 'সাক্ষী', 'আমার অসুখ' ও 'ভদ্রলোক' নামক রচনা কয়েকটিও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র ঘটনার সাহায্যে পরিণতি লাভ করেছে এবং প্রত্যেকটিই হয়েছে অল্পবিস্তরভাবে উপভোগ্য। বর্ত্তমানের বহু লেখক যেমন বহুক্ষেত্রে সমাজ-জীবনের বাহ্যিক আবরণটাকেই তাঁদের গল্পের বিষয়সর্ব্বস্ব কল্পনা ক'রে নিত্যতা লাভের আশায় বঞ্চিত হন,—অচিন্ত্যকুমার তাঁদের সমপন্থী নন; তিনি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ও হৃদয়বৃত্তির স্বচ্ছতায় ব্যবহারিক জগতের সকল বস্তুরই অন্তস্তলে প্রবেশ ক'রে প্রায় প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানের দ্বারাই চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার বিন্যাস করেন। তাই কোথাও তাঁর রচনা অস্বাভাবিক ও অপ্রাসঙ্গিক ব'লে পাঠকের বিরক্তির কারণ হয় না। 'ভদ্রলোক' গল্পের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সেগুলি প্রাদেশিকতার প্রভাব-জনিতই হোক বা অনবধানবশতই হোক তাঁর রচনার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত নয়। 'উড়াল দিল' এবং 'ঘাই দিল' সাধারণত আমরা বলি না। তাছাড়া 'গভীরতম আত্মা' কথাটিও আপত্তিজনক। কারণ 'আত্মা'র ক্ষেত্রে 'গভীরতম' বিশেষণ প্রযুজ্য হয় কি ক'রে? তার কি কোন বিশেষ স্তর আছে?

মোটের উপর অচিন্ত্যকুমারের গল্পগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং সেখানে বর্ত্তমান জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ব'লেই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ১৭৯৫-১৮৭৬। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলিকাতা। মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণের ২॥০।

ডক্টর সুশীলকুমার দে এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন: 'ব্রজেন্দ্র বাবু তথ্যমাত্রদর্শী ঐতিহাসিক। তিনি নাট্যশালার ঘটনাবলীর ইতিহাস লিখিয়াছেন কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ভিতরকার ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই।......... হয়ত সাহিত্যিক বা সমালোচক হিসাবে তাঁহার কোনও অভিমান নাই, কিন্তু সাধারণ বাঙালী পাঠক কেবল তারিখ, তথ্য বা ঘটনার অপেক্ষাকৃত নীরস বিবৃতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার নিকট উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের, গ্রন্থকারদের বা নাট্যোল্লিখিত বিষয়বস্তুর অধিকতর সরস বিবরণ প্রত্যাশা করিতে পারে।"

গ্রন্থটি পড়িয়া ভূমিকা-লেখকের মতে সায় দিতে পারিলাম না। ব্রজেন্দ্রবাবু যে 'তথ্যমাত্রদর্শী ঐতিহাসিক' তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনাকে নীরস বলিলে অবিচার করা হইবে। তিনি শুধু সনতারিখের তালিকাসমেত ঘটনাবলীর ক্রমিক উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, সাময়িক সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি হইতে এই ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে সকল বিস্তৃত মন্তব্যের বহুল উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই সরস। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের নাড়ীনক্ষত্র ব্রজেন্দ্রবাবু জানেন—তাই এই কার্য যেরূপ উৎসাহ ও যোগ্যতার সহিত তিনি করিয়াছেন আর কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। তবে মনে রাখিতে হইবে তিনি নাট্যশালার বা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখিতেছেন, নাট্য-সাহিত্যের নহে; তাই তাঁহার পুস্তকে নাট্যোল্লিখিত বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যাশা করা সঙ্গত হইবে না।

ব্রজেন্দ্রবাবুর এই পুস্তকটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সখের নাট্যশালার কথা, দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ বঙ্গালয়ের। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় সখের নাট্যশালায়। ভারতবর্ষীয় একাধিক প্রতিষ্ঠানের মতন প্রথম বাংলা অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ একজন ইওরোপীয়ের উৎসাহে স্থাপিত হয়। তাঁহার নাম হেরাসিম লেবেডেফ। তিনি ছিলেন রুশদেশবাসী। নানাদেশ ঘুরিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ২৫নং

ডুমতলাতে—অর্থাৎ বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটে—এক নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১৭৯৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর তারিখে এই রঙ্গালয়ে The Disguise-নামক একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রথম অভিনীত হয়। অনুবাদক ছিলেন স্বয়ং লেবেডেফ। কিন্তু লেবেডেফ বিলাত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালাও উঠিয়া গেল। ইহার ছত্রিশ বৎসর পরে ১৮৩১ সনের ২৮-এ ডিসেম্বরে সেকসপীয়রের 'জুলিয়াস সিজর' ও ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' এই দু'খানি ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হয় 'হিন্দু থিয়েটার' নামক বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালায়। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল এই 'হিন্দু থিয়েটার হইতে। লেবেডেফ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় এই ইতিহাসের প্রথম হইলেও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র।

কিন্তু এই সখের থিয়েটারের যুগ চলিল আরও ছত্রিশ বৎসর—১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। ঐ তারিখে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাধারণ বঙ্গীয় রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। এই ভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ে বাঙালীর রচিত নাটক-অভিনয়ের যে-পালা সুরু হইল আজও তাহা চলিতেছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-বাবুর বিবরণ ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। ঐ বৎসর ন্যাশনাল থিয়েটারের উত্তরাধিকারী গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে একটি প্রহসন অভিনীত হয়। তাহার ফলে বঙ্গীয় নাট্যশালাকে দমন করিবার জন্য সরকার Dramatic Performances Control Bill নামক একটি আইনের খসড়া মার্চ মাসে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। বৎসরের শেষের দিকে ইহা আইনে পরিণত হয়।

এই স্মরণীয় ব্যাপারটির ইতিহাস এই: ভারত সম্রাট সপ্তম এডওআর্ড যুবরাজ-রূপে ভারতবর্ষে আসিলে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ও অন্যান্য মহিলারা ভারতীয় প্রথায় যুবরাজকে বরণ করেন। এই ঘটনা কলিকাতায় বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উক্ত প্রহসন তাহারই ফল। পুলিশ ইহার অভিনয় বন্ধ করিলে 'হনুমান চরিত্র' নামে উহা আবার রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত

হয়। ইহার অভিনয়ও বন্ধ হইবার পর “The Police of Pig and Sheep” নামে প্রহসন অভিনীত হয়। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ২৯-এ ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্ডিন্যান্‌স্ জারী করিয়া এই জাতীয় অভিনয় তখনকার মতন বন্ধ করেন। অর্ডিন্যান্‌স্ সেকালেও হইত। কিন্তু এইখানেই গোল মিটিল না। ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নামক অশ্লীল নাটক অভিনয়ের অজুহাতে ৪ঠা মার্চ তারিখে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্মকর্তা ও অভিনেতা প্রভৃতি আট জন পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু ছিলেন ইহাদের একজন। বিচার চলিল হাইকোর্ট পর্যন্ত; বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও তারকনাথ পালিত আসামীপক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু নাট্যশালার সহিত সরকারের এই সংঘর্ষের পরিণতি হইল রঙ্গালয় নিয়ামক উক্ত আইনে। এই বিষয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যান্য দেশেরই অনুরূপ। যাহাই হউক, এই ইতিহাসের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইল আইন আদালতের ব্যাপারে।

ব্রজেন্দ্রবাবু আশা করি ইহার পরবর্তী পর্বের ইতিহাসে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। রঙ্গালয়ে যাঁহাদের কোনও আগ্রহ নাই তাঁহারাও ব্রজেন্দ্রবাবুর বিবরণী পড়িয়া প্রচুর জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন, কেননা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-লেখক নিজে যথাসম্ভব কম মন্তব্য করিলেও তাঁহার উদ্ধৃত ও সুকৌশলে সমাবেশিত মন্তব্য ও বিবরণ হইতে এই অঙ্গাঙ্গী যোগ সহজেই অনুভূত হয়। এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

পুস্তকের শেষে দুইটি মূল্যবান পরিশিষ্ট আছে—একটি সমসাময়িক সংবাদ-পত্র হইতে সঙ্কলিত সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিকা; আর একটি, ১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬—এই সময়ের মধ্যে যাঁহারা নাটকপ্রহসনাদি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সমুদয় নাট্য গ্রন্থের নাম ও প্রকাশকালের তালিকা। যতদূর সম্ভব নাট্যকারদের জন্মমৃত্যুর সন তারিখও এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

হিরণকুমার সান্যাল

নোঙরহীন নৌকা—শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'নোঙরহীন নৌকা' বলা হয়েছে ভূমিহীন কৃষকদের। সমাজের এই নির্বিত্ত ও নিরাশ্রয় শ্রেণীর কথা এর আগে এমন নিখুঁতভাবে কেউ ফুটিয়ে তুলেছেন কিনা জানি না। কিন্তু উপন্যাসখানা কেবল সেইজন্যই মূল্যবান নয়। লেখক যাদের কথা লিখেছেন তাদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ তাদের তিনি দূর থেকে দেখেন নি। তার প্রধান কারণ, কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তিনি যুক্ত। এই প্রসঙ্গে এখানে একথাও বলা দরকার, তাঁর এই উপন্যাসের মধ্যে নরম বা গরম বক্তৃতা কোথাও নেই। অবশ্য তাঁর একটা বিশিষ্ট মতবাদ আছে; এবং তিনি যখন কর্ম্মী তখন তো তাঁর একটা স্পষ্ট মত থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্প লেখার কৌশল তাঁর আয়ত্ত ব'লে কোথাও তা উগ্রভাবে প্রকাশ পায় নি, প্রায় উহ্যই থেকে গেছে।

যুবক নিরাপদ হ'লো উপন্যাসের নায়ক। নিরক্ষর ক্ষেত-মজুর সে; সংগ্রামের ভিতর থেকেই জীবনের পাঠ সঞ্চয় করে। গ্রামের বিধবা যুবতী সুশীলা তাকে টানে; সেও বুঝি তাকে চায়। কিন্তু সুশীলাকে গ্রহণ করতে তার বাধে। ওদিকে আবার নিরাপদর একমাত্র বোন রাধা পতিতা-বৃত্তি অবলম্বন করেছে। তার জন্যও মাঝে মাঝে নিরাপদর মনটা হুহু ক'রে ওঠে। নিরাপদ থাকে বনমালীর বাড়িতে। বনমালীর বৌ কাঁদন, সুশীলা ও রাধা ছোট বেলায় এক গাঁয়ে মানুষ হয়েছে। তাদের সখিত্বের সম্পর্কটা ভারি মধুর। দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে যদিও বা কোনো রকমে তাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল, মাঝখান থেকে বাদ সাধল জমিদারের অক্টোপাশ-বৃত্তি। নিরাপদ সেই সময় কিছুদিনের জন্য গ্রামে ছিল না; স্বগ্রামে বেড়াতে যায়। ফিরে এসে দেখে ক্ষেত-মজুরের কাজ জোটানোও ভার। মনটা এই কারণে তার পীড়িত ছিল; তার উপর যখন সে স্বচক্ষে দেখল, তার বোন রাধার বুকের রক্ত কোন্ এক মিল শুষে নিচ্ছে, এবং তার আকৃতির রুক্ষতার ছোঁয়াচ প্রকৃতিতে গিয়েও লেগেছে তখন ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে নিজের অসহায়তাকেই ভালো ক'রে উপলব্ধি করল। মানুষ যে এই সংসারে

কতখানি সইতে পারে তা সম্ভবত সে নিজেও জানে না। নিরাপদর মধ্যেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাই সুশীলার আকস্মিক অন্তর্ধানও সে মুখ বুজে সহ্য করে। বাস্তব সংগ্রাম ও মানসিক দ্বন্দ্ব—এই ঘাত-প্রতিঘাতে নিরাপদর অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটে, সাধারণ মানুষ অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। তাই যখন সে জানতে পারল কার চক্রান্তে প'ড়ে সুশীলা পতিতা হয়েছে, এবং নিরাপদ চাইলে সে ফিরতেও প্রস্তুত তখন নিরাপদর হৃদয়াবেগের বন্যায় সংস্কারের জগদ্দল পাথর ভেসে গেল। গল্পটার শেষ কিন্তু এইখানেই নয়। গ্রামের অন্যান্য চাষার মতো বনমালীকেও অবশেষে ভিটে-হীন হ'তে হ'লো। বনমালী ও কাঁদনের সঙ্গে নিরাপদও মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু হারাল।

এই কাহিনীকে সরস ক'রে তোলার জন্য লেখক বহু ছোটখাটো ঘটনা সন্নিবিষ্ট করেছেন। তার ফলে গল্পের গতি আশ্চর্য্য রকম বেড়েছে এবং লেখকের বক্তব্যও অপরিস্ফুট থাকে নি। উপন্যাসের অনেক চরিত্রই চমৎকার ফুটেছে, অবশ্য জমিদার ও তার মেয়ে বাদে। লেখকের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'লেও তা মার্জ্জনাসাপেক্ষ। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে লেখক অবহিত না হ'লে তাঁকে আমরা মার্জ্জনা করতে পারব না। যে-বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন তাতে ও-ভাষা খাপ খায় না। এ-ত্রুটি দেখাবার উদ্দেশ্য, তাঁর এই প্রথম উপন্যাস প'ড়ে খুশি হয়েছি।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পান্থপাদপ : শ্রীজ্যোতি সেন (শ্রীগুরু লাইব্রেরী—মূল্য পাঁচ সিকা)।

মাত্র তিনটি গল্প দিয়ে গল্পের বই বার করায় দুঃসাহসিকতার পরিচয় আছে, বিশেষ ক'রে লেখক যখন স্বনামধন্য নন। এ-রকম দুঃসাহসিক হবার স্পর্দ্ধা অবিশ্যি লেখক করতে পারেন, কেননা তাঁর 'রিক্তরাহী' গল্পটি প্রবাসীতে প'ড়ে এককালে পাঠক হিসাবে আমরা এই লেখককে সাধারণ গল্প-লিখিয়ের উপরেই স্থান দিয়েছিলাম। মনে হয় পাঠকের মনের সন্ধান পেয়েছেন বলেই বইটিতে গল্প-সংখ্যাকে তিনি প্রধান ক'রে তোলেন নি।

যদিও আজকের দিনে পাঠকরা 'পান্থপাদপ' বইটির গল্পগুলো প'ড়ে খুব বেশী খুসী হয়ে উঠ্‌তে পারবেন না, তবু যে কালে এগুলো লেখা হয়েছিল সে-কালের মানদণ্ডে এরা সম্মানই পেয়ে এসেছে। তার প্রথম কারণ লেখকের প্রাঞ্জল, নিরাভরণ বর্ণনাভঙ্গী ; আধুনিক যুগেও অবিশ্যি এ বস্তুটি লেখকদের সদ্‌গুণই নির্দ্দেশ করে কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি সে-যুগে আদৃত হয়ে থাকলেও এ-যুগে অচল। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে ভাবপ্রবণতা। প্রচুর অর্থ ও শিল্পজ্ঞান নিয়ে ভবঘুরে একটি নায়ক বা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নায়ক সেদিনে পাঠকের চিত্তকে বড় বেশি চঞ্চল ক'রে তুল্‌ত। আজকাল এই মণীন্দ্রলালবসু-বৃত্তি নিরর্থক, এমনকি, হাস্যকরই মনে হয়।

'পান্থপাদপে'র তিনটি গল্পই ভাব-প্রধান, মানুষের মনের নারী-ক্ষুধার আবেগময় চিত্র। এ-চিত্রের ঔচিত্য বা স্বাভাবিকত্বের রং কিরূপ এবং কতটুকু হওয়া দরকার সে আলোচনা একটি প্রবন্ধের বিশদকলেবরসাপেক্ষ। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে-সব পাঠক খুব বেশি আধুনিক সংস্কৃতির ধার ধারেন না তাঁরা 'রিক্তরাহী'র দেবদাস-বৃত্তি বা 'ছাতা' গল্পটির প্রভাতমুখুজ্জে-সুলভ প্যাঁচ অনায়াসেই উপভোগ করতে পারবেন। কিন্তু 'পান্থপাদপে'র কথা স্বতন্ত্র। তার আবহাওয়া এ যুগেও পচে যায় নি। এ-গল্পটিতে লেখক এমন আবহাওয়া তৈরী করতে পেরেছেন যাতে ব্যক্তিগত আবেগের স্বৈরাচার নেই, সমষ্টির মনের রেখাচিত্রের আভাস যাতে উপস্থিত। কাজেই এর সৌন্দর্য্য এখন পর্য্যন্ত অম্লান। নায়ক শুভঙ্কর ঐতিহ্য-গত ভবঘুরে হ'লেও আমাদের মনকে বিষিয়ে তোলে না, কেননা তার মনে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের সামান্যতম ছায়া পড়েছে দেখা যায়, তাছাড়া নায়িকা সিসিলও রক্তে-মাংসে স্বাভাবিক মানুষ।

বর্ণাশুদ্ধি এবং দৃষ্টিকটু প্রচ্ছদপট বইটিকে যথোচিত সম্ভ্রান্ত ক'রে তুল্‌তে পারেনি—প্রকাশকের এ তাচ্ছিল্য প্রশংসনীয় নয়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

'কবিতা'

বাংলা দেশে কবির অভাব নেই, কবিতারও না। কিন্তু শুধু কবিতাবাহী কাগজ বাংলাদেশেও নূতন—অন্তত ছয় বৎসর আগে যখন প্রথম 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন নূতন ছিল। কিন্তু 'কবিতা'-পত্রিকা কবিতাপ্রধান হ'লেও কবিতাসর্বস্ব নয়, কেন না, বিশুদ্ধ কবিতা, অবিশুদ্ধ বা গদ্য কবিতা ও বিশুদ্ধ গদ্য এই মিশ্র উপাদানে পত্রিকাটির সাধারণ সংখ্যাগুলি গঠিত হয়। কিন্তু গত কার্তিক মাসে পত্রিকাটির যে অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা বিশুদ্ধ গদ্যে রচিত সমালোচনার সমষ্টি। এই রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য দুটি: শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সমালোচনা ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সমর সেন রচিত 'গ্রহণ' পুস্তকের সমালোচনা। 'গ্রহণ'-এর কবিতাকে অমিয়বাবু ঝর্না ছন্দের কবিতা আখ্যা দিয়েছেন। এই আখ্যা আধুনিক গদ্য কবিতার মধ্যে একমাত্র সমর সেনের কবিতা সম্বন্ধেই খাটে, কেন না একমাত্র তাঁরই গদ্য কবিতায় ছন্দের দোল পাওয়া যায়। সমর বাবুর সৌভাগ্য যে অমিয় বাবুর পাকা হাতে তাঁর বই সমালোচনার ভার পড়েছিল। কেন না তাঁর কবিতার উৎকর্ষ বাছাই বাছাই উদ্ধৃতির সাহায্যে যে-ভাবে অমিয়বাবু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, তা' খুব কম সমালোচকই পারতেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত একাধারে আলঙ্কারিক ও আইনবিৎ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও রসোপভোগ—এই দু'য়েতেই তিনি অভ্যস্ত। কিন্তু 'কবিতা'য় আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত প'ড়ে এই কথাই মনে পড়ে যে তিনি উকিল, বিচারক নন। তবে তাঁর সমকক্ষ উকিল খুঁজে পাওয়া ভার। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হলেও, এ রকম দক্ষ সমালোচনা পড়বার সুযোগ বাঙালী পাঠকের কদাচিৎ ঘটে।

অতুলবাবু আধুনিক কবিতার মধ্যে যেগুলি কিছুমাত্র আধুনিকতার দাবী

রাখে সেইগুলির প্রতি একেবারেই বিমুখ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,বিষ্ণু দে ও সমর সেন প্রভৃতি কবি সম্বন্ধে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন তা' তাঁদের পক্ষে হয়তো খুব প্রীতিকর হবে না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। এই সব আধুনিক কবিদের কাব্যরসাস্বাদনে আরো অনেকেই অক্ষম—এবং তাঁদের অক্ষমতার যে-যে কারণ তাঁরা প্রচার ক'রে থাকেন, অতুলবাবু সেইগুলিরই পুনরুল্লেখ করেছেন, অবশ্য তাঁর সুনিপুণ ভাষায়।

আধুনিক কবিতার অর্থবোধে অক্ষম হ'য়ে আমার মতন যাঁরা নিজেদের মেধা সম্বন্ধে সন্দেহ করতেন তাঁরা অতুলবাবুর মত নিঃসন্দেহ মেধাবী লোকেরও এই অক্ষমতার কথা জেনে আশ্বস্ত হবেন। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতাপ্রসঙ্গে গুপ্ত ম'শায় বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করে তিনি যে অর্থ করবার চেষ্টা করেছেন তা পড়ে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। বিলেতের বিখ্যাত ব্যাঙ্ক-পরিচালক ওঅল্‌টার লীফ 'ব্যাঙ্কিং' নামক বইতে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড-এর যে সাপ্তাহিক হিসেব নিকেশ প্রকাশিত হয় তা দেখে ঐ ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করেন এমন লোক কেউ আছেন কি না জানিনা—অন্তত ওঅল্‌টার লীফ-এর মতন অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কারেরও তা অসাধ্য ছিল। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে ওঅল্‌টার লীফ একবার বলেন, "আপনাদের হিসেব নিকেশের একটি দফা ছাড়া আর সবই আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য।" গভর্নর উত্তরে একটু হেসে শুধু জবাব দেন, 'মিষ্টার লীফ, ঐ একটি দফাও আপনি বোঝেন কিনা সন্দেহ।" যাই হোক, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গুপ্ত মশায় যে অর্থ করেছেন তা যদি কবির অভিপ্রেত হয়, তাহলে সুখী হব।

বুদ্ধদেব বসুর রোম্যান্টিক কবিতা যদি আধুনিকতাবিমুখ অতুল বাবুর ভালো লাগে তাতে আক্ষেপ করবার কিছু নাই, যদিও চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ঠিক বোধগম্য নয়। আরো বোধগম্য নয়, তিনি অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে একেবারে নীরব কেন। কিন্তু রোম্যান্টিক কাব্যই যে আধুনিক বাঙালী কবিদের চরম কীর্তি ধুরন্ধর সমালোচকেরা যদি এই মত প্রচার করেন তা নিশ্চয়ই আক্ষেপের বিষয়। কেননা, 'আধুনিক' বাংলা কবিতা ব'লে যা আদৃত,

বেশির ভাগ স্থলেই তা যে কাব্য হ'য়ে ওঠেনি, তা আধুনিকতার প্রভাবের জন্য নয়, বরঞ্চ প্রকৃত আধুনিকতার অভাবেই। তবু রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-কে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে বলেই তারা ভবিষ্যৎ কাব্যের পথনির্দেশক। এই নির্দেশ সম্বন্ধে অন্ধ ব'লেই অতুল গুপ্ত মশায় লিখতে পেরেছেন :

> বেশ কল্পনা করা যায় যদি এমন দিন আসে যখন মানুষের সমস্ত কাজ ও চিন্তা রাষ্ট্রের নিখুঁত ও নিফাঁক নিয়ন্ত্রণে বীজগণিতের 'ফরমুলা' হয়ে উঠবে তখন মন এমনিধারা অর্থহীন অসংলগ্নের মধ্যেই মুক্তি ও কাব্যের আনন্দ পাবে। সে যুগের জন্য এখন থেকেই কাব্য-রচনায় হয় ত লাভ নেই। তখন হয় ত এর চেয়ে অন্য ভঙ্গীর অসঙ্গতির আদর হবে।

অতুলবাবু আশ্বস্ত থাকুন। বর্ত্তমান বাংলার 'আধুনিক' কবিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চেতনা এখনো এতটা জাগ্রত হয়নি যে তাঁরা 'সে যুগের' জন্য কবিতা রচনা করবেন। এখনকার কবিতা শুধু এখনকারই—বিশেষ ক'রে এই ভাঙনের যুগের—কবিতা। কিন্তু এই যুগেও এমন কবিতা—সংখ্যায় খুব সামান্য হলেও—লেখা হয়েছে যা ভবিষ্যকালে কাব্যের মর্যাদা পাবে, যদিও অতুলবাবুর দৃষ্টিতে এই রকম কবিতা একটিও ধরা পড়েনি। আধুনিক কবিতার অর্থহীন অসংলগ্নতা পূর্ববর্তী যুগের রোম্যান্টিক কাব্যেরই প্রতিক্রিয়া ও বর্তমান যুগের অনিশ্চয়তার প্রতিভাস। সুগঠিত রাষ্ট্রের নিখুঁৎ ও নিফাঁক নিয়ন্ত্রণ যখন ভবিষ্যতে সত্য হয়ে উঠবে তখন মানুষের মন অর্থহীন অসঙ্গতির মধ্যে মুক্তির অন্বেষণ করবেনা, কেননা তখনকার কবিরা এমন কবিতা লিখবেন যা হবে অত্যন্ত সঙ্গত ও সত্যই আধুনিক।

হ

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ ১৩৪৭

পারিজয়

স্বারাজ্য-সিদ্ধি

আমরা দেখিয়াছি, জীবন্মুক্তের শরীর সংস্কার বশে কিছুকাল বিধৃত থাকে—চক্রভ্রমণবৎ ধৃত-শরীরঃ। ঐ শরীরই তাঁহার অন্তিম দেহ। প্রারব্ধক্ষয়ে ঐ শরীরের পতন হইলে কি হয়? এ বিষয়ে আমরা অচিরেই আলোচনা করিব কিন্তু তৎপূর্বে জীবন্মুক্তি সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য আছে।

আমরা দেখিয়াছি, যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী—তিনি ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-সিদ্ধ—গীতা যাহাকে 'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগত'; বলিয়াছেন। ইহাই Attainment of Divine similitude—ইহাকেই খৃষ্টানেরা 'Deification' বলেন—'when the human is made Divine'—যাহা জীব সম্পর্কে যিশু-খৃষ্টের লক্ষ্য ছিল—'Be ye perfect as your Father that is in Heaven is perfect'—অর্থাৎ পরব্যোমে পরম পিতা যেমন সম্পূর্ণ, সেইরূপ সম্পূর্ণ হও—পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্। *

---

* চৈতন্য চরিতামৃতকারও বলিয়াছেন—

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে।

বৃহদারণ্যক উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
'ব্রহ্ম হইলে তবেই ব্রহ্মসাযুজ্য হয়।'

ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ কি? জীব কিরূপে ব্রহ্ম হয়?—How is the human made Divine? জীব কি প্রকারে ব্রহ্মের 'স-রূপ' হয়?

আমরা জানি ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম—

তিনি একাধারে 'অস্তি ভাতি প্রিয়ঃ'—প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন—'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love', যুগপৎ 'Life, Light and Love'—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি।

সন্ধিনী হ্লাদিনী সংবিৎ ত্বয়েকে সর্বসংস্থিতৌ—বিষ্ণুপুরাণ

জীব যখন ব্রহ্মের অংশ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

জীব যখন ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ—

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি সহস্রশঃ—বৃহ, ২।১।২০

জীব যখন ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি (His own image)—তখন ব্রহ্মখণ্ড জীবও সচ্চিদানন্দ*—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

---

* সেই জন্য থিয়সফিতে জীবকে 'Triune Monad' বলা হয়। Man is made in the image of God. * * The Divine spark of the spirit in man is seen to be *triple* in its appearance.—C. W. Leadbeater's Man, visible and invisible.

This Divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the *triple* nature of the Logos Himself.—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom.

—তখন জীবের অভ্যন্তরেও ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম—বিস্ফূর্ত না হইলেও বীজভাবে বিদ্যমান। সেই জন্য বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র (Monad)। স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি অব্যক্ত (latent) থাকে, তেমনি জীবে ঐ শক্তিত্রয় সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী অব্যক্ত থাকে। সেই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম (শঙ্কর)

—ভিন্ন নহে, অধিক—যেমন বৃক্ষ বীজ হইতে অধিক। অর্থাৎ, ব্রহ্মে যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম—যে Life, Light and Love—যে Power, Wisdom and Bliss—পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত (সম্পূর্ণ=patent)—জীবে তাহা বীজভাবে স্থিত।

একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, জীব একাধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা—তাহার অভ্যন্তর হইতে ত্রিবিধ শক্তি—কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান-শক্তি—যুগপৎ উৎসারিত হইতেছে। কর্মশক্তি=Power of Action, যাহার প্রকাশ চেষ্টনায় (Conation-এ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সন্ধিনীশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রতাপ বা Power) ; ইচ্ছাশক্তি=Power of Desire, যাহার প্রকাশ কামনায় (Emotion-এ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে হ্লাদিনীশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রেম বা Love) ; এবং জ্ঞানশক্তি=Power of Thought, যাহার প্রকাশ ভাবনায় (Cognition-এ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সংবিৎশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রজ্ঞা বা Wisdom)।

আর একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বীর, ধীর ও পীর—the Hero type, the Sage type and the Saint type। যাঁহাদের সন্ধিনীশক্তি বেশ স্ফূর্ত্ত তাঁহারা বীর; যাঁহাদের সম্বিৎশক্তি বেশ স্ফূর্ত্ত তাঁহারা ধীর এবং যাঁহাদের হ্লাদিনীশক্তি বেশ স্ফূর্ত্ত তাঁহারা পীর। বীরের মধ্যে যে সন্ধিনীশক্তি অর্দ্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত, ধীরের মধ্যে যে সম্বিৎশক্তি অর্দ্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত, পীরের মধ্যে যে হ্লাদিনীশক্তি অর্দ্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত—সেই সেই সম্ভাবনাকে সুব্যক্ত করিবার জন্য, সেই সেই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্য, সেই সেই অঙ্কুরকে বৃক্ষে বিকশিত করিবার জন্য জীব-বীজকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়—

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

বাইবেলের ভাষায়, He is sown in weakness in order to be raised in power.

এই যে ক্রমাভিব্যক্তি—অব্যক্তের ব্যক্তীভবন—ইহারই নাম Evolution.

আমরা যাহাকে সাধনা বলি, তাহার লক্ষ্য জীবের ঐ অব্যক্ত বা অর্দ্ধব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাবকে সুব্যক্ত করা—ঐ অর্দ্ধবিকশিত প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমকে বিস্ফূর্জিত করা। যে জীবে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব মহোজ্জ্বল—তিনিই ব্রহ্মের স্বারূপ্য-সিদ্ধ—তিনিই জীবন্মুক্ত।

জীব কিরূপে ব্রহ্ম হইবে? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর—প্রণালীশুদ্ধ সাধন দ্বারা। এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি :—

'সাধনাদ্বারা জীবের মধ্যে অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎভাব ও আনন্দ-ভাব—অব্যাকৃত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি সুব্যক্ত করিতে পারিলে—তবেই জীব ব্রহ্ম হইবে—তবেই জীব বুঝিতে পারিবে 'তত্ত্বমসি'—তবেই জীব বলিতে পারিবে 'সোঽহং' 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং'। এইরূপ সাযুজ্যসিদ্ধির জন্য কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি একশঃ কোন মার্গই যথেষ্ট নয়। পরমাত্মার যে চিদ্‌ভাব—জীবের বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—জ্ঞানযোগ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে; পরমাত্মার যে আনন্দভাব—জীবের আনন্দময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—ভক্তিযোগ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে; এবং পরমাত্মার যে সৎভাব—জীবের হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—কর্মযোগের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ, জীবকে একাধারে বীর, পীর ও ধীর (Hero, Saint and Sage) হইতে হইবে। এইরূপে যখন জীবের সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব পূর্ণ বিকশিত হইবে, যখন তাহার মধ্যে অর্দ্ধব্যক্ত প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত হইবে, তখন জীব আর জীব থাকিবে না—শিব হইবে। তখন সে যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবে—যোঽসাবসৌ—পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি—ক্রাইষ্টের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবে—'I and my Father are one'।

এইরূপ যিনি সাধনের চরম ফল লাভ করেন, যিনি যিশু খৃষ্টের সহিত বলিতে পারেন 'Consummation est—it is finished'—যিনি বুদ্ধদেবের বাণীর

প্রতিধ্বনি করিতে পারেন—'খীণা জাতি বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং কতং করণীয়ং নাপরং ইত্থত্তা যাতি' 'Lived out is the Holy Life'—এক কথায় যাঁহার মধ্যে সৎ-ভাব, চিৎভাব ও আনন্দ-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে—তিনি ভিন্ন আর কে এমন কথা বলিতে পারে? ইহাই ব্রহ্মভূত হওয়া—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

এই যে ব্রহ্মভাব বা ব্রাহ্মী স্থিতি—অন্যভাবে দেখিলে ঐ মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য না বলিয়া জীবের স্ব-রূপে অবস্থান বলা যাইতে পারে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১

'মোক্ষে ব্রহ্ম সহিত মিলনে জীবের স্ব-রূপ প্রতিষ্ঠা হয়—তাঁহার যে স্ব-রূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয়।'

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্ব-রূপস্য। (মোক্ষে) যং দশা-বিশেষং আপদ্যতে, স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ—রামানুজ-ভাষ্য।

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ স্মরণীয়—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভি-নিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

"এই 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।"

এখানে মুক্তপুরুষই শ্রুতির লক্ষ্য—মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২

যাজ্ঞবল্ক্য এইভাবেই জীবকে 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়াছেন এবং বৃহ, ৪।৩।৯ মন্ত্রে জীবের 'স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা'র উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা জীবের এই 'স্ব-রূপে অবস্থান'কে লক্ষ্য করিয়া নির্বাণ-দশার বর্ণনায় বলিয়াছেন—

He reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence (Grimm's Doctrine of the Buddha, p 539).

This, his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests. (Ibid, p 196)

এই 'Inscrutable Essence'ই উপনিষদের লোকোত্তর আত্মা (Transcendental Self)—যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে যাহাকে 'অসঙ্গ পুরুষ', জীবের 'অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্‌মা অভয় রূপ' বলিয়াছেন—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্‌মা অভয়ং রূপম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬ ও ৪।৩।২২

যেহেতু ঐ Essence লোকোত্তর (transcendental), সেইজন্য ঐ 'স্ব-রূপ'কে উদ্দেশ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

—যিনি বিষয়ী (বিষয় নহেন), যিনি দ্রষ্টা (দৃশ্য নহেন), যিনি জ্ঞাতা (জ্ঞেয় নহেন)—তাঁহাকে, সেই pure subject-কে জানিবে কি প্রকারে ?

সেই আত্মা যে, 'নেতি নেতি'—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—বৃহ, ৪।২।৪

'ঐ আত্মা নেতি নেতি—নির্দেশের অতীত। তিনি অগ্রাহ্য—কখনও গৃহীত (বিদিত) হন না।'

বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

The Atma, our kernel, cannot be grasped at all, by means of cognition * * * The True one is therefore not to be discovered as an object of cognition * * It is transcendent (Grimm's Doctrine of the Buddha, pp 499 & 515)

আমরা জানিয়াছি যে, চতুর্বেদ 'মহাবাক্যে' সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করেন—সোঽহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, এই যে অহং ও ত্বং, এই যে আত্মা—ইনি জীবাত্মা নহেন—সেণ্ট্ পল্ যাহাকে Soul বলিয়াছেন সেই Soul নহেন, তিনি প্রত্যগাত্মা (Monad), সেণ্ট্ পলের 'Spirit'।

পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যখন অমৃত, তখন সেই প্রত্যগাত্মাও নিশ্চয়ই অমৃত। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী'-ব্রাহ্মণে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ (বৃহ, ৩।৭।৩-২৩)। এই 'ধ্রু' (Formula) তাঁহার মুখে একবার নয়, দুইবার নয়, ঐ স্থলে একুশবার শুনিতে পাই।

আমরা আরও জানিয়াছি যে, ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।১

বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭

'অমৃত ব্রহ্মকে জানিলে অমর হওয়া যায়'।

জীবের স্ব-রূপে অবস্থানেরও ঠিক ঐ ফল—কারণ, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ এবং ঐ অবস্থায় জীব 'realises his true nature'।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি, স ইদং সর্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চন অভূত্যৈ ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০

'অতএব অদ্য ও এখানে যিনি জানিতে পারেন 'আমিই ব্রহ্ম', তিনি এ সমস্তই হন। দেবতাদের সাধ্য নাই—তাঁহার এই ভাব বারণ করিবে। কারণ তিনি এ সকলেরই আত্মা হন।'

ইহাই জীবের স্বরূপে অবস্থান। সাংখ্যেরা ইহাকে 'কৈবল্য' বলেন।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যম্ আপ্নোতি ॥

—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

'জীবন্মুক্তের দেহপাত হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন।'

অধিকন্তু প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের 'লিঙ্গ'শরীররূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও বিলয় হয়—লিঙ্গস্য আ-বিনিবৃত্তেঃ। এইরূপে পুরুষ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ স্বচ্ছ 'কেবল' অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থান করেন—'remains in a passive state of eternal isolation.'

কৈবল্যং স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি

—যোগসূত্র, ৩।৩৪

তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি

—ব্যাসভাষ্য—

তদভিব্যক্তৌ কেবলঃ শুদ্ধো মুক্তঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠো পুরুষঃ—গৌড়পাদ

ইহাই মুক্তি। তখন পুরুষ 'স্বরূপ-প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে' (১।৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য)। এই ভাবে ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্ব-রূপেণ ব্যবস্থিতিঃ

আর এক ভাবে দেখিলে মোক্ষকে স্ব-স্বরূপে অবস্থান না বলিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্তন বলা যাইতে পারে। সে অনেক কথা—আমরা আগামী বারে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাফো

"শোনো, তাকাও আমার দিকে। ভারি চমৎকার চোখ দুটি তো!" মেয়েটি বল্লে এগিয়ে এসে। "তোমার নাম কি ?"

"জাঁ।"

"শুধু জাঁ ?"

"জাঁ গোস্যাঁ।"

"ও তুমি দক্ষিণের লোক, তাই বটে! কত বয়েস ?"

"একুশ।"

"আর্টিষ্ট ?"

"না।"

"তাই নাকি ? তাহ'লে তো ভালোই আরো!"

পোষাকী বল্-নাচের নৃত্যপরায়ণ যুগলদের ভিড়ে, চমৎকার উচ্চহাস্য এবং গীতবাদ্যের মূর্চ্ছনার মধ্যে, এই ধরনের টুকরো-টাকরা আলাপ চলছিল দু'জনের। সদ্য-পরিচিতদের একজন হচ্ছে উপর্য্যুক্ত তরুণ, অপরটি মহিলা—মিসর দেশীয় পোষাকে সজ্জিতা। শিল্পী দ'শেলেতের ষ্টুডিয়োর নেপথ্য-স্থিত তালীকুঞ্জে, ফার্ণগাছের ছায়ার অবকাশে কেবল ওরা দু'জন। জুন মাসের রাত।

তরুণ যুবক সরল ভাবেই এই সব জরুরী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল—যে সরলতা যৌবন-তারুণ্যের সহজাত। অনেক্ষণ থেকেই, বাধ্য হয়ে, তাকে মৌন হয়েই থাকতে হয়েছে। চারিদিকের কুশলী ও নামজাদা, শিল্পী ও ভাস্করদের মধ্যে নিজেকে সে নিতান্ত একাকী মনে করেছে এতক্ষণ।

যে বন্ধুটির সঙ্গে এখানে প্রবেশ করেছে তা'কে সে গত দু'ঘণ্টা ধরে খুঁজছে—কিন্তু বৃথাই! তার সুন্দর মুখ ঘেমে উঠেছে, একমাথা কোঁকড়া চুল তার সুশ্রী মুখটির চারিদিক এসে ছড়িয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে।

হাঁপ-ছাড়বার জন্যই সে এই মাত্র এই তালীকুঞ্জে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সময়েই এই মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা।

নাচঘরের নামজাদা শিল্পী ও ভাস্করদের, গায়িকা ও অভিনেত্রীদের সম্মানিত

সমারোহের মধ্যে তার নিজেকে মনে হচ্ছিল নিতান্তই যৎসামান্য! অবশ্য অনেকের দৃষ্টিই সে আকর্ষণ করেছিল, তার সুন্দর চেহারার জন্যে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। এতক্ষণে অনেকবারই তার কানে এসেছে কোন-না-কোন মেয়ের অস্ফুট ইঙ্গিত: "বাঃ বেশত!" "ভারী চমৎকার!" "কী চমৎকার চেহারা।"

কিন্তু এ সবের অর্থ সে কি বোঝে? বোঝে কি ঠিক মতো?

নাচঘরের আবহাওয়া একেবারেই ভালো লাগছিল না তার। কিন্তু যেমনি না সে এসেছে এই ফার্ণগাছের ছায়ায়, এই মেয়েটিও এসে বসেছে তার পাশে।

তরুণী? সুন্দরী? কী ক'রে সে বলবে সে-কথা? সবুজ সিল্কের পোষাকের পরিবেশে, সুঠাম সুকুমার দু'টি নরম শুভ্র হাত—বড়ো বড়ো ধূসর চোখ,—কেমন যেন ভালোই লাগছিল তার!

কে এই মেয়েটি? কোন অভিনেত্রী? নিঃসন্দেহ! অভিনেত্রীদের অনেকেই তো দ'শেলেতের বাড়ি এসে থাকেন! তাঁদেরই কেউ হয়তো। কিন্তু এ-কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করে না সে—এই শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি আছে তার।

মেয়েটি কথা বলছিল অত্যন্ত তার কাছ ঘেঁসে। একটা কনুই রেখে নিজের জানুর উপরে—মুখ রেখে নিজের হাতের মুঠোয়। তার মুখের উপর ছায়া পড়েছে প্রচ্ছন্ন মাধুর্য্যের, হয়ত শান্তিরও।

—"দক্ষিণ দেশের লোক তুমি,--বটে? এমন চমৎকার তোমার চুল! আশ্চর্য্য তো!"

মেয়েটি জানতে চায়, কতদিন সে আছে প্যারিসে, তার বিদেশীয় দৌত্য-পরীক্ষার দেরি কতো—সে পরীক্ষা দেওয়া খুব শক্ত কিনা! প্যারিসের কত জনের সঙ্গেই বা তার আলাপ পরিচয় আছে!

শেষ প্রশ্নের জবাবে সে একজনের কেবল নামোল্লেখ করতে পারে: "লা গুর্‌নেরি—কবি লা গুর্‌নেরি—আমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।" লা গুর্‌নেরির নাম মেয়েটির জানা নিশ্চয়!

অকস্মাৎ মেয়েটির মুখ যেন অন্ধকার হয়ে আসে—ক্ষণেকের জন্যই; যেন ভেসে-যাওয়া মেঘে ঢাকা পড়ে শুভ্রাকাশের শুক্লাচাঁদ।

ছেলেটি কিন্তু মেয়েটির এ ভাবান্তর লক্ষ্য করে না ; তার তখন সেই বয়েস যে বয়সে চোখ করে চক্‌চক্—অথচ দেখে না কিছুই।

তার বন্ধু, যে তাঁকে এই বল্‌-নাচের আসরে নিয়ে এসেছে, সেই তাকে জানিয়েছিল যে, লা গুর্‌নেরিও এই বল্‌-নাচের আসরে উপস্থিত থাকবেন—এবং তাঁর সঙ্গে সে তার পরিচয় করিয়ে দেবে। এতক্ষণ ধরে ভিড়ের মধ্যে নিজের বন্ধুকেই সে খুঁজেছে—কিন্তু দেখতে পায় নি।

"ওঁর কবিতা এতো ভালো লাগে আমার!" ছেলেটি বলে।

মেয়েটি একটুখানি হাসে—যেন ঈষৎ করুণার হাসি। বলেঃ "দেখি, আমি আবিষ্কার করতে পারি নাকি তোমার কবিকে!"

তালীকুঞ্জের পত্রাচ্ছাদনের অন্তরাল সরিয়ে, বল্‌-নাচের আসরে নিজের সন্ধানী দৃষ্টিকে সে প্রেরণ করে। গোস্যাঁ নিজের কথার উপসংহার করে—"বাস্তবিক, ভারী চমৎকার মানুষ নাকি এই লা গুর্‌নেরি। আমার বন্ধু বলছিল।"

মেয়েটি বলে ওঠেঃ "ঐ যে! ঐখানে, ঐ যে তোমার কবি!"

"য়্যাঁ?" হতাশা যেন ব্যক্ত হয় তার কথার ব্যঞ্জনায়। তার কবি! মেদবহুল, ঘর্ম্মাক্ত, ঝক্‌মকে পোষাক-পরা কিম্ভুত কিমাকার ঐ লোকটি—সেই তার এতদিনের স্বপ্নের কবি? যার কবিতা, যখনই সে পড়েছে, তার মনে অদ্ভুত এক মোহসঞ্চার করেছে—তারই রচক এই অদ্ভুত মানুষটি! সে যেন যন্ত্রচালিতের মত আবৃত্তি করেঃ

> তোমার পাষাণময়ী ঐ দেহে আনিবারে প্রাণ,
> মোর শেষ রক্তবিন্দু, অয়ি সাফো করিলাম দান!

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়—"কি, কি বল্লে?"

লা গুর্‌নেরির কবিতার ছত্র; মেয়েটি জানে না দেখে ছেলেটি অবাক হয়ে যায়।

"কবিতার আমি ধার ধারি না!" সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় মেয়েটি। এই বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—তার কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। নাচিয়েদের দিকে দৃষ্টি রেখে, তার সম্মুখে দোদুল্যমান ভায়লেট ফুলের স্তবক সে দলিত

করতে থাকে তু'হাতে। তারপর কি ভেবে একটু ইতস্ততঃ করে সে বলে ঃ "শুভ সন্ধ্যা।" তারপরই অন্তর্হিত হয় মেয়েটি।

ছেলেটি দমে যায় অকস্মাৎ। সে ভাবে ঃ কী হলো মেয়েটির ? এমন কি আমি বলেছি ?

কিন্তু কিছুই সে ভেবে পায় না।

নাচের শেষে, চাকরেরা তখন খাবারের টেবিল সাজাতে সুরু করেছে। ছোটো ছোটো গোল টেবিল—কাফেতে যে ধরণের টেবিল সাজানো দেখা যায় সাধারণত। এক একটি টেবিল কেন্দ্র ক'রে চার পাঁচজন বসছে ঘিরে—গোস্ঁ্যার মনে হলো এই হচ্ছে এখান থেকে প্রস্থানের সময়।

যাবার উত্তোগ করছে এমন সময় তার সেই বন্ধু, (সেও ছাত্র নিজে) ঘর্ম্মাক্ত দেহে কোথা থেকে এসে হাজির—তুই চোখ তার যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে তার কপাল থেকে, তুই বগলে তুই মদের বোতল। সে বলে ঃ "যাচ্ছ কোথায় তুমি ? তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি কখন থেকে ? একটা টেবিল আমি দখল করেছি, কয়েকটা মেয়েও—তার ভেতর একজন জাপানী মেয়েও আছে। চলে এস চট্‌পট্‌ !"

এই বলে সে উধাও হয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে।

দূরবর্ত্তী বন্ধুর টেবিল থেকে সেই জাপানী মেয়েটি ডাকে তাকে ইসারায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তার কানের পাশে গম্ভীর মিষ্ট কণ্ঠ শুন্‌তে পায় সে ঃ "যেয়ো না। যেয়ো না ওদের কাছে।"

তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি—তার ক্ষণপূর্ব্ব-পরিচিত সেই তরুণী। সে তাকে টেনে নিয়ে চলে বাইরে। সেও তার অনুসরণ করে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না কোরেই। কেন ? যে তাকে ইঙ্গিত করেছিল তার চেয়ে এই মেয়েটির আকর্ষণ যে বেশি তা নয়, তবু একটা তুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির কাছে, যার রহস্য সে কিছুই জানে না, বোঝেও না, তার মাথা আপনা থেকেই কেমন নুয়ে আসে।

ভোর হয়ে এসেছে তখন—বাইরে এসে জানতে পারে তারা। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর প্রতীক্ষায়। "কোথায় যাবে—তোমার না আমার ওখানে ?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

গোসঁ্যার মনে হোলো তার নিজের ঠিকানা দেওয়াই ঠিক হবে—কোচ্-ম্যানকে সেই নির্দ্দেশই সে দিয়ে দেয়। তারপরে সুদীর্ঘ পথযাত্রা, সুন্দর স্নিগ্ধ প্রভাতে—মেয়েটির একখানি হাত তার হাতের মধ্যে—কি তুষার-শীতল সেই হাত!

রু জ্যাকবে দাঁড়ায় তাদের গাড়ি—এক ছাত্রাবাসের সম্মুখে। চারতলার উপরে থাকে গোসঁ্যা। কতটুকুই বা! সে জিজ্ঞাসা করে—"আমি তোমাকে নিয়ে যাব কোলে ক'রে?"

এইটুকু ছেলে—সে পারবে? অবিশ্বাসের দৃষ্টি মেয়েটির চোখে!

কিন্তু ছেলেটি, যৌবনের শক্তিমত্তা তার সর্ব্বদেহে, এক ঝাঁকুনিতেই তুলে নেয় তাকে কোলে—ছোট্ট শিশুর মত। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে—কিম্বা ছুটতেই সুরু করে দেয় যেন। প্রথম তলাটা একদমেই সে পেরিয়ে আসে। শুভ্র নগ্ন হাতে মেয়েটি জড়িয়ে ধরছে তার গলা—কি সুন্দর নরম এই অপূর্ব্ব বোঝা! আর কী হালকা! আর কী চমৎকার! আশ্চর্য্য রকমের অনুভূতি ছেয়ে আসে গোসঁ্যার মন।

দ্বিতীয় তলাটা পার হ'তে একটু দেরিই লাগে—যাত্রাটাও যেন একটু কম আনন্দদায়ক। মেয়েটিও যেন অকস্মাৎ অনেকখানি ভারী হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় তলা পার হতে তার দম বেরিয়ে আসে যেন। যারা পিয়ানো মাথায় কোরে ওঠে ওপরে প্রায় তাদের অবস্থা! মেয়েটি আরামের অর্দ্ধমুদিত চোখে বলেঃ "ওঃ প্রিয়! কী চমৎকার! কী আনন্দ পেলাম আজ!"

আর সে? সে কোনো জবাব দেয় না। শেষের সিঁড়িগুলো সে ভেঙে চলে একটার পর একটা। সিঁড়ির যেন আর অন্ত নেই, মনে হ'তে থাকে তার—ঘুরে ঘুরে যেন একেবারে আকাশে গিয়ে উঠেছে। আর যাকে কোলে নিয়ে সে উঠছে তা যেন কোন তরুণীরই দেহ নয় আর—বীভৎস ভারী একটা লাগেজ—যেটাকে এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই যেন হাঁপ ছেড়ে সে বাঁচে।

অবশেষে নামবার জায়গায় এসে তারা দাঁড়ায়। মেয়েটি তার চোখ মেলে—"এর মধ্যেই?" আনন্দে তার দেহ অবশ। ছেলেটি কিছু বলে না, জবাব দেবার মত অবস্থা নয় তখন তার। কেবল মনে মনে সে ভাবে—"এতক্ষণে!"

(২)

মেয়েটি গোসঁ্যার কাছে থাক্‌ল ছ'দিন। তারপর সে চলে গেল। গোসঁ্যার মনে ছাপ রেখে গেল নরম দেহের আর পোষাকের মসৃণতার। নিজের সম্বন্ধে কিছুই সে বলেনি গোসঁ্যাকে, কেবল দিয়ে গেছে তার নাম আর ঠিকানা আর বলে গেছে এই কথা : "যখন তোমার আমাকে দরকার হবে, খবর দিয়ো—আমি প্রস্তুত থাকব সব সময়েই।"

সুন্দর আর সুরভিত ছোট্ট কার্ডখানিতে লেখা :

ফানি লগ্রঁা

৬, রু দে লা'আরকেদ্‌

কার্ডখানি গোসঁ্যা রেখে দিয়েছে তার আয়নার গায়ে গুঁজে। তারপর, পড়াশুনার চাপে, কয়েকদিনের মধ্যে ভুলেই গেছে তার কথা। সামনের নভেম্বরে তার পরীক্ষা—আর তিন মাস মোটে তার দেরি।

দ'শেলেতের বাড়ির সেই বল্‌-নাচের এক সপ্তাহ বা ছ'সপ্তাহ পরে, একদিন সন্ধ্যায়, গোসঁ্যা আলো জ্বেলেছে ঘরে, টেবিলের ওপরে তার বই খোলা, পড়া সুরু করে-এই-আরকি, এমন সময়ে তার দরজায় ভীরু করধ্বনি হয় এবং চমৎকার সাজ-পোষাকে সজ্জিতা একটি মহিলা প্রবেশ করে তার ঘরে—কাছে এলে তাকে চিনতে পারে সে।

'কি দেখছ ? আমি। আমি এসেছি আবার।"

গোসঁ্যা অস্বস্তি-ভরা দৃষ্টিতে তাকায় উন্মুক্ত বই-এর দিকে।

"না না! আমি বিরক্ত করব না তোমায়! পড়বে বই-কি তুমি!"

এই বলে টেবিল থেকে একটা মাসিকপত্র তুলে নিয়ে, পাশের একটা চেয়ারে ব'সে পড়বার ভাণ করে সে। কিন্তু গোসঁ্যা, তার পড়াশুনার ফাঁকে, যতবারই চোখ তোলে, মেয়েটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। মেয়েটি কি সত্যিই পড়ছে, না, একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই দিকে ?

গোসঁ্যার আত্মসম্বরণের শক্তি অসাধারণই বলতে হবে। অমন সুন্দর মেয়ে তারই সম্মুখে—আত্মসমর্পণের জন্য উৎসুক, তার ছোট্ট মাথা, ছোট্ট কপাল, কামনা-পরিপূর্ণ রক্তাধর—তার তন্বী তনুর সমস্ত সুষমা নিয়ে অনতি-

দূরেই অপেক্ষমাণ—অথচ সে এই মুহূর্ত্তেই তাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছে না এ তার দুর্নিবার ক্ষমতারই পরিচয়।

পরদিন সকালে ফানি চলে যায় বিদায় নিয়ে—কিন্তু আবার—বহুবার সে ফিরে আসে সেই সপ্তাহে। প্রত্যেকবারই সে যখন আসে তার মুখ বিবর্ণ, হাত ঠাণ্ডা, কণ্ঠ আবেগকম্পিত।

প্রতিবার এসেই সে বলে: "আমি জানি যে তোমায় আমি বিরক্ত করছি, তোমার ক্ষতি করছি। কিন্তু কি করব—আমি পারি না। তুমি বিশ্বাস করবে কি, প্রত্যেকদিন সকালেই আমি প্রতিজ্ঞা করে যাই যে আর আসব না—কিন্তু সন্ধ্যা হলেই আবার না এসে পারি না। কে যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে।"

গোসঁ্যা আমোদ বোধ করে ফানির কথায়, তার এই ভালোবাসার আবেগে। এর আগে যে-সব মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, হয়েছে ঘনিষ্ঠতা—যে-সব মেয়েকে সে পেয়েছে কাফেতে কিম্বা স্কেটিং করতে গিয়ে, যে-সব মেয়ের সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে এখানে-সেখানে, তাদের সবার বোকার মত হাসি, কথোপকথনের কর্কশতা, আর অপদার্থতা তার মনে বিরক্তিপূর্ণ অবসাদের ছাপ রেখে গেছে—এ-মেয়েটি কিন্তু তাদের মতো নয়!

ফানির মধ্যে সে পেয়েছে সত্যিকারের নারীর পরিচয়—অপূর্ব্ব একটা মাধুর্য্য আর মর্য্যাদাজ্ঞান—দেহের সুষমার সঙ্গে মনের সুসমতা—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা বিস্ময়কর অপরূপতা।

আজকাল মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরয় তারা; প্যারিসের উপকণ্ঠে যে-সব সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে সবই ফানির নখদর্পণে। জনতার ভীড় বা কোলাহল যেখানে, সে-সব জায়গায় কদাচই যায় তারা,—যে সব সরাইখানায় লোকজন কম, সেইখানেই টিফিন তারা সারে।

গোসঁ্যা একদিন প্রস্তাব করে: "চলো আজ ভ-ডি-সঁার্ণেতে গিয়ে লাঞ্চ করা যাক্।"

ফানি আপত্তি করে: "না না, ওখানে না। অনেক আর্টিষ্ট যায় ওখানে।"

তখন গোসঁ্যার মনে পড়ে যায়, আর্টিষ্টের প্রতি বিরাগই তাদের মধ্যে পরিচয়

ও ভালোবাসার সূত্রপাত। গোসঁ্যা এই বিরাগের কারণ জিজ্ঞাসা করে ফানিকে।

ফানি বলে ঃ "আর্টিষ্টরা যত মাথা পাগলা লোক—খরগোসের মত বুদ্ধি তাদের! সব কিছুই বাড়িয়ে দেখা আর বলা ওদের অভ্যাস। মারাত্মক লোক সব! ওরা ভয়ানক ক্ষতি করেছে আমার।"

"কিন্তু তা সত্ত্বেও"—গোসঁ্যা প্রতিবাদ করে ঃ "আর্ট কী চমৎকার! কী সুন্দর, অপরূপ! জীবনকে প্রশস্ত করতে, সজ্জিত করতে, অলঙ্কৃত করতে,—জীবনের মুক্তি আনতে আর কিছুই নেই আর্টের মতো।"

"কী সুন্দর, কী অপরূপ, তা কি জানো তুমি? আমি তোমাকে জানাবো, প্রিয়! জীবনে সব চেয়ে চমৎকার হচ্ছে কুড়ি বছর বয়স আর প্রেমে পড়া—যেমন তুমি!"

কুড়ি! ফানিকে দেখে মনে হয় না যে তারও বয়েস কুড়ির বেশি—সব সময়ে, আনন্দে, উৎসাহে আর উৎসাহে সমুচ্ছল!

গোসঁ্যা চুপ ক'রে ভাবে—কী ভাবে সেই জানে। সেই কি জানে?

(৩)

একদিন ওরা ভিল্-ডি-আভরে হ্রদের ধারে প্রাতর্ভোজন করছিল। কুয়াসাচ্ছন্ন হৈমন্তী আলোর আভা পড়েছিল মৌন জলের বুকে, তাদের সম্মুখে ঘন অরণ্যের ছায়া। সামান্য আঙুরের প্রাতরাশ—কিন্তু তাই অসামান্য হয়ে উঠেছিল বনের আর তাদের মনের পরিবেশে।

আঙুর খাচ্ছিল আর চুমু খাচ্ছিল তারা। দুটি খাদ্যের মধ্যে কোনটি মধুরতর নির্ব্বাচিত করা যে সময়ে বেশ শক্তই হয়ে উঠেছে তাদের পক্ষে, এমন সময় অদূরবর্ত্তী একটা পাইন গাছের আড়াল থেকে একটা উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল ঃ "আমি বলছি কি, তোমার চুমু খাওয়া সমাধা হয়ে গেল"—

বলতে বলতে ভাস্কর কুদালের ভারী মুখ আর এক মুখ দাড়ি আত্ম-প্রকাশ করে পাইন গাছের অন্তরাল থেকে।

"আমি ভাবছি তোমাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দেব। এই বনের মধ্যে একলা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি।"

ফানির মুখে এই অবাঞ্ছিত বাধায় স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে না। গোস্যাঁ লাফিয়ে ওঠে এই প্রস্তাবে—কুদাল প্রথিতযশা, এমন একজন শিল্পীকে এত কাছাকাছি পাওয়া সে সৌভাগ্য বিবেচনা করে। কুদালের সম্বন্ধে জানবার তার ব্যগ্রতা হয়, হয়তো এই বিখ্যাত শিল্পী কোন ভাস্কর্য্য-রচনা নিয়েই ব্যাপৃত আছেন এই বিজনতায়—কে জানে!

কুদালের বেশবাস সতর্কতার সঙ্গে অগোছালো—সব কিছুতেই একটা আলগোছা সযত্নতার পরিচয়—গলার টাই থেকে পায়ের জুতোর লেস পর্য্যন্ত। কিন্তু দ'শেলেতের বল্‌-নাচের আসরে সে যে কুদালকে দেখেছিল তার চেয়ে যেন এখন অনেক বেশি বড়ো দেখাচ্ছে ওকে। রাত্রের কৃত্রিম আলোয় মুখের যে সব রেখা বা কুঞ্চন সেদিন তার চোখে পড়েনি, আজ দিনের আলোয় সে-সবই স্পষ্ট দেখাচ্ছে—অনেক চেষ্টাতেও তার দাগ ঢাকা পড়েনি।

কিন্তু কুদাল যখন, অন্তরঙ্গ ভাবে 'ফানি' ব'লেই সম্বোধন করে তার নায়িকাকে, তখন গোস্যাঁ ঈষৎ বিব্রতই যেন বোধ করে নিজেকে।

"ফানি", কুদাল বলে, "তুমি জানো, আমি দিন পনেরো থেকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করছি? মারিয়া পালিয়েছে মোরাতরের সঙ্গে। এমন মন খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে আমার! কাজ করাই অসম্ভব! মনই লাগে না কাজে। তাই আমি ষ্টুডিও ছেড়ে পালিয়ে এসেছি এখানে—শান্ত হ্রদের ধারে, মনের জ্বালা জুড়োতে!"

"বেশ, জব্দ করেছে তোমায় তাহ'লে!" হাসতে হাসতে বলে ফানি।

কুদালের এবার ভালো ক'রেই চোখ পড়ে গোস্যাঁর দিকে। সে ভাবে: "যৌবন! যৌবন কি অপরূপ! আরো চমৎকার এই জন্যে যে এ সংক্রামক! এর ছোঁয়াচ লাগে অপরকে। ফানিকেও কি তরুণী দেখাচ্ছে না—ঐ কিশোরের মতই?"

আপন মনে কুদাল বিড় বিড় করে—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!" বিষাদ আর ঈর্ষার ছায়া পড়ে তার মুখে।

"আমি বলছি কি, ফানি, তোমার কি মনে পড়ে, আরেক দিন আমরা প্রাতরাশ করেছিলাম এখানে? অনেকদিন হয়ে গেল, অবিশ্যি! এজানো, দিজোয়ি, আমাদের সব্বাই এসেছিলাম এখানে। তুমি প'ড়ে গেছলে হ্রদের

মধ্যে। আমরা তোমাকে পুরুষ মানুষের পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। কোট প্যান্তলুনে তোমাকে মানিয়েছিলও চমৎকার!"

"স্মরণ ক'রো না সে-কথা।" ফানি বলে, তার কণ্ঠস্বর একটু কঠোরই। বর্ত্তমান—কেবল নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমানের মধ্যেই ফানির আত্মার অস্তিত্ব। অতীতের স্মৃতির কী মূল্য তার কাছে? ভবিষ্যতের ভাবনারই বা কোন প্রয়োজন?

কিন্তু কুদাল? অতীতের মধ্যে সে বেঁচে আছে এখনো। সে বকবক ক'রে ব'কে চলে; তার যৌবনের কাহিনী, ভালোবাসার এবং নেশার; যে-সব দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার জয় হয়েছিল; যে-সব অপেরায় আর নাচের আসরে সে যোগ দিয়েছে—

কিন্তু হঠাৎ সে দেখতে পায়, শ্রোতাদের কারোই কান নেই তার কথায়,—তারা তখন পরস্পরের অধর থেকে আঙুর ফল তুলে খেতেই বেশি ব্যস্ত।

"দেখছি, আমি বাধা দিচ্ছি তোমাদের"—এই কথা ব'লে কুদাল উঠে পড়ে। ক্ষুণ্ণ মনে, বিষণ্ণ মুখে চলে যায় সেখান থেকে—ওদের মনোযোগ আকর্ষণ না ক'রেই।

যেতে যেতে কুদাল বলে আপন মনেই—"আঃ! কী খারাপ এই বুড়ো হওয়া! আর যৌবন কি চমৎকার!"

ওরা তাকিয়ে থাকে, কুদালের দীর্ঘকায় দেহ আবার মিশে যায় বৃক্ষাচ্ছাদের অন্তরালে।

ফানি বলে—"বেচারী কুদাল! ওর হয়ে গেছে!"

গোসঁ্যা কিন্তু আশ্চর্য্য হয়, মারিয়া, একটা সামান্য মেয়ে মডেল-মাত্র, সে কিনা কুদালের মত নামজাদা শিল্পীর সান্নিধ্য ছেড়ে চলে গেল মোরাতরের সঙ্গে। মোরাতর—যে একজন অতি নগণ্য পটুয়া কেবল, না আছে প্রতিভা, না আছে কৌশল, খ্যাতির বিন্দুমাত্রও নেই—কেবল এক তরুণ বয়স ছাড়া কিছুই নেই যার স্বপক্ষে—তার সঙ্গেই কিনা—! বিস্ময়-প্রকাশ করে গোসঁ্যা।

ফানি শুধু জবাব দেয়—"কি সরল! কি সরল তুমি! কিছুই জানো না জীবনের!"

এই ব'লে সে তার মাথা টেনে নিয়ে আসে নিজের জানুর উপরে, দু'হাতে

জড়িয়ে ধ'রে আঘ্রাণ করতে সুরু করে তাকে—তার চোখ, তার চুল, তার সর্ব্বাঙ্গ—এক গোছা ফুলের মতই।

সেদিন সন্ধ্যায়, জ়ঁা তার নায়িকার বাড়ি প্রথম সান্ধ্য আহার করল।

তিন মাস ধ'রে ফানি ক্রমাগত তাকে খুঁচিয়েছে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু কেন বলা যায় না, সে যেতে রাজি হয় নি কিছুতেই।

সেদিনও সে রাজি হতে চায় নি সহজে, কিন্তু ফানি আবদার সুরু করে—"বল না, কেন যাবে না?"

"আমি জানি না। সাহস হয় না আমার।"

"আমি বলছি যে আমার কিছু অসুবিধা হবে না, আমি স্বাধীন, কারো তাঁবে নই।"

অনেক হাঁটাহাঁটিতে গোস্যাঁর পরিশ্রান্তি এসেছিল সেদিন, এবং ফানির আবাস, রু দে লা' কার্দ্, ষ্টেশনের কাছাকাছিই—এই জন্য সে বেশি আর আপত্তি করতে পারে নি সেদিন।

বুড়ো ঝি, বদখত চেহারা, এসে দরজা খুলে দিল।

"মাশোম এর নাম।" ফানি বলে গোস্যাঁকে। "আজ আমার শুভদিন, মাশোম!—এই যে, এখানে! এই দেখো আমার প্রিয়তম, আমার রাজা! আজ আনতে পেরেছি—যাও, চট্পট্! আলো জ্বেলে দাও চারধারে। উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক আমার কুটীর!"

জ়ঁা চুপ ক'রে ব'সে থাকে ছোট্ট ড্রইংরুমের একধারে একলাটি একটা সোফায়। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে কয়েকটা ল্যাণ্ডস্কেপের ফ্রেমে আঁটা ছবি। প্রত্যেকটি ছবির গায়ে লেখাঃ "ফানি লগ্রাঁকে" কিম্বা "আমার প্রিয় ফানিকে।"

একটা উঁচু আধারের ওপরে ভাস্কর কুদালের খোদাই করা সাফোর মর্ম্মর মূর্ত্তি। এরই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের অনুকৃতি সে দেখেছে এখানে-ওখানে, অনেকস্থানে, এমন কি তার বাবার পড়বার ঘরেও। হ্যাঁ, এক রকম শিশু-কাল থেকেই সে দেখে এসেছে এই মূর্ত্তি।

মর্ম্মর মূর্ত্তির নিকটেই জ্বলছিল একটা মোম বাতি—। তার আলোতে তার হঠাৎ মনে হয়, এই মূর্ত্তির সঙ্গে তার প্রিয়ার, ফানির মুখের যেন ভয়ানক মিল।

মুখের প্রত্যেকটি রেখা, চোখের এবং অধরের ভঙ্গিমা, বাহুর নিটোলতা সবই মনে করিয়ে দেয় সেই একজনকেই।

একটুখানির মধ্যেই ফিরে আসে ফানি। মর্ম্মর মূর্ত্তির ধ্যানে গোসঁ্যাকে সমাহিত দেখে সে হাল্‌কাভাবে বলে: "অনেকটা আমার মতই দেখতে—নয় কি? কুদালের মডেল দেখতে ছিল ঠিক আমার মত।"

এই ব'লে তৎক্ষণাৎ সে তাকে নিয়ে যায় নিজের ঘরে—যেখানে মাশোম্ মুখ গোম্‌ড়া ক'রে টেবিলের উপরে দুজনের জন্য আহারের ব্যবস্থা সজ্জিত কচ্ছিল। বাতিদানের সমস্ত আলো প্রজ্জ্বলিত, যেখানে যা বাতিদান ছিল, সবগুলোই জ্বালানো হয়েছে—টেবিলের চারধারেও আলোকমালা। এ যেন একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে নাচের আসরের আলোক-সমারোহ!

"মাশোম্ তুমি যেতে পারো। আমরা নিজেরাই পরিবেশন ক'রে নেব।"

মাশোম্ চলে যায় মুখ ভার ক'রে,—যাবার সময়ে সজোরে দরজা ভেজিয়ে।

ফানি বলে গোসঁ্যাকে: "কিছু মনে ক'রো না তুমি। ও ওই রকম। আমি তোমাকে এত ভালোবাসি তা ওর সহ্য হয় না।"

ফানি গোসঁ্যার ডিশে খাবার তুলে দেয়, শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে—কিন্তু নিজে আহার করতে ভুলে যায়; গোসঁ্যা খায়, তাই সে দু'চোখ ভ'রে দেখে।

"কই তোমার নিজের ডিশে তো কিছু নিলে না?" জিজ্ঞাসা করে জঁ।

"এই যে নিই"—

গোসঁ্যা তাকে বসায় নিজের পাশে, এক ডিশ থেকে দু'জনে খায় আর গল্প করে—স্ফূর্তির মধ্যে কেটে যেতে থাকে সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ। ফুর্‌ফুরে হাওয়ার মত যত হাল্‌কা মুহূর্ত্ত!

"আর!" বলে ফানি: "দ'শেলেতের বাড়ির আসরে যখনি তোমাকে আমি ঢুকতে দেখলাম, আমার কেমন যেন ভালো লেগে গেল তোমায়! আমার ইচ্ছা হোলো আমি তোমাকে নিয়ে যাই, তুলে নিয়ে যাই তক্ষুনি অন্য কোথাও, যাতে আর কেউ না পায় তোমায়। আচ্ছা, বল না, তোমার কি মনে হয়েছিল যখন তুমি দেখলে আমায়?"

প্রথমে একটু ভয়ই হয়েছিল তার, কিন্তু ক্রমশই তার বিশ্বাস দৃঢ় হল।

অবশেষে গোস্যাঁরও ভালো লেগে গিছ্‌লো তাকে। "আচ্ছা," গোস্যাঁ বলে, "আমি জিজ্ঞাসা করি নি এতদিন। লা গুর্‌নেরির দু'ছত্র কবিতায় তুমি চটে গিছ্‌লে কেন বলত? সেই দু'ছত্র—

তোমার পাষাণময়ী ঐ দেহে আনিবারে প্রাণ
মোর শেষ রক্তবিন্দু, অয়ি সাফো"—

বাধা দেয় ফানি: "থাক থাক। তুলো না কখনো! কবিতা আমার ভালো লাগে না। ভালো লাগে না কবিদের।"

ফানির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সেদিনের মতই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে তার দু'বাহু জড়িয়ে দেয় গোস্যাঁর গলায়—"আজ এই সুন্দর সন্ধ্যায় আর কিছু নয়; কেবল তুমি আর আমি। তুমি আর আমি।"

গোস্যাঁ আর কিছু জানতে চায় না। তার চোখ-জড়িয়ে আসে আনন্দের আবেশে।

তার মুদিত চোখের সামনে দিয়ে যেন স্বপ্নের মত হাল্‌কা পাখায় ভর দিয়ে ভেসে যেতে থাকে, হেমন্তের কুয়াসাচ্ছন্ন বন, সূর্য্যালোকিত সবুজ মাঠ, ছোট ছোট পাহাড়ের নীল চূড়া—

মুখে এসে পড়ে প্রিয়ার নিশ্বাসের মেদুর সুরভি!

আর কী-ই বা জিজ্ঞাস্য আছে তার?

ক্রমশঃ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

আলফোঁস দোদে-র "সাফো" হইতে অনূদিত

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

এইবার আমরা বৈদিক আর্য্যদিগের সমাজতত্ত্ব (Sociology) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইব। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে 'বর্ণ' বা 'জাতিভেদ' একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এই ধর্ম্মের নৈষ্ঠিকেরা বলিতে চাহেন, বেদে চতুর্বর্ণের উল্লেখ আছে ; এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে 'বর্ণাশ্রম' একটি চিরন্তন প্রথা। উক্ত প্রথা চিরন্তন সত্য কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ ভারতীয় ইতিহাস এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত।

বেদের সময়ে জাতিভেদ, (caste system) প্রথা ছিল কিনা এই বিষয়ে পণ্ডিত মহলে খুব বাক-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অধিকাংশই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা, যাহা পরে বিবর্ত্তিত হয়, তাহা বৈদিক কৌমগুলির নিকট অজ্ঞাত ছিল ; যাহারা উক্ত মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তাঁহারা বলেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদের রচনকাল খৃঃ পূঃ ২০০০—৬০০ বৎসর মধ্যে বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন) মধ্যে চারি জাতি বৈদিক সমাজে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এস্থলে সিমার একটি সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, (১) যদি বেদোক্ত সরস্বতী নদীর অপর পারে 'সপ্ত-সিন্ধব' জনপদে অবস্থিত বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদানুযায়ী জাতিভেদ এবং তৎসহ বিশিষ্ট পুরোহিতশ্রেণী থাকিত তাহা হইলে যে-সকল আর্য্য-কৌম এইস্থানে বাস করিত তাহারা মহাকাব্যগুলি (Epics) রচনার সময়ে মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী লোকদের দ্বারা কেন 'অর্দ্ধ-বর্ব্বর' বলিয়া বিবেচিত হইত ? কেন "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' (১৭,১,১৪) যাহা সর্ব্ব পুরাতন

১। Zimmer, p. 189.

ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত ও অভিহিত হয়—উহাতে ইহাদের সম্বন্ধে উক্ত আছে—"ন হি ব্রহ্মচর্য্যম্ করন্তি," "অদীক্ষিতম্ দীক্ষিত ভাষাম্ বদন্তি"। এই কৌমগুলি কি তখন পৈতৃক জাতিভেদ মানিয়া চলিত, না উহা ত্যাগ করিয়াছিল যেজন্য পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে তাহারা গালাগালির ভাজন হইয়াছিল (২)?

এতদ্দারা আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে তথাকথিত চতুর্বর্ণ ও পৌরহিত্য-বাদ বেদের প্রাচীনাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল না; বরং বেদে ব্রাহ্মণগণের ক্ষত্রিয় রাজাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার কথা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪,১; ৫,২)

২। সিমারের এই প্রশ্নের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট তথ্য লুক্কায়িত আছে। কেন মহাভারতের শল্যকে গালি দিয়া কর্ণ বলিতেছিল—মদ্রক, গান্ধারক, পঞ্চনদজন, সিন্ধু সৌবির দেশ, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যাজ্য হয়, তথায় স্ত্রী পুরুষেরা এক সঙ্গে মদ্যপান করিয়া নৃত্য করে (উপরোক্ত বৈদিক কৌমগুলির নৃত্য সম্পর্কীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য), তাহারা আচার বর্জ্জিত, ইত্যাদি। কর্ণের এই গালাগালির পাত্র জনপদগুলিই আজ মুসলমান প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে! আর ভারতে তাহার পূর্ব্বের দেশগুলি (পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত) আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ আঁকড়াইয়া আছে। এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াই মুসলমান উর্দ্দু কবি হালী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—'Ganges broke the continuity of Islam" (গঙ্গানদী ইসলামের নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে)। "মরক্কো হইতে সাহারাণ-পুর সিধা লাইন" আর অগ্রসর হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—উপরোক্ত দেশসমূহে উহা প্রচলিত বা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই বলিয়াই কি ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হইত, এবং পরে সীমান্তবর্ত্তী দেশের কৌমগুলিকে "পৈশাচিক প্রাকৃতভাষী, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ব্রাহ্মণ্যবাদ তাহাদিগকে নিজের গণ্ডীর বাহিরের লোক বলিয়া বিবেচনা করিত বলিয়াই কি হিন্দু আচার ও জনশ্রুতি-বিহীন হইয়া শেষে তাহারা শীঘ্রই মুসলমান হইয়া "অভারতীয়" মনোবৃত্তি গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভারতীয় tradition হারাইতে সক্ষম হইয়াছে? বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, হেলেনিষ্টিক গ্রীক, শক, ইউচি, হুন, পারদ প্রভৃতির আক্রমণ ও শাসনের ফলে পূর্ব্ব ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সর্ব্বশেষে গজনীর মুসলমান তুর্কীদের শাসনাধীনে থাকা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত এইসব জনপদের লোকেরা বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্ম বা "ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণ্যবাদ" যাহা পৌরাণিক যুগে মধ্যদেশে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা কখন গ্রহণ করে নাই বলিয়াই তাহারা এত শীঘ্র মুসলমান ও 'অভারতীয়' হইতে পারিয়াছে। এইজন্যই (মুসলমান উর্দ্দু কবি) হালীর 'আক্ষেপের' মূলে সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি তাহার কন্যা রোমসাকে ক্ষত্রিয় রাজা স্বনয় ভবয়ভ্যকে বিবাহ দিয়াছেন (১, ১২৬, ৬-৭); ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা বেদের অনেকগুলি শ্লোক রচিত হইবার কথা উল্লেখ আছে। এমন কি বৈশ্যের দ্বারাও বৈদিক গান রচিত হইয়াছে। অনেক ক্ষত্রিয় রাজার নিকটও ব্রাহ্মণগণ "ব্রহ্মবিদ্যা" শিক্ষার জন্য গমন করিত। এমন কি "শতপথ ব্রাহ্মণে" ইহা উক্ত আছে যে রাজা জনক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (৩)।

এই সকল প্রাচীন জনশ্রুতি ব্যতীত এই বিষয়ে ঋকবেদই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী বলিয়া মনে হয়। ঋকবেদের সাক্ষ্য বিষয়ে মুইর (৩ক) বলেন,—(i) পুরুষ সূক্ত (১০,৯০) ব্যতীত কোন ঋকে চতুর্বর্গ সম্পর্কে কোন প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ নাই (৪); (ii) একস্থানে যে আর্য্যবর্ণ বা জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সেখানে এক সংজ্ঞাতেই ভারতীয় সমাজের সকল উচ্চশ্রেণীকে বুঝাইয়াছে; পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ সকলেই আর্য্য (৫) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; (iii) ব্রাহ্মণ শব্দটি পুরুষ সূক্ত ভিন্ন কেবল ঋকবেদের আটটি গানে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মণ শব্দটি ছয়চল্লিশ বার পাওয়া যায়। তাহা হইলে যখন অধিকাংশ ঋক্‌সমূহ রচিত হয়, সেই সময় প্রথমোক্ত শব্দটি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিলনা বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'রাজন্য' শব্দটি কেবল পুরুষ সূক্তে পাওয়া যায় এবং দুই এক জায়গায় (১০,১০৯,৩) ক্ষত্রিয় অর্থে রাজবংশীয় লোক, অভিজাত বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' শব্দ শুধু পুরুষ সুক্তেই পাওয়া যায়, যদিচ বেদে 'বিশ' অর্থে জনসমূহ (people) বুঝাইয়াছে: (iv) "ব্রাহ্মণ" শব্দটির প্রথম অর্থ ছিল—জ্ঞানী (sage), কবি, 'পুরোহিত'; অবশেষে বিশিষ্ট প্রকারের পুরোহিত; (v) কতকগুলি ঋকে (১,১০৮,৯; ৪,৫০,৮; ৮,৭,২০; ৮,৪৫,৩৯ প্রভৃতি) 'ব্রহ্মণ' অর্থে পেশাদার পুরোহিত বুঝাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়; (vi) কতকস্থানে ইহার

৩। Max Mueller,—*Chips from a German Workshop*, pp. 2, 338

৩ক। Muir—S I. I (2), 12, 258.

৪। ঋক্‌বেদের 'পুরুষ সূক্ত' ব্রাহ্মণ্যবাদের সৃষ্টির পর বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া আজকাল বিবেচিত হইতেছে।

৫। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে শূদ্রকেও 'আর্য্য' বলা হইয়াছে। মুইরের গবেষণা এই পুস্তক আবিষ্কারের পূর্ব্বে হইয়াছিল।

অর্থ কোনও ব্যক্তির কোন বিশিষ্ট গুণকে বুঝাইতেছে বলিয়া বোধ হয় (১০, ১০৬,৬) ; (vii) ব্রাহ্মণ অর্থে 'ব্রহ্মপুত্র'—ব্রাহ্মণের ছেলে (২,৪৩,২) বলিয়া বুঝাইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় এই অর্থ প্রচলিত হইবার সময় পৌরহিত্য কার্য্য একটি পেশা হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে বেদের প্রথম যুগে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। ইহা পরে উদ্ভূত হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে সিমারের তর্কসূত্র অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত একমত হইয়া অনুমান করেন যে যেমন প্রাচীন জার্ম্মান কৌমগুলি বৈদেশিক অভিযানের ফলে ধর্ম্মমণ্ডলীর (Church) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া রাজতন্ত্র বিবর্ত্তিত করে তদ্রূপ বৈদেশিক কৌমগুলিও অভিব্যক্ত হয়। প্রথমত আমরা বৈদিক সমাজে জাতিভেদ পদ্ধতি পাই না। কিন্তু পরে বোধ হয় বাধ্য হইয়া শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল। বেদেই দেখা যায় যে পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম দিক হইতে বিভিন্ন আর্য্য কৌম দক্ষিণে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। 'দশ রাজার যুদ্ধ' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পক্ত, (৬) ভলানা, অলিনা, ভিসানিন্, শিব প্রভৃতি পঞ্চ কৌম, 'যদু, অনু, দ্রুহু, তুর্ভাসা, পুরু' প্রভৃতি আরও পঞ্চ কৌমের সহিত সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অভিযান করিলে এৎসু-ভারত কৌম তাহার রাজা সুদাসের অধীনে এই সম্মিলিত অভিযানকে বাধা প্রদান করিবার জন্য তাহাদের উপরোক্ত যুদ্ধে পরাজিত করে (৭।১৮)। এই সম্মিলিত দশ রাজাদের মধ্যে অনেকে পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমের পর্ব্বতমালার পরপার হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই যুদ্ধেই আমরা "পক্ত" জাতির সম্বন্ধে প্রথম সংবাদ পাই।

৬। হেরোডোটাস সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিমভাগে Paktues নামক জাতি ও তাহাদের দেশকে 'Paktues Ge' বা 'Paktyika' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেরোডোটাসের মতে পক্তুদের একাংশের নাম ছিল 'গান্ধারী' ; অপর একাংশের নাম 'আপ্রিদি'। পণ্ডিতদের অনুমান, ইহারাই বর্ত্তমান পূর্ব্ব আফগান কৌম 'পক্তুন' ; ইহাদিগকে ভারতীয়েরা পাঠান বলিয়া থাকে। ভালানারাও একটি সীমান্তবর্ত্তী কৌম ছিল। হয়ত বর্ত্তমান "বোলান খাড়ি" (Bolan pass) ইহাদের নামটিকে আজও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। হুয়েঙ্গসাঙ্গ 'আলিনি' রাজ্যের উল্লেখ করেন। বোধ হয় কাফিরি স্থানের নিকট এই আলিনারা বাস করিত। ভিসানিনদের সনাক্ত করা যায় না। 'শিব' জাতি পরে বোধ হয় 'শিবি' নামে মহাকাব্যে উল্লিখিত হয়।

হেরোডোটাস ইহাকে (এই 'পক্ত' জাতিকে) 'পক্তু' বলিয়াছেন ; ইহারা আজও নিজদিগকে 'পক্তুন' বা 'আফগান' বলিয়া অভিহিত করে। ভারতীয়-গণ ইহাদিগকে পাঠান বলে। গজনীর মাহমুদের দরবারী ঐতিহাসিক আলবেরুণী বলিয়াছেন অনুমান দেড় হাজার কিম্বা দুই হাজার বৎসর পর গজনীর মাহমুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করিতে যায়, তখন সোলেমান পর্ব্বত এবং সিন্ধু উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী দেশের অধিবাসীরা নিজদিগকে 'আফগান' বলিত। ইহারা মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয় ; এবং ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই আফগানেরাই ভারতে 'পাঠান' নামে পরিচিত হয়।

এই দশরাজার যুদ্ধে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পারো পামিশুসে (বর্ত্তমান হিন্দুকুশ) পর্ব্বতের দিক হইতে দলে দলে বিভিন্ন কৌম যুগ-যুগান্ত ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আসিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই পর্ব্বতমালার কৌমগুলির লক্ষ্য হইতেছে সিন্ধু ও গঙ্গা উপত্যকার উর্ব্বরা ভূমিতে বাসস্থান ও উপনিবেশ স্থাপন করা। দশরাজার যুদ্ধের অন্যতম নেতা "পক্তরাজার প্রচেষ্টাও প্রায় তিন হাজার বৎসর পরে তাহার বংশধর আহমেদশা আবদালীর চেষ্টা উভয়ই একই গতির (tendency) পরিচায়ক। দক্ষিণ উর্ব্বরা ভূমির অধীশ্বর হইবার জন্যই এইসব অভিযান ! কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই পঞ্চনদে ও যমুনা বা গঙ্গার কূলে উপনিবেশ স্থাপনকারী আর্য্য-কৌমগুলি নূতন অভিযানকারী-দিগকে বাধা প্রদান করিত ! এই সব ব্যাপার ইউরোপের অন্ধকার যুগের "Voelkerwanderung-"র (কৌমদের পরিভ্রমণ) ন্যায় ছিল। বিভিন্ন কৌমসমূহ একত্রিত হইয়া নয়াদেশ দখলের জন্য সদা সচেষ্ট থাকিত। উত্তর পশ্চিমের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে কত অভিযান হইয়াছে তাহার খবর কে রাখে ? কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদের মতে পশ্চিম পঞ্জাবের লাঢনা (Ladhna) উপভাষা ও কাশ্মিরী ভাষায় (৭) 'খো' ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ভাষাকে (খো) প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ "পৈশাচিক প্রাকৃত ভাষা" (৮) বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে খাঁটি সংস্কৃতভাষীদের বাহিরের জাতিগুলি এই

৭। Imperial Gazetteer—Punjab দ্রষ্টব্য।

৮। Grierson—The Paichacha Prakrit Language.

সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এই সব ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই ভারতের অভ্যন্তরস্থিত কৌমগুলি সমাজের নয়া অভিব্যক্তি করিয়া সভ্যতায় পশ্চাদবস্থিত অনুন্নত জাতি কৌমগুলিকে "পৈশাচিক, ব্রাত্য, ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত" এবং পরে "যবন" ও "ম্লেচ্ছ" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া 'পর' করিয়াছে। বহু পরে যখন গজনীর সুলতান বংশ ও ঘোর বংশের শাসন সময়ে সভ্যতায় পশ্চাদবস্থিত অনগ্রসর এই সকল কৌম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন ভারতীয়দের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহারা বৈদেশিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্যই আজ "পাঠান, দরদ, গিলগিট, চিত্রালি" প্রভৃতি জাতিগুলি হিন্দুদের নিকট বৈদেশিক ও ভিন্ন জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়, যদিচ অনুসন্ধান করিলে তাহাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার এবং জনশ্রুতির মধ্যে 'হিন্দুর' সংবাদ এখনও মিলে!

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—রাজনীতিক সংঘর্ষের ফলে যেমন খৃষ্টীয়-জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল, ভারতেও সেই কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্র বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করেন যে বিদেশ (পররাজ্য) জয়কারী ও জয়েচ্ছু লোকদের যুদ্ধের জন্য রাজার প্রয়োজন হয়। এইজন্য প্রত্যেক যুদ্ধকারী আর্য্য কৌমের একজন করিয়া 'রাজা' বা 'নেতা' বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যখন আর্য্য কৌমগুলি পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে আসিতে থাকে, তখন তাহারা স্থানীয় আর্য্য বা আদিম অধিবাসীদের দ্বারা ক্রমাগত বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই বাধা জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হইত। ইহার মধ্যে সর্ব্বাধিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন রাজাই সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে পারিত। এতদ্দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। যে সকল কৌম পরাজিত হইত তাহাদের লোকদের আংশিকভাবে দলভুক্ত করিয়া নেওয়া হইত। ফলে ঐ সকল পরাজিত কৌমের রাজারা স্বীয় স্বাধীনতা হারাইত। এইরূপে অনেক চেষ্টা ও কষ্টের পর আদিম অধিবাসীদিগকে পর্ব্বতে ও বনে তাড়াইয়া আর্য্যেরা যমুনা ও গঙ্গা তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ দখল করে। যে-সকল আদিম অধিবাসী হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতে

পলায়ন করিলনা, তাহারা আক্রমণকারীদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং তাহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া নানা দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও গ্রামেই বাস করিতে লাগিল। বিজেতাগণ বিজিতদিগের জমি ভাগ করিয়া নূতন দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বসবাস করিতে লাগিল; পঞ্জাবে অবস্থানকালে যেমন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অতি অল্প সময়ে সশস্ত্র ও একত্রিত হইতে পারিত, এই সুবিস্তৃত দেশে তাহা সম্ভব হইত না। এইজন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ থামাইবার জন্য সম্রাজকে একদল যোদ্ধা নিজের পার্শ্বে রাখিতে হইত। এই সময়ে ছোট ছোট কৌমের রাজারা এই সম্রাজের বর্দ্ধিত ক্ষমতা দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহার দলে মিশিয়া যাইত, নতুবা সেই শক্তিদ্বারা তাহার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইত। ফলে সে তাহার কৌমের গোষ্ঠী ও সদলবলে সম্রাজের যোদ্ধৃ অভিজাতদের মধ্যে মিশিয়া যাইত।

এই প্রকারে বিশ হইতে বিভিন্ন একজন রাজা উদ্ভূত হইত। এই অবস্থায় যোদ্ধৃ অভিজাতবর্গ ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত, এবং এই ব্যবসায় তাহাদের পুত্রদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করিত। প্রয়োজন হইলে 'বিশগুলিও (people) যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইত। বিশেরাও যে যুদ্ধ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিত তাহারও প্রমাণ আছে। বেদে যুদ্ধ ব্যাপারে "বিশম্ বিশম্" (১০,৮৪,৩) শব্দের প্রয়োগ আছে। সিমারের মতে এই শব্দটির অর্থ, সৈন্যদলের একটি অংশ, অর্থাৎ পল্টনদের একটি অংশকে এই নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু বিশেরা যে যুদ্ধকালে যোগদান করিত তাহা কিথ্ ও ম্যাকডোনেল (Vedic Index, vol. ii., pp. 248-256) স্বীকার করিতেছেন। পুরাকালে যুদ্ধের সময় সৈন্যেরা কুল ও কৌম অনুসারে নিজের কুলপতি ও কৌমপতির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। মধ্যযুগেও উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্রীক ইতিহাসে গ্রীস আক্রমণকারী পারস্য বাহিনীর বিষয়ে হিরোডোটাসের এবম্প্রকারের বর্ণনা রহিয়াছে। তথায় গান্ধারীদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভারতীয়েরা যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। আবার মুসলমান যুগের ভারতীয় সৈন্যদলেরও এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। এইজন্যই অনুমিত হয় যে 'বিশম্ বিশম্' অর্থ কৌমগত 'বিশ' নামক রাষ্ট্রীয় অংশ। সৈন্যদলে 'বিশ' অপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশকে রাষ্ট্রীয় বিভাগ অনুসারে 'গ্রাম' বলা হইয়াছে (৩,৫৩,১২)।

বেদোক্ত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে একটি কৌমের যোদ্ধা সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত হইত ঃ যথা,—বিশ, গ্রাম বা ব্রজ, কূল।

"বিশ" প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য, পশুপালন, এবং বাণিজ্যে, লিপ্ত থাকিত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্পর্কে "বিশ" সভা-সমিতি এবং সেনার সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইহাকে 'বল' বা 'শক্তি'র (Power) প্রতিনিধি বলিয়া অথর্ব্ববেদের শেষভাগে (অথর্ব্ব ৩,১৯,১ ; ৯, ৭,৯) জনসাধারণকে বলের সহিত একশ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সময় রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণী উদ্ভূত হয় : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বল (বিশ) (অথর্ব্ব ৯,৭,৯ ; ৩১৯,১)। বোধ হয় জীবিকার বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরিয়া এই তিনটি শ্রেণী ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হয়। এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বিশ ও বলকে এক বলিয়া সনাক্ত করায় (identify) আমরা বুঝিতে পারি যে, তখনও রাষ্ট্রশক্তি সাধারণের হস্তে ছিল। রাজা তখনও ভগবানের প্রতিনিধি বা স্বেচ্ছাচারীরূপে বিবর্ত্তিত হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্তুতি-গায়কদের অবস্থানের (position) বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের কবি-প্রতিভাকে ধর্ম্মের কাজে লাগাইয়া রাজা ও ধনীর প্রাণের ইচ্ছা দেবতার নিকট জানাইত। এই জন্য তাহারা মোটা রকমের পারিশ্রমিক এবং বকশিস্ পাইত। এইভাবে তাহাদের খ্যাতি ও পদোন্নতি হইত ; এবং বিশেষভাবে দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত বলিয়াও বিবেচিত হইত। বৈদিক যুগের শেষে এই প্রথা হইয়াছিল যে পূজা সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য, সমস্ত কৌমের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং যাহা রাজা সম্পাদন করিত, তাহা সে স্বয়ং না করিয়া একজন স্তুতিগায়কের উপর উহার কার্য্যভার ন্যস্ত করিত। এইরূপ ভারপ্রাপ্ত একজনকে বলা হইত—'পুরোহিত' (পুরেতার ঋকবেদ, ১,৩৩,৬) ; রাজা সুদাস ও তাঁহার কৌম এৎসুর এমন একজন পুরোহিত ছিল—'বশিষ্ঠ' (৭,৮৩,৪)। এইখানেই ভারতীয় পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভবের আরম্ভ (৯)। এই প্রথার ফলে অভিজাতবর্গ জন সাধারণের নিকট হইতে যে সুবিধা অর্জ্জন করে তাহা পূজক-শ্রেণীর সহিত

৯। Roth—Zur Litteratur und Geschischte ; p. 117.

Zimmer—Altindisches Leben : p. 195. Vedic Index—vol. II, pp. 249—251.

ভাগ বাটোয়ারা করিতে হয়। পূজকদের (priest) ক্ষমতা তাহাদের পৌর-হিত্যের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—রাজা আপন জন ও জনসাধারণের তরফ হইতে যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি করিতে পারিত। এই সময়ে অভিজাতবর্গও যে পুরোহিত হইতে পারিত তাহা দেবাপি আরতি সেনার (ঋক ১০।৯৮; যাস্ক নিরুক্ত ২।১০—এই ব্যাখ্যা দিতেছে) ব্যাপারে দৃষ্ট হয়। যখন একটি বিশিষ্ট শ্রেণী উদ্ভূত হইল, যাহা রাষ্ট্রীয় জনসমূহও দেবতাদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতা করিতে লাগিল তখন পুরোহিত শ্রেণী কায়েম হইয়া রাষ্ট্রে আবার একটা নূতন সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি করে। এই প্রকারে রাজা স্তুতি গায়ক বা ভাট পরে দেবতাগণের অনুগৃহীত পুরোহিত এবং তৎপর ব্রাহ্মণদেবতারূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

এই প্রকারে পুরোহিত শ্রেণী (Sacredos Civitatis) সৃষ্টি হইয়া একটা প্রথায় পরিণত হইলেও পুরোহিত দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করা কোন রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক রীতি ছিল না (ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।২৭)। এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে: সুসাদমানের পুত্র রাজা বিশ্বন্তর কোন পুরোহিতকে না নিয়াই স্বয়ং যজ্ঞ করিতেছে (১০)। কিন্তু স্তুতি গায়কেরা পুরোহিত পদটি নিজেদের মধ্যে একচেটিয়া করিয়া রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে; রাজাকে স্বয়ং পূজা হইতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করে (৪,৫০,৭ ; ৭,৩৩,৬) আবার বলে, যে-রাজার পুরোহিত নাই, দেবতারা তাহার পূজার বলি গ্রহণ করে না; এইজন্য যে রাজা পূজা করিতে চায়, সে যেন একজন ব্রাহ্মণকে খাড়া করে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।২৪)। এই প্রকারে কালের সহিত পুরোহিত স্তুতি-গায়কদের দাবীও বাড়ে (১০।১০৫।৮ ; ৭।২৬।১,২ ; ৮।৬৯।14)। এই প্রকারে দেবতা ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এই স্তুতিগায়কেরা মধ্যবর্ত্তী লোকরূপে খাড়া হইতে লাগিল; ধর্ম্মেও নানা আচার-অনুষ্ঠান সৃজিত হইতে লাগিল; যজ্ঞের ফল ইহাদের নৈষ্ঠিক কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। আবার এই স্তুতিগায়কগণ নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের গানগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা

১০। Roth—Zur Litteratur und Geschischte, p. 118

বাড়াইতে লাগিল (১১)। তৎপর যখন গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি বিজিত হইতে লাগিল, তখন সেই সব স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার এই সকল চালাক জন-শ্রুতির সহিত পরিচিত ও শিক্ষিত লোক ব্যতীত কাহারা গ্রহণ করিবে? যখন এই শ্রেণী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে নিজেদের অধীন করিতে চেষ্টা করে তখন তাহাদের শক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমন সময়ে এই স্তুতিগায়ক শ্রেণী নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া এই শ্রেণীর সভ্যশ্রেণী হওয়ার ব্যাপারটিকে জন্মাধীন করে, তখন অন্যান্য শ্রেণী হইতে পৃথকীকৃত একটি গণ্ডীবদ্ধ পুরোহিত-শ্রেণী সৃষ্টি হয়।

কিন্তু বিনা আপত্তিতে রাজা ও অভিজাতবর্গ ব্রাহ্মণদের এই দাবী গ্রহণ করে নাই। এই সময়ে যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া হইতে পারে নাই, তাহা বেন রাজার ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ করিতে নিষেধ করায়, পুরুরবা দ্বারা তাহাদের অলঙ্কারাদি অপহরণ, এক হাজার ব্রাহ্মণ দ্বারা নহুষের রথ বা পাল্কী টানান প্রভৃতি উপাখ্যান হইতে বোঝা যায়। তৎপর অনেক ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রাম, রক্তপাত, অত্যাচারের পর পুরোহিত দল নিজেদের দাবী গ্রাহ্য করাইয়া নিয়াছে এবং নিজেদের সুবিধানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। রামায়ণ মহাকাব্যে পরশুরামের ক্ষত্রিয়-সংহার (১১ক) উল্লিখিত আছে (১২)। এই শ্রেণী-

---

১১। এই উপায়ে এই বর্ব্বর আর্য্য কৌমদের রাজা ও তাহাদের স্তুতিগায়কদের গান-গুলি, যাহা সাদা "চাষার গান" মাত্র, তাহা আজ পর্য্যন্ত "অপৌরুষেয় বেদবাক্য" বলিয়া হিন্দুর চোখে ধাঁধা দিতেছে।

•১১ক। এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা পার্জিটার কিন্তু অন্যভাবে করিয়াছেন। তিনি মহাভারত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া (১, ১৭৮; ৬৮০, ২-১৫) বলিতেছেন এই যুদ্ধটী হৈহয় বংশীয় কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রদের সহিত তাহাদের পুরোহিত বংশীয় ভার্গবদের মধ্যে আরম্ভ হয়। কার্ত্ত-বীর্য্য অর্জ্জুন ভার্গবদের অনেক ধন প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ ভার্গবদের উহা প্রত্যর্পণ করিতে বলে; তাহারা প্রত্যর্পণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে হৈহয় রাজপুত্রেরা বলপূর্ব্বক ঐ ধন কাড়িয়া নেয়। ইহাতে ভার্গবেরা অন্য দেশে পালাইয়া যায়, এবং উত্তরে ক্ষত্রি রাজাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। ইহাদের বংশে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করে। তিনি অযোধ্যার রাজবংশে বিবাহ করেন। ইহারই পুত্র পরশুরাম। অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্য তাহার দিগ্বিজয়ের সময় জমদগ্নিকে উত্যক্ত করে। ইহাতে বিবাদ বাধে এবং

সংগ্রামের যুদ্ধের সময় অনেক স্তুতি বা গান রচিত হইয়া অথর্ব্ব বেদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল রচিত গানে সংগ্রামের তীব্রতা ব্যক্ত হইয়াছে (অথর্ব্ব ৫।১৭-১৯)।

এই শ্রেণী সংগ্রামে ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণীর উপর ক্রোধের ঝাঁঝটা অথর্ব্ববেদের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে: "যখন একজন স্ত্রীলোকের দশজন অব্রাহ্মণ স্বামী থাকে, এবং যখন একজন ব্রাহ্মণ তাহার পাণিগ্রহণ করে, তখন সেই ব্রাহ্মণই একাই তাহার স্বামী (অথর্ব্ব ৫,১৭,৮)।

অর্জ্জুনের পুত্রগণ জমদগ্নিকে মারিয়া ফেলে। পরশুরাম প্রতিহিংসায় অর্জ্জুনকে ও অনেক হৈহয়কে নিহত করে। তত্রাচ হৈহয়রা বহুকাল পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া উত্তর-ভারত ছারখার করিয়া ফেলিত। অবশেষে অযোধ্যার রাজা সাগর তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া হৈহয় শক্তি ধ্বংশ করে। পার্জিটারের মতে এই গল্পই ব্রাহ্মণেরা উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে দিয়া পরশুরাম কর্ত্তৃক একুশবার নিক্ষত্রিয়করণে খাড়া করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জনশ্রুতি এবং রাম ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরামের পরাজয়ের কথা বলিয়া ক্ষত্রিয়দের সম্মান বাঁচাইয়াছে (Pargiter—"Ancient Indian Historical Tradition" : pp. 199—200)। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ওয়েবার সিমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত পার্জিটারের ব্যাখ্যা মিলে না। যদি বহুবর্ষ-ব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধ দুইটি বংশের ব্যক্তিগত ঝগড়ার সহিত দুইটি ক্ষত্রিয় রাজবংশের আধিপত্যের কলহে মিলিত হওয়াতে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কেন রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত পরশুরামের পরাজয়ের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে? আর শত ক্ষত্রিয়ের শ্লোক (যজুর্ব্বেদ ১৬।১।২১) "তস্করাণাং পতয়ে নমঃ" প্রভৃতি এবং অথর্ব্ববেদের রাজন্যবর্গ দ্বারা ব্রাহ্মণের স্ত্রী হরণ ও গরু মারিয়া খাওয়ার কাতরোক্তি কেন উল্লিখিত হইবে? পার্জিটার ভুলিয়া যান যে (তিনি রামায়ণের গল্প বাদ দিয়াছেন) মহাভারতের এই গল্পও ব্রাহ্মণের দ্বারা রচিত; উহাতে শ্রেণী-সংগ্রাম গোপন করা হইলেও, পরশুরামের পরাজয় স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সীমারও লাসেন মহাকাব্য সমূহের মধ্যে এই শ্রেণী-সংগ্রামের চিহ্ন সুপরিস্ফুট দেখিতে পান (Lassen—I (2), 705 ; Zimmer—pp. 19-71.)। অন্যপক্ষে জৈনপুস্তকে বর্ণিত আছে যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র সুভৌম একুশবার ক্ষিতি নিঃব্রাহ্মণ করিয়াছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণদের (রচিত) জনশ্রুতির ইহাই পাল্টা জবাব।

১২। Lassen—vol. I, p. 705 : Shama Sastry—Evolution of Indian Polity : pp. 49—74.

একজন ব্রাহ্মণই একা তাহার স্বামী—একজন রাজন্য নয়, একজন বৈশ্য নয়। ইহা সূর্য্য তাহার স্থান হইতে পঞ্চজনকে (পঞ্চকৌম) ঘোষণা করিয়াছে" (অথর্ব্ব ৫।১৭।৮)। এই শ্লোকদ্বয় ব্রাহ্মণদের অন্যান্য শ্রেণী সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াইয়ের নজীর মাত্র। ইহা দ্বারা 'বহুস্বামিত্ব' (polyandry) প্রথা প্রমাণিত হয় না। পুনঃ বলা হইতেছেঃ "তাহারা দেবতা এবং মানুষদের প্রত্যর্পণ করে, যখন রাজারা ন্যায় বিচার করিয়া ব্রাহ্মণদের স্ত্রী প্রত্যর্পণ করে" (অথর্ব্ব ৫-১৭ ; ১০) : "যখন তাহারা ব্রাহ্মণদের স্ত্রী প্রত্যর্পণ করে এবং (তদ্দ্বারা) দেবতাদের নিকট নিজেদের পাপের শোধ-বোধ করে, তখন পুণ্যের পরিবর্ত্তে পৃথিবীতে আরও অধিক রাজত্ব পায়" (অথর্ব্ব ৫-১৭-১১)।...... হে নৃপতি, তুমি দেবতাদের এই গরু খাইতে দিও না ; হে রাজাদিগের বংশধর, তুমি ব্রাহ্মণের গরু মারিও না, যাহা তোমার খাওয়া উচিত নয়" (অথর্ব্ব ৫।১৮।১)।..."যে ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, যে তাহার কাছে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়, যে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া তাহার সম্পত্তি চায়—দেবতাদের ঐ উৎপীড়কের হৃদয়ে ইন্দ্র আগুন জ্বালায় ; যে এমন করে তাহাকে উভয় জগত ঘৃণা করে" (অথর্ব্ব ৫।১৮।৫।)..."অগ্নির প্রিয় তনুর ন্যায় একজন ব্রাহ্মণ অবধ্য ; সোম হইতেছে আত্মীয়, ইন্দ্র অকল্যাণ হইতে তাহার রক্ষাকর্ত্তা (অথর্ব্ব ৫।১৮।৬)।

এই সকল শ্লোকে ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে তাহাদের উপর রাজন্যবর্গের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া শেষোক্তদের অভিসম্পাত করিতেছে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে উভয় শ্রেণীই অন্যায় ও অবিচার করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বৈদিক সাহিত্যে এই শ্রেণী-সংগ্রামের উল্লেখ অনেক স্থলেই আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা রাজন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে (২,৫,১০,১ ইত্যাদি)। আবার মৈত্রিয়াণী সংহিতা (৪,৩,৮), বাজসনেয় সংহিতা (২১।২১) প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয়ের উপর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছে। কখন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যুদ্ধ হইয়াছে (কাথক সংহিতা ১।৮।৫) ; যজ্ঞ করিবার ক্ষমতা (অধিকার) পাইয়া ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় ক্ষত্রিয়কে জন সাধারণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত করাইয়াছে (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২,২,১১,২ ; মৈত্রিয়াণী সংহিতা ২,৬,৫ ; ২,১,৯ প্রভৃতি ; কথক সংহিতা ১৯।৮ প্রভৃতি) বা অন্য ক্ষত্রিয়ের সহিত কলহ বাঁধাইয়া দিয়াছে (মৈত্রীয়াণী ১১,৩,৩,১০)। আবার কোন কোন স্থানে

জনসাধারণ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে (তৈত্তিরীয় ২,২,১১,২ : মৈত্রিয়াণী ১,১,৫ ; ২,১,৯ , কথক ২৯।৮ প্রভৃতি)।

এই শ্রেণী সংগ্রামের সময় যখন রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণের দাবীতে অন্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন অভিজাতশ্রেণীর নামে অনেক অত্যাচারের কাহিনী অথর্ব্ববেদে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে (অথর্ব্ব ৮-১২)। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ওয়েবারের মত—এই সময়কার চিত্র অঙ্কিত করিয়া যজুর্ব্বেদের "শতরুদ্রিয়" রচিত হয় (বাজসনেয় ১৬=তৈত্তিরীয় ৪, ৫, ১-১১=কাথ ১৭, ১১-১৬)। ওয়েবার বলেন, সাধারণতঃ এই সময়ের ভারতীয় জীবনের চিত্র বড় সুবিধাজনক নয়। অনেক প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাতি, খুন, জুয়াচুরি, রাহাজানি (বাজ ২০ -২২) দ্বারা সেই সময় বড় বিপজ্জনক বলিয়াই মনে যয়। এই সময়ে অনেক বর্ণসঙ্কর জাতিরও উল্লেখ আছে (বাজ ২৬, ২৭)। ইহা স্বাভাবিক যে এই জাতিগুলি বিনা প্রতিবাদে সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া যায় নাই। তাহারা প্রকাশ্যে বা গুপ্তভাবে তাহাদের অত্যাচারীদের উপর প্রতিশোধ নিয়াছে। এই সময়ে যে দেবতার (রুদ্র) আরাধনা হইত, সেও অত্যাচার ও ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। এইজন্য মনে হয় 'শতরুদ্রিয়' স্তোত্র মহাকাব্যের সময়ের পূর্ব্বে এবং একটা মধ্যবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছিল (১৩)।

ওয়েবার বলেন, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পুরোহিত শ্রেণী দৃঢ়তা সহকারে

১৩। Weber—"Ind. Stud.", 2, 32. সংস্কৃত ভাষায় 'শতরুদ্রিয়' স্তোত্রে গিরিশ, 'শিব,' 'পিনাকং,' 'ত্রিশূলাদিবং,' 'নীলগ্রীবা,' 'পশুপতয়,' 'কপর্দ্দিনে' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা রুদ্রকে সম্বোধিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে বৈদিক রুদ্রকে পৌরাণিক ত্রিশূলধারী 'শিবে' পরিণত করা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানটি কখন হয় তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ইহা নিশ্চয়ই বৈদিক যুগের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। যখন পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি রচিত হয় তখনই ত্রিশূলধারী নীলকণ্ঠ শিবের সৃষ্টি হয়। আবার মহেনজো-দাড়োতে ত্রিশূল, লিঙ্গপূজা, যোনীপূজা, ধ্যানী যোগীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কখন বৈদিক রুদ্র ও সিন্ধু উপত্যকার লিঙ্গোপাসনা (ইহাই কি বেদে ঘৃণিত 'শিশ্নোদেবা' পূজা ছিল?) মিলিয়া ত্রিশূলধারী, পিনাকী, নীলকণ্ঠ হিন্দুর শিব বা মহাদেবের কল্পিত হইল তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। শতরুদ্রিয়ের এই অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যদ্বারা ইহাকে পরে লিখিত হইয়া বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ওয়েবার বলেন, বৌদ্ধদিগের মতে এই স্তোত্র তাহাদের বিরুদ্ধে রচিত হইয়া পরে বেদে সংযোজিত করা হইয়াছে।

নিজেদের দাবী আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল ; এবং উহা বৃথা যায় নাই। অবশেষে তাহাদের চারিটি দাবী গ্রাহ্য হয় (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১,৫,৭,১) : (১) 'অর্ঘা'—অর্থাৎ প্রত্যেকে পুরোহিতকে সম্মান করিবে ; (২) 'দান'—প্রত্যেকে তাহাকে উপঢৌকন দিবে ; (৩) 'অজেয়তা'—তাহাকে কেহ অত্যাচার বা অবনমিত করিতে পারিবে না ; (৪) 'অবধ্যতা'—কেহ তাহাকে হত্যা করিতে করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় ; এবং উহাও স্বার্থ-দুষ্ট। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যজুর্ব্বেদের সময় চারিটি শ্রেণী উদ্ভূত হয়। বেদের ব্রাহ্মণকাণ্ডে যেমন ক্রিয়াকলাপ, যাগ-যজ্ঞের বহরের বর্ণনা আছে, তেমন যজুর্ব্বেদের সময় চারি শ্রেণী বা চতুর্বর্ণ বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু "ইহা পরবর্ত্তীকালের মত কড়া ছিল না"। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার গরিমাও বড় বাড়াবাড়ি করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ক্ষমতা যেমন রাজা ও যোদ্ধা রাজন্যদের হস্তে ছিল, এই সময় হইতে ব্রাহ্মণদের (পুরোহিতদের) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই যুগেই আমরা ক্ষত্রিয়দের দ্বারা ব্রাহ্মণদের দাবী গ্রাহ্য করাইয়া নেওয়ার কথা পাই। কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণদের তরফের কথা। রামায়ণে ইহা অন্যভাবে ব্যক্ত হইয়াছে (১৩ক)। সাম শাস্ত্রীর মতে, এই শ্রেণী-সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণই জয়লাভ করিয়াছিল। পরশুরাম ইক্ষাকুবংশীয় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে দক্ষিণাপথে গিয়া বাস করে। মালাবারের নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের জনশ্রুতি, যে—তাহারা পরশুরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত ঔপনিবেশিকদের বংশধর—ইহা সামশাস্ত্রীর মতে সম্ভবপর। কারণ, তাঁহার মতে এই প্রথা (১৪) সেখানে পরশুরাম কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিনের ব্রাহ্মণ আধিপত্যের ব্যাপারে ঠিক 'ব্রহ্মগাভী' ও 'ব্রহ্মজায়া' প্রথা পাওয়া যায় না। সামশাস্ত্রীর মতে—'ব্রহ্মজায়া' ও 'ব্রহ্ম-গাভী' নিয়া ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণী বিরোধ উপস্থিত হইত ; এবং ক্ষত্রিয়েরা তাহাদেরই সন্ততি। প্রধান পুরোহিত ও প্রথমা ব্রহ্মজায়াই রাজ-

---

* ১৩ক। জৈন ধর্ম্মপুস্তক সমূহে উক্ত হইয়াছে যে কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের পুত্র স্বভৌম একবিংশতিবার ক্ষিতি নির্ব্রাহ্মণা করিয়াছিল :—জৈন "হরিবংশ পুরাণ" ও স্বভৌম চরিত" দ্রষ্টব্য।

১৪। R. Shama Sastry—Study of Indian Polity : pp. 43, 73, 74.

শক্তি হস্তে পাইত। অন্য পুরোহিত ও ব্রহ্ম জায়াদের সন্তানেরা Militia-র ন্যায় একটি সৈন্যদল গঠন করিত। রাজা ও তাহার সৈন্যগণ বিবাহ করিতে পাইত না। কতকগুলি রাষ্ট্রের রাজারা উক্ত প্রথার প্রতিবাদ করিয়া নিজেরা ব্রহ্মজায়াদের বিবাহ করে। 'ব্রহ্মগাভী' স্তোত্রপাটে বোঝা যায় যে গরু নিয়া মধ্যে মধ্যে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কলহ হইত। সামশাস্ত্রীর মতে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, পরশুরাম ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত কলহ "ব্রহ্মজায়া" ও ব্রহ্মগাভী" লইয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যে ব্যাপার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণাধিপত্যের পরে সমাজে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বে নয়। তাহার ব্যাখ্যা প্রসূত অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যবাদের বুজরুকি বা বাহাদুরীর গল্প বলিয়া বোধ হয়। অপরাপর সংস্কৃতজ্ঞ বিশারদেরা এই শ্লোকগুলির এইরূপ ব্যখা করেন নাই। বোধ হয় সুদূর দক্ষিণ ভারতে নাথার জাতির প্রতি নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের অত্যাচারের চিত্র সামশাস্ত্রী মহাশয় বেদে দেখিতে চান। সেইজন্যই এই অদ্ভূত গল্প বেদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে! অবশ্য ঋকবেদে রাজন্য কন্যাদের সহিত ঋষিগণের বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে। আবার সেখানে ঋষি কন্যাদেরও রাজন্যবর্গের সহিত বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়। ঋক বেদে ৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে রাজা রথবীতি তাহার কন্যাকে শ্যাবাশ্বের সহিত বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই মণ্ডলের অপর একটি শ্লোকে (১৮) উল্লিখিত আছে—"সাম যোগ সম্পন্ন হইলে তুমি আমার হইয়া রথবীতিকে ইহা নিবেদন করিও যে তাঁহার কন্যার (প্রতি) আমার প্রণয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।" ইহা হইতে একটি রাজকন্যার সহিত জনৈক ব্রাহ্মণের বিবাহের সংবাদ জানা যায়। অপরপক্ষে, ক্ষত্রিয় রাজার সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের সংবাদও আমরা ঋকবেদে (১,১২৬,৬-৭) ও পুরাণে (বৃহৎ দেবতা ৩,৩৫৫-৪৩৩) পাই, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় কথিত ব্রহ্ম জায়ার সন্ধান আমরা এই সকল শ্লোকে পাই না। বরং অথর্ব্ববেদে ৫,১৭,১০) উল্লিখিত আছে— (এবম্প্রকারে) দেবতারা তাহাকে প্রত্যর্পণ করে, (এমতে) পুরুষেরা স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করে। রাজারা যাহারা তাহাদের সত্য রক্ষা করিয়াছিল তাহারা ব্রাহ্মণের বিবাহিত স্ত্রী ফিরাইয়া দেয়।" অথর্ব্ববেদের অপর এক শ্লোকে বলা হইয়াছে—"অন্যলোক তাহার ঘরে (একজন ব্রাহ্মণ

স্ত্রীকে) আনয়ন করিলে সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী ভীতিপ্রদ বা ভীষণ হয়। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ পর্য্যন্ত সে অমঙ্গল আনয়ন করে (৫,১৭,৬)।"

অতঃপর অথর্ব্ববেদের (৫,১৮,১) "ব্রহ্মগাভী" স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—"হে নৃপতি, দেবতারা এই গাভী তোমায় আহার করিতে দেয় নাই, হে রাজন! ব্রাহ্মণের গরু ভক্ষণ করিতে চাহিও না ; উহা কেহ খাইতে পারে না"। অপর এক শ্লোকে (৫,১৮,৭) বলিতেছে—"যে মূর্খ ব্রাহ্মণের খাদ্য খায় এবং মনে করে ইহার আস্বাদন ভাল, সে খায় বটে, কিন্তু গরু হজম করিতে পারেনা। কারণ শত কাঁটা সংলগ্ন থাকে।" আবার আর একটি শ্লোকে (৫,১৮,১০) বলিতেছে, "বৈতহব্যেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কারণ তাহারা জনৈক ব্রাহ্মণের গরু ভক্ষণ করিয়াছিল।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পরাভূত

‘ওকে আসতে বারণ করে দিতে পারো না, মা ?’

মেয়ের মুখে কথাটা অত্যন্ত অদ্ভুত শোনালো। স্নেহলতা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বললেন, ‘তোর বন্ধু, তুই বারণ করলেই তো পারিস।’

‘তবু তুমি অভিভাবক, মা। বারণ করাটা তোমারই শোভা পায়।’

‘আমি তো এতে বারণ করার কিছুই দেখতে পাই না।’ স্নেহলতা য়্যালকোহলে তুলো ভিজিয়ে ইনজেকশানের সূঁচ মুছতে লাগলেন: ‘তোকে যদি তার ভালো লেগে থাকে, সে তো ভালোই।’

‘ভালোই ?’ মায়ের চোখের মধ্যে অণিমা তীক্ষ্ণ চক্ষু ফেললো। শূন্য থেকে খানিকটা হাওয়া মুখে করে নিয়ে বললে, ‘অত্যন্ত লজ্জার কথা মা, অত্যন্ত বিশ্রী।’

স্নেহলতা এগিয়ে এসে জিগগেস করলেন, ‘এর আগেরটা কোন হাতে দিয়েছিলি ?’

অণিমা তার ডান বাহুটা বাড়িয়ে ধরলো।

বেঁধা জায়গাটা ডলে দিতে দিতে স্নেহলতা বললেন, ‘বিয়েটাই একমাত্র বাকি আছে। কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, দিন ফিরেও যেতে পারে বা।’

ব্রজলাল আজ বিকেলবেলায় এসেছে। ইচ্ছে ছিলো অণিমাকে নিয়ে কোথাও যদি বেরুনো যায় বেড়াতে।

দোতলার ফ্ল্যাট। উঠেই খানিকটা বসবার জায়গা, গোল করে কয়েকখানা চেয়ার সাজানো। পিছনে দেয়াল, সামনে দু'খানা ঘর, পাশাপাশি। দরজায় পুরু পর্দা ঝুলছে। পশ্চিমের ঘরটাতে স্নেহলতা রুগী দেখেন। পুবেরটা শোবার, মা ও মেয়ের জন্যে আলাদা খাট পাতা।

দুটোর একটাতেও ব্রজলাল এখনো ঢোকেনি। বাতাসে পর্দা উড়ে যাবার

সময় যা একটু দেখেছে এই বাইরে বসে। ওদের পরে আর কী কোথায় আছে সে অনুমান করতে পারে মাত্র।

আজ চোখে পড়লো পূবের ঘরের পর্দার পিছনে দরজা খিল-দেয়া। মেঘলা পেয়ে গা ঢেলে খুব একচোট ঘুম দিচ্ছে বুঝি অণিমা।

ঝি এলো বেরিয়ে পশ্চিমের ঘর দিয়ে।

'দিদিমণি আছে ?'

'আপনাকে বসতে বললে।'

'কী করছে ?'

ঝি একটু হাসলো। বললে, 'সিগরেট খাচ্ছে।'

ব্রজলাল থ হয়ে গেল। পাঞ্জাবির যে পকেটে তার সিগারেটের প্যাকেট ও দিয়াশলাইর বাক্স থাকে সেটা সে একটু অনুভব করলো হাত দিয়ে। অন্য-মনস্কের মতো ধরালো একটা সিগারেট। ভাবলো, সামনাসামনি খেতেই বা লজ্জা কী!

চেয়ার টানা থেকেই অণিমা বুঝেছে কার ঐ শব্দ। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান সে সবে দিয়েছে, মুখের থেকে ধোঁয়াটা তখনো নেয়নি বুকের মধ্যে। সিগারেট একটা শেষ হতে অণিমার পনেরো মিনিটের কমে হয় না। রয়ে-সয়ে জিরিয়ে-জিরিয়ে একটু-একটু করে খাবার ওটা জিনিস, এক ঢোঁকে গিলে ফেলার মতো নয়। একবার ধরিয়ে নিবিয়ে ফেলার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। কিন্তু পনেরো মিনিট তাকে বাইরে বসিয়ে রাখতেও মায়া করে। টানটা দীর্ঘ করতে গিয়ে অণিমার চোখে জল এলো, তাকালো একবার দরজার দিকে ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে আগেই বন্ধ করেছিলো সেটা।

যতদূর সম্ভব গিলে-গিলে সিগারেটটা অণিমা শেষ করলো। হ্যাঁ, ওটা সম্পূর্ণ খেয়ে না নিলে মোটেই সে সুস্থ বোধ করতো না। সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সে মুখ ধুলো সুগন্ধি একটা মাউথ-ওয়াশে। কব্জি-পর্য্যন্ত-হাতা গলা-বন্ধ ব্লাউজ পরে শাড়িটা বিক্ষেপে বদলে নিলো। চুলটা ঠিক করলো কি না-করলো। সন্দেহ হলো চোখের কোলে কালি পড়েছে, স্নো ঘষে-ঘষে সেটাকে একটু ফিকে করলো। ঘাড়ে ও গলায় বুলোলো একটু সেন্ট।

শোবার ঘরের দোর খুললো না, বেরুলো পাশের ঘর দিয়ে।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে।' শিথিল ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে অণিমা হাসলো। বসলো একটা চেয়ারে, একটু বা দূরে। চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে, একটু টান হয়ে।

'কিন্তু আর বসবো না।' ব্রজলাল অস্থির গলায় বললে, 'চলুন, এখুনি বেরিয়ে পড়ি।'

যে ডাকে সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠবার কথা সে ডাকে অণিমা ভয় পেলো। ঈষৎ নিচু গলায় বললে, 'মা বাড়ি আছেন যে।'

উত্তরটা ব্রজলাল একেবারেই প্রণিধান করতে পারলো না। মা বাড়ি আছেন—থাকবেনই তো বাড়ি—অনেক দিন ধরেই তো আছেন। কত-কত দিন সে আরো এসেছে, কোনোদিন স্নেহলতা ছিলেন, কোনোদিন ছিলেন না, একনজর কোনোদিন দেখেছেন, কোনোদিন বা লক্ষ্যের মধ্যেই আনেন নি। একদিন তো দস্তুরমতো অভ্যর্থনা করে বসিয়েছিলেন মনে আছে।

'আপনার সঙ্গে আমার মেলামেশাটা তিনি পছন্দ করছেন না।' অণিমা চোখ নামালো।

ব্রজলাল তাকালো একবার অণিমার বেশবাসের দিকে, হাওয়ায় শুঁকলো বা একটু তার গায়ের গন্ধ। বললে, 'আপনি করছেন তাই যথেষ্ট।'

'কিন্তু মার আশ্রয়ে মার বাড়িতে যত দিন আছি—'

'সেই জন্যেই তো বলছি হাওয়া বদলাতে চলুন বাড়ির বাইরে।'

অণিমা কথা বললো না। শ্রান্তের মতো ঘাড় ফেরালো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধের মতো ব্রজলাল প্রশ্ন করলেঃ 'চাকরিটা আপনি ছাড়লেন কেন?'

সেই দিন যা উত্তর দিয়েছিলো আজো তাই বললে অণিমা। বললে, 'মা বলেন, চাকরি করার দরকার কী। যত দিন আমি আছি তোর খাবার-পরবার ভাবনা নেই।'

'তবু তো করেছিলেন কয়েক মাস।'

'কি জানি খেয়াল হয়েছিলো। একটু চেষ্টা করে দেখতে গিয়েছিলুম। সারা দিন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতো। কাউনসিলর প্রভঞ্জন মল্লিক মার

চেনা, কর্পোরেশনের ইস্কুলে জুটিয়ে দিলেন মিসট্রেসি, নিয়ে নিলুম। মাস আষ্টেক ছিলুম বোধ হয়। কিন্তু.' অণিমা ভাসা-ভাসা চোখে তাকালো : 'চাকরির কথা জিগগেস করছেন কেন ?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েও তো ফের ফাঁকা-ফাঁকা লাগা উচিত ?'

'তা তো উচিত।' অণিমা ম্লান চোখে হাসলো।

'টিউশনি ছুটো আছে ?'

'সকালেরটা দূরে, ছেড়ে দিয়েছি। সন্ধেরটা পাড়াতে আমি যাই না, মেয়েটিই আসে। তাও সব দিন নয়।' অণিমা আবার ভয়ে-ভয়ে তাকালো : 'কিন্তু এ-সব কথা কেন ?'

ব্রজলাল গম্ভীর গলায় বললে, 'দেখছি বাড়ি থেকে আপনার বেরুনোই একদম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'প্রায় তাই।'

'বাইরে যদি না পাই তবে কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?'

'কেন, এইখানে।' মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল অণিমার। পরে শুকনো গলায় সে একটা ঢোঁক গিললো : 'দিন-ক্ষণ জানিয়ে আপনাকে আমি চিঠি দেব। সেই অনুসারে—'

'কিন্তু ও-ছাড়া অন্য দিন যদি দেখা করতে ইচ্ছে করে ?'

অণিমা উত্তর দিলো না।

'রোজ যদি ইচ্ছে করে ?'

এবারো কোনো জবাব নেই।

'মা কারু চিরকাল থাকে না।' হঠাৎ খাপছাড়ার মতো ব্রজলাল বলে উঠলো।

'কেউই আমরা চিরকাল নেই।' আবার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অণিমার।

প্রথম ছুই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তৃতীয় প্রশ্নের এই নিস্পৃহ জবাবে ব্রজলালের রাগ হলো। দ্রুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তবে যাই।'

চেয়ারের হাতল থেকে অণিমার ডান হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়লো। বললে, 'না, যাবেন না, বসুন।'

ব্রজলাল বসলো। বললে, 'কিন্তু আপনার মা রয়েছেন যে।'

'যখন একবার দেখে ফেলেছেন তখন তো দেখেই ফেলেছেন। এখন আরো খানিকক্ষণ থেকে গেলে ক্ষতি কী?'

'ওঁর এবেলা কল্ নেই?'

'হয়তো রাতের দিকে আছে, জানি না। ফিরেছেনই তো প্রায় দুটোয়।'

'কোথায় উনি?'

'ও-পাশের ঘরে বসে কী পড়ছেন দেখলুম। কিন্তু চোখ কেবল বইয়েতেই নয়।'

ব্রজলাল হাঁসফাঁস করতে লাগলো। বললে, 'যেতেও বলছেন থাকতেও বলছেন এই অবস্থায় কী করি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

'গল্প করুন।'

ব্রজলাল পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটা বের করে অণিমার দিকে এগিয়ে ধরলো। বললে, অত্যন্ত সহজ নির্লিপ্তভাবেই বললে, 'নিন, খান একটা।'

'সিগারেট?' মুহূর্তে অণিমার মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললে, 'এ আবার আমি কবে খেতে গেলুম! কোনো ভদ্র মেয়ে খায় নাকি এই সব?' বলে সে শব্দ করে হাসলো। কেমন রুগ্ন অস্বচ্ছন্দ হাসি।

ব্রজলাল গুটিয়ে নিলো হাত এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও। বুঝতে বাকি রইলো না, সমস্তই আগাগোড়া মিথ্যা, একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি।

'হ্যাঁ, আমার মাইনে অত্যন্ত কম; মোটে একশো টাকা, আর চাকরিটাও বলে বেড়াবার মতো নয়। তাই আপনার পছন্দ হচ্ছে না শেষ পর্য্যন্ত। তাই যদি মনে ছিলো তবে আগে এত কাছে ডেকেছিলেন কেন? এটাই বা কোন ভদ্রমেয়ের ব্যবহার? আর, আমি ছাড়া কেই বা সাড়া দিতো আপনার ডাকে? নিজের দিকেও তাকিয়ে দেখবেন একবার। ঐ তো চেহারা—ঐ তো—' ব্রজলাল বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় ট্রাম-ষ্টপের কাছে উত্তেজিত পদক্ষেপে সে পাইচারি করছিলো যতক্ষণ না ট্রাম একটা আসে। উঠতে যাবে, দেখলো ট্রাম থেকে স্নেহলতা নামছেন, হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ আর ষ্টেথিসকোপ।

ব্রজলালের ইচ্ছে হলো চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে স্নেহলতার পিছু-পিছু আবার সে উপস্থিত হয় সেখানে। আরো কতগুলি স্পষ্ট কঠিন ও নির্লজ্জ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে।

স্নেহলতা উপরে এসে দেখেন অণিমা চেয়ারের কাঁধে দুই হাত রেখে মাথা গুঁজে বসে আছে। বুকের পাশটা ঘন-ঘন ওঠা-নামা করছে।

উঁচু-হিলের আওয়াজ শুনে অণিমা চোখ চেয়ে দেখলো, মা।

'ওকে বারণ করে দিয়েছিস বুঝি আসতে?' স্নেহলতা তিরস্কারের ভঙ্গিতে জিগগেস করলেন।

'বারণ করলেও শুনতে চায়না, মা।' অণিমা শিথিল পায়ে চলে গেল তার শোবার ঘরে।

আলো জ্বালবার মতো সময় হয়েছে কিন্তু সুইচে হাত দিতে সাহস হলো না। পাছে চকিতে আরশিতে সে নিজের মুখ দেখতে পায়। ঐ তো চেহারা!

আস্তে-আস্তে বসলো গিয়ে তার চেয়ারে, জানলার ধারে। টেবলের উপর সিগারেটের বাক্স। বাক্স থেকে সিগারেট একটা নিয়ে একটুখানি ভাবলো এখুনি ধরাবে কি না। আরো কতক্ষণ যাক। আরো যতক্ষণ যায়। আরো একটু রাত হোক।

টেবলের উপর মাথা গুঁজে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো অণিমা বসে রইলো।

ঐ তো চেহারা।

তবু দু'দিন যেতে না যেতেই ব্রজলাল উপস্থিত। তেমনি বিকেল।

শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল-দেয়া। পশ্চিমেরটা খোলা, পর্দা ঝুলছে।

চেয়ার টানার শব্দ থেকেই বোঝা গেল। বেরিয়ে এলেন স্নেহলতা।

'অণিমা কোথায়?'

'ঘরে।'

ওঁর সঙ্গে একটা শেষ কথা ছিলো।' অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে ব্রজলাল বললে।

'ওর শরীরটা আজ ভালো নেই।'

খানিকটা অবাক হলো ব্রজলাল। কোনদিন ভাবতেই পারেনি অণিমার সম্বন্ধে এমন কথা কখনো শুনতে হবে। যতটুকু সে দেখেছে, শরীর সম্বন্ধে অণিমা বড়ো বেশি হুঁসিয়ার।

তবু, কেউ অসুস্থ শুনলেই মনটা নরম হয়। ব্রজলাল জিগগেস করলে: 'কী অসুখ?'

'এই সর্দি, কাশি—জ্বর।'

'এ-সময়টা হচ্ছে বটে জ্বরজারি।' ব্রজলাল ঈষৎ দ্বিধা করলো: 'আমি ওঁকে দেখতে পারি না একটু?'

তবে এত কাছে ডেকেছিলেন কেন? কথাটা মনে পড়লো ব্রজলালের। আশ্চর্য্য, কোনোদিন তার বিছানার পাশটিতেও সে বসেনি। দুই চেয়ারের মাঝখানে ছিলো সর্বদা একটা টেবলের ব্যবধান। তারা সম্ভ্রান্ত তো! তাদের তো বয়েস হয়েছে!

কাছে ডাকা মানে কি শরীরের কাছে ডাকা? সান্নিধ্য মানে কি সামীপ্য?

ভাসা-ভাসা ওর সঙ্গে আলাপ, দিন গুণে দেখলে এক বছর এই ঘুরে এসেছে। আগেতে বাইরে, ইদানি বাড়িতে। ছিন্ন ক'টি মুহূর্ত্ত। তবু, এত তারা শ্রান্ত, এত দিনের আলাপ বা প্রতীক্ষার কোনো দরকার ছিলো না। ব্রজলাল সাঁইত্রিশ, অণিমা ত্রিশের ধারে।

ব্রজলাল তাকালো দরজার দিকে।

স্নেহলতা সাদাসিধে গলায় বললেন, 'অনেকক্ষণ পরে এখন ও একটু ঘুমুচ্ছে।'

'অনেকক্ষণ পরে! খুব মাথা ধরে ছিলো বুঝি?' কেমন ছেলেমানুষের মতো বললে ব্রজলাল। কারু মাথা ধরলে যে তার মাথা টিপে দেয়া যায় এমন একটা কথা অনেক আগে, ছেলেবয়সে, কোথায় যেন সে পড়েছিলো।

'বলতে পারি না।'

অথচ, এ বাড়িতে আসে ব্রজলাল দেখেনি আর এমন কাউকে। এলে বলতে বাধা ছিলো না অণিমার। অন্তত না-বলার অর্থ ছিলো না কোনো। এ বয়সে যা লাগে তা আঘাত নয়, শূন্যতার অভ্যস্ত একটু আস্বাদ। ব্রজলাল

স্নেহলতাকে একবার দেখলো। এই গরিব লেডি-ডাক্তার আর তার গ্রাজুয়েট মেয়ে—এরা কারা ?

'দেখুন,' ব্রজলাল উঠে দাঁড়ালো : 'ওঁর যখন ঘুম ভাঙবে ওঁকে বলবেন আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম।'

স্নেহলতা থমকে গেলেন।

'সেদিন ওঁকে কতগুলো অন্যায় কথা বলেছিলুম আমি। বলবেন সে-সব ভুলে যেতে।'

যেন খানিকটা আলো ঠিকরে পড়লো—ব্রজলালের মনে হলো যেন হঠাৎ শোবার ঘরের দরজা খুলে অণিমা বেরিয়ে এসেছে। চমকে চাইলো পিছনে, আলোও গেল মিলিয়ে।

পড়ন্ত রোদ তার চশমার কাঁচে লেগে দেয়ালে পিছলে পড়েছে।

রাত্রে একটা ট্রেনের ঠিকানা দিয়ে ষ্টেশনে দেখা করতে বলে চিঠি দিয়েছে অণিমা। দিন-ক্ষণ জানিয়ে আপনাকে আমি চিঠি দেব, সেই অনুসারে—। ব্রজলাল চঞ্চল হয়ে উঠলো। এত দিন পরে একসঙ্গে কি তারা পালিয়ে যাবে নাকি ?

আপিস কামাই করে দুপুরবেলাতেই সে সমাগত।

একটু নতুন রকম মনে হচ্ছে—সময়টাই নতুন রকম। শোবার ঘরের দরজা এখন খোলা, পর্দাটাও উত্তোলিত। পিছন থেকে ঘরের মধ্যে অণিমাকে সে চিনতেই পারতো না যদি না দেখতো চেয়ারে বসে সে সিগারেট খাচ্ছে।

ধোঁয়ার একটা উৎকট কদর্য গন্ধ তার নাকে এলো। মড়া পোড়ার গন্ধ। এ সিগারেট ইজিপ্টের না দক্ষিণ আফ্রিকার তামাকের কিছু সে হদিস পেলো না।

শেষ না হতেই হাতের সিগারেটটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অণিমা ডেকে উঠলো : মা। যেন স্বাভাবিক ডাক নয়। বেদনায় বিকৃত। জলমগ্ন। সে-ডাক শুনে এলেন না স্নেহলতা। ঝিটা সামনা দিয়ে হেঁটে গেল, ভ্রূক্ষেপ করলো না।

ব্রজলাল ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। ঘুরে দাঁড়িয়ে একেবারে অণিমার সামনা-সামনি।

হন্তদন্তে চোখ তুলে অণিমা দেখলো ব্রজলালকে। যেন চিনতে পারলো। শূন্য থেকে খানিকটা হাওয়া মুখে করে নিয়ে বললে, 'আপনি ইনজেকশান করতে পারেন? তবে শিগগির—' কথাটা শেষ করতে পারলো না।

ব্রজলাল আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অনড়, অথর্ব। এমন কোনোদিন দেখেনি সে অণিমাকে। কল্পনার বাইরে এ অণিমা। চেয়ারে বসে হাতল দুটোর উপর দু' হাতের ভর রেখে গলা তুলে সে শূন্যে বাতাস খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তার বুক হাপরের মতো উঠছে আর পড়ছে অনবরত। পেটটা সেঁধিয়ে যাচ্ছে গর্ত হয়ে।

'কী দাঁড়িয়ে আছেন হাঁ করে?' অণিমা দমকে-দমকে বললে, 'টেবলের থেকে ইনজেকশানের সিরিঞ্জটা নিন, ওখানেই য়্যাড্রিনেলিনের শিশিটা আছে, দাগ দেখে এক সি-সি তুলে নিয়ে আসুন। একটা ইনজেকশান দিতে হবে। মা বাড়ি নেই। কল থেকে এখনো ফেরেন নি।'

ব্রজলাল চোখে অন্ধকার দেখলো। অস্থিরের মতো বললে, 'আমি এক্ষুনি একজন ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

'না, না, ডাক্তার লাগে না। ও আমিই পারি। আমিই দেব। এখন টান খুব উঠে গেছে বলে টেবলটা পর্যন্ত যেতে পাচ্ছি না। ভীষণ কষ্ট। দয়া করে নিয়ে আসুন ঐ সিরিঞ্জ আর ওষুধের শিশিটা।'

কী করছে কিছুই না বুঝে ব্রজলাল টেবল থেকে সিরিঞ্জে করে এক সি-সি য়্যাড্রিনেলিন তুলে আনলো।

সামান্য একটা সেমিজ শুধু গায়ে ছিলো অণিমার। তাই অনায়াসে বাম বাহুটা ব্রজলালের দিকে সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তলার দিক থেকে জোরে চেপে ধরুন হাতটা। দিন, আমিই প্রিক করছি। দেখছেন, ফুঁড়ে-ফুঁড়ে দুই হাতে আর আমার জায়গা নেই।'

ব্রজলাল এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো: 'য়্যালকোহল দিয়ে জায়গাটা একটু মুছে নিলে হতো না?'

'অত বাবুগিরির সময় নেই। কোনোরকমে সেরে ফেলতে পারলেই হলো। প্রাণ আমার যায়। হ্যাঁ, এবার হাত দিয়ে একটু ডলে দিন জায়গাটা। বুক আমার খুব দপদপ করছে—ও করে। আমাকে একটু হাওয়া করুন।'

বিছানা থেকে হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে ব্রজলাল হাওয়া করতে লাগলো। তার ভয় করতে লাগলো মুহূর্তে না-জানি কী অঘটন ঘটে যায় এক্ষুনি।

শ্রান্তের মতো চোখ বুজলো অণিমা।

ক্রমেই যেন শান্ত হয়ে আসছে ঝড়। ক্রমেই যেন অণিমা ফিরে আসছে। এখন তার মুখের যে ভাব সেটা কষ্ট নয়, লজ্জা।

ইসারায় বললো হাওয়া লাগবে না। এলোমেলো চুলগুলোকে খোঁপায় নিয়ে গেল, বেশবাসের শৈথিল্যকে শাসন করলে। গলার হারের সঙ্গে গাঁথা মাদুলিগুলো বেরিয়ে পড়েছিলো, সেগুলো পাঠিয়ে দিলো সেমিজের অন্তরালে।

আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। আলনা থেকে ব্লাউজটা তুলে নিয়ে ব্রজলালের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে পরে নিলো—সেই কব্জি-পর্যন্ত-হাতা গলা-বন্ধ ব্লাউজ। ব্রজলাল ভেবেছিল এবার বোধ হয় বিছানায় যাবে, কিন্তু দাঁড়ালো গিয়ে আয়নার সামনে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে তাড়াতাড়ি একটু পাউডার বুলিয়ে নিলো।

রাশি রাশি ওষুধে আকীর্ণ হয়ে আছে টেবলটা, দেখলে ভয় করে। তার ভিতর থেকে সিগারেটের বাক্সটাই ব্রজলালকে বেশি আকর্ষণ করছে। লক্ষ্য করে দেখলো এ তামাকের সিগারেট নয়, ধুতুরার। প্যারিস থেকে এসেছে।

সম্পূর্ণ তৈরি এখন অণিমা। এত তৈরি, চমৎকার সে হাসতে পারছে পর্যন্ত।

বললে, 'আসুন বাইরে।' আর বাইরে এসেই ঘরের পর্দাটা সে ফেলে দিলো।

ওটা যেন রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপট। ভাবলে ব্রজলাল।

বললে, 'এখন কেমন আছেন?'

নিশ্চিন্ত, একটু বা নিষ্ঠুর গলায় অণিমা বললে, 'ভালো।'

'এখন গিয়ে তবে একটু শোন। বড়ো কষ্ট পেয়েছেন।' ব্রজলালের কণ্ঠে শুধু এখন করুণা। শারীরিক করুণা।

'আর আপনি? হাওয়া করবেন পাশে বসে?' কালো চোখে অণিমা একটু ঝিলিক দিলো।

'করতে পারি, কিন্তু আপনার মা এসে দেখে ফেলেন সেই ভয়।' ব্রজলাল উঠে দাঁড়ালো।

'চললেন? ইনজেকশানের জায়গাটা যে ভীষণ ব্যথা করছে।'

'ও তো আর আপনার নতুন নয়। নূনের পুঁটলি করে সেঁক দিতে বলুন ঝিকে। এখন আর কথা বলবেন না, চুপচাপ একটু ঘুম যান।

ব্রজলাল চলে গেল।

রাত্রের ট্রেনের কথাটা ব্রজলালের মনে পড়লো বাইরে এসে। এবং রাত্রে কেমন আছে জানবার জন্যে যেতেই হবে ষ্টেশনে। না যায়, বাড়িতে গিয়েই তবে খোঁজ নিতে হবে।

স্নেহলতা বললেন, 'ঐ আসছে ব্রজলাল। সিগারেটটা ফেলে দে।'

অনেকগুলি ধোঁয়া ফুসফুসের মধ্যে নিয়ে অণিমা বললে, 'ওঁকে আর লজ্জা নেই, মা।'

গাড়িগুলির মধ্যে থেকে ব্রজলালের তাই চিনে নিতে দেরি হলো না।

'কেমন আছেন এখন?' ব্রজলালের কণ্ঠে শুধু উদ্বেগ।

'বেশ ভালোই আছি।'

'একা নাকি?'

'ভীষণ। যদিও গাড়িতে অসম্ভব ভিড়। আপনিও আসুন না।' এমন ভাবে বললে অণিমা, তার চোখের দিকে চাইতে হলো ব্রজলালকে।

'আসুন না, ব্রজলালবাবু।' ওপার থেকে স্নেহলতা মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি আসবেন বলে মেয়েদের গাড়িতে উঠিনি।'

'এই যে, নমস্কার।' পরে অণিমাকে লক্ষ্য করে ব্রজলাল বললে, 'ভারি আশ্চর্য তো, আমি যাবো, আর ওঁর আপত্তি হবে না?'

'না, হবে না। আপনি আসুন।' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে অণিমা ব্রজলালের হাত ধরলো।

'বা, আমি যাবো কোথায়!' ব্রজলাল উঠলো হেসে।

'কিন্তু আমি কোথায় যাচ্ছি একবারো জিগগেস করলেন না?' অনেক স্তব্ধতার পর, গাড়ি যখন ছাড়ো-ছাড়ো, জিগগেস করলে অণিমা।

'কোথায়?' ব্রজলালের মনে হলো প্রশ্নটা অবান্তর নয়।

'চিত্রকূট।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে কোজাগরী পূর্ণিমা-রাতে শিশিরে-ভেজা পায়েস খাবো।'

'সে আবার কী?'

'ওষুধ। দেখবেন আমি ভালো হয়ে যাবো একেবারে। আমার এই আজন্ম-কালের রোগ এক রাত্রে সেরে যাবে। দেখবেন—' চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে অণিমা হাসিমুখে স্কুলের মেয়ের মতো তরল গলায় বলতে লাগলো: 'আমি আর এমনি থাকবো না। হয়তো তখন একেবারে চেনাই যাবে না আমাকে। দেখবেন—ততদিন—'

ব্রজলাল একই জায়গায় নিশ্চলের মতো দাঁড়িয়ে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

চতুর্থ শিলানুশাসন

গিরনার

(ক) অতিকাতং অংতরং বহুনি বাস-সতানি বঢিতো এব প্রাণারংভো, বিহিংসা চ ভূতানং, ঞাতীসু অসংপ্রতিপতী, ব্রাম্হণ-স্রমণানং অসংপ্রতীপতী।

(খ) ত অজ দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমচরণেন ভেরী-ঘোসো অহো ধংম-ঘোসো, বিমান-দসণা চ হস্তি-দসণা চ অগি-খংধানি চ অঞানি চ দিব্যানি রূপানি দসয়িৎপা জনং।

(গ) যারিসে বহূহি বাস-সতেহি ন ভূতপুবে তারিসে অজ বঢিতে দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমানুসস্টিয়া অনারংভো প্রাণানং, অবিহীসা ভূতানং, ঞাতীনং সংপটিপতী, ব্রহ্মণ-সমণানং সংপটিপতী, মাতরি পিতরি সুস্রুসা, থৈর-সুস্রুসা।

(ঘ) এস অঞে চ বহুবিধে ধংম-চরণে বঢিতে।

(ঙ) বঢয়িসতি চেব দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা ধংম-চরণং ইদং।

(চ) পুত্রা চ পোত্রা চ প্রপোত্রা চ দেবানংপ্রিয়স প্রিয়সিনো রাঞো প্রবঢয়িসংতি ইদং ধংম-চরণং আব সবটকপা; ধংমংহি সীলংহি তিস্টংতো ধংমং অনুসাসিসংতি।

(ছ) এস হি সেস্টে কংমে য ধংমানুসাসনং।

(জ) ধংম-চরণে পি ন ভবতি অসীলস।

(ঝ) ত ইমংহি অথংহি বঢি চ অহীনী চ সাধু।

(ঞ) এতায় অথায় ইদং লেখাপিতং,—ইমস অথস বঢি যুজংতু, হীনি চ নো লোচেতব্যা।

(ট) দ্বাদস-বাসাভিসিতেন দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা ইদং লেখাপিতং।

অনুবাদ

(ক) অতীত কালে বহুশত বৎসর ধরিয়া প্রাণীহত্যা, জীবকে কষ্ট দেওয়া, জাতিদিগকে অসম্মান করা ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে অসম্মান করা বাড়িয়াছিল।

(খ) কিন্তু এখন দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মাচরণের দ্বারা লোককে বিমান-দর্শন, হস্তি-দর্শন অগ্নিস্কন্ধ এবং অন্যান্য দিব্যরূপ দেখাইয়া ভেরীঘোষণা ধর্ম্মঘোষণা হইয়াছে।

(গ) আজ দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মানুশাসনের দ্বারা প্রাণীহত্যা না করা, জীবকে কষ্ট না দেওয়া, জ্ঞাতিদের প্রতি সম্মান, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান, মাতার ও পিতার আজ্ঞাপালন ও বয়োবৃদ্ধদের আজ্ঞাপালন যেমন বাড়িয়াছে তেমন বহুশত বর্ষ ধরিয়া হয় নাই।

(ঘ) এইরূপ আরও অনেক ধর্ম্মাচরণ বাড়িয়াছে।

(ঙ) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এই ধর্ম্মাচরণ ভবিষ্যতেও বাড়াইবেন।

(চ) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর পুত্রগণ, পৌত্রগণ ও প্রপৌত্রগণ প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মাচরণ আরও বাড়াইবেন; ধর্ম্মে ও শীলে অধিষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন।

(ছ) ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই হইতেছে শ্রেষ্ঠ কাজ।

(জ) অশীলের দ্বারা ধর্ম্মাচরণ হয় না।

(ঝ) অতএব এই বিষয়ের (শীলের) বৃদ্ধি ও অহানি সাধু।

(ঞ) এই (শিলানুশাসন) এই উদ্দেশ্যে লিখিত হইল—যেন (তাহারা) এই বিষয়ের (শীলের) বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে, ইহার (শীলের) হানি যেন তাহাদের ভাল না লাগে।

(ট) দ্বাদশ-বর্ষাভিষিক্ত দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর দ্বারা ইহা লেখান হইল।

টিপ্পনী

(ক) অংতর = অন্তর = সময়, কাল। "অতিকা' অ" এখানে ২য়া বিভক্তির বদলে ৭মী বিভক্তি হওয়া উচিৎ ছিল।

(খ) ‘ত”=সং তস্মাৎ। “ভেরীঘোসো অহো ধংমঘোসো”=উৎসবের ভেরী-ঘোষণা ধর্ম্মঘোষণার কাজ করিয়াছে ; অহো <অভোৎ> সং অভবৎ= হইল, কিন্তু অহো-শব্দটি ‘সত্যই’ এই অর্থদ্যোতক সং ‘অহো!’ শব্দও হইতে পারে।

বিমানদর্শন—এইগুলি সম্ভবত বিভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আকাশে রথ দেখাইয়া লোককে ধর্ম্মাচরণ দ্বারা স্বর্গগমনের লোভ দেখান বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য ছিল। “হস্তি দর্শন” বোধ হয় বুদ্ধের প্রতীকস্বরূপ শ্বেত হস্তি, ইহাও বোধ হয় আতশবাজির সাহায্যে আকাশে দেখান হইত। “অগ্নিস্কন্ধ ও অন্যান্য দিব্যরূপ”ও বোধ হয় ঐরূপ আতশবাজির সৃষ্ট আকাশে দেবতাদের উজ্জ্বলরূপ।

(গ) সুস্রুসা—শুশ্রূষা=(কথা) শুনিবার ইচ্ছা=আজ্ঞাপালন। প্রাকৃত ব্যাকরণানুযায়ী কথাটি সুস্রুংসা বা সুস্স্রূসা হওয়া উচিৎ ছিল। থইর <স্থবির=বয়োবৃদ্ধ।

(চ) সবট-কপা <সং সংবর্ত্তকল্প=প্রলয়।

(ঙ) হইতে (ছ) পর্য্যন্ত বাক্যগুলিতে অশোকের সাধু ইচ্ছা ও সাধু উদ্যম সূচিত হইয়াছে।

(জ) বাক্যে অশোকের আন্তরিকতা বুঝা যায়। ধর্ম্ম শুধু মুখের কথার দ্বারা হয় না, চরিত্র না থাকিলে ধর্ম্মপালন হয় না।

(ঞ) বাক্যটি বোধ হয় তাঁহার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি ভবিষ্যৎবংশীয়দের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন।

পঞ্চম শিলানুশাসন

গিরনার

(ক) দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ (:)

(খ) কলাণং দুকরং ;

(গ) যো আদিকরো কলাণস সো দুকরং করোতি ;

(ঘ) ত ময়া বহু কলাণং কতং ;

(ঙ)　ত মম পুতা চ পোতা চ পরং চ তেন য মে অপচং আব সংবট্‌-কপা অনুবতিসরে তথা সো সুকতং কাসতি।

(চ)　যো এত দেসং পি হাপেসতি সো দুকতং কাসতি।

(ছ)　সুকরং হি পাপং ;

(জ)　অতিকাতং অংতরং ন ভূতপূর্বং ধংম-মহামাতা নাম।

(ঝ)　ত ময়া ত্রইদস-বাসাভিসিতেন ধংম-মহামাতা কতা।

(ঞ)　তে সব-পাসংডেসু ব্যাপতা ধামধিস্‌টানায় (চা ধংম-বধিয়া হিদসুখায়ে বা) ধংমযুতস চ যোণ-কংবোজ-গংধারাণং রিস্‌টিক-পেতিণিকানং যে বা পি অংঞে অপরাতা।

(ট)　ভতময়েসু ব (বংভনিভেসু অনথেসু বুধেসু হিদ-) সুখায় ধংম-যুতানং অপরিগোধায় ব্যাপতা তে৷　　　　:

(ঠ)　বংধন-বধস পটিবিধানায় (অপলিবোধায়ে মোখায়ে চা এয়ং অনুবধা) প্রজা কতাভীকারেসু বা থইরেসু বা ব্যাপতা তে।

(ড)　পাটলিপুতে চ বাহিরেসু চ (নগলেসু সবেসু ওলোধনেসু ভাতিনং চ মে ভাগিনিনাং) যে বা পি মে অঞে ঞাতিকা, সর্বত ব্যাপতা তে।

(ঢ)　যো অয়ং ধংম-নিস্রিতো তি ব (ধংমাধিথানে তি ব দান-সযুতে ব সব-পুঠবিয়ং ধংম-যুতসি বিয়াপটা) তে ধংম-মহামাতা।

(ণ)　এতায় অথায় অয়ং ধংম-লিপী লিখিতা (চিলথিতিক্যা হোতু, তথা চ মে পজা অনুবততু)।

গিরনারের এই লিপিটির কয়েক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানগুলি উপরে ( ) ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। ঞ, ট, ঠ, ড এবং ণ বাক্যগুলির লুপ্ত কথাগুলি কালসী-লিপি হইতে এবং ঢ বাক্যের লুপ্ত কথাগুলি ধউলি-লিপি হইতে উপরে ব্রাকেটের মধ্যে উদ্ধৃত করা হইল।

অনুবাদ

(ক)　দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিয়াছেন—

(খ)　কল্যাণ-সাধন দুষ্কর (কাজ) ;

(গ) যে কল্যাণ (কর্ম্ম) আরম্ভ করে সে দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করে ;

(ঘ) আমার দ্বারা বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ;

(ঙ) এবং আমার পুত্রগণ, পৌত্রগণ, এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহাদের পর আমার যে বংশধরগণ হইবে, তাহাদের মধ্যে যে এইরূপ অনুবর্ত্তন করিবে (অর্থাৎ আমার মত কল্যাণ-সাধন করিবে) সেও দুষ্কর কাজ করিবে।

(চ) কিন্তু যে তাহার (এই কল্যাণের) একাংশেরও হানি করিবে সে দুষ্কার্য্য করিবে ;

(ছ) কারণ পাপ কার্য্য করা খুবই সহজ ।

(জ) অতীতকালে ধর্ম্মমহামাত্র নামক কোন (কর্ম্মচারি) ছিল না ;

(ঝ) কিন্তু আমার অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরে আমি ধর্ম্মমহামাত্র (নামক কর্ম্মচারিদের নিয়োগ) করিয়াছি ।

(ঞ) তাহারা সব সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি যবন, কম্বোজ, গান্ধার, রিষ্টিক, পেতেনিক এবং আমার অন্যান্য অপরান্তদের (western borderers, পশ্চিম দেশবাসী প্রতিবেশী) মধ্যেও, যাহারা ধর্ম্মে যুক্ত তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের অধিষ্ঠানের জন্য, ধর্ম্মের বৃদ্ধির জন্য এবং তাহাদের হিত ও সুখের জন্য ব্যাপৃত আছে।

(ট) তাহারা ভৃত্যদের ও প্রভুদের মধ্যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে, ধনীদের মধ্যে, অনাথদের ও বৃদ্ধদের মধ্যে হিত ও সুখের জন্য এবং যাহারা ধর্ম্মে যুক্ত আছে তাহাদের মুক্তির জন্য ব্যাপৃত আছে ।

(ঠ) তাহারা বন্ধনবদ্ধ (বন্দী)-দের অর্থসাহায্য করিতে, বা বন্ধন মোচন করিতে বা (বন্দীদের) সন্তান থাকিলে, সেইরূপ বন্দীদের মুক্তিদান করিতে, এবং যাহাদের উপর যাদু করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে, বা বৃদ্ধদের মধ্যে ব্যাপৃত আছে ।

(ড) তাহারা পাটলিপুত্রে ও বাহিরের নগরগুলিতে, এবং আমার ভাইদের, ভগিনীদের ও অন্যান্য জ্ঞাতিদের অন্তঃপুরে—সর্ব্বত্র ব্যাপৃত আছে।

(ঢ) এই ধর্ম্মমহামাত্রগণ আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মে যুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে,

কে ধর্ম্মে অনুরক্ত, কে ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত, কে উপযুক্ত ভাবে দানে যুক্ত (তাহা নির্ণয় করিতে) ব্যাপৃত আছে।

(ণ) এই উদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইল—যেন ইহা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং যেন আমার ভবিষ্যৎবংশীয়েরা ইহার অনুবর্ত্তন করে।

টিপ্পনী

(ঙ) অপচং > সং অপত্য = সন্তান। কাসতি—বোধহয় সং কর্ষ্যতি ('করিষ্যতি'র স্থানে) হইতে নিষ্পন্ন, কিন্তু এখানে বহুবচনান্ত হওয়া উচিৎ ছিল।

(চ) হাপেসতি—হা-ধাতুর (হানি করা, ক্ষতি করা) ভবিষ্যৎকাল 'হাপয়িষ্যতি হইতে।

(জ) ধর্ম্ম-মহামাত্র—মহামাত্র = মন্ত্রী ; ধ·—মহামাত্র = Minister of Public Morality.

(ঞ) পাসংড < পাসড < সং পার্ষদ ('পরিষৎ' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন 'পারিষদ', স্থানে)। অতএব কথাটির অর্থ = মণ্ডলীভুক্ত, দলভুক্ত। জৈন প্রাকৃতে এই অর্থ বিস্তৃত হইয়া শব্দটির অর্থ হইয়াছিল 'অন্যদল, পরদল বা বিরুদ্ধ-দল-ভুক্ত' এবং তাহা হইতে বর্ত্তমানে বাংলায় 'পাষণ্ডে'র অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'দুষ্ট, অপদার্থ, rascal, scoundrel'। যোণ—ও স্থলে অব হইয়া এই শব্দটি 'যবন'-রূপে re-Sanskritised হইয়াছে। এখানে শব্দটিতে গ্রীকদের বুঝাইতেছে। কম্বোজ = কাবুলী। গান্ধার = উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের অধিবাসী। রিস্‌টিক—এটি বোধ হয় 'রাস্‌টিক' হইবে, কারণ শাহবাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রাতে 'রঠিক' এবং ধউলিতে 'লঠিক' পাঠ রহিয়াছে। গিরনার-লিপিতে প্রায়ই আ-স্থানে ভুল করিয়া ইকার দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়। এই "রাষ্ট্রীক"রা ঠিক কাহারা তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই ; Lassen অরট্ট-নামে পঞ্জাবের একটি পুরাতন জাতির নাম করিয়াছেন, Periplus-এও অরট্টি বলিয়া একটি পাঞ্জাবী জাতির উল্লেখ আছে; Hultzsch মনে করেন ইহারাই অশোকের "রাষ্ট্রীক" জাতি হইবে।

পেতিনিক—ইহাদেরও পরিচয় ঠিক ধরা পড়ে নাই। অপরাতা < সং অপরান্তাঃ = অপর (পশ্চিম) + অন্ত (frontier)।

(ট) ভতময় = ভত (ভৃত্য)—ম্—অয় (আর্য্য = প্রভু)। বংভনিভ = বংভন (ব্রাহ্মণ) + ইভ (ইভ্য = ধনী)। বুধ < সংবৃদ্ধ।

অ-পরিগোধ = বাসনাহীনতা ; পরিগোধ = বাসনা।

(ঠ) পটিবিধান < প্রতিবিধান = বন্দীদিগকে অর্থ সাহায্য দান ; সে যুগে বন্দীদিগকে আহারাদি বন্দীশালা হইতে দেওয়া হইত না, বন্দীদের আত্মীয়েরা যদি আহার না জোগাইত তবে বন্দী অনশনে মারা পড়িত।

অ-পলিবোধ (= পরিবোধ)—বন্ধনমোচন ; পরিবোধ = বন্দীর পায়ের বেড়ি।

অনুবধা—যথাক্রমে, respectively।

প্রজা—কাল্‌সী-লিপিতে 'পজাব' < প্রজাবৎ = সন্তানবান।

কতাভীকার < কৃত + অভিকার = যাহার প্রতি যাদু প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(ড) ওলোধন < অবরোধন = অন্তঃপুর, harem।

(ঢ) নিসিত বা নিস্রিত < আনুমানিক সং নিশ্রিত = অনুরাগী তু' পা' নিস্‌সিতো।

রাজ্যে ধর্ম্মাচরণবৃদ্ধির জন্য অশোক একটি সরকারি বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার ভার একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই মহামাত্রদের কাজের যে বিবরণ অশোক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কারণ এরূপ প্রয়াস পৃথিবীর অন্য কোন রাজা আর করেন নাই। অন্য অনেক সুকার্য্যে যেমন অশোক শুধু নিজের প্রজাদের মধ্যে তাহা আবদ্ধ না রাখিয়া প্রত্যন্ত-দেশের রাজাদেরও তাহা করিতে অনুরোধ করিতেন, এখানেও সেইরূপ করিয়াছিলেন। সমস্ত শুভকাজ অশোক নিজ রাজপরিবারবর্গের মধ্যেও চালাইবার চেষ্টা করিতেন, charity begins at home, ইহাতে তাঁহার আন্তরিকতা বুঝা যায়। কিন্তু সত্যই যদি অশোকের মহামাত্র

ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এরূপ অত্যুৎসাহের সঙ্গে লোকের ধর্ম্মের পিছনে লাগিয়া থাকেন, ঢ-বাক্যের বর্ণনা অনুযায়ী কে ধর্ম্ম করিল না করিল তাহার হিসাব রাখিয়া থাকেন, তবে লোকের মধ্যে, বিশেষতঃ তাঁহার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রবল হস্তক্ষেপের জন্য অসন্তোষ, বিদ্রূপ ও বিরক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সম্রাটকে খুসী করিবার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারিরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে লোকের এই বিরুদ্ধভাব না জানাইয়া বলিত যে খুব কাজ হইতেছে, খুব চেষ্টা চলিতেছে। সরলবিশ্বাসী অশোকও তাহা বিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রসাদ (কিন্তু গর্ব্ব নয়) লাভ করিতেন।

ড-বাক্যের 'পাটলিপুত্র' স্থানে অন্য লিপিগুলিতে 'হিদ'= 'এখানে' শব্দ আছে। ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে ছিল।

ষষ্ঠ শিলানুশাসন

গিরনার

(ক) দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ ঃ

(খ) অতিক্রতং অংতরং ন ভূতপুর্ব সবকালে অথকংমে ব পটিবেদনা বা।

(গ) ত ময়া এবং কতং—

(ঘ) সবে কালে ভুংজমানস মে ওরোধনংহি গভাগারম্হি বচম্হি ব বিনীতম্হি চ উয়ানেসু চ সবত্র পটিবেদকাস্টিতা অথে মে জনস পটিবেদেথ ইতি।

(ঙ) সর্বত্র চ জনস অথে করোমি।

(চ) য চ কিংচি মুখতো আঞপয়ামি স্বয়ং দাপকং বা স্রাবাপকং বা, য বা পুন মহামাত্রেসু আচায়িকে অরোপিতং ভবতি, তায় অথায় বিবাদো নিঝতী ব সংতো পরিসায়ং আনন্তরং পটিবেদেতব্যং মে সর্বত্র সর্বে কালে।

(ছ) এবং ময়া আঞপিতং।

(জ) নাস্তি হি মে তোসো উস্টানম্হি অথ-সংতীরণায় ব।

(ঝ) কর্ত্তব্য-মতে হি মে সর্ব-লোক-হিতং।

(ঞ) তস চ পুন এস মূলে—উস্‌টানং চ অথ-সংতীরণা চ।

(ট) নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোক-হিতংপা।

(ঠ) য চ কিংচি পরাক্রমামি অহং কিংতি ভূতানং আনংণং গছেয়ং, ইধ চ নানি সুখাপয়ামি, পরত্রা চ স্বগং আরাধয়ংতু।

(ড) ত এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপী লেখাপিতা কিংতি চিরং তিস্‌টেয় ইতি, তথা চ মে পুত্রা পোতা চ প্রপোত্রা চ অনুবতরং সব-লোক-হিতায়।

(ঢ) দুকরং তু ইদং অঞত্র অগেন পরাক্রমেন।

অনুবাদ

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিয়াছেন—

(খ) অতীত কালে সব সময়ে কার্য্যনির্ব্বাহ বা প্রতিবেদনা (submission of reports) (করিবার প্রথা) ছিল না।

(গ) কিন্তু আমি এরূপ (ব্যবস্থা) করিয়াছি—

(ঘ) (আমার রাজ্যের) সর্ব্বত্রস্থিত প্রতিবেদক (Reporters) দিগকে (এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা) সব সময়ে—আমি খাইতেই বসিয়া থাকি, বা অবরোধেই (harem) থাকি, বা গর্ভাগারেই (অন্তঃপুর) থাকি, এমন কি যদি ব্রজেও (গোশালা) থাকি, বা পাল্কিতেই (ভ্রমণে বাহির হইয়া) থাকি, বা উদ্যানেও থাকি,—আমাকে লোকের অর্থ (affairs of the people) জানাইবে।

(ঙ) সর্ব্বত্রই আমি জনার্থ (-সম্পাদন) (disposal of the affairs of the people) করি।

(চ) দান বা ঘোষণা বিষয়ক যাহা কিছু আমি স্বয়ং মৌখিক আজ্ঞা করি, অথবা যাহা কিছু আত্যয়িক বিষয় (matter of emergency) মন্ত্রী-পরিষদে (বিবেচনার জন্য) আরোপিত হয়, সে সম্বন্ধে মন্ত্রীপরিষদে কোন বিবাদ (মতভেদ) বা নিধ্যপ্তি (amendment) উপস্থিত হইলে, অবিলম্বে, যখন বা যেখানেই হউক, আমাকে জানাইতে হইবে।

(ছ) এইরূপ আমি আজ্ঞা দিয়াছি।

(জ)　কারণ উত্থান (exertion) ও কার্য্যনির্ব্বাহে কিছুতেই আমার সন্তোষ হয় না।

(ঝ)　যেহেতু সর্ব্বজনের হিত (সাধন করা) আমি আমার কর্ত্তব্য মনে করি।

(ঞ)　কিন্তু তাহার (সর্ব্বজন-হিতের) মূল হইতেছে এই—উত্থান (exertion) ও কার্য্য-নির্ব্বাহ।

(ট)　কারণ সর্ব্বজনের হিতসাধনের চেয়ে শ্রেয় কর্ম্ম আর কিছু নাই।

(ঠ)　এবং যাহা কিছু পরাক্রম (effort) আমি করিতেছি (তাহা) এইজন্য, যাহাতে আমি ভূতের কাছে আনৃণ্য লাভ করিতে পারি (অর্থাৎ সর্ব-জীবের ঋণশোধ করিতে পারি = সর্ব্বজীবের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি), যাহাতে আমি তাহাদিগকে ইহলোকে সুখী করিতে পারি, এবং যাহাতে তাহারা পরকালে স্বর্গলাভ করিতে পারে।

(ড)　অতএব এই উদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মলিপি লেখান হইল যাহাতে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে এবং যাহাতে আমার পুত্রগণ, পৌত্রগণ ও প্রপৌত্র-গণ সর্ব্বজনের হিতের জন্য ইহার অনুবর্ত্তন (অনুসরণ) করিতে পারে।

(ঢ)　কিন্তু বিপুল পরাক্রম (প্রচেষ্টা, প্রয়াস) ব্যতীত ইহা করা দুষ্কর।

টিপ্পনী

(চ)　"যাহা কিছু আত্যয়িক বিষয়……" তু' "আত্যয়িকে কার্য্যে মন্ত্রিণো মন্ত্রী-পরিষদম্ চাহূয় ব্রুয়াৎ"—কৌটিল্য, ২৯পৃঃ ১২ লাইন—"জরুরী (emergent) কাজ উপস্থিত হইলে মন্ত্রীদিগকে এবং মন্ত্রী-পরিষদকে-ডাকিয়া জানাইবে।"

(ছ)　উস্টান > উৎ + স্থান = উত্থান = প্রচেষ্টা, উদ্যম। সংতীরণা > সং আনুমানিক সম্ + > তীর ; পাণিনি ধাতুপাঠের "তীরতি কার্য্য-সমাপ্তৌ" হইতে এই ধাতুটির অর্থ বুঝা যায়।

(ট)　কংমতর = কর্ম্মতর ; সাধারণত বিশেষণের সঙ্গে তর, তম প্রত্যয় হইয়া

তুলনা অর্থ বুঝায় কিন্তু এখানে বিশেষ্যের পর প্রত্যয় যোগ হইয়াছে।

হিতৎপা > হিতত্বাৎ

(ঠ) আনণং < আনৃণ্যং = ঋণ-শূন্যতা।

(ঢ) অগেন < অগ্রেন ; অগ্র = প্রথম (শ্রেণীর), বিপুল, উত্তম।

এই অনুশাসনটি অশোকের মনোভাবের একটি উজ্জ্বল ছবি। তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্থলের উৎস এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণার রহস্যটি এখানে ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার আন্তরিকতা, অকপটতা ও সাধু ইচ্ছার এমন নিদর্শন আর বোধ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অতি-উৎসাহও এই লিপিটিতে বেশ বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়দের উদ্দেশ্যে লিখিত এই লিপিগুলি হইতে দেখা যায় যে তাঁহার রাজত্ব বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহার দ্বারা তিনি মনে করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরও বহুকাল তাঁহারই সন্ততির অধীনে তাঁহার রাজ্য থাকিবে।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

১ম, ২য় ও ৩য় শিলানুশাসন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুষ্পদী

(১)

নীল ধোঁয়া যেন হয়েছে মেখলা রেখা
অশ্বারোহীর উদ্ধত মাথা মেঘের বুকে।
স্বর্ণ বিকালে মুলতানী মুখ লেগেছে ভালো।
নিকষ চিকুরে সোনালী রৌদ্রে লেখা
স্বপ্ন কাহিনী। জাগ্রত দিন তোমার মুখে
নিয়ত কি হানে অনাচারী নীল কঠিন আলো।

ঘন ঘন তাই ঘুম ভেঙ্গে যায় পাতাল এ ঘুম,
গভীর, বিরাট আদিম ছায়ারা যেথায় ফেরে,
কর্কশ পারিপার্শ্বিকে হয় সমাপ্তি এর
প্রখর সভার আলোকে ত্রস্ত হে দ্রৌপদী।
চিত্রল মন খুঁজে ফের কত অন্ধ হাতে
সামরিক ভিড়ে। জানত যদিও বৃথা এ খোঁজা।

লোহিত তপন ডুবেছে
এখন রাত্রি নিঝুম।
মনে হয় ভালো পাশাপাশি থাকা
অনিকেত ছোঁয়া এ সহবাসের।
যদিচ জৈব রূপায়ণে জানি সমাপ্তি এর।
সমাধি প্রাচীর ভেঙ্গে হয় হোক চুরমার, হোক শেষ
চৈত্রের অবশেষ
জীবনে নামুক। অনুকাঙ্খার বাঙ্ময় অবলেপ
মোদের আকাশে ফুটাক স্নিগ্ধ তারা॥

(২)

কভু বুঝি মনে হয় প্রাণ বায়ু আবৃত্তির দাস
নিত্য ওঠা পড়া আর প্রাত্যহিক লোভ পরিক্রমা,
দেহ হতে দেহে, আর মন হতে মনে।
ইন্দ্রিয়ের অতিথিরা পরস্পর বিতণ্ডায় ভোর।
তাই বেঁচে চলি
পলে পলে পাণ্ডুতম মুহূর্ত্তেরে পদতলে দলি।
প্রতিদিন একই সুর সাধা
তাম্মাত্রিক ঐকতানে দিনের প্রহরগুলি বাঁধা।
নিচের গলিতে শুনি আগন্তুক শিশুদের খর করতালি
নিরাপন্ন প্রাণের কাকলি,
চীনে ফিরিওয়ালা হাঁকে,
ক্যাংস নাদী দ্বিপ্রহরে দূরাগত ট্রেনে সাইরেন।
এই সব শত-গ্রন্থি দিনগুলি নাচে আর ঘোরে
পায়েতে ঘুঙুর বাঁধা ভিখারীর মত।
সে শিঞ্জন-সমাধিতে মনে হয়
এ জীবনে সমাপ্তি কি নেই।
দুর্জ্জয় মানুষ,
হায়, দুর্জ্জয় মানুষ তবে এই!
প্রকৃতির শাপে দেখি ভস্মীভূত
দুর্ব্বল কাগজ।
পরিশ্রমে রক্তমুখ, মস্তকের ঘর্ম্ম ঝরে পায়ে।
অন্ধকারে ভয় হয়, বুঝি পাতা আছে
ইঁদুরের কল।
আর্ত্তনাদ কভু শোনা যায়
কবলে পড়েছে কোনও অসতর্ক প্রাণী।
দুরন্ত রুটির গন্ধ পুলিশের মত ধরে আনে।

তবু দেখি রৌদ্র নামে,
রৌদ্র ধোয়া বাড়ীগুলি স্বপ্ন দেখে নির্জ্জন চাঁদের।
প্রতিদিন অধ্যুষিত তাম্র দগ্ধ কায়
দিনান্তের স্বপ্নে দেয় ডুব,
তপ্ত হাতে করে পান রজনীর স্নিগ্ধতম স্নেহ ॥

(৩)

ক্ষান্ত-বরিষণ সন্ধ্যা
এখানে, অথবা আরও সহস্র নগরে।
কামনার আমন্ত্রণে কুঞ্জে কুঞ্জে দ্রুত পদক্ষেপ
দ্রুততর ধমণীর গতি।
ধর্ষিত নক্ষত্রলোক কোটি ম্লান চক্ষু মেলে দেখে
আততায়ী মূর্ত্তিগুলি স্তব্ধ মোড়ে মোড়ে
সংহত সংহার বেগে—মর্ম্মর সমাধি।
পশ্চিম আকাশে ফোটে রক্ত সরোবর
লাল ফৌজ সারি সারি উদ্যত সঙ্গীন্—
প্রশান্তির বক্ষ-ক্ষতে রক্তিম গোধূলি।

প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব হল বুঝি দূরে
মৃত্যু-ভাণ্ড হাতে ॥

(৪)

কামনায় শ্রান্তি নাই, মুমূর্ষু পোকার ঘুরে মরা
তপ্ত দীপাধার ঘিরে ; হৃদয়ের শুধু ওঠা পড়া—
কামনায় শান্তি নাই। নির্বেদের সাড়া পাই মনে
শ্রমলব্ধ জীবনেরে বৃথা ধরে রাখা প্রাণপণে।
অনুস্মরণের জালে ধূলিসাৎ প্রাসাদ জড়ানো,
অনুর্ব্বর পাহাড়ের শান্তিপাঠে রূঢ় উচ্চারণও

মর্ম্মে পশে,—বসন্তের ধ্বংস অবশেষ।
প্রাণীহীন নগরীতে বিচরণ এই বুঝি শেষ।
ভারী জগতের ভ্রূণ রূপায়িত কোন শুভ্র মেঘে
খুঁজে ফিরি, আর ঊর্ধ্বে অহরহ গোপন আবেগে
কাঁপে নীল নিঃশেষের ঘন অবকাশ
নীড়মগ্ন পাখীদের স্তব্ধতায় নিথর আকাশ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

মৃত্যুং তীর্ত্বা

আমরা সেখানে রবো :
উধাও মৃত্যুর পারে
চিরতরে শূন্য তব স্থান—
ফিরিবেনা জানি।
অশ্রুবাষ্পনীহারিকা সপ্তবর্ণসুরঞ্জিত হবে।
শোকস্তব্ধ ধমনীতে
উচ্ছ্বাসিবে জীবনের হিংস্র জোয়ার,
নিদ্রাভয়আহারমৈথুন—
প্রবঞ্চিকা প্রকৃতির সম্মোহসম্ভার।
তোমারে ভুলিব, বন্ধু।
ইহাই নিয়ম।

তবু শোক।……
লুপ্তির আড়াল হতে
অস্তশেষরশ্মিসম অনুলিপ্ত রহে
ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতে
অশরীরী সন্নিধির অপার্থিব মায়া।
স্মরণসমৃদ্ধ বেদনায়
স্পন্দমান বিধুরতা
শাশ্বত রহিয়া গেল নির্বিশেষ অখণ্ড সত্তায়
দেশেকালে প্রচ্ছন্ন বিন্দুতে—
মরণে হানিল পরাভব।
রয়ে গেল তবু
একায়িত অন্তরের স্বর্ণিল বিমোহে চেয়ে-দেখা

নদীপারে হেমন্তসন্ধ্যায়
দূরান্তের ধূসরন্ত প্রান্তিম আকাশ,
কুহেলি ঘনায় ঃ
বৈশাখীপূর্ণিমারাত্রে
প্রান্তরে কঙ্করপথে অনির্দেশ পিঙ্গল ইঙ্গিত,
আমের বোলের গন্ধে সচকিত হাওয়ার খেয়াল ঃ
শালবনপরপারে যবাঙ্কুরপাণ্ডু শশী ত্রিকূটের শিরে,
দূরগ্রামে মাদলের রোল ঃ
চিলে কোঠা ঃ
অর্থহীন গুঞ্জরণ—ভবিষ্যের লূতাতন্তু বোনা ঃ
রিমিঝিমি শাঙনরজনী,
পূরবৈঁয়া পবন চলত—
নিদ্রাহারা যৌবনের গান
রয়ে গেল তবু।······

উধাও মৃত্যুর পারে
তোমারে ভুলিব, বন্ধু।
তবু কি ভুলিব ?

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রথমটা একটু উত্তেজিত হইয়াছিল, তারপর কিন্তু মহেশ চৌধুরী অস্বাভাবিক রকম শান্ত হইয়া পড়িল। একেবারে শান্তির প্রতিমূর্ত্তি। মুহূর্ত্তের জন্যও তার মুখের চামড়া কুঁচকায় না, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয় না, কথায় আলো প্রকাশ পায় না। আরও বেশী আস্তে চলাফিরা করে, আরও বেশী ধীরতার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিয়া যায়।

মাধবীলতা দাঁতে দাঁত কামড়ায়।—'আপনি কিছুই করবেন না ?'

'করব।'

'কি করবেন ?'

'কি করব তাই ভাবছি মা।'

মাধবীলতা রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।—'আপনার কিছু করা উচিত কিনা তাও ভাবছেন বোধ হয় ?'

মহেশ চৌধুরীর স্পষ্ট, মৃদু ও একটানা আলাপ করার সুর বদলায় না। 'ভাবছি বৈকি। সব কথা না ভেবে কি কিছু করতে আছে ? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।'

আগে কোনদিন মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে সদানন্দ বলে নাই। সে অনায়াসে নামটা উচ্চারণ করিয়া গেল, খাপছাড়া শোনাইল মাধবীলতার কাণে,—সে নিজেই মহেশ চৌধুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে ও নামটা খুনীর।

'স্বামীজির দোষ আছে বলেই—'

'দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা ?

মাধবীলতা বড় দমিয়া গেল, মুখখানা হইয়া গেল ফ্যাকাসে। মহেশ চৌধুরী কেন তাকেও দোষী করিতেছে অনুমান করা কঠিন নয়। এদিকটা আগে সে ভাবিয়া ছাখে নাই।

'তুমি আগেও ভাবতে সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে বিভূতিকে খুন পর্য্যন্ত করতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে যে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে—একবার একটু সন্দেহও জাগে নি। তোমার কোন দোষ না থাকলে এসব কথা ভাবতে কেন?'

'আমি—

'তোমার কি দোষ তুমি জান না?' অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মহেশ চৌধুরী যেন তার সেই অক্ষমতাকে সমর্থনই করে, 'সেইখানে তো মুস্কিল বাছা। নিজের দোষ যদি আমরা জানতে পারতাম তবে আর ভাবনা ছিল কি। আমি কি আমার দোষ জানি?'

মাধবীলতা বড় দমিয়া যায়। কি ভাবিতেছে মহেশ চৌধুরী? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কি ধারণা জাগিয়াছে তার সম্বন্ধে তার মৃত স্বামীর পিতার মনে? কি সন্দেহ করিয়াছে এই হাবাগোবা ভালমানুষটি,—মাঝে মাঝে যাকে মারাত্মক রকমের চালাক মনে হয়? তার ছেলের বৌকে পাওয়ার লোভে সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া তার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াও মহেশ চৌধুরীর অবিচালিত ভাব দেখিয়া মাধবীলতার আর রাগ করিবার সাহস হয় না। তাছাড়া, এতক্ষণে তার মনে হইতে থাকে যে মহেশ চৌধুরীর করিবারই বা কি আছে, সে কি করিতে পারে? প্রথমে মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী আসল ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিলেই বুঝি সদানন্দের শাস্তির আর সীমা থাকিবে না। এখন মাধবীলতা ভাবিয়া পায় না, এমন একটা বিশ্বাস তার কেন জাগিয়াছিল। প্রতিহিংসা নেওয়ার মানুষ মহেশ চৌধুরী নয়, সে ক্ষমতাও তার নাই।

দাঙ্গার ফলে আর কিছু না হোক আশ্রমের নাম আরও বেশী ছড়াইয়া গিয়াছে। কেবল কাছাকাছি গ্রাম আর সহরের মানুষের মধ্যেই ব্যাপারটা নিয়া হৈ হৈ হয় নাই, খবরের কাগজেও বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। দাঙ্গার বিবরণ শুধু নয়, আশ্রম সম্পর্কেও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কাগজে লেখা হইয়াছে: এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীশ্রী সদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল তপস্যার পর জনসেবাই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়া রোগশোকদারিদ্র্যনিপীড়িত নরনারীর কল্যাণের জন্য ইত্যাদি।

সকল মহৎ কর্ম্মের বিরোধিতা করাই এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি, এইরূপ একদল লোক অন্যভাবে আশ্রমের ক্ষতি করিতে অসমর্থ হইয়া আক্রোশের বশে আশ্রমের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন গুণ্ডা ভাড়া করা ইত্যাদি। এই বিবরণটি যে কাগজে বাহির হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে সেই কাগজটিই রাখা হয়। বাড়ীতে খবরের কাগজটি আসামাত্র সকলের আগে মাধবীলতা সেটিকে দখল করে। দাঙ্গাহাঙ্গার কোন বিবরণ তার অজানা নয়, ব্যাপারটার জের কি দাঁড়াইতেছে তাও খবরের কাগজে বাহির হওয়ার কয়েকদিন আগেই তার কাণে আসে, তবু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত আর ভুল বিবরণ পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতে থাকে। সদানন্দ, তার আশ্রম ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে অভিনব টিকা পড়িয়াই কাগজটি হাতে করিয়া সে মহেশ চৌধুরীর কাছে ছুটিয়া যায়।

'দেখেছেন কি আরম্ভ করেছে ওরা? পড়ে দেখুন।'

মহেশ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া বলে, 'সদানন্দের তপস্যা আর আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা সত্য, গুণ্ডা ভাড়া করার কথাটা সত্য নয়।'

মাধবীলতা বোমার মত ফাটিয়া যায়, 'একটা কথাও সত্যি নয়। ও লোকটা কত খারাপ আপনি জানেন না, যে সব কাণ্ড চলে—'

মহেশ বলে, 'জানি মা সব জানি। সদানন্দ অনেক সাধনা করেছে, তবে কি জান মা, সাধকেরও পতন হয়। সদানন্দ লোক ভাল। আশ্রমটাও বড় উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ঠিক সেভাবে কাজ হয় নি। মানুষের ভুল ত্রুটি হয় কিনা, বুঝবার দোষ হয় কিনা নানারকম—'

মাধবীলতা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দ লোক ভাল? আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ? এত কাণ্ডের পর মহেশ চৌধুরীও যে এমন কথা বলিতে পারে, কাণে শুনিয়াও মাধবীলতার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, লোকটি বোধ হয় পাগল। প্রত্যেক উন্মাদের মত নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে সে বাস করিতেছে আর বাস্তব জগতের অর্থ স্থির করিতেছে তার নিজের খাপছাড়া জগতের নিয়মে।

'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাধবীলতা অভিভূতের মত বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে?'

মহেশ চৌধুরী একদিন আশ্রমে গেল। বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, 'বিভূতির দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু?'

'ওরাও তো মারামারি করেছিল।'

'তা করেছিল কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হ'ত না।'

বিপিন চুপ করিয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হয়, লোকটা কি পাগল? দাঙ্গা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরিযাছে, বিভূতিকে নিজের হাতে মারিয়াছিল এমন লোকও যাদের মধ্যে আছে, তারা শাস্তি পাইবে বলিয়া এই মানুষটার দুর্ভাবনা।

সেদিন সকালেই বিপিন আর সদানন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়িত্বটা ছিল বিভূতির। কিছুদিন আগে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন ভাল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বড় আশ্রমটির ক্ষতি করিবার জন্য একটি বিরোধী আশ্রম স্থাপন করাই মহেশ চৌধুরীর আসল উদ্দেশ্য ইহা টের পাইয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বাপের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিভূতি এই হাঙ্গামা বাধায়। মহেশ চৌধুরীকেও দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া কিছু দিনের জন্য জেলে পাঠানোর চেষ্টা করার ইচ্ছা সদানন্দের ছিল, বিপিন কোমতেই রাজী হয় নাই। মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে বিপিনের মনের ভাব ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া যাইতেছিল।

বিকৃত সত্য বলিয়া জানিয়া যা আদালতে প্রমাণ করার জন্য সদানন্দের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিতেছিল, মহেশ চৌধুরী নিজে আসিয়া তাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সব দোষ ছিল তার ছেলের! বিভূতি দোষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল স্বার্থরক্ষা, বিভূতির দোষে কতকগুলি লোক জেলে যাইবে বলিয়া মহেশ চৌধুরীর হইতেছে আপশোষ।

'কিছু করা যায় না?'

'কি করা যাবে বলুন?'

'বিভূতির দোষটা আদালতে প্রমাণ করলে—?'

বিপিন ভাবিয়া বলিল, 'তাতে অন্য সবাই ছাড়া পাবে না, তবে শাস্তিটা কম হতে পারে।'

মহেশ বলিল, 'তাই হোক। তাছাড়া যখন উপায় নেই, কি আর করা যাবে।'

সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা ঠিক হইয়াছিল সেটা মনে মনে বাতিল করিয়া দিয়া বিপিন বলিল, 'আদালতে কি বলবেন?'

'যা সত্য তাই বলব, আর কি বলব?'

যা সত্য আদালতে তাই বলা হইবে স্থির হইলেও কি বলা হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা গেল। সকলে সত্য কথা বলিলেও সত্যের খুঁটিনাটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এমন পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আদালতে দাঁড়াইয়া মহেশ চৌধুরী ধীর স্থির শান্তভাবে বলিয়া গেল, বিভূতি কেমন একগুঁয়ে ছিল, মেজাজটা তার কি রকম গরম ছিল, আগে একবার সে একটা ছোটখাট হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ফলে মহেশ কি ভাবে কয়েকজনের হাতে মার খাইয়াছিল এবং বাপকে যারা মারিয়াছিল তাদের শাস্তি দিবার জন্য কীর্ত্তনের আসরে গিয়া সে কি ভাবে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ছেলের চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও করিল যে, কর্ত্তব্যজ্ঞান, নিষ্ঠা, তেজ, সাহস এ সব মানুষের যতই থাক ভাল মন্দ উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলে ওসব কোন কাজেই লাগে না।

অনেকে হতভম্বের মত শুনিয়া গেল, কেউ ভাবিল মহেশ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন সকৌতুকে হাসিতেও লাগিল।

বিভূতির মা বলিল, 'আদালতে দশ জনের কাছে তুমি আমার ছেলের নিন্দে করে এলে! এবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না।' বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

মাধবীলতা বলিল, 'আপনার মনে এই ছিল! আমিও গলায় দড়ি দেব।' বলিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মহেশ চৌধুরী তাদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার কোন চেষ্টা করিল না এতটুকু বিব্রত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

অপরাহ্নে বিপিন আসিল। মহেশ বলিল, 'এসো বিপিন।'

বিপিন যেন হঠাৎ তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সম্বোধনের তারতম্যটা বিপিনও খেয়াল করিল কিনা সন্দেহ, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মত সামনে বসিয়া পড়িয়া পরমাত্মীয়ের মতই বিনা ভূমিকায় বলিল, 'কিছু ভাল লাগছে না।'

মহেশ সায় দিয়া বলিল, 'অনেক দিন থেকেই তো তোমার মন খারাপ।'

ছোট ছেলে যেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় গুরুজনকে দুঃখ জানায় তেমনি ভাবে বিপিন বলিল, 'আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম চৌধুরী মশায়। যা ভেবেছিলাম তা তো কিছু হলই না, একটার পর একটা হাঙ্গামাই বাধছে। কত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে কি রকম আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কি দাঁড়াচ্ছে আশ্রমটা! এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোল্লায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না।'

মহেশ বলিল, 'কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আর সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাতো বেড়েছে? নাম ছড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাও তো ছড়িয়েছে?'

বিপিন বলিল, 'কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম তার যে কিছুই হচ্ছে না, বরং উল্টো ফল হচ্ছে।'

মহেশ বলিল, 'সে দোষটা তোমার।'

বিপিন আহত হইয়া বলিল, 'আমার দোষ? আমার কি দোষ?'

মহেশ বিপিনকে তার দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করে। আগে বিপিন রাগ করিত, আজ নিঃশব্দে শুনিয়া যায়। মহেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, 'আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম!'

'পাবে।'

'আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন?'

'দেব। ক'দিন আগেই ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা এবার আমিই নেব। মন দুর্ব্বল কিনা তাই ভাবছিলাম, ধীরে সুস্থে ক'দিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক দেরী করে লাভ কি, কি বল?'

বিপিন অভিভূতের মত বলিল, 'নিশ্চয়।'

মহেশ বলিল, 'চলো তবে আজকেই যাই।'

বিপিন ভয়ে ভয়ে বলিল, 'কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কি করা যাবে?'

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে।'

সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থার অর্থ বিপিন এক রকম বুঝিয়াছিল। সদানন্দকে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইবে এবং মাধবীলতাকে মহেশের কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিবার অর্থটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। মহেশের আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সদানন্দকে সরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন জাগিতে পারে, মাধবীলতাকে সরাইয়া দিবার প্রয়োজন কি, কারণ কি? মহেশ যে দুজনকে একসঙ্গে সরাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা করিতে পারে নাই।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরী আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আসল উদ্দেশ্যটা তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাত্রে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথম দিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।

নৌকা চলিয়া গেলে মহেশ বলিল, 'আমরা সবাই মিলে এবার আশ্রমটা গড়ে তুলব বিপিন।'

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

Roger Fry—A biography—By Virginia Woolf (Hogarth Press)

ঠাট্টার ছলে একদিন রজার ফ্রাই ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ্‌কে বলেছিলেন, "জীবনচরিত রচনা সম্বন্ধে তোমার ধারণাগুলি না হয় আমাকে নিয়েই পরীক্ষা কোরো।" তারই ফলে এই নিতান্ত সুখপাঠ্য বইখানি। আর্ট-সংক্রান্ত মতামত বাদ দিয়ে তাঁর মতন জগদ্‌বিখ্যাত কলাবিদের জীবনি যে লেখা সম্ভব সেইটাই আমাদের কল্পনাতীত; তার ওপর রজার ফ্রাই-এর জীবনে নাটকত্ব কিছুই নেই। ঘটনা বলতে পোষ্ট-ইম্প্রেসনিষ্টদের প্রদর্শনী সম্পর্কে জনসাধারণের এমন কি বন্ধুবান্ধবদের কাছে অপ্রিয় হওয়া, 'ওমেগা' কারখানা খোলা, এবং পিয়ারপণ্ট মর্গ্যানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মোটা মাইনের চাকরী ছাড়া জীবনচরিত-লেখকদের পক্ষে এ-গুলি নিতান্তই সাধারণ, এমনকি স্ত্রীর মাথা খারাপ হওয়া পর্য্যন্ত। অতএব, বাকী রইল রজার ফ্রাই-এর ইংরেজ জাতকে আর্ট-শিক্ষা দেবার প্রয়াস—বক্তৃতা, চিঠি ও কথাবার্ত্তার মারফতে। যাঁরা রাস্‌কিন-মরিসের পরবর্ত্তী ইংরেজ সমাজের রুচি কি ছিল জানেন, এবং সর্ব্বত্র জনসাধারণের চারুকলার প্রতি বীতরাগ অনুভব ক'রে দুঃখ পেয়েছেন তাঁরা বুঝবেন রজার ফ্রাই-এর কৃতিত্ব কোথায় ও কতখানি। সে-কৃতিত্বের প্রেরণা ছিল না রজার ফ্রাই-এর সৃষ্টির দৃষ্টান্তে; ছিল তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে। এই আগ্রহ ও উৎসাহের পরশ লাগানই ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফের মুন্সিয়ানা। লেখিকার সর্ব্বজন-বিদিত রচনাভঙ্গী পূর্ব্বোক্ত কাজের নিতান্ত অনুকূল। আদর্শেরই হোক আর রোগেরই হোক অজানিতে যেমন ছোঁয়াচ লাগে তেমনই লেখিকার ভাষা ও ভঙ্গীর সাবলীল গতিতে আমরা রজার ফ্রাই-এর জীবন-ধর্ম্মে উৎসাহিত হই। আশ্চর্য্য হতে হয় লেখিকার সংযমে, তাঁর নির্ব্বাচন শক্তিতে বিষয়-বস্তুর অন্তরে প্রবিষ্ট হবার সহজ ক্ষমতায়। ষ্ট্রেচীর পদ্ধতির তুলনায় এই কৌশল ভদ্র লাড্‌ভিগের পদ্ধতি থেকে বেশী বুদ্ধিসম্মত ও সূক্ষ্ম।

রজার ফ্রাই-এর প্রতিবেশ কোয়েকার গোষ্ঠীর। সে-গোঁড়ামির তুলনা এ-দেশে একমাত্র সেকেলে ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায়। ফ্রাই-এর এক পূর্ব্বপুরুষের বিবেক-দংশন হত ওষুধের দাম নিতে, তাতে জল মেশান থাকে ব'লে। পিতা ছিলেন জবরদস্ত। চিরটা কাল ফ্রাই পিতার মনস্তুষ্টি সাধনে ব্যগ্র থাকতেন, পৃথক হবার পরেও। এই অদ্ভুত গোঁড়ামি ও পিতৃভক্তি রজার ফ্রাই-এর চরিত্রের যেন দুটি মোটা সুতো। দ্বিতীয়টির জন্য যেমন তিনি সহজে অন্যের মতামতে প্রভাবান্বিত হতেন, প্রথমটি তেমনই ভিন্ন ভিন্ন মতামত বেছে নিয়ে নিজের একটি মত বেঁধে দিত। একধারে তাঁর যেমন খোলা মন অন্যধারে তেমনই কঠিন তাঁর বিচারশক্তি। ভদ্রলোক কত ভাল লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, ম্যাকটাগার্ট, ম্যাকার্থি, ডিকিনসন, রটেনষ্টাইন, ইয়েটস, চার্লস মরঁ, লিওনার্ড ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, কত কথা শুনেছেন, কত তত্ত্বের যাচাই করেছেন, কত ছবি দেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই, তৎসত্ত্বেও নিজের মতের জোরেই তিনি সমগ্র ইংরেজী ভাষাভাষীর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আর্ট-সমালোচক। রাস্‌কিনের পর অমন খ্যাতির ইংলণ্ডে কেউ পান নি। এমন কি প্রফেসার টঙ্ক্‌স্‌, যাঁর সঙ্গে রজার ফ্রাই-এর কোনো কালে বনে নি, তিনিও বলতে বাধ্য হন যে তাঁর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে আর্টের অবস্থা, জার্ম্মানীতে হিটলার, রুশিয়ায় ষ্টালিন ও ইটালিতে মুশোলিনির মৃত্যুর পরাবস্থার সামিল। খোঁচাটা নিষ্ঠুর হলেও ব্যাপারটা আংশিক ভাবে সত্য।

রজার ফ্রাই-এর সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ব্যাখ্যান এখানে অবান্তর—কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি, বইখানিতে তার নির্দ্দেশ নেই। ধরাই যাক, তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু ছিল না, যার জোরে তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইতিহাসে স্থান পেতে পারেন। তবে এক হিসেবে যুগান্তকারী ছিল সেটা। আমার মতে তিনি যতই নিষ্কাম উপভোগের জয়গান করুন না কেন, কোয়েকার মনোভাবের তাগিদে তিনি অজানিতে অবশ্য, রাস্‌কিনেরই পদানুসরণ করেন। ভিনিস থেকে লেখা এক চিঠিতে রাসকিনের প্রতি বক্রোক্তি এখানে অগ্রাহ্য। রাস্‌কিনের Political Economy of Art এবং রজার ফ্রাই-এর Art and Socialism এক সঙ্গে পড়লেই সমাজে আর্ট ও আর্টিষ্টের স্থান সম্বন্ধে তাঁদের আন্তরিক মিল প্রকট হয়। অন্য দিকে ওমেগা-কারখানা খোলাতে তাঁর ওপর মরিস্‌-এর প্রভাব ধরা পড়ে।

অবশ্য রজার ফ্রাই অস্‌কার ওয়াইল্ড-এর পরবর্ত্তী। তাই তিনি art for art's sake গ্রহণ করেন নি, সেই মতটিকে অদল বদল করে যুগোপযোগী দাঁড় করালেন। বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের 'মা ফলেষু কদাচন' ভাবটির সঙ্গে ব্যক্তির অনুরাগপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চর্চ্চা মিশিয়ে রসোপভোগকে একাধারে ভদ্র ও কঠিন সাধনার স্তরে তিনি তোলেন। অর্থাৎ, আজকার ভাষায় বুর্জ্জোয়া সভ্যতার বেনেপনা বাদ দিয়ে তার শ্রেষ্ঠাংশটুকু তিনি বজায় রাখলেন। বুদ্ধি-বিচারের সাহায্যেই তিনি কৃতকার্য্য হন। বিচারের অংশ হয়ত একটু বেশী ছিল। সেই জন্য কে একজন বলেছেন যে রজার ফ্রাই-এর সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেকটা বুদ্ধিমতী অবিবাহিতা প্রৌঢ়ার কামশাস্ত্র পড়ে কামজ্ঞানেরই মতন। তবু আমার বিশ্বাস, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ঋজুতার মূল্য, তাঁর ব্যাখ্যায় আবিষ্কারের আনন্দ কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। বুর্জ্জোয়া-সভ্যতার মহৎ গুণ এই বুদ্ধি-চর্চ্চা—সীমার মধ্যে হলেও। এক এক সময় মনে হয়, বিশেষত তাঁর শেষ-বক্তৃতাগুলির এক আধটি পড়লে, যে তাঁর মতের সমন্বয়-সাধন হয় নি, তাঁর দৃষ্টি-পরিসরে ফাঁক, blind spots ছিল। সন্দেহ হয় বুঝি নিষ্কাম উপভোগ এ-যুগে অসম্ভব। তবু, ইংরেজ-জাতের সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে আমাদের সঙ্গেও, সীজান ও তাঁর পরবর্ত্তী ফরাসী চিত্রশিল্পী, চীনে ও ফার্সী ছবি প্রভৃতির পরিচয় ঘটাতে যে পেরেছিলেন এই জন্য তাঁর সমাজ-সংস্কারকে এবং মহান অথচ অভিনব-কে গ্রহণ করার মতন বিচারবুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির স্থিতিস্থাপকতাকে সমাদর না করে থাকা যায় না। তাঁর মতের চিরন্তন মূল্য যাই হোক, সেটি রুচি-পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়েছিল এই যথেষ্ট।

কিন্তু বইখানি সম্বন্ধে আমার গোটা কয়েক বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস রজার ফ্রাই-এর চরিত্রে যে আন্তরিক বিরোধ আছে তার ব্যাখ্যা কোয়েকার-রক্ত এবং পিতৃ-ভয়ে সম্পূর্ণ নয়। ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ অবশ্য ইঙ্গিত করেছেন যে রজার ফ্রাইএর চিত্রাঙ্কন শক্তি দেরীতে খোলে। সে-ইঙ্গিতের সূত্র ধরে সত্য ব্যাখ্যায় আসা যেত। লেখিকার বন্ধুবাৎসল্যে বাধা পড়ে বলে বোধ হয় তিনি এ-বিষয়ে ততটা জোর দেন নি। রজার ফ্রাই একজন বড় চিত্রকর ছিলেন না মানতেই হবে। বড় আর্টিষ্ট হওয়া শক্তি ও শিক্ষাসাপেক্ষ। তাঁর শিক্ষায় কোনো ত্রুটি ছিল না, বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী পাওয়া থেকে

নামজাদা প্যারিসের ষ্টুডিও ও অনুকূল সঙ্গের সুযোগ পাওয়া পর্য্যন্ত, কোনো কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর ভাগ্যে। স্ত্রীও এক পথের পথিক ছিলেন। অতএব, তাঁর সৃষ্টিতে আন্তরিক অভাবের ও আপেক্ষিক নিস্ফলতার প্রকৃত নির্দ্দেশ শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে মিলবে না। এমন কি কোয়েকার-রক্তেও পাওয়া যাবে না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ভীষণ জানি; কিন্তু ঐ-রকম অবদমনের প্রতিক্রিয়াই কি রজার ফ্রাই-এর চিত্রে ও প্রবন্ধে আশা করা যায় না? কিন্তু তা কই? বরঞ্চ অতি-সাবধানেরই ছড়াছড়ি। ভেতরের জোর থাকলে সমাজের তৈরী জটিলতা দুঃসাহসিক সরলতায় পরিণত হত। তা যখন হয়নি তখন রজার ফ্রাই-এর সারা জীবনব্যাপী চঞ্চলতার ও বহুমুখিতার সর্ব্বগ্রাসী ঔৎসুক্যের মধ্যেই তাঁর জীবনধর্ম্মের মূলমন্ত্র খুঁজতে হবে। সে বীজ হচ্ছে আমার মতে তাঁর বিচার-বুদ্ধির ও সৃষ্টিশক্তির মধ্যে আন্তরিক বিরোধ। বৈপরীত্য নয়, গোড়ায় ব'লে দিচ্ছি।

অতি-শিক্ষিত ব্যক্তির রচনা কি সমালোচনায়, কি সৃষ্টিতে প্রাবন্ধিকই থেকে যায়। রজার ফ্রাই অবশ্য বেলিনি ও সীজান সম্বন্ধে দু'খানি বই লেখেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য বেশী ফুটেছে, বেশী কার্য্যকরী হয়েছে ঐ নেশন এথিনিয়ম বার্লিংটন ম্যাগাজিনের প্রবন্ধাবলীতে ও নানা জায়গার বক্তৃতায়, যেগুলি জড় করে তাঁর Vision and Design, Transformations, এবং Last Lectures। তা ছাড়া কথোপকথনে, চিঠিপত্রে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন। যে তাঁর মুখের কথা শুনেছে সেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিশ্লেষণ, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জাগাবার ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। অথচ কেন তাঁর হাত দিয়ে একটা ক্রান্তিকারী বই বেরুল না? উত্তর হবে, সময় ছিল না। ভুল—সময় অনেক ছিল, সময়ের অভাব বাজে কথা। লোকে বলবে, পয়সা ছিল না। ভুল—বাপের দোরে ধন্না দিলেই হত। আদত কারণ, ভয়, যার রূপ-পরিবর্ত্তন বুদ্ধিগত সততা, যার পূর্ব্বে রয়েছে সৃষ্টিশক্তিতে অবিশ্বাস, ঐ প্রাথমিক ও আদিম দ্বন্দ্বের আশীর্ব্বাদে।

আরো প্রমাণ রজার ফ্রাই-এর নিজের আঁকা ছবিতে। আমি তাঁর বেশী ছবি দেখিনি, নামজাদা গোটাকয়েক পোট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ দেখেছি। প্রথমে তিনি পূর্ব্বেকার ইংরেজ ওয়াটার-কলারিষ্টের প্রভাবে পড়েন। ১৯১০ সালের

পর সীজানের পদ্ধতি তিনি স্বীকার করেন। আমি তাঁর শেষ-জীবনের ছবির উল্লেখ করছি। সেগুলির সঙ্গে সীজানের আঁকা যে-কোনো ছবির তুলনা করলে হতাশ হতে হয়। রজার ফ্রাই-এর ছবি নির্দ্দোষ—অঙ্কনপদ্ধতির দিক থেকে, যেমন অঙ্কের পদ্ধতি ঠিক হলে উত্তর হয় নির্দ্দোষ; অর্থাৎ যেন, মাত্র নির্দ্দোষ। এরও আনন্দ উঁচুদরের। কেবল তাই নয়, বুঝি বা এ-যুগে ঐ ধরণের আনন্দই যথাযথ। এমন কি, অনেক সময়, অরাজকতার প্রতিক্রিয়ায় জ্যামিতিক আনন্দকেই শ্রেষ্ঠ বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সীজানের পোট্রেট দেখলেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—ইয়াঃ কেয়া মাকুল, চুস্ত্, মাত্তজু ! মুসলমান ওস্তাদ মিয়াকি মল্লারের গান্ধারটি লাগালেন, জেনে, না-জেনে, কে কেয়ার করছে ! অথবা, দু' চারটি মেয়ে মনের পটে ছায়া ফেলার গুণ ধরে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, আকারে, বুদ্ধিতে, মেজাজে—কিন্তু তবু যেন ছবি ফুটল না, অথচ, হয়ত একজন, নাকটা তার টিকল নয়, গালের হাড় উঁচু, একটু বা কথা রাখে না, চা-এ চার চামচ চিনি খায়—এমনটিকেও মনে হল—এই ঠিক। অথবা, কোনো নতুন বউ বিশ বছর সংসার করবার পরেও যেন নতুন বউই রইলেন, আর কেউ বা বিবাহের এক হপ্তা পরে আঁচলে চাবি বেঁধে আপন অধিকারে গিন্নীপণায় আরূঢ়া হলেন। অর্থাৎ নিয়ম মেনে চললে ভাল লাগে, কিন্তু অনায়াসে কোনো স্থান অধিকৃত হচ্ছে দেখলে আরো ভাল লাগে। সীজানের ছবিতে বিষয়-বস্তু স্বকীয়স্থানে অধিষ্ঠিত বলে তার মূল্য, এবং ফ্রাই-এর ছবিতে সেটি ডিজাইনের নিয়ম অনুবর্ত্তনের জন্য। আবার বলছি, দু'এই আনন্দ পাই; কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করি সীজানের দৃষ্টি একাগ্র, কারণ, সেটি সমন্বিত, এবং রজার ফ্রাই-এর দৃষ্টির চেয়ে ডিজাইনের প্রতি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিটাই বেশী উন্নত সমন্বয়ের অভাব দ্বন্দ্বের নিদর্শন। পাঠকবর্গ যদি যামিনী রায় ও অতুল বসুর প্রদর্শনী চোখ খুলে দেখে থাকেন তবে আমি যা বলছি তা সহজেই বুঝবেন।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্য একটু ভয়ে ভয়ে লিখছি। রজার ফ্রাই-এর নির্ব্বাচিত গুরু সীজান হলেও তাঁর প্রকৃতিগত গুরু ছিলেন, আমার মতে, আংরে (Ingres)। Vision এর চেয়ে Design এর দিকেই নজর ছিল রজার ফ্রাই-এর বেশী—হয়ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষারই কৃপায়। সাজান, ম্যানে, গগ্যাঁ, মাতিস্, পিকাসো, সাইন্যাক, দেরেঁ, ফ্রীজ প্রভৃতি যে সব চিত্রকরের রচনা ১৯১০ ও

১৯১২ সালে গ্রাফ্‌টন্ গ্যালারীতে দেখান হয় তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বড় ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। এঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী আংরে, প্যুভিস্ দ' স্যাভান, দেলাক্রোয়া, ক্লদ্ লোরেন, প্রভৃতিরও ড্রাফ্‌ট্‌ম্যানশিপ জগদ্‌বিখ্যাত। দুটি পদ্ধতির তুলনা করলে বোঝা যায় যে আংরের নক্সা, চোখ দিয়ে বিষয়ের যে প্রাথমিক গড়ন ধরা পড়ে, তার রীতিনীতির ওপর ততটা নির্ভর ক'রে, নক্সা আঁকার সাধারণ নিয়ম-কানুনের আজ্ঞাবহ ছিল। এক হিসেবে, আংরের পদ্ধতিতে বিষয়-বস্তুর স্বকীয় গঠন ধরা পড়ত না। প্রথম যুগের সীজান ও ইম্প্রেসনিষ্ট দল সে অভাব ঠিক পূরণ করতে পারেন নি। কারণ, তাঁরা Visuality-তেই খতম হলেন। সেইজন্য, কথার ছলে ম্যানে প্রভৃতিকে রজার ফ্রাই পোষ্ট-ইম্প্রেসনিষ্ট বলেন। এঁরা আরো এগিয়ে বিষয়-বস্তুর পিছনে হাজির হলেন—অর্থাৎ বিষয়-বস্তুর প্রাকৃত গঠনে। এই হিসেবে রজার ফ্রাই-এর মন্তব্য অত্যন্ত বিচার-সম্মত—অর্থাৎ পোষ্ট-ইম্প্রেসনিষ্টরা পুরাতন ঐতিহ্যই বজায় রাখতে ব্যগ্র, তাঁদের প্রয়াস অভিনব নয়। কিন্তু, অন্যদিকও আছে। মানতেই হবে যে এঁদের যাত্রা সুরু হয়নি visual design-এর পৃথক অস্তিত্বে, অতএব তার সাধারণ রীতির উপলব্ধি থেকে। যদি তাই হত, তবে সম্পূর্ণভাবে ধারা বজায় থাকত। থাকে নি, তাই পোষ্ট-ইম্প্রেসনিষ্ট ধুরন্ধরদের পরে ডাডা-ইজম্। থাকতে পারল না, তার কারণ এ নয় যে আংরের ডিজাইন আর্টের চরম পরিণতি, কারণ, ফ্রান্সের গোড়ায় পচ ধরেছিল, নচেৎ তার আজকার পতনকে ভগবানের অভিশাপ বলতে হয়। রজার ফ্রাইএর শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল, উইলেনসকী যাকে architechtural design বলেছেন তাইতে। তিনি বুদ্ধির দিক থেকে এর কাছ ঘেঁসে একবার যান—ইটালি ভ্রমণের এক বর্ণনায় তিনি যে র‍্যাফেলের মাহাত্ম্য উল্লেখ করেন সেটা র‍্যাফেলের ঐ architechtural design-এর জন্য, তাঁর আঁকা মিষ্টি মুখের জন্য নিশ্চয় নয়। রজার ফ্রাই-এর রুচি শিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে উন্নত ছিল। অথচ, তিনি সেখানে পৌঁছতে পারলেন না, যা আমরা প্রত্যাশা করতে পারতাম তাঁর তর্কবুদ্ধি, তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা, তাঁর কোয়েকার সুলভ নৈতিক বিধানে আস্থা, তাঁর সমসাময়িক সমাজের শান্তিময় শৃঙ্খলা স্মরণ রেখে। কেন তিনি পারলেন না ? কারণ, ঐ বিচার-বুদ্ধি ও সৃষ্টিশক্তির বিরোধ। সীজান, ম্যানে, গগ্যাঁর অদ্ভুত ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে

যেমন বিচারের শেষ-বেশ হল না, তেমনই তাঁর সৃষ্টিশক্তি ঘুরে গেল সমাজ সেবায়। অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি তাঁকে শেখালে যে ইংরেজী আর্টের অফিসিয়াল একাডেমীর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই বিষয়-বস্তুর গঠনগত প্রকৃতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করলে। এটা মস্ত বড় কাজ; অনেকটা বাংলাদেশে হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ ১৯১০।১১ সালের চিত্রপ্রদর্শনীরই মতন। ১৯১০ সালের পূর্ব্বে লেটন, পয়ণ্টার, আল্‌মা-টাডেমা, কলিয়ার এবং রবিবর্ম্মা; ১৯১০।১১ সালের পর অগাষ্টস জন, ডানকান গ্রাণ্ট, স্পেন্সর, এরিক গিল, ভ্যানেসা বেল, লুইস এবং অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্র, বীরেশ্বর প্রভৃতি। ঐতিহাসিক অনুপাতটা এই, মায়, জনসাধারণের শ্রীমুখ থেকে অভদ্র গালাগালিটা পর্য্যন্ত। রজার ফ্রাই-এর কৃতিত্ব এই ভাবেই স্মরণীয় হবে। কিন্তু, আমরা যখন তাঁর জীবনের বিবরণই আলোচনা করছি, তখন ব্যক্তিগত ভাবে এই আর্টিষ্ট হিসেবে তাঁর অ-পরিণতিকে স্বীকার করতে হবে। তিনি আশা করছিলেন যে এইবার তাঁর নিজের চিত্রপ্রতিভা খুলবে। খুল্‌ল না। অতি-বুদ্ধির হাতে দড়ি। তবু, কি ক্ষুরধার বুদ্ধি! ভদ্রলোক সত্যই সভ্য ছিলেন।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

CO-OPERATIVE FARMING—S. K. Dey, I. C. S. Published by Indira Dey, Collector's House, Nadia. Price : Rupee one only.
ITALIAN ECONOMY AND CULTURE—Dr. Manindra Mohan Moulik. Published by Messrs Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta. Price : Rupees three only.

মিঃ এস. কে. দে প্রণীত "Co-operative Farming" গ্রন্থে তত্ত্বের জাবর কাটুনি নেই, কিন্তু তথ্যের সহজ সমাবেশ আছে। তিনি কোন মত প্রতিষ্ঠা করেননি শুধু পথের সন্ধান দিয়েছেন। যখন পথ বিভিন্ন মতের জঞ্জালে আকীর্ণ, তখন বাঙলার এক জেলার প্রধান কর্ম্মচারী দেশের পল্লী-উন্নয়ন সংকল্পে সত্যিকারের চেষ্টা দেখাবেন, তাতে বিস্ময়ের বস্তু না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসা ও অভিনন্দন দাবি করে প্রচুরভাবে। আমরা জমি-সমস্যায় জমি ও জমার দিকে তাকাইনে—আমরা কলহ করি জমির মালিকানা সত্ব নিয়ে। এই গ্রন্থে মিঃ দে জমির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে কৃষকের উন্নতি সাধন করতে হলে কৃষির উন্নতি প্রথম প্রয়োজন। এবং তাই তিনি নদীয়া জেলায় তিনটি সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপন করেছেন এবং তাদের ফলাফল মঙ্গলপ্রসূ হয়েছে।

আমরা সাধারণতঃ বাঙলাদেশে সমবায় আন্দোলন অর্থে বুঝি টাকা ধার করবার সুযোগ সৃষ্টি করা। সমবায় নীতি অনুসারে সম্পত্তির সাহায্যে যে সম্পদ সৃষ্টি করা যায়, তা বিদেশে গৃহীত হ'লেও আমাদের দেশে তার চেষ্টা খুব সামান্যই হয়েছে। নদীয়া জেলায় সমবায় কৃষি-সমিতি যে গড়ে উঠেছে তার সভ্য হবার যোগ্য হল অকুপান্সি রায়তগণ—সমিতির উদ্দেশ্য সমবায় নীতিতে চাষ করা এবং সেই নীতি অনুসারে লভ্যাংশ বণ্টন করা। চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কৃষ্ণনগরে তিনটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সমিতির মোট চাষের জমি হল ১০৯ বিঘা; মেহেরপুর সমিতির মোট জমি ১০৭ বিঘা এবং কৃষ্ণনগর সমিতির জমি ২৩৫ বিঘা। সমিতি গঠনের পূর্বে সেই সমিতির রায়তবর্গ ছিল বিচ্ছিন্ন এবং তাদের প্রত্যেকের জোত ছিল সামান্য—এত সামান্য যা' চাষ করলে অপচয়ের দিকটাই উগ্র হয়ে উঠে। নদীয়া জেলায় মোটের উপর এক একটি রায়তী জোতের পরিমাণ হল ৭'৩৫ বিঘা এবং নিম্ন রায়তী

জোত ১॥ বিঘা। এই ক্ষুদ্র জোতগুলিকে সম্মিলিত করে সমিতির অধীনে একটি বৃহৎ জোতে পরিণত করা হয়েছে। এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য কৃষির উন্নতি সাধন করা এবং উপযুক্ত মূল্যে কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় বন্দোবস্ত করা। এরকম সমিতি বিদেশে বহু আছে এবং এই ব্যাপারে ইতালীর "Consortium"-এর কার্য্যাবলী প্রণিধানযোগ্য।

মিঃ দে-র কৃতিত্ব হল যে, তিনি বাংলাদেশে সমবায় নীতি অনুসারে কৃষির উন্নতিকল্পে সমিতি গঠন করেছেন এবং সাফল্য দেখাতে পেরেছেন—যে দেশে রায়তবর্গের ভিতর স্তরবিভাগ আছে এবং যেখানে নিজের সত্বকে সজাগ না রেখে সমষ্টির জন্য শ্রম করবার পথে আইনগত ও সমাজগত বাধা অনেক। সবাই মিলে করি কাজ—এ রব বাঙালীর মুখের কথা, প্রাণের কথা নয়। তাই সমাজে ও রাষ্ট্রে আমরা মঙ্গল কামনাই করি, মঙ্গল সাধন করতে পারিনে। মিঃ দে কলরব না করে মঙ্গল সাধনার পথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই পথে তিনি কোন চমকপ্রদ মাদুলির সন্ধান দেননি বটে, কিন্তু বাঙলার কৃষির উন্নতির পথে সমবায় নীতির স্থান যে অতি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, তা' তিনি পরীক্ষিত ফল দ্বারা প্রমাণ করেছেন—তর্ক দ্বারা নয়। বিতর্কপ্রিয় বাঙালীর মনে এই দৃষ্টান্ত কতখানি দাগ কাটবে জানি না, কিন্তু বাঙলার গবর্ণমেণ্টের কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্য থাকা উচিত। এই co-operative farming এবং collective farming এক বস্তু নয়, একথাটা জানা দরকার।

আমাদের দেশে কৃষি-কর্মে সমবায় নীতি প্রচলন করার কতকগুলি বাধা আছে। আমাদের রায়তবর্গের ভিতর স্তর বিভাগ আছে এবং অনেক স্থলে কৃষকের সংখ্যা এত অধিক যে, জমির আয়ের উপর তাদের নির্ভর করা উচিত নয়। প্রজাস্বত্ব আইন কৃষির উন্নতির জন্য রচিত হয়নি—তাই সেই আইনের সাহায্যে চাষ না করে চাষী হওয়া যায় এবং রায়তী জোতকে অসঙ্গত ভাবে বিভক্ত করে লাভবান চাষের অনুপযুক্ত করা যায়। যে জেলায় রায়তের স্তরবিভাগ অত্যধিক এবং নানা শ্রেণীর রায়তের ভিতর খাজনার হারের তারতম্য অনেক, সেখানে কৃষিকর্মে সমবায় নীতি প্রচলন করা সুকঠিন। যদি একজন প্রথম স্তরের রায়তের ২০ একার জমি থাকে—তিনি একজন নিম্নস্তরের রায়তকে ১৫ একার বিলি করেছেন এবং সেই রায়ত আবার আর একজন নিম্ন রায়তকে

৭ একার বিলি করেছেন। প্রত্যেকের হাতে চাষের জমি আছে এবং প্রত্যেকেই অকুপান্সি রায়ত। এমন অবস্থায় সেই সব রায়তগণ যদি সম্মিলিত হয়ে সমবায় নীতিতে কৃষিকর্ম চালাতে প্রস্তুত হন—তাহ'লে লভ্যাংশ বণ্টনে এত তারতম্য থেকে যাবে যে, সমানভাবে পরিশ্রম ক'রে বিভিন্ন রকমের লাভ ভোগ করা সমবায় ধর্মকে আঘাত করবে। তাই, যার যত "শেয়ারস্" বেশি থাকবে, সে তত লভ্যাংশ বেশি পাবে—অথচ সব চাষীই সমান খাটবে—এই অবস্থার অসঙ্গতি মিঃ দে-কে আঘাত করেছে কি-না জানি না। তারপর সমস্ত জোত একত্রীভূত হলে যত রায়ত পূর্বে চাষ করত, তার প্রয়োজন হবে না—এ সমস্যা মিঃ দে অনুভব করেছেন কিন্তু এই উদ্বৃত্ত রায়তবর্গের একটা ব্যবস্থা প্রয়োজন। অর্থাৎ বাঙলাদেশে "কো-অপারেটিভ ফার্মিং" প্রচলন করতে হ'লে একটি সুসঙ্গত বিধানের প্রয়োজন—তার বাধাকে দূর করতে হবে এবং গ্রহণের পথকে সহজ করতে হ'বে। এই "প্ল্যানিং"-এর অভাবে বাঙলার মাঠ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং বাঙলার চাষী হাঁপাচ্ছে। গবর্ণমেণ্ট কলরব করে সমস্যাকে চাপা দিচ্ছেন—কিন্তু ব্যথা তাতে কমছে না। মিঃ দে-র পরিকল্পনা নদীয়া জেলার তিনটি সমবায় সমিতিতে সাফল্য লাভ করেছে বলে সমস্ত জেলায় সমস্ত রায়তবর্গব্যাপারে অন্য কোন জটিল সমস্যা সৃষ্টি না করে কার্যকরী হবে, তা' ভাববার কারণ নেই। কিন্তু "কো-অপারেটিভ ফার্মিং"-এর সম্ভাবনা এত প্রচুর যে, তার সফলতার পথে যে-সব বাধা আছে, তা' দূর করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য। এবং সে-কর্তব্য গবর্ণমেণ্ট করবেন কি-না, তা, মিঃ দে আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। মিঃ দে-র এই প্রচেষ্টায় অথবা তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় যদি বাংলার গবর্ণমেণ্ট কৃষিকর্মে সমবায় নীতি প্রচলন ক'রে প্রদেশের ঈপ্সিত উন্নতি সাধন করেন, মিঃ দে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর যদি মিঃ দে-র উক্ত তিনটি সমিতি দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করতে থাকে—তাহলেও প্রশংসা যিনি পাবার তিনি পাবেন, কিন্তু দেশের সমস্যা বিস্তৃতি লাভ করে মিঃ দে-র প্রশংসনীয় চেষ্টাকে গ্রাস করে ফেলবে।

দ্বিতীয় আলোচ্য গ্রন্থখানি ইতালীয় বিধান ও সংস্কৃতির পরিচয়। ডাঃ মৌলিক ইতালীতে গিয়াছিলেন অর্থনৈতিক গবেষণা করতে। তিনি চোখ দিয়ে যা' দেখেছেন, প্রাণ দিয়ে তা' লিখেছেন। পুঁথিগত বিদ্যাই তাঁর

একমাত্র সম্বল নয়। ইতালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁকে বিমুগ্ধ করেছে, ইতালীর নব অভ্যুত্থান তাঁকে বিস্মিত করেছে—তাই ইতালীর নানাবিধ প্রেরণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি আমাদের দিয়েছেন। D'Annunzio, Pirandello, Grazia Deledda Jucci, Carducci Sibilla Aleramo—প্রভৃতি ইতালীর চিন্তাশীল ব্যক্তির সহজ পরিচয় আছে—তাঁদের দান, বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতির আলোচন আছে। ইতালীর নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মতের অমিল থাকলেও ডাঃ মৌলিকের লেখার সরসতা ও সজীবতা পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট করবে।

এই গ্রন্থের সব চেয়ে বড় গুণ যে, তিনি ইতালীর পরিচয় দিতে গিয়ে মুসোলিনীকে প্রাধান্য দেন নি—ফ্যাসিষ্ট ইতালীর মনন কি কি প্রেরণা দ্বারা অনুরঞ্জিত, তার আলোচনায় ইতালীয় সভ্যতার মর্মকোষে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আলোচনার সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা গ্রন্থকারের মত পাই বেশি—বিচার পাই না। তাই যা আখ্যাত হয়েছে, অনেকস্থলে তা' ব্যাখ্যাত হয়নি—ফলে, জিজ্ঞাসু মনকে উৎসুক করবে, তৃপ্তি দেবে না।

শচীন সেন

পথ ও বিপথ (একাঙ্ক নাটক)—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। প্রকাশক বিশ্বভারতী।

COMMUNAL HARMONY—By Percival Spear (Oxford University Press).

'পথ ও বিপথ' সম্বন্ধে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে নাটকটি রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নয়। ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব, সুদীর্ঘ বক্তৃতার আতিশয্য ও আলোচনার অতিদুরূহতাই এর কারণ। সম্ভবত লেখকও অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এ নাটক রচনা করেন নি। ভারতের সাম্প্রতিক সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে

এটি রচিত। কাজেই সমস্যা সমাধানের সাফল্য এবং 'পথ ও বিপথ' সম্বন্ধে তাঁর মতামতের মূল্যই এ নাটকের প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

নাটকটির মূল চরিত্র দু'টি—গওহর ও সুজিত। ভারতের স্বাধীনতা এই দুই চরিত্রের যোগসূত্র কিন্তু ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ সম্বন্ধে দু'জনার মত-বিরোধ আছে। সৌভাগ্যবশত এটা সেই চিরন্তন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা মূলত হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কর্ম্মীরা প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িকতার আবরণে ঢাকা পরোক্ষ শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করবে?

গওহরের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে কল্পনাবিলাস প্রবল। সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি কখনও কখনও বিশ্লেষণীশক্তির আলোয় উজ্জ্বল কখনও বা ভাবুকতা ও রহস্যময়তার ধোঁয়ায় ঝাপসা। ভগবদ্‌বিশ্বাসী হলেও প্রচলিত ধর্ম্মের গ্লানি তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি তাই পুরাতনের জায়গায় নূতন এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর—সে ধর্ম্ম অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। বলা বাহুল্য এ ধর্ম্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শ্রেণিদ্বন্দ্বের কোন স্থান নেই। এই জাতীয়তাবাদের ধর্ম্ম যে সাম্রাজ্যবাদ কি ফাসিস্‌মের রূপ গ্রহণ করবে না সে সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চয়তার কারণ প্রথমত জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মত-বাদের প্রসার ও দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান। জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা সংগঠিত না হলে যে কি বিপর্য্যয় ঘটে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে বিজ্ঞানের বিপত্তির কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। এক কথায় বলতে পারা যায় যে সমাজ-ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মত বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সুজিতের চিন্তাধারার উপর সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। বিশেষত সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার মতামত প্রকাশ্যভাবে সমাজতান্ত্রিক। তাই Communal Awardএর প্রতি কংগ্রেসের 'না গ্রহণ, না বর্জ্জন' নীতি সুজিতের সমর্থন পেয়েছে যদিও সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক হিসাবে গণসংযোগের উল্লেখ করা উচিত ছিল।

কিন্তু সুজিতের সমাজতান্ত্রিকতার মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও শ্রমিক ও কৃষক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব সংগঠিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে তার সংশয় আছে।

সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে এ অসঙ্গতি অদ্ভুত। কারণ শোষিত জনসাধারণ তাদের নিজস্ব দাবীদাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সংগ্রামকে ভিত্তি করেই ব্যাপক জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তাদের নিজস্ব সংগ্রামে তারা যে পরিমাণে শক্তিলাভ করবে ঠিক সেই অনুপাতেই জাতীয় সংগ্রামের দ্বিধা, দৌর্ব্বল্য হতে মুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে। চীনদেশে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এড়িয়ে নয় শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্রতর করে তুলেই, সুদৃঢ় জাতীয় ফ্রন্ট্ গঠন সম্ভব হয়েছে; স্পেনের ইতিহাসও সেই সাক্ষ্য দেয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই অসঙ্গতির ফলে আপাতবৈষম্য সত্ত্বেও শেষ-পর্য্যন্ত ভাব-বাদী গওহরের সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক' সুজিতের কোন মূল পার্থক্য নেই, কারণ সাম্প্রদায়িকতার আবরণে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাকে স্বীকার করে ব্যাপকতর গণবিক্ষোভকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

এ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতাক্লিষ্ট বাঙ্গলা দেশে এ সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভাব এত শোচনীয় যে এই সব অসঙ্গতি ছাপিয়ে উঠে লেখকের আন্তরিকতাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য।

স্পিয়ার তাঁর পুস্তিকাটিতে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই উপায়টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অনুরূপ, অর্থাৎ বিষ দিয়ে বিষের উপশম। লেখকের মতে দেশের শাসনব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথমটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত একটি শাসনপরিষদ; এর কাজ হবে সর্ব্বসাধারণের স্বার্থসম্পর্কিত সকল রকম শাসনব্যবস্থা। আর, দ্বিতীয়টি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্প্রদায়িক বিষয়গুলি পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য এই প্রতিষ্ঠানটির নির্ব্বাচন সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। স্পিয়ার এর নামকরণ করেছেন "গিল্ড্"। তাঁর বিশ্বাস ভারতবর্ষে এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই পাশাপাশি অস্তিত্ব সম্ভব। ইউরোপের ইতিহাসে আমরা দেখি ফিউডাল যুগের পর নতুন প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাব বর্জ্জন ক'রে সম্পূর্ণ secularised করা হয়েছে। এর কারণ স্পষ্ট। ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির সঙ্গে ফিউডালিজমের যোগ অবিচ্ছিন্ন। তাই একটির হাত থেকে নিস্তার পেতে

হলে অপরাটিকে ধ্বংস করতে হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই সত্য বিশেষ-ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিই ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে লেখকের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এ দেশের পক্ষে অমঙ্গলকরই হবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কোথায় জানতে পারলে তার সমাধানও সহজ হয়ে আসবে। ভারতবর্ষের সমস্যা আজ বিশেষ করে তার দারিদ্র্যের সমস্যা। এই প্রকৃত সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যই সাম্প্রদায়িকতার বিষ রোপন করা হয়েছে। লেনিনের ভাষায়—"The reactionary bourgeoisie has everywhere taken care........to inflame religious enmity in order to divert the attention of the masses in this direction, away from really important and fundamental economic and political questions ...." একমাত্র জনসাধারণের সচেতন মনোভাব এই বিষ উৎপাটন করতে সক্ষম হবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভারত আবার তার সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য খুঁজে পাবে।

চিন্ময় সেহানবীশ

হে কিশোর-চিত্ত—শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়। ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি প'ড়ে মনে হয় যে গ্রন্থকারের রুচি মার্জ্জিত, ভাষা প্রাঞ্জল—এমন কি চিত্রকল্প, লিখনভঙ্গী সরস কিন্তু কল্পনাশক্তি নিশ্চল।

যে পরিকল্পনা অবলম্বন ক'রে তিনি আখ্যায়িকাটিকে দাঁড় করিয়েছেন তার প্রাণবস্তু গতায়ু হয়েছে অনেক বছর পূর্ব্বে। সেদিন আর এখন নাই যখন পল্লীগ্রামের ছাত্র কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের সংসর্গে এসে নিজের পারিবারিক ইতিবৃত্তি জ্ঞাপন করতে লজ্জাবোধ করত। এবং সাবেকী আমলের সেই ভালমানুষ নিরীহ বৃদ্ধরাও আজ বিগত যাঁরা নাকি অভ্যাগত যুবকদের জীবনের বৃত্তান্ত না জেনেই পরিবারভুক্ত ক'রে নিতেন।

তখনকার সমাজ সংস্কারের নূতন উন্মাদনায় যা কিছু সম্ভব বা স্বাভাবিক হ'য়ে থাকবে আজ তাই অবলম্বন ক'রে উপন্যাস রচনা করা নিরর্থক। মোটামুটি দেখতে গেলে আজ স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন যেমন পল্লীগ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে তেমনি বিবাহের বয়সও উর্দ্ধে উঠেছে। ফলে ভদ্র ঘরের যুবকেরা অবস্থাপন্ন বা উচ্চ শিক্ষিত না হলেও মার্জ্জিত ও পরিণত-চিত্ত নারীর সাহচর্য্য পাবার সুযোগ অনায়াসে পেয়ে থাকে এবং তাদের অভিজ্ঞতা যতই অল্প হোক না কেন তারা বর্ত্তমানে গ্রন্থের নায়ক নরেন-এর মত অশোভন ভাবে ব্রীড়াবনত হয় না।

নরেন যখন প্রথম কলিকাতায় আসে কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টায়, তখন তার কপাল-গুণে হঠাৎ নিভার পিতা সর্ব্বতোষ বাবুর সঙ্গে অভাবনীয় ভাবে পরিচয় হয়ে যায়। চির প্রচলিত রোমান্টিক প্রথায় জুড়ি গাড়ির ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মুখ থেকে তাঁকে উদ্ধার ক'রে নরেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে নেয়। তারপর সে এম. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছর সেই পরিবারে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে, নিভার করস্পর্শ ক'রে প্রেম জ্ঞাপন করেছে, কিন্তু নিজের স্ত্রী পুত্র যে বিদ্যমান সে কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নি।

প্রেম নাকি গোপনে রয় না, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে গুজবটি পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের অনেককে অকারণে উচাটন ক'রে তুললো। এদিকে নিভার বন্ধু ইরা যুবকটির প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ল। তরুণীদ্বয়ের ঈর্ষা ও ব্যথা অন্তঃসলিলার মত অদৃশ্যভাবে ব'য়ে চলেছিল, এমন সময়ে নরেন তার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরলো। তারপর এক সপ্তাহকাল সেবা ক'রে সে অবহেলিতা, অশিক্ষিতা মেয়েটিকে চিতায় তুলে অনুশোচনার ঘোরে একেবারে জামসেদপুরের এক ধর্ম্মঘটের আন্দোলনে ভিড়ে গেল। সেখান থেকে গেলো পুরীতে স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে।

গল্পের উপসংহারে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের রাজনৈতিক বোধের বিশ্লেষণ করা সমীচীন। তিনি ভারতীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত কারখানার মালিকদের প্রতিপক্ষে শ্রমিক আন্দোলনে দেখেছেন স্বদেশপ্রীতিপূর্ণ কর্ম্মজীবনের মাধুর্য্য। প্রথমে ভেবেছিলাম যে তিনি সাম্যবাদীদের মত শ্রেণী সংঘর্ষকে অনিবার্য্য ব'লে বিশ্বাস করেন এবং রিক্তদের স্বার্থের সঙ্গে দেশ-

প্রেমকে সমান করেছেন অনবধানে। কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পুরীর কাহিনী পড়ে সে ভুল ভেঙে গেল।

নরেন সেখানে এক কীর্ত্তন গায়ক দলের অনুগমন ক'রে সমুদ্রের মাঝে প্রচ্ছন্ন এক বালু চড়ার ওপর উপস্থিত হ'য়ে তাদের দলপতির কাছে শুনল—

"এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি আমাদের স্বাধীনতার কল্পনার খোরাক জুটিয়ে আসছে। আমরা কল্পনা করতে থাকি এই আমাদের একটা স্বাধীন উপনিবেশ। এই মনে ক'রে আমাদের আনন্দ ঐ সমুদ্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মতোই উৎফুল্ল হয়ে উঠতে থাকে। বাস্তবিক স্বাধীনতায় কত আনন্দ তা বুঝি না, কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় এই যে স্বাধীনতার—কল্পনার আনন্দ, এই যে দেশ জোড়া পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-লাভের সাধনা, এই আনন্দের কাছে প'ড়ে-পাওয়া স্বাধীনতার আনন্দ অতি তুচ্ছ।" বঙ্কিমী আনন্দমঠ ঢঙের এই উক্তিটি গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত ধারণার সারাংশ তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য।

নরেন-এর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির মধ্যে তার শিশুপুত্রের তত্ত্বাবধায়ক পিসিমা'র মৃত্যু ঘটে এবং নিভা দৈবাৎ সমুদায় সমাচার অবগত হ'য়ে সেই অনাথ বালকের ভার গ্রহণ করে। নরেন ফিরে এসে তাকে বিবাহ ক'রলে ভগ্নমনোরথ ইরা পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত এক অপদার্থ পাণিপ্রার্থীকে গ্রহণ ক'রে যারপরনাই লাঞ্ছিত হ'য়ে ইহলোকে ত্যাগ করে।

গ্রন্থের গল্পাংশটি মামুলী ও সেকেলে হ'লেও তথাকথিত আধুনিক তরুণ সাহিত্য হ'তে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কোথাও উৎকট বা উদ্ভট কিছুর নাম গন্ধ নাই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্শ্ব চিত্রের বর্ণনা মধুর হ'য়ে প্রকাশ হয়েছে। মোটের ওপর গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত শালীনতা পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মনে শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি নায়কের চরিত্রটি অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে গড়ে উঠেছে। তার ওপর পাঠকের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয় যখন সে পুরীর সমুদ্রের উপকূলে নিভার দাদা অপূর্ব্ব-র সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপনের পরও তাকে চিনতে পারলে না, আর যখন সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৎসরাধিক কাল অনাথ শিশু পুত্রের

কোন সংবাদ নিলে না। এই দুইটি অপরাধই অমার্জ্জনীয় ব'লে মনে হয় এবং গ্রন্থকারের সে বিষয় সচেতন থাকা উচিত ছিল।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

স্বামীজির জীবনকথা—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। কলকাতা প্রকাশনা নিকেতন। মূল্য এক টাকা।

"মানুষ রবীন্দ্রনাথ" বই-এর লেখক কাননবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নন্ সে বইখানি নিয়ে সমালোচক মহলে মতদ্বৈধ হয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রতিকূল সমালোচনার বিশেষ অবসর নেই। কারণ কানন বাবু শুধুই ঘটনার ক্রমিক ইতিবৃত্তি সাজিয়ে যাননি, স্থানে স্থানে তার সাহায্যে "জীবন কথা"র মহাপুরুষের মানবরূপ স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনী লেখার মূলসূত্র ও প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে অনেক পণ্ডিতী তর্ক আছে; কিন্তু মোটামুটি এইটুকু বলা যায়, যে লেখকের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত যা পুরাতন উপকরণকে নূতন আলোকে সমুজ্জ্বল করে তোলে অথচ লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতে ঐতিহ্যকে অবিচার করে না। কানন বাবুর স্বকীয় দৃষ্টি আছে যা'তে স্বামীজির সর্ব্বজন পরিচিত কাজ ও চিন্তাধারা একটা নতুন রূপ নেয়। কর্ম্মী ও ভাবুক বিবেকানন্দের অন্তস্থলে মানুষ নরেন্দ্রনাথ আছে, তাঁর মধ্যে অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি, প্রত্যক্ষদর্শিতা ও বিশ্লেষণ, এক কথায় আদর্শলিপ্সা ও বাস্তব বুদ্ধি এই দুই ভিন্নমুখী মনোভাবের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। এতো অল্প মূল্যে স্বামীজির একখানা সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য জীবনপ্রসঙ্গ পেয়ে আমরা খুশী ও কৃতজ্ঞ হই।

বিপক্ষে একটি কথা শুধু বলবার আছে কাননবাবু অনেক স্থলে নিজের ভাষার মোহে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছেন। হয়ত উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে ও

নাটকীয় বর্ণনায় বইখানি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পারে, কিন্তু 'জীবন কথা'র লেখকের কাছে আমরা আরো বেশী সংযম প্রত্যাশা করতে পারি। 'জীবনের পাগল পূজারী' 'জীবন নটরাজের অফুরন্ত লীলা খেলা' 'প্রাণধারার নিরন্তর বিকাশ'—এ ধরনের পদবিন্যাস কেমন যেন রবীন্দ্রগন্ধী। স্বামীজির আদর্শ যে বর্জ্জন নয়, জীবনকে অকপট ভাবে গ্রহণ ক'রে তার যাথার্থ্য-বিচার, এ সত্যটি "বাঁধন দিয়ে বাঁধন-ভাঙ্গা খেলা" হিসাবে বর্ণনা করলে তাতে কেবল লেখকেরই প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচয় মেলে, বক্তব্যটাও অনেক স্থলে কাব্য-ঘেঁসা হয়ে পড়ে।

নইলে "স্বামীজির কথা" সকলের কাছেই ভালো লাগার কথা।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-রচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী। মূল্য ৪॥০, ৫॥০, ৬॥০ ও ১০৲।

রবীন্দ্রনাথের যে-রচনাগুলি তিনি স্বয়ং অপরিণত ও বর্জনীয় মনে করেন সেইগুলি 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র সঙ্গে একত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে বিশ্বভারতী সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই রচনাগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন—এই সম্বন্ধে তাঁর অতিশয় উপভোগ্য চিঠি ও কবিতা প্রকাশকের নিবেদনে উদ্ধৃত হয়েছে—তবু বাঙালী পাঠকের কাছে এগুলি অমূল্য। তার কারণ দুই। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ কি ভাবে হয়েছিল এই রচনাগুলি তা' বুঝতে বিশেষ সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এই রচনাগুলির মধ্যে অপরিণত অংশ বাদ দিলেও, এমন যথেষ্ট বাকী থাকে যার সাহিত্যিক মূল্য চিরন্তন, সেগুলিকে চিরকালের জন্যে বর্জন করলে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। এই অচলিত সংগ্রহ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হ'লেও ভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে শুধু

গদ্যে বা পদ্যে রচিত যে সকল পুস্তক বা পুস্তিকা একবার মুদ্রিত হয়ে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই সেইগুলি প্রকাশিত হয়েছে—যথা, কবি-কাহিনী, বনফুল, ভগ্ন-হৃদয়, রুদ্র-চণ্ড, কাল-মৃগয়া, বিবিধ প্রসঙ্গ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত ও বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম সংস্করণ। 'জীবনস্মৃতি'-তে ও অন্যত্র এই সকল রচনার অনেকগুলির কথা পড়ে স্বভাবতই এগুলি পড়বার জন্যে আমাদের যে-আগ্রহ হয়েছিল, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের উদ্যোগে এতদিন পরে তা' চরিতার্থ হবার সুযোগ হ'ল। অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের যে সকল রচনা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই থেকে গেছে সেগুলি সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

হিরণকুমার সান্যাল

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

বাঙলা কথাসাহিত্য ও বাঙলা গদ্য

পাঠকগণের হয়তো মনে আছে গত 'আশ্বিন' সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষ-লিখিত 'ফসিল' নামক গল্পের একটি চুম্বক এই পত্রিকা-প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল! গল্পটি বেরিয়েছিল 'অগ্রণী' পত্রিকাতে। অতঃপর ঐ লেখকের আরো তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে: দুটি 'দেশ' পত্রিকায়, একটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যায়। শেষোক্ত গল্পটির নাম 'শক-থেরাপী'। 'ফসিল' পড়ে লেখকের অসামান্য ক্ষমতা সম্বন্ধে যে-ধারণা হয়েছিল তা বদ্ধমূল হ'ল 'শক থেরাপী' পড়ে। বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীদের মধ্যে শুধু এই দুটি গল্পের জন্যে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষ গৌরবের স্থান অর্জন করেছেন, যেমন রাখালচন্দ্র সেন করেছেন তাঁর 'সহযাত্রী' গল্পের জোরে।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষের লেখা পড়ে তাঁর ভাষার তারিফ না ক'রে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের হাতে চলতি বাঙলা যে শক্তি ও সম্পদ অর্জন করেছে তার সনিপুণ প্রয়োগ দেখা যায় সুবোধচন্দ্রের প্রত্যেকটি গল্পে। সমসাময়িক আর কোনো লেখকের লেখা এত প্রাণবান বাঙলা গদ্য আমি পড়িনি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। উপন্যাসে বা গল্পে ভাষার স্থান গৌণ। এমন একাধিক উঁচুদরের কথা-সাহিত্যিকের নাম করা যেতে পারে যাঁদের ভাষা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই জনেরই রচনায়। অপর পক্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী —এঁদের একজনেরও ছোট গল্পের বা উপন্যাসের ভাষা আমাদের মোহাবিষ্ট করেনা, রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো গদ্যরচনার ভাষার মতন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অবশ্য বাঙলা ভাষায় নতুন ষ্টাইলের প্রবর্তক। ভঙ্গীদোষসত্ত্বেও এই ষ্টাইল অত্যন্ত উপভোগ্য। কিন্তু এই ষ্টাইলের পরিচয় আমরা প্রধানত পাই প্রমথবাবুর প্রবন্ধে, তাঁর গল্পে নয়। গল্প-লেখক হিসাবে

তাঁর কৃতিত্ব এইখানেই। সুদক্ষ শিল্পী বলেই ন্যূনতম কথায় ও নিতান্ত মামুলী ভাষায় তিনি এমন নিছক ছোট গল্প লিখতে পেরেছেন যার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে নাই। এই রকম বিনা আড়ম্বরে গল্প বলার কৌশল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও আয়ত্ত করেছিলেন।

বাঙলা কথাসাহিত্যের আলোচনা শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে করা অসম্ভব। গল্পরচনায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা কেউ অস্বীকার করবে না এবং ছোট গল্পে বা উপন্যাসে তাঁর আখ্যায়িকার বাহন হিসাবে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তার প্রয়োগে তাঁর দক্ষতাও সকলেই মানবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভাষা তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একেবারে আদ্যন্ত ধার করা--তাঁর বিশ বা চল্লিশ বার 'গোরা'-পাঠের কিম্বদন্তী সত্য হোক বা না হোক। এই জন্যে যেখানে তাঁর বক্তব্য দুর্বল, সেখানে তাঁর ধার-করা ভাষার শিথিল অভিভাষণ অসহ্য লাগে, কেননা এমন ভাষা সৃষ্টি তাঁর অসাধ্য ছিল যা শুধু স্বকীয় গৌরবে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই রকম ভাষা পাই একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পে বা উপন্যাসে তাঁর ভাষার ইন্দ্রজাল আখ্যায়িকার আকর্ষণকে ক্ষুন্ন করেনি, প্রবলতর করেছে। কথাসাহিত্যের ইতিহাসে ভাষার ও আখ্যায়িকার এই রকম বিস্ময়কর সমাবেশ বিরল।

এই প্রসঙ্গে আর একজন লেখকের নাম না করলে অন্যায় হবে: শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু: বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতন বাঙলা ভাষাকে তিনি কোন নূতন সম্পদ দান করেন নি; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মতন কোনো নূতন ভঙ্গীরও প্রবর্তক তাঁকে বলা যায় না। কিন্তু তবু যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেন তা একেবারে তাঁর স্বকীয় ভাষা; আশ্চর্য কৌশলে এই ভাষাকে তিনি তাঁর আখ্যায়িকার যোগ্য বাহন ক'রে তুলেছেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু যে জাতীয় রসরচনার জন্যে খ্যাত, তার সাফল্য শুধু আখ্যায়িকার পরিকল্পনা নয়, রচনাভঙ্গীর উপরও অনেকখানি নির্ভর করে।

পরবর্তী লেখকদের মধ্যে এমন পাঁচ ছয় জনের নাম করা যেতে পারে গল্পে ও উপন্যাসে যাঁরা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই ভাষা সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন; তাই শিথিল রচনা-ভঙ্গী ও শব্দের অপ-

প্রয়োগ গল্পের আকর্ষণ সত্ত্বেও আধুনিক বাঙলা কথা-সাহিত্যের পাঠককে পদে পদে ক্ষুব্ধ করে। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখা যায় দুজনের রচনায়; 'বনফুল' ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ ভাবে, 'বনফুল' যে আধুনিক বাঙলা গদ্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক তাতে সন্দেহ নাই।

'নিরুক্ত'

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের দ্বৈত সম্পাদনায় বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিক পত্র 'নিরুক্ত' গত আশ্বিনে আবির্ভূত হ'য়েছে—শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার সহচর না প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তা বলতে পারি না। তবে, বাঙলায় সার্থক কবিতা এত প্রচুর লেখা হয় না যে মিশ্র পত্রিকা-গুলির চাহিদা মিটিয়েও দুটি বিশুদ্ধ কবিতার কাগজের খোরাক প্রতি তিন মাসে দু'দফা যোগাড় হ'তে পারে। তাই ভেজালের আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। 'নিরুক্ত'-র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-প্রেরিত আশীর্বাদ-পত্রে ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র-লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই ভেজালেরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্র ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। 'কাব্যের সুস্থ আদর্শ অটুট রাখার চেষ্টাই' যে 'নিরুক্ত'-র উদ্দেশ্য প্রেমেন্দ্র বাবু এই কথা আমাদের জানিয়েছেন ও এই আশ্বাস দিয়েছেন যে 'সাম্প্রতিক কাব্যের কয়েকটি লক্ষণ কেন আমরা রোগের প্রকাশ বলে মনে করি ভবিষ্যতে তা সবিস্তারে আলোচনা করতে আমরা দ্বিধা অবশ্য করব না।' ভবিষ্যতের কথা অবশ্য অনিশ্চিত, কিন্তু 'নিরুক্ত'র প্রথম সংখ্যা প'ড়ে কাব্যের সুস্থ আদর্শ সম্বন্ধে পাঠকের যে কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হবে তা মনে হয় না। তবে, 'নিরুক্ত'-র একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি শুধু 'সাম্প্রতিক' কবিদের মুখপত্র নয়। প্রমাণ, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের কবিতা এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে রাজনীতি-ক্ষেত্রের মতন সাহিত্যের ক্ষেত্রও একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যদি 'নিরুক্ত' সাম্প্রতিক ও অসাম্প্রতিক সকল কবি-গোষ্ঠীরই মুখপত্র হয় নিশ্চয় তা' আনন্দের কথা। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র অভিজ্ঞ সম্পাদক ও কৃতী সাহিত্যিক, সুতরাং তাঁর চেষ্টায় এই রকম একটি পত্রিকা গড়ে উঠবে এই আশা করা অসঙ্গত হবে না।

'চতুরঙ্গ'

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, সমালোচনা, এবং সিনেমা, সঙ্গীত ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য ইত্যাদি বিবিধ উপকরণে সজ্জিত গত আশ্বিন সংখ্যার 'চতুরঙ্গ' বিষয়ে ও বহরে ত্রৈমাসিক পত্রিকার যোগ্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়-লিখিত 'লিয়ঁ ট্রট্স্কী' ও 'ফিরিস্তা'-লিখিত 'ট্রট্স্কীবাদ' এই সংখ্যার দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। নামকরণ থেকেই এই প্রবন্ধ দুটির পার্থক্য বোঝা যায়। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় ট্রট্স্কীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ এই উভয়ের সাহায্যে। 'ফিরিস্তা' সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে 'ট্রট্স্কী'র নামের সঙ্গে যে-মতামত, যে-কর্মনীতি জড়িত শুধু তারই আলোচনা করেছেন। এই দুটি প্রবন্ধ পড়ে একটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ঃ ষ্টালিন-এর সঙ্গে ট্রট্স্কীর বিরোধের প্রকৃত কারণ কি। ভবিষ্যতে এই রকম প্রবন্ধ আরো ছাপাতে পারলে বাঙলা পত্রিকার আসরে 'চতুরঙ্গ' যে-সম্মানের স্থান অধিকার করেছে তা অটল থাকবে।

স

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।